কোরআন শরীফ

প্রথম খণ্ড

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফছীরসহ

কোরআন শরীফ

প্রথম খণ্ড

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

৩/১৩, লিয়াকত এভিনু্য, ঢাকা-১

দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রথম সুলভ সংস্করণ

প্রকাশকাল
মাঘ, ১৩৮২

ঝিনুক পুস্তিকার পক্ষে
রুহুল আমিন নিজামী কর্তৃক
৩/১৩, লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা-১
হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ শিল্পী
হাশেম খান

জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১
মহীউদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক মুদ্রিত।

হাদীয়াঃ বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে।

اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

নিশ্চয় আমার সব প্রার্থনা, সব উপাসনা, আমার সব সাধনা, সব কোরবান, আমার সকল জীবন, সকল মরণ —সকল বিশ্বের স্বামী আল্লাহ্‌র নামে নিবেদিত।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

প্রভু হে!
নিজের দীন-দাসের পক্ষ হইতে ইহাকে কবুল কর নিশ্চয় তুমিই ত সম্যক্‌ শ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

প্রভু হে!
যদি ভুলিয়া যাই বা ভুল করিয়া ফেলি—সেজন্য এই দুর্বল বান্দাহ্‌কে দায়ী করিও না।

আমীন।

THE HOLY QURAN

With

BENGALI TRANSLATION AND TAFSIR

Volume No-1

(COMPLETE IN 5 VOLUMES)

by

Mohammad Akram khan

Hadia : Tk. 12·50

সূরা ফাতেহা ১

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে(১)

١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ○

১। যাবতীয় কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌রই (২) প্রাপ্য—যিনি সকল জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার, (৩)

٢ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ○

২। যিনি করুণাময় কৃপানিধান,

٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ط○

৩। যিনি বিচারদিবসের মালিক,

۴ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ط○

৪। (হে আমাদের পরওয়ারদেগার !) আমরা এবাদত করি একমাত্র তোমারই—আর সাহায্য-প্রার্থনা করি একমাত্র তোমারই নিকটে, (৪)

۵ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ○

৫। আমাদিগকে পরিচালিত করিও সরল-সুপ্রতিষ্ঠিত পথে—

۶ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ○

৬। যাহাদের উপর কৃপা করিয়াছ তাহাদের (অবলম্বিত) পথে, (৫)

٧ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ع○

৭। কিন্তু দণ্ডভাজন করা হইয়াছে যাহাদিগকে এবং সুপথ-হারা হইয়াছে যাহারা, তাহাদের পথে নহে। (৬)

তাফ্‌ছীর

১। টীকা ঃ বিছ্‌মিল্লাহ্‌

বে-বর্ণ, এছ্‌ম ও আল্লাহ্‌—এই তিনটি শব্দের সংযোজনে উৎপন্ন। উহার শাব্দিক অর্থ—"আল্লাহ্‌র নামে।" ভাবার্থে—"আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি।" যে কোনও সৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ করার সময় বিছ্‌মিল্লাহ্‌ বলা প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ অযু করার পূর্বে, খাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে এবং কোনও জীবজন্তু জবেহ্‌ করার সময়, এ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা আবশ্যক। হযরত রাছুলে করীমের বিভিন্ন আমল ও আদেশ হইতে এ বিষয়ের তাকীদ প্রমাণিত হইতেছে। (হাদীছের কেতাব ও এবন-কাছীর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

"আল্লাহ্‌" হইতেছে মূল নাম, রাহমান ও রাহীম প্রভৃতি নামগুলি হইতেছে তাঁহার "এছ্‌মে ছেফৎ" বা গুণবাচক নাম। ৯৮টি গুণবাচক নাম তাঁহার ওলুহীয়তের এক একটি দিকের মহিমা কীর্তন করিতেছে। কিন্তু ইহা দ্বারাও তাঁহার "জাত" বা সত্তার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইতে পারে নাই। অবশ্য, মানুষের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ভাষায় ইহার অধিক আশা করাও সঙ্গত হইবে না। কোর্‌আন মাজীদে অন্যত্র বলা হইয়াছে—و له الاسماء الحسنى। অর্থাৎ —সৎ, সুন্দর ও সুমহান নামগুলি সমস্তই তাঁহার। (আ'রাফ ৮০ আয়াত)। হাঁ তাঁহার, একমাত্র সেই পরম সুন্দরের অরূপ স্বরূপের মহিমা কীর্তনের এক একটা মন-বুঝান উপকরণ মাত্র।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইতেছে মানুষ এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ সমাজ হইতেছে তাওহীদের সাধক ও উপাসক মুছলমান—সেই মুছলমানের জামা'আত্‌ভুক্ত হইয়া আমরা সেই সত্য সুন্দরকে ভুলিয়া থাকিব, এ কেমন কথা।

আল্লাহ্‌—আমি যতটুকু জানি ও বুঝি, দুনিয়ার কোনও ভাষায় "আল্লাহ্‌" শব্দের অনুবাদ করা সম্ভব হইতে পারে না। উহার কোনও ত্রুটীহীন ও দার্শনিক সংজ্ঞা দেওয়াও মানুষের সাধ্যাতীত। আরবী সাহিত্যের দিক দিয়া ইহার উৎপত্তিগত ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধেও দোস্ত-দুশমনদের মধ্যে কেহই কোনও কূল-কিনারা করিতে পারেন নাই। আমাদের তাফ্‌ছীরকারগণের একদল আলেম ইহার ধাতুমূল আবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী কাল্পনিক অভিমতের উল্লেখ করা ব্যতীত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বহু বিজ্ঞ আলেম ইহাকে اسم جامد Not derivable মৌলিক শব্দ—উহার اشتقاق বা Derivation হইতে

পারে না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (কাছীর)। ইহাই সঙ্গত কথা। God বা ঈশ্বরের যতগুলি প্রতিশব্দ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত আছে, আরব পৌত্তলিকগণ সেগুলিকে নিজেদের দেবদেবীদিগের উপর প্রয়োগ করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহার কোনওটাকে আল্লাহ্ নাম দিতে, আরবের কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত-পুরোহিতগণ কস্মিনকালেও সাহসী হয় নাই। কারণ তাহারা জানিত যে, ইহা অনাদি আল্লাহ্‌র অনাদি নাম, তাহাদের ব্যাকরণ অলঙ্কারের বহু উর্ধ্বে তাহার স্থান।

২। টীকা ঃ হাম্‌দ্, বা কৃতজ্ঞতা

আল্-হাম্‌দো অর্থে সকল প্রকারের সমস্ত হাম্‌দ। হাম্‌দ শব্দের অর্থ শোকরগোজারী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। "মহিমা কীর্তন" অর্থও হইতে পারে। কিন্তু ঐ দুই অর্থের ফলিত তাৎপর্য অভিন্ন। কেবল তা'রিফ বা প্রশংসা বুঝাইতে হইলে হাম্‌দ না বলিয়া মাদ্‌হ مدح বলা হইত। ইমাম এবন জারীর, ইমাম শাওকানী প্রভৃতি "কৃতজ্ঞতা প্রকাশ" অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় কাহারও কোনও উপকার বা অনুগ্রহের জন্য। আমাদের মানব জীবনের সমস্ত উপকরণ উপাদানই একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহদান। সুতরাং আমাদের সমস্ত শোকরগোজারী একমাত্র তাঁহারই দরগাহে নিবেদিত হওয়া উচিত। দুনিয়ার জীবনে আমরা মানুষের দ্বারা উপকৃত হই, অন্নের দ্বারা উপকৃত হই, পানির দ্বারা উপকৃত হই, এবং এই প্রকারের আরও অনেক বিষয় ও বস্তু দ্বারা উপকৃত হই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ সমস্ত নিমিত্ত ও উপাদানগুলি আমাদের পাওয়া উপকার বা অনুগ্রহের আদি কারণ মোটেই নহে। সেগুলিও আমাদেরই মত আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, তাঁহার নিয়োজিত এবং তাঁহা কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত। কাজেই নিজেদের জীবনের প্রতিস্তরের প্রত্যেক নিয়ামতের জন্য আমাদিগকে আল্লাহ্‌র হুজুরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে, মনে মুখে ও প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যের দ্বারা।

কিন্তু মানুষের উপর আল্লাহ্‌র নিয়ামতের অন্ত নাই। তার জীবনের সবকিছুই তাঁহার অনুগ্রহ-দান। এ অবস্থায় দুর্বল মানুষের পক্ষে সেই সব নিয়ামতের শোক্‌রীয়া যথাযথভাবে আদায় করা কি সম্ভব? এক কথায় ইহার উত্তর—না, সম্ভব নহে। শেখ ছা'দী বলিয়াছেন—মানুষের জীবন প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নির্ভর করে তাহার শ্বাস ক্রিয়ার উপর। ইহা দ্বারা বাহিরের বাতাস অধঃগত হইয়া জীবনকে বর্ধিত করে, আবার তাহা বাহির হইয়া দেহকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে। অতএব প্রত্যেক নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে দুইটি নিয়ামত বিদ্যমান এবং এক-

একটি নিয়ামতের জন্য যদি একবার মাত্র শোকর আদায় করিতে হয়, তাহা হইলেও প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মানুষকে অন্ততঃপক্ষে দুইবার শোকর করিতে হয়। তাহার পর তিনি ইহার সমাধান হিসাবে উপসংহারে বলিতেছেন—

بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر بدرگاه خدا آورد

ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد

"সেই বান্দাহ্‌-ই উত্তম, যে সদাসর্বদা খোদার দরগাহে নিজের ত্রুটিগুলিকে স্বীকার করিতে থাকে।

"নচেৎ তাঁহার খোদাঅন্দীর উপযুক্ত (শোকর বা এবাদত) বজায় করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই।"

অন্তরের অন্তস্তলে এই যে নিজ অপরাধের অনুভূতি, এবং এই যে অনাবিল কণ্ঠে বান্দাহ্‌র ত্রুটী স্বীকার —আল্লাহ্‌র অভিপ্রেতও ইহাই।

রাব্‌—এই শব্দে যুগপৎভাবে দুইটি তাৎপর্য নিহিত আছে। ইহার অর্থ—(১) মালিক, প্রভু। (২) তারবিয়ৎ —অর্থাৎ কোনও বস্তুকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যবর্তিতায় পূর্ণতার সীমায় পৌঁছাইয়া দেওয়া। (ছেহাহ্‌, জাওহারী, মিছ্‌বাহুল মুনীর, রাগেব, এবন-কাছীর, বাহ্‌রুল মুহীত, ফাৎহুল কাদীর প্রভৃতি)।

আলাম্‌—অর্থে জাহান, World। জগৎ, বিশ্ব বা ভুবন বলিয়া উহার অনুবাদ করা সঙ্গত হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। অবশ্য পূর্বে আমিও "জগৎ" বলিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছিলাম। আমাদের বাসস্থান এই ভূ-মণ্ডল একটি আলাম্‌। এইরূপে আকাশ মণ্ডলে আরও বহু আলাম্‌ বা জাহান আছে। ধাতুগত হিসাবে, যাহার দ্বারা অন্য কোন বিষয় বা বস্তুর পরিচয় জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়, তাহাকেই আলাম্‌ বলা হয়। যেহেতু পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রাদির দ্বারা সেগুলির সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, এই জন্য ঐগুলিকেও ব্যবহারে 'আলাম্‌ বলা হয়। এই অসংখ্য আলামের মধ্যে অতি অল্পের সন্ধান মানুষ আজ পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহার কোনওটির প্রকৃত স্বরূপ আজও নিশ্চিতভাবে জানিতে পারে নাই।

এখন এই আয়াতের সার শিক্ষাগুলি যথাক্রমে উল্লেখ করিতেছি :

(১) আমরা এই জীবনে যে সমস্ত নিয়ামত প্রাপ্ত হইয়াছি বা হইতেছি, সে সমস্তই একমাত্র আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ-দান। একমাত্র আল্লাহ্‌র —অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহা দান করে না, করিতে পারে না। সুতরাং কোন ইষ্টের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রার্থনাও করা যাইতে পারে না এবং শোকরীয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করা যাইতে পারে না।

(২) আল্লাহ্ হইতেছেন রাব্ বা পরওয়ারদেগার। তিনি মালিক বা প্রভু হিসাবে সকল জাহানকে, বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া পূর্ণতার সীমায় পৌঁছাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সেই পূর্ণতা লাভের জন্য, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

(৩) মানব সমাজ দৈহিক হিসাবে এই উৎকর্ষের পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু আত্মার দিক দিয়া মানুষ যে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কতটা কদর্‌দানী করিয়াছে, তাহা বলা কঠিন। আল্লাহ্‌র নিয়ামতের—তাঁহার দেওয়া বিবেক-বুদ্ধির অমর্যাদা করিলে, অব্যবহার বা অপব্যবহার করিলে, মানুষের যে অধঃপতন ঘটিতে পারে, ইহাও সেই প্রভু-পরওয়ার্‌দেগারের ন্যায়-রাজ্যের অমোঘ নিয়ম, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

৩। টীকাঃ ইয়াওমিদ্দীন

ইয়াওম্ শব্দের সাধারণ অর্থ—সূর্য উদয়ের সময় হইতে সূর্য অস্ত যাওয়ার কাল। কিন্তু ব্যবহারে সময়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোনও অংশকে ইয়াওম বলা হইয়া থাকে (রাগেব, মুহীত, মিছ্‌বাহুলমুনীর, ফাৎহুলবায়ান প্রভৃতি)। ইমাম রাগেব ইহার প্রমাণ হিসাবে কোর্‌আন মাজীদের কয়েকটা আয়াতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্চাশ হাজার বৎসরেও "একদিন" হইতে পারে (মাআরেজ, ৪)। সুতরাং "বিচার দিবসের মালিক" অর্থে—বিচারের যে কোনও সময়ের একমাত্র কর্তা বা বিচারক তিনি। সে বিচার কাল দুনিয়াতেও উপস্থিত হইতে পারে, বরং হইয়া থাকে। কিন্তু আসল বিচারের ও সম্পূর্ণ বিচারের সময় উপস্থিত হইবে মানব সমাজের বর্তমান জীবনের অবসান ঘটার পর। কোর্‌আন মাজীদের বহু সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে শেষ-বিচার অনুষ্ঠিত হইবে সমগ্র মানব সমাজকে নিয়া, একত্রে একই সময়ে। বলা বাহুল্য যে, সমগ্র মানব সমাজের মৃত্যুর (ও পুনর্জীবনের) পূর্বে তাহা সম্ভব হইতে পারে না।

মানব সমাজের সৎ ও অসৎ সমস্ত কৃতকর্মের একটা শেষ ও সম্পূর্ণ বিচার হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, সে সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। দুনিয়ায় কত চোর পরস্ব অপহরণ করিয়া আইনকে ফাঁকি দিতেছে, কত নরহন্তা ধরা পড়িতেছে না, কত পাষণ্ড অবলা নারীর উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াও আইনের ফাঁকের মধ্য দিয়া মুক্তি লাভ করিতেছে, কত জালেম বাদশাহ্ আল্লাহ্‌র নিরপরাধ বান্দাদিগকে হত্যা করিয়া বিজয়ী বীরের গৌরব লাভ করিতেছে। সমাজ জীবনে এই শ্রেণীর শত শত অমানুষিক জুলুম-জবরদস্তি ঘটিতেছে। অথচ দুনিয়াতে তাহাদের অনেকের উপর কোনও দণ্ড প্রবর্তিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে

কত সাধু সজ্জন দুনিয়াতে নিজেদের সাধনার পুণ্যফল লাভ করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ইহার একটা বিচার অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় হক্কের হাকীম আল্লাহ্‌র ন্যায় ও নিয়মের রাজ্যের নামে কলঙ্ক বর্তিয়া যাইবে।

দুনিয়াতে মোটেই কোন দণ্ড আসে না, অথবা আদৌ কোনও পুরস্কার আসে না, এরূপ মনে করাও উচিত নহে। কত মাতাল অল্প বয়সে লিভার পচিয়া মরিয়া যাইতেছে, কত লক্ষপতি জুয়াড়ী শেষ বয়সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে, কত ব্যভিচারী নিজের পাপ-জীবনের অভিশাপ বহন করিয়া কানা বোবা অন্ধ খঞ্জ হইয়া জঘন্য জীবন যাপন করিতেছে। এই শ্রেণীর বহু উদাহরণ সদাসর্বদা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। আমরা সেগুলি দেখিয়াও দেখি না। এক একটা জাতি, এক একটা জনপদ নিজেদের পাপের প্রতিক্রিয়ায় আকস্মিকভাবে দুনিয়া হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা পলে পলে তিলে তিলে বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখার অবসরও আমাদের নাই। অতীতের ইতিহাস, চল্‌তি দুনিয়ার হাল-আহ্‌ওয়াল অথবা নিজেদের পারিবেশিক পরিস্থিতিগুলিতেও আমরা দেখিবার শিখিবার ও চিন্তা-ভাবনা করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাই না।

সাধুসজ্জন মানুষ যে দুনিয়াতে কোনও পুরস্কার লাভ করিতে পারেন না, সাধারণভাবে এ-কথাও স্বীকার করা যায় না। তবে কথা এই যে, পার্থিব জীবনের কল্যাণের জন্য যে সাধনা—পার্থিব জীবনে তাহার ফল পাওয়া যায়, এবং পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের জন্য যে সাধনা—তাহার পুণ্যফল দেওয়ার জন্যই আখেরাত্ বা পরবর্তী জীবন। সাধু ব্যক্তিরা সেখানে নিজেদের পুণ্যফল লাভ করিবেন সম্পূর্ণভাবে, বরং বহুগুণ বর্ধিত পরিমাণে। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, "সাধুসজ্জন" কথাটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করে, আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের, বিশেষতঃ নিজের পোষ্য প্রতিপাল্য স্বজনগণের প্রতি নিজের কর্তব্যপালন করে এবং নিজের প্রতি কর্তব্যপালন করে, ইছ্‌লামের পরিভাষায় তাহারাই সাধুসজ্জন বা আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাহ্। যাহারা অলস, যাহারা অপব্যয়ী এবং যাহারা একদিকের কর্তব্য পালন করিয়া অন্যদিকের কর্তব্যে অবহেলা করে, তাহাদিগকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না।

দীন—এখানে দীন অর্থে কর্মফল। ফলতঃ আয়াতের তাৎপর্য হইবে—আল্লাহ্ কর্মফল দানের সময়ের কর্তা। কিন্তু কর্মফল দেওয়া হইবে বিচারের পর। সেই জন্য ভাবার্থে উহার অনুবাদ করা হয় "বিচার দিবসের মালিক" বলিয়া। দীন অর্থে ধর্মও হইয়া থাকে। স্থান ভেদে এইরূপ অর্থভেদ ঘটিয়া থাকে।

বিচারের সর্বময় কর্তা সেখানে স্বয়ং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলা, সেখানে সে বিচারে কোনও দোষ-ত্রুটী স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৪। টীকা: এবাদত্

অভিধানে এবাদত্ শব্দের অর্থ—হেয়তা স্বীকার। শরীয়তের পরিভাষায় উহার সংজ্ঞা হইতেছে:

ما يجمع كمال المحبة و الخضوع و المخوف

"সম্পূর্ণ প্রেমভাবের সহিত সম্পূর্ণ বিনয় ও ভয়ের একত্র সংযোগ," এক কথায় প্রেমভাবে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এখানে সম্পূর্ণ প্রেমভাব ও সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ কথা দুইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দাসভাবে আত্মসমর্পণ ও প্রেমভাবে আত্মসমর্পণে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আবার প্রেমের পরিপূর্ণতার স্বাভাবিক ফল হইতেছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ। বান্দাহ্‌র সব ইচ্ছা, সব সাধ, সব প্রবৃত্তি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যখন লীন হইয়া যায়, তখন সে পরিচালিত হয় তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে, তাঁহারই ফরমানে আত্মসমর্পিত ফরমাঁবরদার বান্দাহ্ হিসাবে। হাফেজ এবন-কাছীর বলিতেছেন;—"দীন-এছলামের সব শিক্ষাই এই দুইটি তাৎপর্যের দিকে ফিরিয়া আসে। জনৈক পূর্ববর্তী লেখক বলিয়াছেন—কোর্‌আনের সার তত্ত্ব হইতেছে সূরা ফাতেহা আর ফাতেহার সার তত্ত্ব হইতেছে এই আয়াতটি।"

নাস্তায়ীন—এস্তেআনাত মছ্‌দার হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ মদদ্ চাওয়া, সাহায্য প্রার্থনা করা।

আয়াতে "ইয়া কা" কর্মপদটি, না'বোদো ও নাস্তায়ীনো ক্রিয়া পদের পূর্বে আনা হইয়াছে। ইহার ফলে অর্থ হইয়াছে—আমরা এবাদত্ করি এক-মাত্র তোমারই ও সাহায্য প্রার্থনা করি একমাত্র তোমারই নিকটে। অর্থাৎ, তোমার এবাদত্ করি এবং তুমি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়ের এবাদত্ করি না, এবং সকল বিষয়ে তোমার কাছে মদদ্ তলব করি, অন্য কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের নিকট কোনও প্রকার মদদ্ তলব বা সাহায্য প্রার্থনা করি না।

মানব-জীবনের প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে তাহার পরওয়ারদেগারের এবাদত্। কিন্তু দুর্বল মানুষের পক্ষে এই কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া চলা সব সময় সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তাই এবাদত্ করার অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দাহ্‌র মুখ হইতে বলান হইতেছে: হে আমার পরওয়ারদেগার! এই কর্তব্য পালনের জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, বান্দাহ্ এবাদতের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হউক,

নিজের সাধ্যমত এই কর্তব্য পালন করিয়া যাউক আর আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকুক—আমিই তাহাকে এই কর্তব্য সমাধা করার শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করিব।

৫। টীকা ঃ মোনাজাতের স্বরূপ

নিজের কর্তব্য পালন করার জন্য বান্দাহ্ আল্লাহ্‌র হুজুরে মোনাজাত করিবে কি প্রকারে ও কোন্ উদ্দেশ্যে, সূরার শেষ তিন আয়তে তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইতেছে।

হেদায়ত হেদায়ত শব্দের অর্থ - পথ দেখাইয়া দেওয়া বা পথে পরিচালিত করিয়া লক্ষ্যে বা মানজিলে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণীয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইবে—"হে পরওয়ারদেগার, আমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিয়া লক্ষ্যে উপনীত করিয়া দাও।" এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্ কাহাকেও জবরদস্তি গোমরাহ বা পথহারা করেন না অথবা জবরদস্তি সুপথে পরিচালিত করেন না। এই দুইটি অবস্থার জন্য বান্দাহ্‌র আমল ও আকিদাই প্রধান দায়ী। সূরা বাকারার ২য় আয়াতের তাফ্‌ছীরে ও অন্যান্য বহু স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ছেরাতুল, মোস্তাকীম—ছেরাত অর্থে পথ। মোস্তাকীম—এস্তেকামত মছ্‌দর হইতে উৎপন্ন। ছেরাত বা পথের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ হইতেছে—অবক্র, সরল, উজ্জ্বল ও সুব্যবস্থিত পথ। এই পথে পরিচালিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য মোমেন বান্দাহ্ আল্লাহ্‌র হুজুরে মোনাজাত করিবে।

এই আয়াতে ছেরাতুল মোস্তাকীমের একটা সহজ পরিচয় দেওয়া হইতেছে। বান্দাহ্ মালিকের দরগাহে মোনাজাত করিতেছে—"তোমার এন্‌আম বা কৃপা-ভাজন হইয়াছেন যে সব (মহাজন) ব্যক্তি, আমাদিগকে পরিচালিত করিও তাঁহাদের অবলম্বিত পথে—অর্থাৎ ধর্মপথে।" এই পথের হাদী, ইমাম বা অগ্রপথিক হিসাবে আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন যাঁহারা, ছূরা নেছার ৬৯ আয়াতে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ঃ

و من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين' و حسن اولئك رفيقا ـ

৬। টীকা ঃ বিরাগ-ভাজন ও বিপথগামী

মোছলেম-বান্দাহ্ কোন্ পথে ও কাহাদের অবলম্বিত পথে পরিচালিত হইতে

চায়, ৬ আয়াতে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এই আয়াতে নেতিমূলক-ভাবে তাহার বর্জনীয় পথের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণও বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

মাগজুব—"গজব" হইতে উৎপন্ন। ব্যবহারভেদে উহার অর্থভেদ হইয়া থাকে। সাধারণভাবে উহার অর্থ—ক্রোধ, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মানসিক উত্তেজনা। কিন্তু আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলা হইলে, উহার অর্থ হইবে দণ্ড বা কর্মের প্রতিফল দেওয়ার ইচ্ছা। (রাগেব, কাবীর)।

জাল্লীন—"জাল্লুন" শব্দের বহুবচন। যাহারা পথপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই, অথবা যাহারা পথ পাওয়া সত্ত্বেও বিপথগামী হইয়া গিয়াছে—সাধারণতঃ এই প্রকার অর্থে জাল্লীন শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উপক্রম-উপসংহার অনুসারে ইহার তাৎপর্যে আরও অনেক রকম সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এখানে ইহা দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মানুষ আল্লাহ্‌র বিচারে দণ্ডার্হ হয়, নিজের অন্যায় আমলের প্রতিফলে। এইরূপে বুঝিয়া-সুজিয়াও অনেকে সত্যপথকে বর্জন করিয়া বিপথগামী হইয়া যায়, নিজের অভিমান ও সংস্কারের প্রভাবে এবং ঈমান ও সৎসাহসের অভাবে। এই দুই শ্রেণীর লোকের মানসিকতা ও কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করিবে যাহারা, তাহারা যথাক্রমে আল্লাহ্‌র গজব-ভাজন ও বিপথগামী পর্যায়ভুক্ত হইবে—তাহারা যে যুগের ও যে সমাজের লোক হউক না কেন। হযরত রাছুলে করীম (সঃ) এই হিসাবেই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে আল্লাহ্‌র গজব-ভাজন ও পথভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (কাছীর প্রভৃতি)।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ইহুদী জাতির অভিশপ্ত হওয়ার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ও কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সেই লক্ষণ ও কারণগুলির সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া থাকি। অন্যথায় আমরাও সেই অভিশাপের ভাগী হইয়া পড়িব। কিন্তু আমাদের মধ্যেও একদল আহ্‌বার ও রোহ্‌বান (পণ্ডিত ও পুরোহিত) আছেন, যাঁহারা এই সব ক্ষেত্রে বিচলিত হইয়া পড়েন এবং কওমকে বুঝাইতে চাহেন যে, ঐ ব্যাপারগুলি ইহুদী-নাছারাদের সহিত সংশ্লিষ্ট, মুছলমান সমাজের প্রতি ঐগুলি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

এই অসঙ্গত মতবাদের ফলে, কোর্‌আন মাজীদে বহুলভাবে বর্ণিত, বানি-ইছরাইল জাতির ইতিবৃত্তগুলির নৈতিক শিক্ষা হইতে, মোছলেম জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

সূরা বাকারা ২

سُورَةُ الْبَقَرَةِ ٢

নামকরণঃ বাকারা একবচন, বহুবচনে বাকার্। অর্থ, গরু (Cow)। বিশেষ করিয়া ষাঁড় ও বলদকে বুঝাইতে হইলে (ثور) ছওর শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই সূরার ৬৭ হইতে ৭১ আয়াত পর্যন্ত, বানি-ইছ্রাইলের প্রতি গো-কোর্বানীর আদেশ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সেখান হইতে এই নামের উৎপত্তি।

সময়ঃ সূরা বাকারা নাজেল হইতে আরম্ভ হয় হিজরতের ও বদর যুদ্ধের পূর্বে, এবং হযরত রাছুলে করীমের জীবনের শেষভাগে সমাপ্ত হয়। সূরাটা সম্পূর্ণভাবে মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে মোট ২৮৬টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ আছে। আয়াত ও রুকূগুলির দীর্ঘতা, শাব্দিক হিসাবে ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই সূরায় বহু গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে সেগুলির আভাস পাওয়া যাইবে।

১ রুকূ

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আলেফ-লাম-মীম, (১) ١ الٓمّٓ ○

২। ইহাই (মহিমান্বিত) কেতাব ইহাতে সন্দেহ করার কোনই কারণ নাই, (২) ٢ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ

ইহা হইতেছে পরহেজগার লোকদিগের জন্য হেদায়তকারী, (৩) فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৩। যাহারা অ-দৃষ্ট বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করে এবং নামাযকে যথানিয়মে কায়েম রাখে, আর আমরা তাহাদিগকে যে সব রেজেক দান করিয়াছি, তাহার কিছু অংশ (সৎকাজে) ব্যয় করিয়া থাকে,—

٣ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

৪। আর যাহারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে—তোমার প্রতি যাহা নাজেল করা হইয়াছে তাহাতে ও তোমার পূর্বে যাহা নাজেল করা হইয়াছিল তাহাতে, এবং আখেরাত্ সম্বন্ধে তাহারাই দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে ; (৪)

٤ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ

৫। ইহারাই হইতেছে নিজেদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রদর্শিত পথের অভিযাত্রী এবং ইহারাই হইতেছে সফলকাম।

٥ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৬। নিশ্চয় কাফের হইয়া গিয়াছে যাহারা, (হে রাছুল,) তুমি তাহাদিগকে (পরিণামের) ভয় দেখাও বা না দেখাও—তাহাদের পক্ষে উভয় সমান—তাহারা ঈমান আনিবে না।

٦ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৭। আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন তাহাদের অন্তরের উপর ও তাহাদের কানের উপর ; অবস্থা এই যে, তাহাদের চোখগুলির উপর (পড়িয়া) আছে আচ্ছাদন আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে গুরুতর আজাব। (৫)	٧ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ع

তাফ্‌ছীর

১। টীকা : আলেফ-লাম-মীম

আলেফ, লাম ও মীম আরবী বর্ণমালার তিনটি অক্ষর। কোর্‌আনে আরও ২৯টি সূরার প্রথমে এইরূপে এক বা একাধিক বর্ণের উল্লেখ আছে। তাফ্‌ছীর-কারগণের অনেকেই বলিয়াছেন যে, এই সব বর্ণ কোর্‌আনের "মোতাশাবেহ" আয়াতগুলির অন্তর্গত। সূরা আল-এমরানের ৬ আয়াতের বরাত দিয়া তাঁহারা ইহাও দাবী করিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর মোতাশাবেহ আয়াত বা বর্ণের অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে। সূরা এমরানের ৬ আয়াতের টীকায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু জানা-ইয়া রাখিতেছি যে, সাধারণ তাফ্‌ছীরকারগণের এই সিদ্ধান্ত ও দাবী সম্পূর্ণ অযৌ-ক্তিক ও অসমীচীন। মানুষকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ কোর্‌আন নাজেল করিয়াছেন ও তাহাতে ঈমান রাখার আদেশ দিয়াছেন। কোনও অবোধ্য বাক্যের উপর ঈমান আনা বা তাহাকে সত্য বিশ্বাস করা, মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে না।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ ছাহেবের অভিমতও ইহাই। তিনি বলিতেছেন—

پس حروف مقطعه اسمائے سوراند بآں معنی که مجملاً دلالت می کنند برانچه در سوره مذکور می شود' شبیه بانکه نام کتابے چیزے مقرر می کنند که حقیقت آں کتاب را پیش ذهن سامع واضح گرداند – (الفوز الکبیر -- ص ۳۷)

২। টীকা ঃ "জালেকা"

"জালেকা"—শব্দের ধাতুগত মূল অর্থ হইতেছে "এই" বা "ইহা"। কিন্তু আরবী সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহারে "জালেকা" ইহা এবং উহা উভয় অর্থে প্রচলিত আছে। কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতেও ঐ শব্দটি "ইহা" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (এবন-কাছীর, কাবীর ১—২৩৭)। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আরবী এছ্‌মে-ইশারা Demonstrative Pronoun "হাজা" ও "জালেকা" (ইহা ও উহা) একে অন্যের স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইহা আরবী সাহিত্যের একটা সুবিদিত ব্যাপার(এবন-কাছীর, বোখারী)। ইমাম রাজী কোর্‌আনের ব্যবহার হইতে ইহার নজিরও উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

মিঃ পামার তাঁহার অনুবাদের টীকায় ইহাকে তাঁহার পূর্ববর্তী অনুবাদকগণের ভুল বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জালেকাল্‌-কেতাব-এর অনুবাদ হইবে That book বা সেই কেতাব। This book বা এই কেতাব বলিয়া তাঁহার পূর্ববর্তীরা একটা গুরুতর রকমের ভ্রমের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন। দুনিয়ার সমস্ত লোক, আরব ও আরবী ভাষার ছনদ বা authority বলিয়া স্বীকৃত সমস্ত পণ্ডিত, সকলে আজ পর্যন্ত ভুল করিয়া আসিয়াছেন, এইরূপ অসম সাহসিকতার কথা বলার পূর্বে, বিষয়টা ভালভাবে বিচার আলোচনা করিয়া দেখা তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লোকের একান্ত কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্যে অবহেলা করার ফলে, তাঁহাকে অতঃপর এই শব্দের অনুবাদে যে সব কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদ হইতেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও তিনি নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য এখানে জালেকা শব্দের অনুবাদে This ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

আমরা যেমন সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ আরবী সাহিত্যে 'হাজা'-সর্বনামের পরিবর্তে 'জালেকা'-সর্বনাম ব্যবহার করারও একটা বিশেষত্ব ইহাই। অর্থাৎ এই আয়াতে কোর্‌আনের সম্ভ্রম ও গুরুত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য জালেকা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিঃ লেন তাহার স্বনামখ্যাত "Arabic-English Lexicon নামক অভিধানে বলিতেছেন —

Like as a person held in mean estimation is indicated by "Haza", which denotes a thing that is near, so on account of the high degree of estimation, a thing that is indicated by "Zalika", whereby one indicates a thing that is remote.

অর্থাৎ—কোনো বস্তুর নগণ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য আরবী ভাষায় যেমন

"হাজা" এছ্‌মে-ইশারা ব্যবহার করার নিয়ম আছে—যাহা নিকটবর্তী বস্তু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে – সেইরূপ কোনও সমর্থিত বস্তুকে, তাহার উচ্চ পর্যায়ের সম্ভ্রমের জন্য "জালেকা" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে—যাহা (সাধারণতঃ) ব্যবহৃত হয় দূরবর্তী বস্তুর জন্য। এই হিসাবেই আমরা "জালেকাল্‌-কেতাব" পদের অর্থ করিয়াছি "মহিমান্বিত কেতাব" বলিয়া।

"এই কেতাব"কে "ঐ কেতাবে" পরিবর্তিত করার একটা বিশেষ মতলবও এই শ্রেণীর খ্রীষ্টান লেখকদের আছে। তাঁহারা কল্পনা করিয়া নিয়াছেন যে, "ঐ কেতাব" অর্থে, তাঁহাদের কেতাব বাইবেলকে বুঝিতে হইবে। সুতরাং কোর্‌আনের সাক্ষ্যেই খ্রীষ্টান ধর্মের জয়জয়কার হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, যীশুখ্রীষ্টের ইনতেকাল করার বহুদিন পরে, যে-সকল পুরাণ সাহিত্য মথি-মার্ক-পল প্রভৃতি লেখকের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবং সাত-নকলের পর তাহার যে ধ্বংসাবশেষ তাঁহাদের কাছে মওজুদ আছে, সেগুলিকে মুছলমানরা হজরত ঈছার প্রতি অবতীর্ণ ইন্‌জীল বলিয়া আদৌ স্বীকার করে না। সুতরাং এক্ষেত্রে "এই" আর "ঐ" কেতাব তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

কেতাব—অর্থে লিখিত পুস্তক, অনুজ্ঞা বা ফরমান, অবশ্য-পালনীয় ব্যবস্থা, অবধারিত বিষয়, ইত্যাদি। এখানে কেতাব-অর্থে কোর্‌আন মাজীদকে বুঝাইতেছে। কালামুল্লাহ্‌র অংশ-বিশেষকেও কেতাব ও কোর্‌আন বলা হইয়া থাকে। কোর্‌আন মাজীদে এই ব্যবহারের বহু নজীর আছে। (আ'রাফ ২০৪, জিন্‌ ১, আহকাফ ৩০ প্রভৃতি)।

কোর্‌আন মাজীদ, অহি নাজেল হওয়ার প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত, নিয়মিতভাবে লিখিত ও সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই হিসাবেও উহাকে কেতাব বলা হয়। এই চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে তাহার একটি বর্ণেরও কোন প্রকার অদলবদল হইতে পারে নাই। ইহা কোর্‌আন মাজীদের একটা প্রত্যক্ষ মো'জেজা। কিন্তু পার্সী, ইহুদী, হিন্দু ও খ্রীষ্টান জাতির সমস্ত মূল ধর্মগ্রন্থ বিকৃত বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

"সন্দেহের কারণ নাই।"—এই কেতাবে অর্থাৎ কোর্‌আনে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে মানুষের মনে সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রশ্নের উদ্রেক হইতে পারে। সে বুঝিতে চায় যে, কেতাবখানা মানুষকে সুপথের সন্ধান দিতে সমর্থ কি-না? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াতেই বলিয়া দেওয়া হইতেছে—"এই কেতাবে কোনও সন্দেহ নাই—ইহা হইতেছে পর-হেজগার লোকদিগের জন্য পথ-প্রদর্শক।"

ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগিয়া ওঠে যে, কেতাবখানা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছে, না, মানুষ কর্তৃক রচিত হইয়াছে? ইহার উত্তরে, মক্কায় অবতীর্ণ বহু ছূরায় বারংবার বলা হইয়াছে—

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم —

"এই কেতাব নাজেল করা হইয়াছে পরম জ্ঞানী ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র তরফ হইতে (ছাজদা ১, মোমেন ১, ইয়াছীন ১, ওয়াকেআ, আল্‌-হাক্কা, জোমর প্রভৃতি)। ছূরা ছাজদার প্রাথমিক দুইটি আয়াতে বলা হইয়াছে :

الـم ٥ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين —

"এই কেতাব যে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নাজেল করা হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।" এখানে বলা হইতেছে :

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين —

"এই কেতাব যে পরহেজগার লোকদিগের জন্য পথ-প্রদর্শক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

৩। টীকা : হেদায়ত্‌ ও তাক্‌ওয়া

মূল ধাতুর হিসাবে হেদায়ত্‌ শব্দের অর্থ হইতেছে কোন বিষয় চিনিতে জানিতে ও বুঝিতে পারা। (রাগেব, জাওহারী)। সাহিত্যে ইহা দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম, পথ দেখাইয়া দেওয়া, সুপথ ও বিপথ চিনাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে, কোনও যাত্রীকে তাহার গন্তব্য স্থানে পেঁৗছাইয়া দেওয়া। এই ধাতু হইতে "এহ্‌তেদা" মছ্‌দর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—সত্যপথ লাভের ইচ্ছুক হওয়া, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করা এবং হাদী কর্তৃক প্রদর্শিত পথে যাত্রা করা। পক্ষান্তরে বিপথে চলিতে কৃতসঙ্কল্প না হওয়া (রাগেব)।

ইমাম রাগেব অতঃপর বলিতেছেন : আল্লাহ্‌ মানুষকে হেদায়ত করেন, কোর্‌আনে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এই হেদায়ত সমাধিত হইয়া থাকে ৪ প্রকারে। প্রথম, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা তিনি মানুষ-সাধারণকে সৎ, অসৎ বা সুপথ ও কুপথ চিনিয়া লওয়ার শক্তিদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, নিজের নবীগণের প্রমুখাৎ ও নিজ কেতাবের মারফত মানুষকে তিনি সুপথের সুস্পষ্ট সন্ধান জানাইয়া দিয়াছেন। কোর্‌আনে নবীগণকে ائمة الهدى বা হেদায়তের ইমাম বলিয়া এই কথা বুঝান হইয়াছে।

তৃতীয়, যে হেদায়ত লাভ করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, আল্লাহ্ তাহাকে সত্যপথ অবলম্বন করার শক্তি-সামর্থ্য বা তাওফিক প্রদান করেন। যেমন বলা হইয়াছে—

و يزيد الله الذين اهتدوا هدى –

"যাহারা হেদায়ত লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, আল্লাহ্ তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত করিয়া দেন (মরীয়ম ৭৬)

চতুর্থ, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য গন্তব্যস্থানে পেঁছাইয়া দেন।

এই চারিটি ব্যবহারের নজীর হিসাবে ইমাম রাগেব বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—"আল্লাহ্ জালেম ও কাফেরদিগকে হেদায়ত করেন না"—এই মর্মের প্রত্যেক আয়াতে হেদায়ত অর্থে তৃতীয় দফার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহারা সুপথ লাভের জন্য চেষ্টিত বা ইচ্ছুক নহে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে হেদায়ত লাভের তাওফিক প্রদান করেন না। এইরূপে যে সব আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মানুষকে হেদায়ত করার ক্ষমতা রাছুলের বা অন্য কোনও মানুষের নাই, তাহার প্রত্যেকটিতে এই তাৎপর্য গৃহীত হইবে যে, পথের পরিচয় প্রকাশ করা এবং যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহার সত্যতা বুঝাইয়া দেওয়ার ক্ষমতাই শুধু রাছুলগণকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কোন ক্ষমতাই তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। কাহাকেও পথে চালাইবার বা গন্তব্যস্থানে পেঁছাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই অধিকারভুক্ত। ফলতঃ "নবী বা রাছুল হেদায়ত করিতে সক্ষম নহেন"-পদের তাৎপর্য ইহাই। পক্ষান্তরে "নবী ও রাছুল হেদায়ত করিতে পারেন" বলা হইয়াছে যেখানে, সেখানে এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে যে, পথ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁহাদের আছে।

হেদায়ত—শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে কোর্‌আন মাজীদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধানকার ইমাম রাগেব যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, উপরে তাহারই সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। ইমাম ছাহেব এই আলোচনার প্রত্যেক দাবী সম্বন্ধে কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। হেদায়ত ও গোমরাহী সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও অনেক আলোচনার দরকার উপস্থিত হইবে। তাই ইমাম ছাহেবের এই সিদ্ধান্তগুলি স্মরণ করিয়া রাখিতে পাঠকগণকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

তাক্‌ওয়া—অভিধানের হিসাবে তাক্‌ওয়া শব্দের অর্থ হইতেছে নিরাপত্তা বা নিরাপদ হইয়া থাকার জন্য চেষ্টা পাওয়া। (কাবীর, কাছীর প্রভৃতি)। প্রত্যেক অন্যায় অনিষ্টকর ও জঘন্য কাজ, কথা এবং ভাবাচিন্তা, অবিশ্বাস ও

অন্ধবিশ্বাস হইতে আত্মরক্ষা করার মনোভাবকে তাক্ওয়া বলা হয়। এক কথায় ইহার সুসঙ্গত অনুবাদ হইতেছে, পরহেজগারী বা পরহেজ করিয়া চলার অভ্যাস। এই অভ্যাসে অভ্যস্ত যাহারা, আরবীতে তাহাদিগকে মোত্তাকী বলা হয়।

সূরা বনি-ইছ্রাইলের ৮২ আয়াতে কোর্আনকে (شفا) শেফা বলা হইয়াছে। উহার অর্থ—"নিরাময়কারী", রোগের উপশম করা হয় যাহা দ্বারা। সকলেই স্বীকার করিবেন যে রোগী যদি চিকিৎসকের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া কুপথ্য গ্রহণ করিতে থাকে এবং তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি অনিষ্টকর কাজ করিয়া চলে, তাহা হইলে বিশেষ উপকারী ঔষধও তাহার পক্ষে ফলদায়ক হয় না। বরং বহুক্ষেত্রে রোগের প্রকোপ আরও বাড়িয়া যায়। এই কুপথ্য বর্জনের নামই পরহেজ বা তাক্ওয়া।

ঠিক এইরূপে এখানে বলা হইয়াছে, কোরআন হইতেছে পরহেজগার লোকদিগের হেদায়তকারী। অর্থাৎ যাহারা পরহেজ করিয়া চলে, কোর্আনের শিক্ষার মারফতে আল্লাহ্ তাহাদের জন্য সৎপথে চলিবার শক্তি, সামর্থ্য বা তাওফীক লাভের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই পরহেজগার বান্দাদিগের কয়েকটা লক্ষণ বা আলামত পরবর্তী দুইটি আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪। টীকা ঃ পরহেজগার বান্দাহ্র আলামত

৩ ও ৪ আয়াতে পরহেজগারদিগের পাঁচটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হইতেছে ঃ-

(১) যাহারা গায়েবে ঈমান আনিয়া থাকে ঃ

এখানে আয়াতের তরতীব অনুসারে প্রথমে ঈমান ও গায়েব শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়া লইতে হইবে। ঈমান শব্দের সাধারণ অর্থ বিশ্বাস করা। কিন্তু বে-বর্ণের দ্বারা যখন তাহাকে সকর্মক (متعدی) বানান হয়, তখন উহার অর্থ হইবে কোনও বিষয় সম্বন্ধে অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করা এবং মুখে তাহার অঙ্গীকার করা। (কোনও কোনও মতে কাজ বা আমলের দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাস্তব প্রমাণ প্রদান করা। সুতরাং الذين يؤمنون পদাংশের তাৎপর্য এই দাঁড়াইতেছে যে, যাহারা অন্তরে ঈমান পোষণ করে এবং প্রকাশ্যভাবে তাহার অঙ্গীকারও করিয়া থাকে। অনুপস্থিত হওয়া, অগোচরে থাকা বা এই অর্থগত একটা ভাবকে গায়েব বা গায়েবুন্ বলা হয়। যে বস্তু উপস্থিত নাই বা অগোচরে আছে, তাহাকে বুঝাইতে হইলে غيب গায়েব না বলিয়া غائب গায়িব বলিতে হইবে, আরবী ভাষার সাধারণ নিয়ম ইহাই। অবশ্য সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে এবং قرينه صارفه বা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মওজুদ থাকিলে مجاز বা রূপকভাবে দ্বিতীয় অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তাফ্‌ছীরকারগণ সাধারণতঃ দ্বিতীয় অর্থের সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আলেম সমাজে তিনটি মত প্রচলিত আছে। একদলের মতে গায়েব শব্দের অর্থ কোরআন, তাক্‌দীর, অহি, ঈমান-মোফাচ্ছল, প্রভৃতি। কিন্তু এইরূপে গায়েব শব্দকে গায়েব অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের অধিকাংশের মতে, যে সব বিষয়ে বিশ্বাস করা ধর্মের হিসাবে কর্তব্য, যেমন আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, আখেরাতের হাশর-নাশর, হিসাব-কিতাব প্রভৃতি তাহার সবগুলিতে বিশ্বাস করার নামই হইতেছে গায়েবে বিশ্বাস।

ইমাম রাগেব উপরোক্ত মত দুইটির উল্লেখ করার পর বলিতেছেন :

و قال بعضهم : معناه يؤمنون اذا غابوا عنكم' و ليسوا كالمنافقين الذين قيل فيهم ' و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن ' و على هذا قوله الذين يخشون ربهم بالغيب -- (و غيرها من الايت)

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, যাহারা গায়েবে ঈমান আনে"—পদের অর্থ এই যে, যে সমস্ত লোক মুছলমানদের সাক্ষাতে যে ভাবে নিজেদের ঈমান ঘোষণা করে, মুছলমান সমাজের অগোচরেও সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত নিজেদের ঈমানের ঘোষণা করিয়া থাকে। মোনাফেকদিগের মত কাফেরদিগের নিকটে গিয়া বলেন না— "আমরা ত তোমাদেরই সঙ্গে আছি। তবে ঈমান আনিয়াছি বলিয়া মুছলমানদিগকে একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া থাকি মাত্র।" (১৪ আয়াত দেখুন)। ইহার পর এই মতবাদের সমর্থনে ইমাম ছাহেব কোরআন মাজীদের কয়েকটা আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহা আবু-মোছলেম ইস্‌পাহানীর সিদ্ধান্ত। ইমাম রাজী এই মতটি যুক্তি-প্রমাণসহ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ভাসা-ভাসা ভাবে তাহার একটু প্রতিবাদও করিয়া দিয়াছেন। আমি এই মতের সমর্থন করি। ইহার কারণগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

(ক) তাহা হইলে গায়েব غيب মাছদারকে গায়িব غائب এছমে ফায়েলের অর্থে গ্রহণ করার আবশ্যক হয় না। বিশেষ কারণ বা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ব্যতীত এইরূপ পরিবর্তন করা অন্যায়। এখানে তাহার সেরূপ কোনও কারণ বা ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে আবু-মোছলেমের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এই পরিবর্তনের দরকার হয় না।

(খ) প্রাসঙ্গিকতার দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, এই মতই

সঙ্গত। সূরার প্রথম হইতে ৫ আয়াত পর্যন্ত মোমেনদিগের আমল ও আকীদার বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পর ৬ ও ৭ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, প্রকাশ্য কাফেরদিগের শোচনীয় অধঃপতনের বিবরণ। অতঃপর রুকুর শেষ পর্যন্ত মোনাফেকদের কার্যকলাপ ও হীন-মানসিকতার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। মোটের উপর এই দুই রুকুতে মুছলমানের এবং কাফের ও মোনাফেকের তুলনায় সমালোচনা করা হইতেছে।

আমরা ঈমানের অর্থে দেখিয়াছি, মুছলমান যে বিশ্বাস পোষণ করে, তাহা স্বীকারও করে প্রকাশ্যভাবে। পক্ষান্তরে মোনাফেক চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যাহা বিশ্বাস করে না, মুছলমানদের সম্মুখে তাহাকেই নিজের বিশ্বাস বলিয়া প্রকাশ করে, অথচ তাহাদের অগোচরে তাহাকে আবার অস্বীকার করে। কিন্তু মুছলমান যাহা স্বীকার করে, স্বধর্মাবলম্বীদের অগোচরে বিধর্মীদের কাছেও তাহা গোপন করে না, বরং প্রকাশ্যভাবে তাহার ঘোষণা করিয়া দেয়। সুতরাং প্রাসঙ্গিকতার হিসাবেও এই তাৎপর্য সুসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(গ) সাধারণতঃ তাফ্ছীরকারগণ, কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশ প্রভৃতিকে তৃতীয় আয়াতের বর্ণিত গায়েব বা অ-দৃষ্ট বিষয়ের তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ৪র্থ আয়াতে বলা হইয়াছে: و بالاخرة هم يوقنون "এবং পরকালের বিষয়গুলিতেও তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে।" কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ ও বেহেশ্ত-দোযখই হইতেছে আখেরাত বা পারকালিক জীবনের বাস্তব উপাদান। ৩ আয়াতে ঐগুলির বর্ণনার পর, ৪ আয়াতে আবার "আখেরাত" বলিয়া সেইগুলির উল্লেখ করা হইলে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। কোর্‌আনের সাহিত্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না।

এই দ্বিরুক্তি দোষ ছাড়া আরবী ব্যাকরণের দিক দিয়াও ইহাতে একটা গুরুতর বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া যাইতেছে। বর্ণনা দুইটাকে একসঙ্গে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, "যাহারা গায়েবে বিশ্বাস করে" পদের পর "এবং" দিয়া বলা হইতেছে যে, "এবং যাহারা আখেরাতে বিশ্বাস করে"। আৎফের ওয়াও বা "এবং" মধ্যে আসাতে নিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে যে, গায়েব ও আখেরাত দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়। সুতরাং আখেরাত বা পারকালিক বিষয়গুলিকে গায়েব শব্দের তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। অন্যথায়—

لكان المعطوف نفس المعطوف عليه و انه غير جائز (ابو مسلم)

ফলতঃ সাহিত্যিক হিসাবেও সাধারণ তাফ্ছীরকারগণের মত অসঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

(ঘ) কোর্‌আন মাজীদের ব্যবহারেও আমাদের গৃহীত মতের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। যেমন —

(ক) ذلك ليعلم انى لم اخنه بالغيب (ইউছুফ,৫২)"স্বামী যেন জানিতে পারেন যে, আমি তাঁহার **অগোচরে** তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই।"

(খ) সূরা নেছার ৩৪ আয়াতে সতী-সাধ্বী নারীদিগের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে حافظات للغيب বলিয়া। অর্থাৎ স্বামীর **অগোচরে** তাঁহার কোনও অপ্রীতিকর কাজে তাহারা লিপ্ত হয় না। ইমাম রাগেব এই ব্যবহারের নজীর হিসাবে আরও আটটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাছুলে কারীমের হাদীছেও এই ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় (মনছুর ১—২৬)।

ইমাম রাজী তাঁহার তাফ্‌ছীরে আবু মোছলেমের তিনটি যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপরে বর্ণিত ৩য় দফায় তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইমাম রাজী তিন দফা উত্তরে আবু-মোছলেমের যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম দফার উত্তরে তিনি তাকরার বা দ্বিরুক্তির অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, ৩য় আয়াতে "গায়েবে ঈমান"-আনার অর্থ হইতেছে, মোটের উপর ঈমান আনা, ৪ আয়াতে আখেরাতে ঈমান আনার উল্লেখ করার পূর্বে যে "এবং" আনা হইয়াছে, তাহা হইতেছে 'عطف تفصيل' অর্থাৎ তাহা দ্বারা প্রথম বর্ণিত ঈমানের তফ্‌ছীল বা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইতেছে। ইহাতে কোনও দোষ ঘটিতে পারে না। যেমন কোর্‌আনে (বাকারা,৯৮ আয়াতে) সাধারণভাবে "ফেরেশতাগণ" বলার পর, "এবং জিব্রাইল ও মিকাইল" বলা হইয়াছে।

সূরা বাকারার ঐ আয়াতের তাফ্‌ছীরে তিনি বলিয়াছেন যে, সাধারণভাবে ফেরেশ্‌তাদিগের উল্লেখ করার পর, বিশেষভাবে জিব্রাইল ও মিকাইলের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য প্রকাশ করার জন্য। তাহা না হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইত না (১--৬৩২)। তাঁহার এই যুক্তি অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, ৩য় আয়াতের উপসংহারে আখেরাতে ঈমান আনার উল্লেখ করার পূর্বে ৩ ও ৪ আয়াতে আর যে সব ঈমানের কথা বলা হইয়াছে, আখেরাতে ঈমান আনার গুরুত্ব ও ফজিলত তাহা অপেক্ষা অধিক। "অন্যথায় এই ব্যাখ্যা সঙ্গত হইবে না।"

ইহার পূর্বে ৩ ও ৪ আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার কথা,তাঁহার রাছুল-গণের ও তাঁহাদের প্রতি প্রেরিত কেতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা

হইয়াছে। ইমাম ছাহেবের উত্তর সঙ্গত হইলে, তাঁহারই প্রতিজ্ঞা অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র, তাঁহার রাছুলগণের আর তাঁহার প্রেরিত কেতাবগুলির, বিশেষতঃ মোহাম্মদ মোস্তফার ও কোর্‌আন মাজীদের উপর ঈমান আনা অপেক্ষা, হিসাব-নিকাশ, বেহশ্‌ত-দোযখ প্রভৃতির উপর ঈমান আনার গুরুত্ব অনেক অধিক।

(২) **ছালাতকে কায়েম রাখা**ঃ মূল ধাতু বা মাছ্‌দার হিসাবে ইহার অর্থ আগুনে দিয়া কোনও বস্তুকে নরম করিয়া ফেলা। ব্যবহারে এই ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াপদগুলির, পৃথক পৃথক বাবের হিসাবে, দুই প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। (ক) অন্য কাহারও অনুবর্তী হওয়া বা কোনও স্থানে প্রবেশ করা। ইহার মাছ্‌দার হইবে (تصلية) তাছ্‌লিয়াঃ। যেমন বলা হয়, صلى الفرس تصلية অর্থাৎ ঘোড়াটা অন্য ঘোড়ার অনুসরণ করিল। (খ) দোওয়া, মোনাজাত বা শুভ কামনা। এখানে মাছ্‌দার হইতেছে "ছালাত"। صلى صلوٰة বলা হইবে কিন্তু এক্ষেত্রে صلى تصلية বলা হইবে না।

যেহেতু বিনয়নম্র দেহ ও মন নিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং যেহেতু দোওয়া ও মোনাজাতই নামাযের প্রধান উপকরণ, সেই জন্য নামাযকে অভি-ধানের হিসাবে "ছালাত" বলা হয়।

ইছ্‌লামের পরিভাষায় একটি সুনির্দিষ্ট এবাদতের নাম ছালাত। নামায ইহার পার্সী অনুবাদ। নামাযের অক্ত, তাহার ছিজদাহ্‌, তাহার রুকু, তাহার জলছা ও কেয়াম, তাহার তাছ্‌বীহ্‌, তাহার কেরআত্‌, তাহার দোওয়া-দরূদ প্রভৃতি আল্লাহ্‌র কেতাবে ও তাঁহার রাছুলের শিক্ষায় সুনির্ধারিত হইয়া আছে। দেহ ও মনের শুদ্ধতা সাধনের সব ব্যবস্থাও তাহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং চৌদ্দ শত বৎসর হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রের যাবতীয় মুছলমান যথাসাধ্য তাহা পালন করিয়া আসিতেছে। মাজ্‌হাবী মতভেদ সত্ত্বেও তাহার কোনও প্রকার বিকার বা ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে নাই।

নামাযকে কায়েম রাখার অর্থ—তাহার সমস্ত শর্ত ও কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করিয়া চলা। যেমন, প্রথমে অযু গোছল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা, দুনিয়ার সব মুছলমানের কেবলা-রোখ হইয়া নামায পড়া, তাহার নির্দিষ্ট অক্তের খেয়াল রাখা, রুকু রাক্‌আত প্রভৃতির নির্ধারিত সংখ্যা ও আকার-প্রকার প্রভৃতির ব্যতিক্রম না করা, ফরয নামাযগুলি সাধ্যপক্ষে নাগা না করা, নামাযে মনকে বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু' করা, নির্ধারিত মতে নামাযে আরবী ভাষায় কোর্‌আন পড়া, আল্লাহ্‌ কোর্‌আনকে আরবী ভাষায় নাজেল করিয়াছেন এবং তাহাকে আট

স্থানে قرآنا عربيا বা আরবী কোর্‌আন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা মোজাম্মেলের ২০ আয়াতে কোর্‌আনের সহজ সাধ্য কিছু অংশ নামাযে পাঠ করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সহজে বোঝা যাইতেছে যে, নামাযে সেই আরবী-কোর্‌আনই পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। কোর্‌আনের উর্দু-বাংলা অনুবাদ নিশ্চয় "সেই আরবী কোর্‌আন"—পদবাচ্য হইতে পারে না। আত্তাহিয়াত ও দোওয়া-দরূদগুলি যথাযথ সময়ে পাঠ করা এবং নামাযের পর ছালাম ফিরান প্রভৃতি—এইসব হইতেছে নামাযের শর্ত ও কর্তব্য। নামাযের এই শর্ত ও কর্তব্যগুলি পালন করার নামই "ছালাতকে কায়েম রাখা।"

নামাযকে কায়েম রাখার হুকুম আসিয়াছিল আল্লাহ্‌র রাছুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার উপর। এই হুকুম আমাদের কাছে পেঁ ৗছিয়াছে তাঁহারই মারফতে। আরবী ভাষার উপর তাঁহার অনুপম অধিকারের পরিচয় আমরা তাঁহার এরশাদ-গুলি হইতে অবগত হইতে পারিতেছি। সবচাইতে বড় কথা এই যে, নিজের রাছুলকে কোর্‌আনের মর্ম "বয়ান" করিয়া দেওয়ার ভারও আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। (কিয়ামত, ১৭)। সুতরাং নামায কায়েম রাখার প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা তিনি নিশ্চয় সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। সেই তাৎপর্যের কথা তিনি নিজ ছাহাবীগণকে বিশদ বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং ২৩ বৎসর পর্যন্ত "নামায কায়েম" করিয়া উম্মতকে সে তাৎপর্যের বাস্তব স্বরূপটাও হাতে-কলমে দেখাইয়া দিয়াছেন।

ছালাত কায়েম রাখার শর্ত ও কর্তব্য এবং তাহার অকর্তব্য বা বর্জনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ প্রদান করা হইয়াছে। যথাস্থানে সেগুলির আলোচনা করা হইবে। এখানে অতি সংক্ষেপে তাহার একটা তালিকা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি :

(১) নামাযের অক্তগুলি অবধারিত হইয়া আছে, (নেছা, ৪),
(২) যুদ্ধের সময়ও অক্তের ব্যতিক্রম করা চলিবে না (ঐ, ১০২),
(৩) নামায কাছর করা (ঐ, ১০১),
(৪) অযু, গোছল ও তায়াম্মোম (মায়দা, ৬),
(৫) নামাযে কেবলা রোখ হওয়া (বাকারা, ১৪৪),
(৬) নামাযের, বিশেষ করিয়া আছর নামাযের হেফাজতের হুকুম (২৩৮)
(৭) বিনীত ও সংযতভাবে নামাযে দাঁড়াইতে হইবে। (ঐ, ঐ,),
(৮) নামাযে আল্লাহ্‌র হুজুরে সুসংযত হইয়া থাকা (ঐ, ঐ),
(৯) নিয়মিত প্রতিদিন ও চিরকাল নামায আদায় করা (মাআরেজ, ২৩),

(১০) নামাযের হেফাজত (মাআরেজ, ২৪),
(১১) নামাযের মূল আদর্শ বিস্মৃত না হওয়া (মাউন),
(১২) লোক দেখান নামায — (ঐ),
(১৩) ফরয নামায জামাআতে আদায় করা (বাকারা, ৪৩),
(১৪) অলস ও অবসন্নভাবে নামায পড়া অন্যায়। (তাওবা,৬; নেছা, ১৫)
(১৫) নেশার অবস্থায় নামায পড়িতে যাওয়া নিষিদ্ধ (নেছা, ১৫)।

হযরত রাছুলে কারীম কি পদ্ধতিতে নামায আদায় করিয়াছেন এবং নামাযের শিক্ষা ও কর্তব্য সম্বন্ধে কি কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, হাদীছের কেতাবগুলিতে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) আল্লাহ্‌র দেওয়া রেজেক হইতে ব্যয় করা ঃ

রেজ্‌ক শব্দের অর্থ—শাশ্বত দান, তা সে দান পার্থিব হউক আর পারকালিক হউক। কোনও বিষয়ের প্রাপ্য বা প্রাপ্ত অংশকেও রেজ্‌ক বলা হয়। যে খাদ্য ও পানীয় উদরস্থ করা হয়, রেজ্‌ক-শব্দ তাহার প্রতিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মানুষের মঙ্গলজনক আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নিয়ামতই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। অবশ্য, প্রাসঙ্গিকতার হিসাবেই প্রত্যেক স্থানের উপযুক্ত তাৎপর্য নির্ধারিত করিতে হয় (রাগেব)।

পরহেজগার লোকদিগের আর একটি লক্ষণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, আমার দেওয়া রেজ্‌ক হইতে কিছু অংশ তাহারা (সৎকাজে) ব্যয় করিয়া থাকে। এখানে সৎকাজ অর্থে—দুস্থ দুর্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য করার কথাই বিশেষ ভাবে বলা হইতেছে। ইহাই ছিল যাকাত দেওয়ার সাময়িক ব্যবস্থা। নামায ও যাকাতকে কোরআন মাজীদের বহু আয়াতে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুছলমানের কর্তব্য তিন প্রকার—আল্লাহ্‌র প্রতি তাহার কর্তব্য, আল্লাহ্‌র বান্দাদিগের প্রতি তাহার কর্তব্য এবং নিজের প্রতি তাহার কর্তব্য। নামায ও যাকাত প্রথম ও দ্বিতীয় কর্তব্যের প্রধান অঙ্গ। ৩য় কর্তব্যের কথা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। যাকাত সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। এখানে পাঠকগণকে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, নামাযের ন্যায় যাকাতের ব্যবস্থাও নবুয়তের প্রথম যুগ হইতে মুছলমানদিগের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া আছে। পরে যথাসময়ে, বিভিন্ন প্রকারে যাকাতকে অপরিহার্য আইন হিসাবে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়। কিন্তু ইছলামের এই অপরিহার্য বিধানগুলিকে আমরা নানা কারণে নানা ছুতা-বাহানা বাহির করিয়া, যেরূপ

নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনা নাই ; একমাত্র এই মহাপাপের প্রতিফলে আমরা "জিল্লাত ও মাছ্‌কানাতের" যে মারাত্মক অভিশাপে জর্জ্জরিত হইয়া চলিয়াছি, তাহারও তুলনা নাই।

(৪) পরেহেজগার লোকদিগের চতুর্থ লক্ষণঃ "তোমার প্রতি'- অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি। "যাহা নাজেল করা হইয়াছে"-বলিতে কোর্‌' আনের যে সব আয়াত নাজেল করা হইয়াছে ও তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্তরে অন্য প্রকারে যে সব অহি নাজেল করা হইয়াছে—সে সমস্তকেই বুঝাইতেছে।

"হযরত রাছুলে কারীমের পূর্ববর্তী নবী ও রাছুলগণের প্রতি যে সব কেতাব নাজেল হইয়াছিল, মোমেন মোত্তাকী লোকেরা সে সমস্তকে আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া বিশ্বাস করিবে। কিন্তু এই বিশ্বাস করিতে হইবে কোর্‌আনের উপর বিশ্বাস করার সঙ্গে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, পূর্ববর্তী কেতাবগুলি ইহুদী ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতদিগের দ্বারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহারা "নিজের হাতে লিখিয়া" বহু বিষয়কে তাহাতে শামিল করিয়া দিয়াছে, বহু বিষয়কে গোপন করিয়া দিয়াছে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে সেই সব কেতাবের অধিকাংশই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আয়াতে বলা হইতেছে যে, মোমেনদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে মোহাম্মদ মোস্তফার "পূর্ব-বর্তী" নবীগণের প্রতি অহি করা কেতাবগুলির উপর। সুতরাং তাঁহার পরবর্তী যুগে যে আর কোনও অহি অথবা অন্য কোনও কেতাব নাজেল করা হইবে না, এবং তাহার বাহক হিসাবে আর কোনও নবীও তাঁহার পরে আগমন করিবেন না, এই আয়াত হইতে তাহাও নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

(৫) আখেরাতে ইয়াকীন রাখা—পঞ্চম লক্ষণঃ আখেরাত শব্দের অর্থ – পরবর্তী, যেমন দুনিয়া শব্দের অর্থ আশু বা নিকটবর্তী। কোর্‌আনের পরিভাষায় আশু বা নিকটবর্তী বলিয়া দুনিয়ার আবাসকে এবং পরবর্তী বলিয়া পরবর্তী জীবন বা আবাসকে বুঝান হইয়াছে। যেমন, সূরা আন্‌-কাবুতের ৬৪ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وما هذه الحيوة الدنيا الا لهو ولعب ' وان الدار الاخرة
لهى الحيوان ' لو كانوا يعلمون —

"এই যে দুনিয়ার জীবন, ইহা ত একটা ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র ; কিন্তু পরকালের যে আবাস, প্রকৃত জীবন হইতেছে তাহাই। এই ব্যবহার বহুলভাবে প্রচলিত থাকায়, স্থানে স্থানে কেবল দুনিয়া ও আখেরাত বলা হইয়াছে—হায়াতুদ্‌-দুনিয়া

বা দারুল আখেরাত বলা হয় নাই। কোর্আনে বর্ণিত আখেরাত্ শব্দের অর্থ যে, পরকালের আবাস, সূরা মোমেনের ২৫ আয়াতে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে :

ان الاخرة هى دار القرار –

"নিশ্চয় আখেরাত—তাহাই ত স্থায়ী অধিবাস।" সুতরাং আখেরাত অর্থে যে, পরকালের জীবনকেই বুঝাইতেছে, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের সুযোগ নাই।

মীরজা বশীরুদ্দীন ছাহেব কোর্আন মাজীদের ইংরাজী অনুবাদে আখেরাত শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "পরবর্তী অহি" বলিয়া। অর্থাৎ তাঁহার পিতা মীরজা গোলাম আহ্মাদ ছাহেবের উপর "যে সব অহি নাজেল হইয়াছে" তাহাতেও ঈমান রাখিতে হইবে। কিন্তু এই দাবীর কোনও দলিলই তিনি পেশ করিতে পারেন নাই। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, হযরতের পরবর্তী সময়ে কোনও নবী আসিবেন না, ফলতঃ কাহারও প্রতি কোনও অহিও নাজেল হইবে না। অধিকন্তু আখেরাত্ শব্দের তাৎপর্য "পরবর্তী জীবন" (বা আবাস) ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

আখেরাত ইয়াকীন করার সার মর্ম হইতেছে কর্মফলে ইয়াকীন করা। আমি যতটুকু বুঝিতে পারি, তাওহীদের পর ইহাই হইতেছে ইছলামের প্রধান পয়গাম।

৫। টীকা : কাফেরদের অবস্থা

রুকুর প্রথম ভাগে মোমেন-মোছ্লেম বান্দাদের নিদর্শনগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষ দুই আয়াতে কাফেরদিগের মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

কাফের শব্দের মূল অভিধানিক অর্থ হইতেছে আচ্ছাদন করা, কোনও বস্তুকে ঢাকিয়া ফেলা। শরিয়তের পরিভাষায়, উহার অর্থ হইতেছে (১) অজ্ঞতা বশতঃ অমান্য করা, (২) সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে অমান্য করা, নাশোকর-গোজারী, ইত্যাদি। কোরেশদিগের মধ্যে একদল লোক ইছলামকে সত্য বলিয়া জানিয়া ছিলেন এবং সত্য বলিয়া তাহাকে স্বীকারও করিয়া নিয়াছিলেন। আর একদল লোক অজ্ঞতা বশতঃ ইছলামকে তখনও পর্যন্ত সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে নাই এবং স্বীকারও করে নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর একটি দল ছিল, ইছলামের সত্যতা যাহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পৌরোহিত্যের

অহঙ্কারে, প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ও কৌলিন্যের অভিমানে আত্মসংবিত হারাইয়া বসিয়াছিল। ফলে তাহারা সব বুঝিয়া-সুজিয়াও সত্যের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আয়াতে শেষোক্ত শ্রেণীর কাফেরদিগের অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু কোরেশ ক্রমে ক্রমে ইছলাম কবুল করিয়াছিলেন, ইহা সকলের জানা আছে।

আয়াতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য "খাত্‌মুন্" শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা আবশ্যক। আরবী ভাষায় খাত্‌মুন্ ختم ও তাব্‌ওন্ طبع একই অর্থ-বাচক শব্দ। (রাগেব) কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতেও এই শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও জিনিসের উপর ছাপ মারিয়া দেওয়া, কোনও বস্তুকে এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া, যাহাতে বাহিরের কোনও বস্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, কোনও পত্র বা পুস্তকের শেষে মোহর করিয়া দেওয়া, কোনও বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাইয়া দেওয়া অর্থে উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইসব তাৎপর্যের মধ্যে বস্তুতঃ বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

হযরত রাছুলকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন—অনাচারের ও ধর্মদ্রোহের চরম-সীমায় উপনীত হইয়া গিয়াছে যাহারা, অতঃপর তোমার কোনও উপদেশ তাহাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে না, তাহারা ঈমান আনিবে না।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইতেছে—"আল্লাহ্ মোহর করিয়া বা ছাপ মারিয়া দিয়াছেন তাহাদের অন্তরের উপর ও তাহাদের কর্ণের উপর, এবং অবস্থা এই যে, তাহাদের চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে আচ্ছাদন বা পর্দা।" অর্থাৎ, মোহর করা হইতেছে যখন, তাহাদের দর্শন ইন্দ্রীয় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার পূর্বে হইতে।

আয়াতে বলা হইতেছে—আচ্ছাদন পড়িয়া আছে তাহাদের "আবছারের উপর"। আবছার বহু বচন, এক বচনে بصر বাছার। দৈহিক চোখ সম্বন্ধে ইহার কুচিৎ ব্যবহার থাকিলেও, মানুষের জ্ঞান-চক্ষু বা বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধেই সাধারণতঃ ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। কোর্‌আন স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিতেছেঃ "নিশ্চয় জানিও, তোমাদের দৈহিক চক্ষু অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হইয়া যায় তোমাদের বক্ষস্থিত অন্তঃকরণগুলি (হজ, ৪৬)।

এই আয়াতে বলা হইয়াছে—"যাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে," আল্লাহ্ তাআলা মোহর করিয়া বা ছাপ মারিয়া দিয়াছেন, তাহাদের মনের ও কানের উপর। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মোহর করা হইয়াছে কাফের হইয়া

যাওয়ার পরে। কিন্তু এখানে কথা শেষ হইতেছে না, প্রকৃতপক্ষে মোহর করা হইয়াছে কাফের হওয়ার পরে এবং তাহার ফলে। কোর্‌আন বলিতেছে :

بل طبع الله عليها بكفرهم --

"প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরগুলির উপর ছাপ মারিয়া দিলেন তাহাদের কোফরের প্রতিফলে।" (নেছা, ২২ রুকু দেখুন)। সূরা নেছা নাজেল হইয়াছিল হিজরতের পরে। এখন হিজরতের পূর্ব যুগের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সূরা নাহালে বলা হইয়াছে ঃ

وما ظلمهم الله و لكن كانوا انفسهم يظلمون ' فاصابتهم سيئات ما عملوا - (نحل ٣٣-٣٣)

و لكن من شرح للكفر صدراً (الى قوله) اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم - (١٠٨-١٠٦)

"আল্লাহ্ তাহাদের উপর জুলুম করেন নাই, বরং জুলুম করিয়া আসিয়াছে তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর, ফলে তাহাদের কৃত-কর্মগুলির কুফলই তাহাদের উপর বর্তিয়া গিয়াছে।" (নাহাল, ৩৩-৩৪)। "কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ হৃদয়কে কোফরের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে—তাহারাই হইতেছে সেই সব লোক, যাহাদের মনের উপর, কানের উপর ও চোখের উপর আল্লাহ্ ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন।" (ঐ, ১০৬—১০৮)।

বিষয়টা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য কোর্‌আন মাজীদের আর দুইটি আয়াত ও হযরত রাছুলে কারীমের একটি হাদীছ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমপারার তাৎফীফ সূরায় বলা হইতেছে :

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

"না, না, কখনই নহে, বরং তাহারা যে সব (পাপফল) অর্জন করিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাহাদের অন্তঃকরণের উপর মরিচারূপে জমিয়া গিয়াছে (১৪)

সূরা ছফে বলা হইয়াছে—

فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم -

"অতঃপর তাহারা যখন বাঁকিয়া গেল, তাহাদের অন্তরকেও আল্লাহ্ তখন বাঁকাইয়া দিলেন।"

তিরমিজী, নেছায়ী, এবন-মাজা ও এবন-জরীর প্রভৃতি বিভিন্ন ছাহাবার

প্রমুখাৎ বর্ণনা করিতেছেন—মোমেন যখন কোনও গোনাহ করে, তখন তাহার মনের উপর একটা কাল বিন্দু বসিয়া যায়। তখন সে যদি তাওবা করে ও অনুতপ্ত হয়, তাহা হইলে বিন্দুটা পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু সে যদি আরও গোনাহ্ করে, তাহা হইলে কাল দাগটা আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে কাল ছাপটা, তাহার সমগ্র অন্তরের উপর জমিয়া বসে। হযরত উপসংহারে বলেন, অন্তরের উপর মরিচা জমিয়া যাওয়ার ইহাই তাৎপর্য (এবন-কাছীর)।

বস্তুতঃ ইহা হইতেছে কর্মের সঙ্গত (جزا وفاقا) প্রতিফল। কার্তাভী বলিতেছেন, উম্মতে মোহাম্মদীর সর্ববাদীসম্মত অভিমত এই যে, ইহা কাফের-দিগের مجازاة لكفرهم কাফেরী আমল ও আকীদার প্রতিফল।"(এবন-কাছীর)

আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি-রাজ্যের একমাত্র নিয়ামক, একমাত্র বিধায়ক ও একমাত্র ব্যবস্থাপক। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বা কর্মের প্রতিফল, তাঁহার এই ন্যায়-রাজ্যের অলংঘ্য বিধান। বৃষ্টি নামে মেঘ হইতে, শস্য উৎপন্ন হয় যমিন হইতে, মানুষ মরে রোগে, অপঘাত মৃত্যু ঘটে সাপের কামড়ে, ঘর ভাঙ্গে ঝড়-ঝাপটে,—এ-সবই এক হিসাবে ঠিক। যেহেতু এ-সব হইতেছে নিমিত্ত কারণ, আর মূল কারণ হইতেছেন আল্লাহ্। তাই তাঁর প্রকৃতি-রাজ্যের সব অবস্থা-ব্যবস্থার একমাত্র কর্তাও তিনি। সংক্ষেপে, আল্লাহ্ ছাপ লাগাইয়া দিলেন—ইহার অর্থ হইতেছে, আল্লাহ্‌র অমোঘ নিয়ম অনুসারে তাহাদের মনের উপর ছাপ লাগিয়া গেল।

---

২ রুকু

৮। জনগণের মধ্যে কতকলোক এরূপও আছে, যাহারা বলে : "আল্লাহ্‌তে ও পরবর্তী দিবসে আমরা ঈমান আনিয়াছি," অথচ ঈমান আনিবার লোক তাহারা কখনই নহে। (৬)	٨ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝
৯। তাহারা তো আল্লাহ্‌র সহিত ও মোমেনগণের সহিত ধোঁকাবাজী করিতে চাহিতেছে, কিন্তু নিজ-দিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধোঁকা দিতে সমর্থ হইতেছে না	٩ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ ط

তাহারা, অথচ তাহারা ইহা অনুভব করিতেছে না। (৭)

١٠ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٥

১০। তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে এক গুরুতর রোগ, সে মতে আল্লাহ্ তাহাদের রোগকে বর্ধিত করিয়া দিলেন, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক যন্ত্রণাদায়ক আজাব—তাহাদের মিথ্যা ভাষণের প্রতিফলে। (৮)

١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٥

১১। আর তাহাদিগকে যখন বলা হয়: "তোমরা দেশে ফাছাদ ঘটাইও না।" তাহারা বলে: "আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করিয়া থাকি।"

١٢ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

১২। সাবধান! এই যে লোকগুলি, ইহারাই হইতেছে ফাছাদপরায়ণ, কিন্তু তাহারা অনুভব করিতেছে না। (৯)

١٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ط أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

১৩। আর যখন উহাদিগকে বলা হয়—"অন্য সব লোক যেরূপভাবে ঈমান আনিয়াছে, তোমরাও সেইরূপ (সততার সহিত) ঈমান আন!" তাহারা বলে: "ঐ নির্বোধগুলি যেরূপভাবে ঈমান আনিয়াছে, আমরাও কি সেইভাবে ঈমান আনিব?" জানিয়া রাখ, নির্বোধ তো তাহারাই, কিন্তু তাহারা জানিতেছে না। (১০)

١٤ و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ج واذا خلوا الى شيطينهم لا قالوا انا معكم لا انما نحن مستهزءون ٥

১৪। অবস্থা এই যে, এই (মোনাফেক) লোকগুলি মোমেনদিগের সম্মুখীন হয় যখন, তখন বলে : "আমরা ঈমান আনিয়াছি," কিন্তু মুছলমানদের অগোচরে নিজেদের শয়তানগুলির সহিত মিলিত হয় যখন, তখন বলিতে থাকে : "আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি—আমরা তো (ঈমানের ভান করিয়া মুছলমানদের সহিত) কেবল ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি।" (১১)

١٥ الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ٥

১৫। আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে এই ঠাট্টা-তামাশার প্রতিফল প্রদান করিবেন, বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে ঢিল দিতেছেন—নিজেদের বিদ্রোহী-মানসিকতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছে তাহারা। (১২)

١٦ اولئك الذين اشتروا الضللة بالهدى ص فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ٥

১৬। এই যে লোকগুলি, হেদায়তের বিনিময়ে গোমরাহীকে গ্রহণ করিয়াছে ইহারাই, ফলতঃ তাহাদের এই বাণিজ্য লাভজনক হইল না, পক্ষান্তরে সুপথ লাভ করিতেও তাহারা সমর্থ হইতেছে না। (১৩)

١٧ مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ج فلما اضاءت ما حوله

১৭। তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাইল, কিন্তু সেই আগুন যখন ঐ ব্যক্তির চারিদিকের সব কিছুকে আলোকে উদ্‌ভাসিত

করিয়া তুলিল, আল্লাহ্ তখন তাহাদের (চোখের) নূরকে বিকল করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে—কিছুই দেখিতে পায় না তাহারা। (১৪)

ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ
فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○

১৮। বধির তাহারা, মূক তাহারা, অন্ধ তাহারা সু—তরাং (সুপথের পানে) ফিরিতে পারিতেছে না। (১৫)

١٨ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ
لَا يَرْجِعُوْنَ ○ لا

১৯। অথবা (তাহাদের উপমা), যেমন আছমানের বৃষ্টিধারা যাহাতে রহিয়াছে অন্ধকার, বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুৎ চমক, বজ্র নির্ঘোষের জন্য তাহারা নিজেদের কানে আঙ্গুল পুরিয়া দিতেছে—মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া; বস্তুতঃ কাফেরদিগকে আল্লাহ্ ঘিরিয়া ফেলিবেন। (১৬)

١٩ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ
ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج
يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْ اٰذَانِهِمْ
مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط
وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

২০। বিদ্যুৎ-চমক যেন তাহাদের দৃষ্টিগুলিকে তখনই ছিনাইয়া লইতেছে; যেমনই তাহাদের সম্মুখে একটু আলোকের সঞ্চার হয়, অমনি তাহারা সেই আলোকে চলিতে থাকে, কিন্তু আবার যখন অন্ধকার হইয়া যায়, অমনি তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায়; বস্তুতঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ ও দর্শন (শক্তিকে)

٢٠ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ط
كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ق
وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ط
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ

হরণ করিয়া লইতে পারিতেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَاَبْصَارِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ع

তাফ্‌ছীর

৬। টীকাঃ মদীনার মোনাফেক

প্রথম রুকু'তে মোমেন ও কাফেরদিগের বিশেষ লক্ষণ, বিশেষণ ও আচরণ-গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই রুকু'র আলোচ্য হইতেছে মোনাফেক্ বা কপট সমাজ।

মক্কার একদল লোক ছিল প্রকাশ্যভাবে কাফের। ইছলাম ধর্মের ধ্বংস সাধন করাই ছিল তাহাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে তাহারা কখনও কুণ্ঠিত হইত না। আর একদল ছিল প্রকাশ্যভাবে মোছলেম। পৌত্তলিকতার অন্ধ-বিশ্বাসকে দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত করিয়া তাহার স্থলে তাওহীদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে ইহারাও দ্বিধাবোধ করিত না।

আওছ্ ও খজরজ্ গোত্র দুইটি মদীনার প্রাচীন অধিবাসী। আরব পৌত্তলিকদিগের সাধারণ ধারা অনুসারে, তাহারাও পূর্বে পুতুল-প্রতিমার পূজা করিত। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইহুদীদিগের কথা বাদ দিলেও, খাছ মদীনায় বানি-কইনিকা, বানি-নাজির ও বানি-কোরেজা নামক তিনটি প্রধান ইহুদী গোত্র মদীনায় বাস করিত। আওছ ও খজরজ্ গোত্রের মধ্যে গৃহবিবাদ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদিগকে নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রভাবে আবিষ্ট করিয়া, মদীনায় একটা ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য—যদিও খজরজ্- গোত্রের (কুখ্যাত মোনাফেক) আবদুল্লাহ্-এবন-উবাইকে প্রথম রাজা-রূপে নির্বাচন করিতে তাহারাও বাহ্যতঃ সম্মতি দিয়াছিল।

আবদুল্লাহ্-এবন-উবাই কয়েক মাস সুযোগ সুবিধার অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু বদর যুদ্ধে কোরেশের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ অবগত হওয়ার পর, সে নিজের নীতি পরিবর্তন করিয়া ফেলিল এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও দল-

ভুক্ত লোকদিগকে নিয়া প্রকাশ্যতঃ মুছলমান হইয়া গেল। ইহুদীদিগের এক-দলও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। মুছলমানদিগের জমা'তে ছদ্মবেশী ও তাহাদের সর্বনাশকামী মোনাফেকদিগের অনুপ্রবেশের ইহাই হইতেছে প্রাথমিক ইতিহাস। এই রুকুতে ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যক্ষতঃ যে এই মোনাফেকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোর্আন মাজীদের অন্যান্য আদেশ, নিষেধ ও উপদেশগুলির ন্যায়, মোনাফেক সংক্রান্ত উপদেশগুলিও সকল যুগের সকল দেশের সমস্ত মোনাফেকের সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে।

৭। টীকা : মোনাফেকদের ধোঁকাবাজী

মোনাফেকরা মনে কোফর লুকাইয়া রাখিয়া মুখে ইছলামকে স্বীকার করে। তাহারা মনে করিয়া থাকে যে, আল্লাহ্ বা মোমেন সমাজ তাহাদের এই মনোভাব ও দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন না। সুতরাং এই ভাবে তাহারা ইছলাম ধর্মের ও মোছলেম জাতির সর্বনাশ সাধন করিতে সমর্থ হইবে। আল্লাহ্ বলিয়া দিতেছেন যে, ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা, তাহারা যে নীতি ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে, তাহা সর্বনাশকর হইবে তাহাদেরই জন্য। অথচ নিজেদের এই পরিণতির বিষয় অনুভব করিতে পারিতেছে না, এমনই অজ্ঞ তাহারা।

৮। টীকা : মনের রোগ

মোনাফেকদিগের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ৬ টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। ইছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতির প্রতি চরম হিংসা বিদ্বেষই হইতেছে তাহাদের মানসিক ব্যাধির প্রকৃত নিদান। কারণ ইছলাম ছিল তাহাদের স্বার্থ ও সংস্কারের পরিপন্থী। কিন্তু দিন দিন ইছলামের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিল, ফলে তাহাদের এই মানসিক ব্যাধিও, আল্লাহ্র অলংঘ্য "নিয়ম অনুসারে, প্রত্যহ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আল্লাহ্ তাহাদের রোগ বর্ধিত করিয়া দিলেন"— পদের তাৎপর্য ইহাই।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হইতেছে যে, মিথ্যা ভাষণের জন্য মোনাফেক-দিগের যন্ত্রণাদায়ক আজাব ভোগ করিতে হইবে। তাহারা অন্তরের অন্ত-স্থলে যে বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে, মুখে তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং সত্য কথা প্রচার করিলেও বস্তুতঃ তাহারা হইতেছে মিথ্যাবাদী (সূরা মোনাফেকুনের প্রথম রুকু দেখুন)।

৯। টীকা : মোনাফেকের দ্বিতীয় লক্ষণ

১১ ও ১২ আয়াতে মোনাফেক সমাজের দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে মোছ্‌লেম জাতিকে অবহিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহারা সর্বদা মোছ্‌লেম-বৈরী পৌত্তলিক ও ইহুদী প্রভৃতি সমাজগুলির সহিত মিলিত হইয়া দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্তর্বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিষেধ করা হইলে তাহারা জোর গলায় উত্তর দেয়—"আমরা তো দেশবাসী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপনেরই চেষ্টা করিয়া থাকি। আল্লাহ্‌ মোমেনদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন, ইহারাই হইতেছে দেশে ফেৎনা-ফাছাদ বা অশান্তি ও উপদ্রব ঘটাইবার প্রধানতম উপকরণ।

মুছলমান সমাজকে ইহাদের সম্বন্ধে সদা-সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে। অন্যথায় প্রকাশ্য শত্রুগণ সুযোগ-সুবিধা মতে ইহাদেরই সহায়তায় তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। এ সম্বন্ধে অতীত ইতিহাসের নজীর উদ্ধার করার দরকার নাই। নিজেদের দেশের বর্ত্তমান-পরিস্থিতির প্রতি নজর দিলেই আমরা এই আয়াতের সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিব।

১০। টীকা : মোনাফেকের তৃতীয় লক্ষণ

মুছলমান নিজের কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে, নিজের নীতি ও আদর্শ অনুসারে। পার্থিব হিসাবে তাহাতে তাহার লাভ হইবে না লোকসান ঘটিবে, তাহা মুছলমানের প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য কখনই হইতে পারে না। হযরত রাছুলে কারীমের ছাহাবীগণ এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল দুঃখকে বরণ করিয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু অতি-বুদ্ধি মোনাফেকদিগের পরিভাষায় ইহা নির্বোধের কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত। তাই এই বুদ্ধিমানের দল নিজেদের মধ্যে বলা-কহা করিত যে, এই নির্বোধ মুছলমানদের মত ঈমান আনা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্বোধ হইতেছে এই সুবিধা-বাদী ও সুযোগ-অন্বেষীর দল। কারণ, নীতিহীন ও আদর্শ বর্জিত কোনও মানব সমাজই কস্মিনকালে সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। এই চিরাচরিত ঐতিহাসিক সত্যটাও কপটের দল উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না যে, জীবন সংগ্রামে সফলতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম দরকার ত্যাগ স্বীকারের। কিন্তু সুবিধাবাদী মোনাফেকের পক্ষে ইহা অসম্ভব।

১১। টীকা : মোনাফেকদের চতুর্থ লক্ষণ

মুছলমানদিগের কাছে মুছলমান, অমুছলমানের কাছে তাহাদের সহযোগী, মোটের উপর ইহা কপটদিগের অন্যতম লক্ষণ। এখানে "শয়তান"-অর্থে প্রধানবর্গ। অর্থাৎ যখন তাহারা পৌত্তলিক ও ইহুদী প্রধানদিগের সহিত মিলিত হয়, তখন তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিয়া থাকে—আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি, অর্থাৎ আমরা তোমাদের উদ্দেশ্যের ও অভিমতের সমর্থন করিয়া থাকি। মুছলমানদিগের কাছে নিজেদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকি, তাহা তো একটা ছলনা মাত্র। নির্বোধগুলাকে ঈমান ও ইছলামের ভাওতা দিয়া নিজেদের মুতলব হাসিল করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

১২। টীকা : ঠাট্টা-তামাশার প্রতিফল

আয়াতে يَسْتَهْزِئُ শব্দ আছে। উহার সাধারণ শাব্দিক অনুবাদ—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছে বা করিবে। কিন্তু এই ক্রিয়ার কর্তৃপদ "আল্লাহ্" হইলে উহার বিশেষ অর্থ হইবে : "আল্লাহ্ এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রতিফল তাহাদিগকে দিতেছেন বা দিবেন (রাগেব, কাবীর, কাছীর, বায়জাভী)।

এই প্রতিফল মদীনার মোনাফেকগণ দুনিয়াতে যথেষ্টভাবে ভোগ করিয়াছিল। তাহাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরাও আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই অমোঘ নিয়ম কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। কিন্তু তাহাদের এই শোচনীয় অভিশাপ শোচনীয়তর হইয়া উঠিবে কিয়ামতের দিনে (সূরা হাদীদ, ১৩—১৫ আয়াত দেখুন)।

১৩। টীকা : মোনাফেকের ব্যবসা

মোনাফেক-সমাজ ধর্মকে নিজেদের ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। হেদায়তের বিনিময়ে তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে জালালাত্ বা গোমরাহীকে। হেদায়ত সম্বন্ধে ৩ টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। জালালাত্ শব্দের অর্থ পথ হারাইয়া ফেলা, সুপথের সন্ধান পাইয়াও তাহাকে বর্জন করা। মোনাফেকরা হেদায়তের বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া থাকে জালালাত্কে, নিজেদের পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাহারা লাভবান হইতে পারে না। কারণ, যে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহারা এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা লাভ করা তাহাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। অধিকন্তু মাঝে পড়িয়া সুপথকে তাহারা বিসর্জন দিয়া বসে। ফলতঃ লাভ তো হইল না, মূলধনটাও নষ্ট হইয়া গেল।

১৪। টীকা : মোনাফেকদের উপমা

১৭ আয়াতের প্রথমে "তাহাদের উপমা" বলিতে মোনাফেকদের উপমাকে বুঝাইতেছে। কারণ, পূর্ব আয়াতে মোনাফেকদিগের প্রসঙ্গই আলোচনা করা হইয়াছে। "এক ব্যক্তি" আগুন জ্বালাইল—অর্থে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বুঝান হইতেছে। নিবিঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন দুনিয়ায় তিনিই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইলেন। সেই প্রদীপের আলোকে মক্কার চতুর্দিক যখন উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল, মোনাফেকদিগের চোখের নূর তখন তাহাদের কর্মফলে বিকলিত হইয়া গেল। কাজেই দর্শনীয় বস্তুটি—আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিলেও—নিজে-দের দর্শন-বিকারের প্রতিফলে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না।

তাফ্‌ছীরকারগণের সাধারণ মত এই যে, আয়াতে বর্ণিত "এক ব্যক্তি" বলিতে "মোনাফেকদিগকে" বুঝাইতেছে। আমি এই তাৎপর্যের সঙ্গতি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণগুলি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

(১) استوقد এক বচন ক্রিয়াপদ। সুতরাং উহার অর্থ হইবে "এক ব্যক্তি" আগুন জ্বালাইল। ماحوله শব্দের "হু" এক বচন সর্বনাম। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই আগুন জ্বালাইয়াছিলেন এক ব্যক্তি। এক ব্যক্তি আর বহু ব্যক্তি নিশ্চয় এক কথা নহে।

(২) আয়াতে বলা হইতেছে। الذى استوقد نارا—"সেই ব্যক্তি" যে আগুন জ্বালাইল। এখানকার "আল্‌-লাজী" শব্দও একবচন, বহু বচনে হইবে الذين আল্‌-লাজীনা। পরস্পর বর্ণিত এই তিনটি এক বচনাত্মক শব্দকে বহুবচনরূপে গ্রহণ করার কোনও কারণ নাই।

(৩) তাফ্‌ছীরকারগণ বলিতেছেন—আল্‌-লাজী শব্দ কখনও কখনও বহুবচনরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা সূরা তাওবার خضتم كالذى خاضوا আয়াতটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই আয়াতে خاضوا বহুবচন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে ব্যতিক্রমের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে ঐ রূপ কোন ইঙ্গিত তো বর্তমান নাই, বরং সমস্ত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম এক বচনই ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত নজীর এ ক্ষেত্রে কোনও মতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না।

(৪) হযরত রাছুলে কারীম বিভিন্ন হাদীছে নিজের ও নিজ কর্তব্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার একটি হাদীছে তিনি বলিতেছেন :

مثلى كمثل الذى استوقد نارا - الحدد . - (بخارى' مسلم)

"আমার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালাইল" ইত্যাদি। (বোখারী, মোছলেম)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীছে, হযরত নিজেকে ও নিজের পয়গামকে মেঘ ও বৃষ্টিধারার সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। এই হাদীছ দুইটিও বোখারী ও মোছলেম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও পরস্পর দুইটি উপমার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হাদীছগুলি হইতে আমার মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

(৫) "মোনাফেকরা আগুন জ্বালাইল"—কথার কোনও সঙ্গত তাৎপর্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

আল্লাহ্‌র নবী আগুন জ্বালাইয়া মানব সমাজের জীবন সাধনার সঙ্গত ও অসঙ্গত পথগুলি সকলের সম্মুখে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন। যাহারা চক্ষুষ্মান,তাহারা সেই আলোকে পথ দেখিয়া চলে। কিন্তু যাহাদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, নিবিড় অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে পড়িয়া তাহারা কেবল আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া মরিতেছে।

১৫। টীকা : বধির, মূক ও অন্ধ

তাহারা বধির—সুতরাং আল্লাহ্‌র কালাম শুনিতে পায় না, অর্থাৎ তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন এই সূরার ১৭১ আয়াতে বলা হইয়াছে—"তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি (পালরক্ষকের ন্যায়) উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু যাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য এই চীৎকার, তাহারা শুধু ডাকহাঁকের শব্দ মাত্র ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পায় না। বধির, মূক ও অন্ধ হইয়া আছে তাহারা, অতএব তাহারা জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না (মর্মানুবাদ)।

তাহারা মূক বা বোবা। মনের কথা প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা অন্ধ, সুতরাং দেখিয়াও শিখিতে পারে না। এ অবস্থায় সত্যের পানে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা তাহাদের নাই। তবে যদি অনুতাপ ও সাধনার দ্বারা তাহারা নিজেদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া নেয়, তখন তাহাদের এই পরিস্থি-তিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

১৬। টীকা : দ্বিতীয় উপমা

হযরত রাছুলে কারীম আল্লাহ্‌র যে মহান কালাম প্রদত্ত হইয়াছেন এবং ইছলামের যে শাশ্বত পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহাকেই বৃষ্টিধারার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। হযরত বলিয়াছেন :

مثل ما بعثني الله به من الهدى و العلم كمثل الغيث الكثير ' الحديث -

"আল্লাহ্ আমাকে যে হেদায়ত ও এলেম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, বিপুল বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহার উপমা······· । (বোখারী, মোছলেম)।

বৃষ্টিধারার দুইটি বিশেষত্ব আছে—প্রথম আশা ও আনন্দের, দ্বিতীয় আশঙ্কা ও সন্ত্রাসের। উর্বর জমিতে পড়িয়া সে ধারা জমিনকে ও জমিনের সমস্ত জীব-জন্তু ও উদ্‌ভিদকে জীবনের সকল সম্পদে সুসম্পন্ন করিয়া তোলে। কিন্তু বন্ধুর ভূভাগে তাহা প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে বিপুল বারিধারা নামিয়া আসে যে মেঘ পুঞ্জ হইতে, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের কড়কও থাকে, বিজলীর চমকও থাকে। এইগুলি হইতেছে সাধন পথের পরীক্ষা। মোনাফেক, মুছলমানের সুখ-সম্পদের হিস্বা নেওয়ার জন্য খুবই লালায়িত, কিন্তু মুছলমান হিসাবে স্বজাতির বিপদ-আপদের অংশ গ্রহণের সময় তাহারা দূরে সরিয়া পড়ে, কাফেরদের সঙ্গে সহযোগ করিয়া আত্মরক্ষা করার চেষ্টা পায়। ২০ আয়াত ইহারই ব্যাখ্যা।

---

৩ রুকু

২১। হে মানব সমাজ! তোমরা এবাদত করিতে থাকিবে নিজেদের সেই প্রভু-পরওয়ারদেগারের, যিনি পয়দা করিয়াছেন তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্বেকার সকল মানুষকে—যেমতে তোমরা সংযমশীল হইতে পারিবে–(১৭)

۲۱ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ
الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

২২। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করিয়া দিয়াছেন শয্যা স্বরূপ এবং আছমানকে করিয়া দিয়াছেন ছাদকের ন্যায়, এবং যিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা নামাইয়া দিয়াছেন ও তাহা-দ্বারা উদ্‌গত করিয়া দিয়াছেন নানা প্রকার ফল-শস্য তোমাদের উপজীবিকা হিসাবে, (১৮) অতএব তোমরা কোনো কিছুকেই

۲۲ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا
وَّالسَّمَاۤءَ بِنَاۤءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ
الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا

আল্লাহ্‌র সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করিও না—অথচ তোমরা অবগত আছ। (১৯)

لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ o

২৩। এবং আমরা আপন বিশিষ্ট বান্দাহ্‌র উপর যে কেতাব নাজেল করিয়াছি, তাহার (সত্যতা) সম্বন্ধে তোমাদের যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ঐ কেতাবের (সূরাগুলির) অনুরূপ একটি মাত্র সূরা তোমরা রচনা করিয়া আন—এবং (ইহার জন্য) আল্লাহ্ ব্যতীত, নিজেদের মুরব্বীদিগকে (সাহায্যের জন্য) আহ্বান জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২০)

٢٣ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ o

২৪। কিন্তু যখন করিতে পার নাই এবং করিতে কস্মিনকালেও সমর্থ হইবে না—সে অবস্থায় সেই জাহান্নাম সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চল, যাহার ইন্ধন হইতেছে মানুষ ও পাথর, যাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে কাফের-দিগের জন্য। (২১)

٢٤ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ o

২৫। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও (সঙ্গে সঙ্গে) সৎকাজগুলি সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে, (হে রাছুল!) তুমি তাহাদিগকে খোশ্-খবর জানাইয়া দাও সেই জান্নাত-গুলির—যাহার অধঃদেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নদ-নদীমালা;

٢٥ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
رِّزْقًا لا قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ وَ اُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط
وَ لَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ لا ق
وَ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ o

যখনই তাহাদিগকে জান্নাতের কোনও ফল "রেজেক" হিসাবে প্রদান করা হইবে, তাহারা বলিবে—পূর্বে আমাদিগকে যে রেজেক প্রদান করা হইয়াছিল—ইহা তো তাহাই, বস্তুতঃ তাহাদের রেজেকগুলি হইবে পরস্পরের সদৃশ; (২২) এবং জান্নাতে তাহাদের (সাহচর্যের) জন্য থাকিবে তাহাদের পাক-ছাফ স্ত্রীগণ এবং সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী।

٢٦ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ
يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا
فَوْقَهَا ط فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج
وَ اَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ
مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا م
يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَّ يَهْدِي بِهٖ
كَثِيرًا ط وَ مَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا
الْفٰسِقِينَ o لا

২৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ একটি ক্ষুদ্র মশকের অথবা তাহা অপেক্ষা বৃহৎ কোনও বস্তুর উপমা দিতে বিরত থাকেন না; সেমতে ঈমান আনিয়াছে যাহারা, তাহারা তো জানেই যে, উহা তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুর হইতে সমাগত বাস্তবিক কথা, কিন্তু কাফের হইয়া গিয়াছে যাহারা, তাহারা বলে: "আল্লাহ্‌ কি উদ্দেশ্যে এই উপমা দিয়াছেন?" ইহা দ্বারা বহু লোককে তিনি গোমরাহ্‌ করেন, আবার বহু লোককে তিনি ইহা দ্বারা হেদায়ত করেন, বস্তুতঃ কুকর্মপরায়ণ (ফাছেক)-লোকদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি গোমরাহ্‌ করেন না—

২৭। —(সেই সব ফাছেক), যাহারা আল্লাহ্‌র (হুজুরে কৃত) অঙ্গীকারকে তাহার দৃঢ়ীকরণের পরও —ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তিনি যে বিষয়টাকে সংযুক্ত করিয়া রাখার আদেশ দিয়াছেন—তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলে, আর দুনিয়ার ফেৎনা-ফাছাদ ঘটাইয়া বেড়ায়—সর্বনাশ-গ্রস্ত তো তাহারাই। (২৩)

۲۷ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ
بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ص وَيَقْطَعُوْنَ
مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ
وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

২৮। (হে অজ্ঞ মানব।) কিরূপে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতঘ্ন হইতে পার—অথচ অবস্থা এই যে, তোমরা ছিলে জীবনহীন, সে অবস্থায় তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিলেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন, তাহার পর তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন, তৎপর তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে তাঁহারই পানে। (২৪)

۲۸ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ
اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ○

২৯। সেই তো তিনি, যিনি জমিনের সবকিছুকে পয়দা করিলেন—তোমাদের কল্যাণের জন্য, এবং তিনি আকাশমণ্ডলের প্রতি মনোযোগী হইলেন আর সে-গুলিকে সপ্তগগনে সুবিন্যস্ত করিয়া দিলেন; বস্তুতঃ তিনি হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্ব-বিদিত।

۲۹ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى
الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰٓى
اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيْمٌ ع

তাফ্ছীর

১৭। টীকা : আল্লাহ্‌র এবাদত

এই আয়াতে সমগ্র মানব সমাজকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে, তোমরা এবাদত করিতে থাকিবে নিজেদের রাব্ বা প্রভু-পরওয়ারদেগারের। (এবাদত ও রাব্ শব্দের তাৎপর্যের জন্য সূরা ফাতেহার ২ ও ৪ টীকা দ্রষ্টব্য।) আয়াতের শেষ ভাগে বলা হইতেছে যে, এই এবাদতই হইতেছে মানুষের রক্ষাকবচ। বস্তুতঃ দৈহিক, আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক এবং ব্যক্তিগত, জাতিগত ও পরিবারগত যত প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগ মানবসাধারণকে পার্থিব জীবনে বিব্রত করিয়া রাখে, আল্লাহ্‌র এবাদতই হইতেছে সে সমস্তের একমাত্র সমাধান।

পূর্ণ প্রেমভাবে পূর্ণ আত্মসমর্পণের নামই এবাদত। এই আত্মসমর্পণের পর বান্দাহ্‌র সব আকাঙ্ক্ষা, সব প্রবৃত্তি আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশের অনুগত হইয়া পড়ে। সুতরাং পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর যেখানে পাপ নাই, সেখানে তাপও নাই।

১৮। টীকা : আল্লাহ্‌র অনন্ত নিয়ামত

২১ আয়াতে মানব সমাজকে সমগ্রভাবে আহ্বান করা হইতেছে আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, বর্তমানে যে সব মানব ধরাপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছে এবং অতীতে যাহারা অবস্থান করিয়াছে, তাহাদের সকলকে পয়দা করিয়াছেন তিনি, এবং একমাত্র তিনিই। মানব সমাজের প্রতি ইহা আল্লাহ্‌র প্রথম ও প্রধান নিয়ামত।

এই প্রসঙ্গে ২২ আয়াতে তাঁহার আর তিনটি প্রত্যক্ষ নিয়ামতের উল্লেখ করা হইতেছে :

(১) তিনি মানব-সাধারণের কল্যাণের জন্য জমিন (ভূমণ্ডল)-কে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তাহারা জমিনের উপর অক্লেশে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারে। (বায়জাভী, ফাৎহুল বায়ান প্রভৃতি)। তাফ্ছীর-কারগণের অনেকেই মনে করিয়াছেন যে, এই আয়াত হইতে জমিনের সমতল হওয়া বা গোলক আকারের না হওয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। আবার কেহ কেহ এই আয়াত হইতে জমিনের কোনও গতি না থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে এই আয়াত হইতে উপরোক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

তাঁহাদের প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে জমিনের সমতল বা গোল হওয়া সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোনও অভিমত প্রকাশ করা হয় নাই। ইমাম এবন্-হাইয়ান বলিতেছেন :

و قد استدل بعض المنجمين بقوله جعل لكم الارض فراشا على ان الارض مبسوطة لا كرية ' و بانها لو كانت كرية ما استقر ماء البحار فيها -- اما استدلا له بالاية فلا حجة له في ذلك ' لان الاية لا تدل على ان الارض مبسوطة و لا كرية - (ج ١ ص ٩٧ - البحر المحيط)

"কোনও কোনও মোনাজ্জেম বলিয়াছেন যে, এই আয়াত হইতে জমিনের সমতল হওয়া ও গোলাকার না হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, জমিন গোলকের মত হইলে নদ-নদীর পানি তাহাতে স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু এই আয়াতে তাঁহাদের এইসব অভিমতের কোনও প্রমাণ নাই। কারণ, জমিন যে প্রশস্ত ও সমতল এবং তাহা যে গোলাকার নহে, আয়াতে ইহার কোনও প্রমাণ নাই।" (মুহীৎ ১—৯৭)। ইমাম রাজী বলিতেছেন :

ومن الناس من زعم ان الشرط في كون الارض فراشا ان لا يكون كرة ' و هذا بعيد جدا ' لان الكرة اذا عظمت جدا كانت القطعة منها كالسطح في امكان الاستقرار الخ -

"কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করিয়া নিয়াছেন যে, পৃথিবীকে ফেরাশ বা শয্যারূপে গ্রহণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা গোলাকার নহে এবং এই আয়াতকে তাঁহারা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অতিশয় অসঙ্গত কথা। কারণ, কোনও গোলাকার পদার্থ অতিশয় বৃহৎ আকার ধারণ করিলে তাহার এক-একটা অংশ এমন সমতলের ন্যায় হইয়া যায়, যাহাতে স্থিতি করা সম্ভব," ইত্যাদি (কাবীর ১—৩২৩)। বায়জাভীও ঠিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত তাফ্ছীরকারগণের এইসব মন্তব্য হইতে জানা যাইতেছে যে, এই আয়াত হইতে জমিনের সমতল হওয়া গোলাকার না হওয়ার কোনও প্রমাণ এই আয়াতে নাই, অধিকন্তু এই মত-বাদের সমর্থনে কোন যুক্তিও নাই।

জমিনের কোনও প্রকার গতি নাই, ইহাও এই আয়াত বা অন্য কোনও আয়াত হইতে প্রমাণিত হয় না। বরং অন্যত্র (তা-হা, ৬ ; জোখরফ, ১০)

জমিনকে مهد বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাছ্‌দার হিসাবে উহার অর্থ কোনও কোনও বস্তুকে সুবিন্যস্ত করা, কোনও বিষয়কে সুসঙ্গতভাবে আঞ্জাম দেওয়া অথবা কোনও স্থানকে জীবের বাসোপযোগী করিয়া দেওয়া। বিশেষ্য-পদ বা اسم হিসাবে উহার অর্থ হয় অবস্থানস্থল ও শিশুদিগের হিন্দোলা (রাগেব, ছোরাহ প্রভৃতি)। আল-এমরানের ৪৫ আয়াতে ও মায়েদার ১১০ আয়াতে এবং হযরত ঈছা সংক্রান্ত সূরা মরিয়মের বর্ণনায় শাহ্‌ অলিউল্লাহ্‌ ছাহেব প্রভৃতি گہوارہ হিন্দোলা বলিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে, হিলনা বা হিন্দোলার গতির কথা দুনিয়ার সকলে অবগত আছেন। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির এবং তাহার মাধ্যাকর্ষণের কথা আজ স্কুল-পাঠশালার ছাত্ররাও অবগত আছে। ইহার যুক্তি-প্রমাণগুলির খণ্ডন করা অসম্ভব। কোর্‌আন মাজীদ অন্ততঃ এগুলিকে অমান্য করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিতেছে না। এ অবস্থায় কোর্‌আনের দোহাই দিয়া সেগুলির প্রতিবাদ করিতে যাওয়ার মত অন্যায় আর কি হইতে পারে।

১৯। টীকাঃ ছামা ও বেনা

ছামা শব্দের ধাতুগত অর্থ—উচচ হওয়া। ঊর্ধ্বস্থ সব বস্তুর প্রতি আরবী সাহিত্যে ছামা শব্দ প্রয়োগ করা হয়। মানুষের মাথার উপর যে অনন্ত শূন্য বিদ্যমান এবং সেই শূন্যস্থ মেঘ, গ্রহ, নক্ষত্র ও তাহাদের গতিপথ প্রভৃতি সমস্তই ছামা-পদবাচ্য হইতে পারে (রাগেব, বায়জাভী, কাবীর প্রভৃতি)।

بناء ما يبنى যাহা বানান হয়, তাহাই বেনা (রাগেব)। ঘরের চাল, তাম্বুর উপরিভাগ, কুব্বা বা গুম্বজ প্রভৃতি যে সব আচ্ছাদনে শীর্ষভাগ ক্রমে নীচের দিকে নামিয়া আসে, সে সমস্তকে আরবী ভাষায় 'বেনা' বলা হয়। চামড়া ও পশমের তাম্বুগুলিই ছিল আরবদিগের প্রধান বেনা। নববধূর জন্য প্রস্তুত এইরূপ তাম্বুর নাম হইতে بنى عليها ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ যখন তাহার ঊর্ধ্বদেশস্থ আকাশের দিকে তাকায়, তখন বাহ্যদৃষ্টিতে গৃহের চাল বা তাম্বুর আচ্ছাদনের মত একটা আকার তাহার নজরে পড়ে। এই হিসাবে আকা-শকে 'বেনা' বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে অভিধানকারগণ সকলেই একমত।

২১ ও ২২ আয়াতের প্রধান প্রতিপাদ্য হইতেছে আল্লাহ্‌র তাওহীদ। যে মহিমা-ময় করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ মানব সমাজকে পয়দা করিয়াছেন, তিনি জমিনকে তাহাদের অবস্থানস্থলরূপে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। অনন্ত আকাশের কুদরতের কারখানারও তিনি একমাত্র বিধায়ক। তিনি আকাশ

হইতে বৃষ্টিধারা নামাইয়া দিয়া এই ধরাধামকে সদাসজীব করিয়া রাখিয়াছেন,— অতএব হে মানব সমাজ। স্থষ্টির কোনও ব্যক্তিকে, কোনও বস্তুকে বা কোনও বিষয়কে কোনও প্রকারে তোমাদের সেই খালেক, মালেক ও রাজেক আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করিও না। ইহাই হইতেছে ইছলামের প্রাণবস্তু, ইহারই নাম তাওহীদ এবং ইহার ব্যতিক্রমের নামই শের্ক। মোমেন ও মোশরেকের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই শিক্ষার আলোকে।

কপালে করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, মুছলমান সমাজ কি আজ এই শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেছে? পাঠক! স্বসমাজে প্রচলিত কাউওয়ালীর ও মৌলুদের উর্দু কেতাবগুলির সন্ধান লইয়া দেখুন, সেখানে আল্লাহ্‌ ও রাছুল অভিন্ন। জীবন্ত বা মৃত পীরের তাছাউওর (تصور شیخ), বা গুরু-ধ্যান, অহ্‌দাতুলঅজুদ বা অদ্বৈতবাদ (Pantheism) মতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সেখানে বিদ্যমান। ইষ্টলাভের বা অনিষ্ট নিবারণের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে গায়রুল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ, আজ আমাদের সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত। ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতে হয়। অথচ আমরা অনেকেই জানি যে, এইসব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করাই হইতেছে ইছলামের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। কিন্তু আমরা মানুষের ভয়ে চুপ করিয়া থাকি, অথবা স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় ঐগুলির সমর্থন করিয়া যাই। তাই আয়াতের শেষভাগে বলা হইতেছে—"অথচ তোমরা অবগত আছ।" এ-সম্বন্ধে যথাযথ স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

২০। টীকা: কোর্‌আনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জ

কোর্‌আনের চিরন্তন দাবী এই যে, তাহা আল্লাহ্‌র কালাম। কিন্তু একদল মানুষ প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছিল যে, "কোর্‌আন মোহাম্মদের রচনা। তিনি নিজের এই রচনাগুলিকে অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র নামকরণে চালাইয়া দিয়াছেন।" কোর্‌আন নানাভাবে ইহার সদুত্তর দিয়াছে। এই আয়াতের চ্যালেঞ্জটি তাহার অন্যতম।

আয়াতের মর্ম এই যে, মোহাম্মদ একজন উম্মী নবী। দুনিয়ার হিসাবে শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এ অবস্থায় কোর্‌আনের ন্যায় এক বিরাট পুস্তকের রচনা করা যদি এই উম্মী কোরেশের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা---মক্কার কবি ও সাহিত্যিকরা, আরবের খ্রীষ্টান ও ইহুদী পণ্ডিতরা, দুনিয়ার বিজ্ঞ মনীষীরা ইহার কোনও অংশের অনুরূপ একটা সূরা রচনা করিয়া আন, এবং এজন্য তোমরা পরস্পরকে যথা-

সম্ভব সাহায্য করিতে থাক। কাহার কথা সত্য এবং কাহার কথা মিথ্যা, এই পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

দীর্ঘ ১৪ শত বৎসর যাবৎ কোর্আনের এই চ্যালেঞ্জ দুনিয়ার দিকে দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। মক্কার কোরেশ হইতে ভারতের আর্য সমাজীরা পর্যন্ত সমগ্র পৌত্তলিক সমাজ, মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান হইতে উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানগর্বিত আধুনিক পাদ্রী প্রচারকগণ, সকলে এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাদের একদল পরাজিতের বিদ্বেষ মাত্রকে সম্বল করিয়া ইছ্লাম ও কোর্আনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতঃ নিজেদের মর্মজ্বালা নিবারণ করার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু আর একদল ন্যায়ের অনুরোধে এই দাবীর নিকট নতি স্বীকারও করিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, কোর্আনের এই দাবীর বিচার হইবে কোন্ হিসাবে? ইহার উত্তর—সুসঙ্গত বিচারের সব হিসাবে, সকল দিক দিয়া। ভাষার হিসাবে, সাহিত্যের হিসাবে, শিক্ষার হিসাবে, দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণ হিসাবে এবং সার্থক ধর্মগ্রন্থ হিসাবে।

আমাদের মতে, শেষের কথাটাই প্রথম কথা। ধর্মপুস্তকের বিচার হইতে পারে প্রধানতঃ দুইটি দিক দিয়া: তাহার শিক্ষা সার্থক হইয়াছে কি-না এবং তাহা অবিকৃতভাবে সুরক্ষিত হইয়া আছে কি-না? প্রথম প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে আমাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে, সত্যকার ধর্মপুস্তকের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত?

আমি যতদূর বুঝি, ধর্মপুস্তক বা খোদায়ী কেতাবের উদ্দেশ্য হইতেছে:

(১) মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে এক, অদ্বিতীয়, সর্বমঙ্গলময়, সর্ববিৎ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারকর্তা, অবিনশ্বর আল্লাহ্র যথাযথ অনুভূতি সম্যকভাবে জাগ্রত করিয়া রাখা।

(২) ধর্মের নামকরণে দুনিয়াময় যে শোচনীয় সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি করা হইয়াছে, সঙ্গতভাবে তাহার অবসান ঘটাইয়া বিশ্বমানবকে এক ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করা।

(৩) বর্ণ ও জন্মের দোহাই দিয়া আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠতম মখলুক মানব সমাজের মধ্যে যে বৈষম্য ও বৈরভাবের সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার যথার্থ প্রতিকার করা।

(৪) আল্লাহ্র বান্দাহ্দিগকে সমস্ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস হইতে মুক্ত করা ও

তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দেওয়া সৎজ্ঞানের অনুশীলনে আগ্রহশীল করিয়া দেওয়া।

(৫) দুনিয়ায় শান্তি ও শৃঙখলা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে কর্মফলে ও পরজীবনে প্রত্যয়শীল করিয়া তোলা।

(৬) জড় পদার্থের পূজা-অর্চনার অভিশাপ হইতে মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে মুক্ত করিয়া, জড়ের উপর হুকুমৎ করার ও তাহা দ্বারা আল্লাহ্‌র মখ-লুকের কল্যাণ সাধন করার শিক্ষায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করা।

এইসব উদ্দেশ্যে কোর্‌আন সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করিয়াছে। আল্লাহ্‌র তাওহীদ কোর্‌আন ব্যতীত দুনিয়ার আর কোনও ধর্মশাস্ত্রে বিশুদ্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকল দেশের সব যুগের নবী ও রাছুলগণকে এবং তাঁহাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র কালামগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, কোর্‌আন ধর্মীয় বিরোধের মূল উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। বর্ণ ও জন্মগত বৈষম্যের অভিশাপকে কোর্‌আন কঠোরতর ভাষায় অস্বীকার করিয়াছে। ইছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতির ইতিহাস ইহার অগণিত বাস্তব নজীরে পূর্ণ হইয়া আছে। কোর্‌আন সমস্ত অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আল্লাহ্‌র কালামের ও তাঁহার দেওয়া বিচারশক্তি میزان এবং حکمت وعقل বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুসরণ করিতে মুছলমান সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই জন্য পূর্ব-পুরুষদিগের "রেছেম রেওয়াজের" বা সংস্কৃতির বিনাবিচারে অনুসরণ করার কোর্‌আন ঘোর বিরোধী। তাওহীদের পর কোর্‌আনের দ্বিতীয় পয়গাম হইতেছে—পরকাল ও কর্মফল। কোর্‌আন মাজীদ জড়পূজা বা প্রকৃতি পূজার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, প্রকৃতির সব উপ-করণ ও সমস্ত অবদানকে নিজেদের বশীভূত করিয়া নেওয়াই মানুষের কর্তব্য। কোর্‌আন বিজ্ঞান পুস্তক নহে, এ-কথা খুবই সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে, যে সব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের গবেষণা করিয়া দুনিয়ায় অমর হইয়া আছেন, তাঁহাদের অনেকেই এই সাধনার প্রথম প্রেরণা ও মৌলিক সূত্রগুলির সন্ধান লাভ করিয়াছেন কোর্‌আন মাজীদেরই আয়াতগুলি হইতে। নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করিয়াছেন: "The Quran is unapproachable as regards convincing power, eloquence, and even composition. And to it was also indirectly due the marvellous development of all branches of science in the Moslem world." (Hirshefeld).

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয়ের উত্তরে সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখিলে যথেষ্ট

হইবে যে, কোর্‌আন নাজেল হওয়ার প্রথম দিন হইতে হযরতের এন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত, এমন সতর্কতার সহিত লিখিত ও সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তাহার কুত্রাপি একটি অক্ষরেরও কোনও পরিবর্তন ঘটিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একদল খ্রীষ্টান মিশনারীদিগকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইছ্‌লাম ও কোর্‌আন সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারাও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন: There is probably in the world no other book which has remained twelve centuries with so pure a text. অর্থাৎ—জগতে এরূপ পুস্তক সম্ভবতঃ আর একখানিও নাই, দীর্ঘ বার শত বৎসর ধরিয়া যাহার এবারৎ এমন অবিকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে (উইলিয়ম মূর Life of Mohammad, ভূমিকা)।*

ইহার মোকাবেলায় অন্যান্য জাতির ধর্মপুস্তকগুলির অবস্থার বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে, হয় সেগুলি শোচনীয়রূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, না হয় মূল পুস্তকগুলি দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই মন্তব্যে আমরা অতি সংক্ষেপে কয়েকটা ইঙ্গিত করিয়াছি মাত্র। ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্য অন্ততঃ ছয়খানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করার দরকার।

২১। টীকা: ইছ্‌লামের সর্বপ্রধান মো'জেজা

এই আয়াতে ২৩ আয়াতের উপসংহার হিসাবে বলা হইতেছে, 'فان لم تفعلوا'—অর্থাৎ যখন অতীতেও কোর্‌আনের অনুরূপ দশটি সূরা বা একটি সূরাও তোমরা রচনা করিতে পার নাই। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, সূরা বাকারা নাজেল হইয়াছে হিজরতের বৎসরাধিককাল পরে। তাহার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা হূদের ১৩ আয়াতে, সূরা ইউনুছের ৩৮ আয়াতে এবং সূরা বানি-ইছ্‌রাইলের ৮৮ আয়াতে ঠিক অনুরূপ চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হইয়াছিল و لن تفعلوا —অর্থাৎ অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতে কস্মিনকালেও তোমরা এই দাবীর উত্তর দিতে সমর্থ হইবে না। ১৪ শত বৎসর পরে আজ আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিতেছি যে, এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দেওয়া দুনিয়ার ইছ্‌লাম-বিরোধী পণ্ডিতগণের পক্ষে অতীতে সম্ভব হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। কারণ কোর্‌আন আল্লাহ্‌র কালাম, বান্দাহ্‌র পক্ষে তাহার মোকাবেলা করা সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্যই আমাদের আলেম সমাজ সমবেতকণ্ঠে কোর্‌আনকে ইছ্‌লামের সর্ববাদীসম্মত মো'জেজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

---

* বার শত বৎসরের পরিবর্তে এখন চৌদ্দ শত বৎসর বলাই উচিত।

"মানুষ ও প্রস্তর, نار বা (জাহান্নামের) আগুনের ইন্ধন হইবে"—এ কথার তাৎপর্য কি? মানুষ ইন্ধন হইতে পারে, কিন্তু প্রস্তরকে ইন্ধন করার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? এখানে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং তাফ্ছীরকারগণ বিভিন্ন প্রকারে ইহার উত্তর দিয়াছেন। প্রথম যুগের তাফ্ছীর-কারগণ সকলেই এখানে প্রস্তর অর্থে "গন্ধক-প্রস্তর" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। (মাজহারী, কাছীর প্রভৃতি)। অন্যরা এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, এখানে প্রস্তর অর্থে প্রস্তর নির্মিত ঠাকুর-দেবতা— মোশরেকরা যাহার পূজা করিয়া থাকে। (বায়জাভী, কাবীর প্রভৃতি)। সূরা আম্বিয়ার ৯৮ আয়াতকে ইঁহারা প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিয়াছেন। এবন-মাছউদ ও এবন আব্বাছের অভিমতকেও ইঁহার সমর্থনে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম রাগেব উপরোক্ত মত দুইটির উল্লেখ করার পর আর একটা মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন:

اراد بالحجارة الذين هم فى صلابتهم عن قبول الحق كالحجارة كمن وصفه بقوله: فهى كالحجارة او اشد قسوة – مفردات –

"অর্থাৎ প্রস্তর বলিয়া সেই সমস্ত লোককে বুঝান হইতেছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যাত করার জন্য যাহারা পাথরের মত কঠিন। যেমন কোর্‌আনে বলা হইয়াছে: তোমাদের অন্তরগুলি অতঃপর কঠিন হইয়া গেল, ফলে তাহা হইয়াছে প্রস্তরের ন্যায় বরং তদপেক্ষা কঠিনতর" (২—৭৪)।

সূরা আম্বিয়ার ৯৮ আয়াতে বলা হইয়াছে—انتم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم।—অর্থাৎ তোমরা, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাহা কিছুর তোমরা এবাদত করিতেছ, তাহারা সমস্তই হইবে জাহান্নামের ইন্ধন।

আমি প্রথম মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কারণ বস্তুতঃই ইহাতে এক 'আম' বা সাধারণ বর্ণনাকে বিনা কারণে খাছ্ করিয়া লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় মতের তুলনায় ইমাম রাগেবের বর্ণিত তৃতীয় মতটিকে আমি অধিক সমীচীন মনে করিতেছি। ইহার কারণগুলি নিম্নে আরজ করিতেছি:

(১) সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াতে মানুষের হৃদয়কে প্রস্তরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতেও উহার এই তাৎপর্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(২) সূরা বানি ইছরাইলের ৩৬ আয়াতে বলা হইয়াছে—

ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا -

8—

"নিশ্চয় চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় (Heart)-কে—উহাদের সকলকে—উহার সম্বন্ধে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।" যেখানে কর্মের জওয়াবদিহি থাকিবে, সেখানে সৎ-অসৎ কর্ম হিসাবে তাহার পুণ্যফল ও পাপফল ভোগও সুনিশ্চিত। মানুষ বলিতে তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝায়, সুতরাং আবার হৃৎপিণ্ড বলার কোনও সার্থকতা থাকে না—এরূপ কথা বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালামে ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পর ইহা দ্বিরুক্তি মোটেই নহে। অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—التخصيص بعد التعميم يفيد التعظيم—অর্থাৎ সাধারণভাবে বর্ণনার পর তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইলে, সেই বিষয়ের গুরুত্ব প্রতিপাদিত হয়।

(৩) আম পারার হোমাজা সূরায় জাহান্নামের আগুন সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

نار الله الموقدة ' التى تطلع على الافئده –

"আল্লাহ্‌র (হুকুমে) প্রজ্বলিত হুতাসন, ("দেহকে স্পর্শ করার সঙ্গে") যাহা পোঁছিয়া যাইবে হৃৎপিণ্ডের উপর।"

(৪) সূরা আম্বিয়ার আয়াতে ما تعبدون শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ—"যাহা কিছুর এবাদত তোমরা করিতেছ।" যাহা কিছু বলিতে কেবল পাথরের মূর্তিগুলিকে বুঝাইতে পারে না। পাথর ছাড়া আরও অনেক জিনিসের দ্বারা দেব-দেবীর মূর্তি গঠন করা হইয়া থাকে। মূর্তি ছাড়াও চাঁদ, সূর্য প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক অবদানের পূজাও মোশরেকরা করিয়া থাকে। অনেক জীব-জন্তুও ঈশ্বরের প্রতীকরূপে পূজিত হইয়া থাকে। ভূত-প্রেতের পূজারও অন্ত নাই। পাথর বলিতে এগুলিকে বুঝাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত, শের্কের মূল উৎস হইতেছে মানসিক ভাব বা আকীদা। কেহ কেহ নিজেদের احبارهم و رهبانهم—পণ্ডিত-পুরোহিতদিগকে খোদারূপে গ্রহণ করিয়াছে, কেহ কেহ যীশু খ্রীষ্টকে সদাপ্রভুর অংশী করিয়া নিয়াছে, আবার কেহ কেহ নিজেদের প্রবৃত্তিকে (اتخذ الهه هواه) ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে। "পাথরের মূর্তি" এগুলি কখনই নহে। পক্ষান্তরে, অনেক ক্ষেত্রে মোশরেকরা এমন সব ব্যক্তি বা বস্তুকে ঈশ্বররূপে পূজা করিতেছে, যাহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

এই শ্রেণীর বিষয়গুলির বিচার করিয়া দেখিলে দ্বিতীয় মতের সমর্থন করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আমার মতে আয়াতের "মা" শব্দটাকে مصدرية বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

২২। টীকাঃ জান্নাতের নিয়ামত

পাপকর্মের প্রতিফলে যাহাদিগকে জাহান্নামের দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাহাদের বর্ণনা দেওয়ার পর ২৫ আয়াতে মানুষের পুণ্যফল ভোগের স্থান অর্থাৎ জান্নাতের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

রেজ্‌ক শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে এই সূরার ৩ আয়াতের তাফ্‌ছীরে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র সকল নিয়ামত, তাঁহার সমস্ত অনুগ্রহ দানকেই রেজ্‌ক বলা হয়, তা সে দান পার্থিব হউক আর পারলৌকিক হউক, দৈহিক হউক বা রূহানী হউক। বলা আবশ্যক, জান্নাতীদিগের দৈহিকভাবে এই নিয়ামত ভোগের ইনকার কোন মতেই করা যাইতে পারে না। সূরা কাফ ও সূরা ইব্‌রাহীম প্রভৃতিতে পুনঃ পুনঃ خلق جديد বা নবসৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। কিয়ামতের তখনকার অবস্থা অনুসারে মানুষের এক নূতন বিবর্তন-যুগ আরম্ভ হইবে। সে যুগের অবস্থা ও ব্যবস্থার কথা এ যুগের মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। কোর্‌আনেই বলা হইতেছে :

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ' جزأ بما كانوا يعملون -

"তাহাদের কৃতকর্মগুলির ফলে কি নয়নাভিরাম (নিয়ামত) যে তাহাদের জন্য প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে, কোনও মানুষেই তাহা অবগত নহে।" (ছাজদা, ১৭) এই মহাবাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত রাছুলে কারীম এক হাদীছে-কুদছীতে বলিতেছেন :

قال الله تعالى : اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر - متفق عليه

"আল্লাহ্‌ বলিতেছেন—আমার সাধু বান্দাহ্‌দিগের জন্য যে নিয়ামত আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কোনও চক্ষু তাহা দর্শন করে নাই, কোনও কর্ণ তাহা শ্রবণ করে নাই এবং মানুষের মনে তাহার কল্পনাও স্থান লাভ করিতে পারে নাই।" (বোখারী, মো ছলেম)। কোর্‌আন মাজীদের এই সুস্পষ্ট আয়াত ও হযরত রাছুলে কারীমের এই ছহী হাদীছকে সর্বদা স্মরণে রাখিয়া জান্নাত সংক্রান্ত সমস্ত বর্ণনার পরমার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা পাইতে হইবে।

'ছামারা' অর্থে ফল। ফল বলিতে যেমন সকল প্রকারের মেওয়াকে বুঝায়, সেইরূপ কর্মফল বা পুণ্যফলকেও বুঝাইতে পারে। প্রথম অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বায়জাভী, মাজহারী প্রভৃতিতে দ্বিতীয় অর্থের সমীচীনতাও স্বীকার করা হইয়াছে। বায়জাভী প্রথম অর্থ দেওয়ার পর বলিতেছেন :

وان للاية محمل آخر' و هو ان مستلذات اهل الجنة فى مقابلة مارزقوا فى الدنيا من المعارف و الطاعات متفاوتة بحيث تفاوتها - فيحتمل ان يكون المراد من "هذا الذى رزقنا" انه ثوابة و من تشابهما تماثلهما فى الشرف و المزية و علو الطبقة - فيكون هذا فى الوعد نظير قولة تعالى ذوقوا ما كنتم تعملون' فى الوعيد -

আমি এই দ্বিতীয় মতকে সঙ্গত মনে করি। এই শ্রেণীর বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাফ্ছীরের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

২৩। টীকা: মশার উদাহরণ

কোর্‌আন মাজীদে মাকড়সা, মৌমাছি ও পিপিলিকার বর্ণনা আছে। ইহাতে কোরেশরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া বলিত: এইসব নিকৃষ্ট কীট-পতঙ্গের উল্লেখ আল্লাহ্‌র কালামে থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যাইত যে, এইগুলিও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাঁহার দৃষ্টিতে মশা ও হাতী উভয়ই সমান—উভয়ই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। অধিকন্তু কুদ্‌রতের এই শিল্পীগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা, নিপুণতা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য আছে, অহঙ্কারী মানুষ আজও তাহার শত অংশের এক অংশও অর্জন করিতে পারে নাই।

২৪। টীকা: জীবনহীন

যাহাতে আদৌ Life বা জীবনের উদ্রেক হয় নাই, অথবা জীবন লাভের পর তাহার অবসান ঘটিয়া গিয়াছে, মাইয়ত অর্থে তাহাদের উভয়কে বুঝায়। জীব সৃষ্টির উপকরণগুলি অতীতের কোনও এক অজ্ঞাত যুগে সৃজিত হইয়া যায়। তাহার পর বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত কোনও এক মুহূর্তে তাহাতে জীবনের সঞ্চার হইয়া যায়। সে সঞ্চার কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহাও বিজ্ঞানের অবিদিত। আয়াতে সেই সময়ের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২৫। টীকা: সাত আছমান

আছমান ছামা শব্দের ফারছী অনুবাদ। ছামা শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে ১৯ টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে ছামা শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে বায়জাভী বলিতেছেন:

و المراد بالسماء هذه الأجرام العلوية او جهات العلو -

"ছামা শব্দের দ্বারা উর্ধ্বস্থ পদার্থগুলি (Heavenly body) অথবা

উর্ধ্বদেশস্থ বিভিন্ন দিক Altitute গুলি। এই সূরার বহু পূর্বে সূরা মোমেনুন নাজেল হইয়াছে। তাহাতে বলা হইতেছে:

و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

"এবং তোমাদের উর্ধ্বদেশে সাতটি(গ্রহ)-পথ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি" (১৭)।

অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে, আল্লাহ্ উর্ধ্বদেশের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং তাহাকে সাতটি গ্রহপথে সুবিন্যস্ত করিয়া দিলেন। আয়াতের প্রথম অংশে ভূ-মণ্ডলের কথা বলা হইয়াছে, এখানে আর সাতটা Orbit বা গ্রহপথের কথা বলা হইতেছে। ছামা বলিতে এতদুভয়কে এবং ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত Heavenly body এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কুদরতের যে সব কারখানা আমাদের উর্ধ্বদেশে বিদ্যমান ও বিরাজমান আছে, সে সমস্তই ছামা-শব্দের ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত।

---

৪ রুকু

৩০ و اذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة ؕ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ج و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك ؕ قال انى اعلم ما لا تعلمون ○

৩০। আর (স্মরণ কর) সেই সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ফেরেশ্তাদিগকে বলিয়াছিলেন: নিশ্চয় আমি জমিনে খলিফা নিয়োগের ইচ্ছা করিয়াছি; (২৬) (তখন) ফেরেশ্তারা বলিয়াছিল: তুমি কি সেখানে এরূপ্ (শ্রেণীর) খলিফা করিবা, যে সেখানে ফেৎনা-ফাছাদ ঘটাইবে আর রক্তপাত করিবে? অথচ আমরা তো তোমার মহিমা ঘোষণা করিতেছি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে, এবং তোমার পবিত্রতার জয় ঘোষণা করিয়া চলিয়াছি; আল্লাহ্ বলিলেন— আমার 'এলেমে যাহা আছে, তোমরা তাহা জ্ঞাত নহ। (২৭)

৩১। অবস্থা এই যে, তিনি "বস্তুতত্ত্বগুলি" সমস্তই আদমকে জানাইয়া দিলেন, তৎপর (ফেরেশ্তাদিগকে) বলিলেন—ঐগুলির তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ কর—তোমাদের বর্ণনা যদি যথার্থ হইয়া থাকে।

٣١ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

৩২। তাহারা বলিল, মহামহিম তুমি! তুমি যেটুকু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ, তাহা ব্যতীত আর কোনও জ্ঞান নাই আমাদের; নিশ্চয় তুমি, হাঁ একমাত্র তুমিই, হইতেছ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (২৮)

٣٢ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

৩৩। বলিলেনঃ হে আদম! ফেরেশতাদিগকে উহাদের তত্ত্বগুলি জানাইয়া দাও। সেমতে আদম যখন উহাদের তত্ত্বগুলি ফেরেশ্তাদিগকে জানাইয়া দিল, (তখন) আল্লাহ্ (ফেরেশ্তাদিগকে) বলিলেন—আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, স্বর্গ-মর্তের সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব আমিই অবগত আছি সম্যকরূপে, আরও অবগত আছি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুকে?

٣٣ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

৩৪। আরও স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), যখন আমরা ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলাম : সকলে তোমরা বিনীত হও আদমের প্রতি, সেমতে একমাত্র ইব্‌লীছ্‌ ব্যতীত আর সকলে বিনীত হইল—সে ইন্‌কার করিল ও অহঙ্কার প্রকাশ করিল, সেমতে সে হইয়া গেল কাফেরদিগের অন্তর্গত। (২৯)

٣٤ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৫। আমরা আরও বলিয়াছিলাম : হে আদম। তুমি ও তোমার জোড়া (স্ত্রী) এই কাননে অবস্থান কর, আর উভয় তোমরা ইহার যেখান হইতে ইচ্ছা যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিতে থাক, কিন্তু সাবধান! এই বৃক্ষটির নিকটেও যাইও না, অন্যথায় তোমরা হইয়া যাইবে কাফের সমাজের অন্তর্গত। (৩০)

٣٥ وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩৬। কিন্তু শয়তান তাহাদের উভয়কে এই নির্দেশ সম্বন্ধে পদস্খলিত করিয়া ফেলিল এবং যে "সুখ-সম্পদের মধ্যে" তাহারা অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগকে তাহা হইতে বাহির করিয়া দিল— আমরা বলিলাম : চলিয়া যাও, পরস্পর পরস্পরের দুশ্‌মন তোমরা; আর পৃথিবীতে তোমাদের

٣٦ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ

অবস্থান ও উপকরণ আছে এক অবধারিত সময় পর্যন্ত। (৩১)

مستقر و متاع الى حين ٥

৩৭। অতঃপর আদম নিজ প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুর হইতে কতকগুলি বাক্যের শিক্ষালাভ করিল, সেমতে আল্লাহ্ তাহার তাওবা কবুল করিলেন; নিশ্চয় তিনিই তো হইতেছেন মহা ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

٣٧ فتلقى ادم من ربه كلمت
فتاب عليه انه هو التواب
الرحيم ٥

৩৮। বলিয়াছিলাম: চলিয়া যাও এখান হইতে—তোমরা সকলে, অতঃপর আমার পক্ষের কোনও হেদায়ত তোমাদের কাছে সমাগত হইলে, সেই হেদায়তের অনুসরণ করিবে যাহারা, কোনও ভয় থাকিবে না তাহাদের, আর (কোনও প্রকার) সন্তাপগ্রস্তও হইবে না তাহারা।

٣٨ قلنا اهبطوا منها جميعا
فاما يأتينكم منى هدى فمن
تبع هداى فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون ٥

৩৯। কিন্তু সে হেদায়তকে অমান্য করিবে যাহারা ও আমাদের আয়াতগুলিকে ঝুট্‌লাইয়া দিবে যাহারা, তাহারাই হইবে জাহান্নামের অধিবাসী, তাহাতে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী।

٣٩ والذين كفروا وكذبوا
بايتنا اولئك اصحب النار ج
هم فيها خلدون ٥

তাফ্ছীর

২৬। টীকাঃ খেলাফতের প্রথম সূচনা

পূর্ব রুকুর ২২ আয়াতে ভূমণ্ডলের অবস্থান সম্বন্ধে এবং ২৯ আয়াতে, তাহাতে অবস্থিত মানুষের কল্যাণজনক অবদানগুলির বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে তাহার ক্রমবিকাশের আর একটি পর্যায়ের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

এই আয়াতের প্রথম অংশে হযরত রাছুলে কারীমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—তুমি মানব জীবনের সেই পর্যায়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার "রাব্" বা প্রভু-পরওয়ারদেগার, দুনিয়ায় নিজের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার কথা ফেরেশ্তাদিগের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খেলাফত-অর্থে প্রতিনিধিত্ব, অন্যের হইয়া এবং তাহার নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য করার দায়িত্বকে বুঝায়। বলা হইল : انى جاعل فى الارض خليفة— "আমি দুনিয়াতে খলীফা বানাইবার বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছি। একদল লেখক খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বকে উত্তরাধিকার বা وراثت বলিয়া ধরিয়া নিয়া বলিয়াছেন, ইহা হইতেছে মানুষের পূর্ববর্তী অধিবাসী "জেন্-" দিগের উত্তরাধিকার।

ইহা সব হিসাবে অসার ও যুক্তি-প্রমাণহীন কথা। আল্লাহ্ খেলাফত দান করিতেছেন নিজের রাব্-স্বরূপের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। এই জন্য আয়াতের প্রথমে, আল্লাহ্ বা তাঁহার গুণবাচক অন্য কোনও শব্দ ব্যবহার না করিয়া, রাব্ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। (ফাতেহা, প্রথম আয়াতের টীকা দেখুন)। "ইহাই সুসঙ্গত কথা" (কাবীর)।

আয়াতে জায়েলুন শব্দের পর দুইটি মাফউল বা কর্মপদ ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উহার তাৎপর্য হইবে گردانیدن বা "হওয়ান।" সৃষ্টি করা বা আবির্ভাব করার তাৎপর্য এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। (কাবীর, রাগেব, বায়জাভী প্রভৃতি)। মোটের উপর ঐ "আদম"কে পয়দা করার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা হয় নাই। আদম (বা বনি-আদম) পূর্ব হইতে দুনিয়ায় মওজুদ ছিল। খেলাফত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের পর, তাহার উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা করা হইতেছে, ইহাই আয়াতের মর্ম। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খলীফা শব্দ এক বচন ও বহুবচন উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (কাবীর)।

২৭। টীকাঃ ফেরেশ্‌তাদের জিজ্ঞাসা

ফেরেশ্‌তাদের এই উক্তিতে আল্লাহ্‌র ঘোষণার পরোক্ষ প্রতিবাদ সূচিত হইতেছে মনে করিয়া, একদল রাবী তাহার কারণ ও সঙ্গতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, মানব সৃষ্টির পূর্বে দুনিয়াতে জেনদিগের বাস ছিল। তাহারা সর্বদা দুনিয়ায় নানাপ্রকার উপদ্রব-অত্যাচার ও রক্তপাত করিত। অবশেষে তাহাদিগের দমনের জন্য ফেরেশ্‌তাদের এক বিপুল বাহিনী দুনিয়ায় প্রেরিত হয়। সে সময় ভীষণ যুদ্ধের পর তাঁহারা বিজয়ী ও জেন জাতি পরাজিত হয়। ফেরেশ্‌তাদের এই অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাঁহারা এইরূপ সংশয় উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের দেবাসুর যুদ্ধের এই তাল্‌মুদিক সংস্করণের মূলে কোনও সত্য নাই। মানুষ পূর্ব হইতে দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল এবং স্বভাবতঃ উৎপাত-উপদ্রব ও সংগ্রাম-সংঘর্ষেরও তাহাদের মধ্যে অভাব ছিল না। তাই দুনিয়ায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া ফেরেশ্‌তারা তাহার গূঢ় তত্ত্বটা অবগত হইতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।

ফেরেশ্‌তাদিগের উত্তরে আল্লাহ্‌ বলিয়াছিলেন—"আমার এলেমে যাহা আছে, তোমরা তাহা অবগত নহ।" মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মঙ্গলময় আল্লাহ্‌ কি মহান উদ্দেশ্যে তাহাদের উদ্ভাবন করিয়াছেন, কেন তাহাদিগকে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া পূর্ণতার চরম সীমার দিকে লইয়া চলিয়াছেন, তাহা ফেরেশতারাও বুঝিলেন না, ইবলীছও বুঝিল না। তাই ঠিক এই প্রসঙ্গে সূরা ইছরাইলের ৭০ আয়াতে ঘোষণা করা হইতেছেঃ "নিশ্চয় বানি-আদমকে আমরা মহিমান্বিত করিয়াছি...এবং নিজ সৃষ্টির বহু বিষয়ের উপর তাহাদিগকে ফজিলৎ দিয়াছি।"

২৮। টীকাঃ আছমা, নাম বা গূঢ় তত্ত্ব

আছ্‌মা—এছ্‌ম শব্দের বহু বচন। উহার অর্থ নাম অথবা নাম-বিশেষণের বাস্তব তত্ত্ব। "কিন্তু শুধু নাম একটা শব্দ বা আওয়াজ মাত্র। সেই আওয়াজের সহিত ভাব ও তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে তাহার কোনই সার্থকতা থাকে না।" (রাগেব, সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)। আমি এই হিসাবে আয়াতের অনুবাদ করিয়াছি। বিশিষ্ট তাফ্‌ছীরকারগণের অনেকে এই তাৎপর্যের সমর্থন করিয়াছেন। অন্য মতের রাবীরা "নামের" বিবরণাদিতে যাইয়া, যাঁহার মনে যাহা আসিয়াছে, তিনি তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন। অথচ ইহার কোনও প্রমাণ কোর্‌আনে নাই, হাদীছে নাই এবং কোনও বিশ্বাসযোগ্য

ইতিহাসেও নাই। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, মানুষের তত্ত্বজ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিকেই আয়াতে তাহার শ্রেষ্ঠতার মানদণ্ড বলিয়া নির্ধারণ করা হইতেছে। ৩২ ও ৩৩ আয়াত ইহার পরিপূরক হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২৯। টীকা ঃ ছিজদাহ্ করা

আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ এইরূপ হইবে—আরও স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশ্তাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা ছিজদাহ্ (ছাজদাহ্) কর আদমের জন্য, ফলে সকলে তাহারা ছিজদাহ্ করিল—এক ইবলীছ ব্যতীত, সে ইনকার করিল ও অহঙ্কার প্রদর্শন করিল, এবং সে হইয়া গেল (বা ছিল) কাফেরদিগের দলভুক্ত।

কোর্আন মাজীদে ছিজদাহ্ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সৃষ্টির সমস্ত বস্তু, এমন কি গাছ পাথর পর্যন্ত সকলেই আল্লাহ্র হুজুরে ছিজদাহ্ করিয়া থাকে, এই মর্মের কতিপয় আয়াত কোর্আনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। শরিয়তের বিশেষ পরিভাষা অনুসারে ইহা ছিজদাহ্ কখনই নহে। কিন্তু আরবী সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহার অনুসারে কোর্আনে ইহাদের ছিজদাহ্ করার কথা বলা হইয়াছে। ফলতঃ এক্ষেত্রে ছিজদাহ্ শব্দের তাৎপর্য হইবে—ফরমাঁবরদার হওয়া, হুকুম তামিল করা, নতি স্বীকার করা। পক্ষান্তরে সৃষ্টির কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকে ছিজদাহ্ করা হারাম, কোরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত হইতে তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে অর্থ হইবে, কোনও বস্তু বা ব্যক্তির 'তা'জীম বা এবাদতের' উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা। তা'জীমের ছিজদাহ্ ও এবাদতের ছিজদার মধ্যে কোনও কোনও অঞ্চলে যে পার্থক্য করা হইয়া থাকে, আমার মতে তাহা ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। বিখ্যাত ছাহাবী মাআজ শামদেশ হইতে ফিরিয়া আসার পর, হযরত রাছুলে কারীমকে ছিজদাহ্ করার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দেন (কাছীর)। তা'জীমের ছিজদাহ্ জায়েজ থাকিলে এই নিষেধের কোনও কারণ থাকিত না।

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে ফেরেশতাদিগকে আদমের প্রতি নতি স্বীকার করার কথাই বলা হইয়াছে।

৩০। টীকা ঃ আদম ও তাঁহার জান্নাত

আদম শব্দের ধাতু কি আর তাহার ধাতুগত অর্থ কি, এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় নাই। বৈয়াকরণ, সাহিত্যিক ও তাফ্ছীরকারগণের সাধারণ

মতে ইহা আদৌ আরবী শব্দ নহে। কেহ কেহ ইহাকে سريانى বা Syriac ভাষার শব্দ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং এ-সম্বন্ধে অধিক মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

আদম-অর্থে একজন বিশেষ মানুষ "হযরত আদম" না, বানি-আদম— এ-সম্বন্ধে প্রথম হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, আদম অর্থে, মানব সমাজের আদি পুরুষ হযরত আদম। আয়াতে তাহাকেই খলীফা করার কথা বলা হইয়াছে। অন্যদের মতে আদম অর্থে মানব সমাজ। আয়াতে এই মানব সমাজকে খেলাফতের গৌরব ও দায়িত্ব দেওয়ার কথাই বলা হইয়াছে। আমার বিবেচনায় শেষোক্ত মতটিই সঙ্গত। ইহার কয়েকটা কারণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

(১) ৩৮ আয়াতে বলা হইতেছে—"তোমরা" বেহেশ্‌ত হইতে চলিয়া যাও। ৩১ ও ৩৩ আয়াতে বর্ণিত "আদম" অর্থে একটি মাত্র বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকিলে, ৩৬ আয়াতে দ্বিবচন ব্যবহার না করিয়া বহুবচন ব্যবহার করা হইত না। কোনো কোনো তাফ্‌ছীরকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, সাপ এবং শয়তানও আদম-হাওয়ার সঙ্গে বেহেশ্‌তে অবস্থান করিতেছিল। আয়াতে তাহাদিগকেও অপসৃত হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সাপের কেচ্ছার সহিত কোর্‌আনের বা হাদীছের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধও নাই। উহা নিছক ইহুদীদের পৌরাণিক কাহিনী। শয়তান সম্বন্ধে সূরা আ'রাফে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, আদমকে ছিজদাহ্ করিতে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জান্নাত্‌ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (১২, ১৩ আয়াত) আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে অবস্থান করার আদেশ দেওয়া হয় শয়তানকে বিতাড়িত করার ঘটনার পর (ঐ, ১৯)।

(২) এই সূরার ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে, জান্নাত হইতে অপসৃত হওয়ার আদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে, ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হেদায়ত আসিবে। যাহারা সেই হেদায়তের অনুসরণ করিবে, তাহারাই হইবে ভয়ভাবনাহীন জীবনের অধিকারী। পক্ষান্তরে সেই হেদায়তকে অমান্য করিবে যাহারা, তাহারা হইবে জাহান্নামের অধিবাসী (৩৮, ৩৯)। এই দুই আয়াতে ৮টি ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে এবং সেগুলি সমস্তই বহুবচন। আদম বলিতে একটি মাত্র ব্যক্তিকে বুঝাইলে, এবং বানি-আদম বা মানব সমাজকে না বুঝাইলে, এই প্রকার ব্যবহারের কোনই সঙ্গতি থাকিত না। পক্ষান্তরে ইঁহারা সকলে আদমকে আল্লাহ্‌র নবী ও রাছুল

বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং রাছুলের কাছে হেদায়ত আসার কোনও অর্থই হয় না এবং তাহার পক্ষে তাহা অমান্য করার কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(৩) ফেরেশ্‌তারা আদমকে ছিজদাহ্ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন যখন, তখন দুনিয়াতে অন্য মানুষের অস্তিত্ব ছিল না—এ-কথা কোর্‌আনের কোথাও স্পষ্টভাবে বা আভাস-ইঙ্গিতে বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে কোর্‌আন মাজীদের দশটি সূরার বিভিন্ন আয়াতে এই আদমের উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ সূরা আ'রাফের দ্বিতীয় রুকুতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্ মানুষের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাকে যথাযথভাবে রূপায়িত করিলেন, "তাহার পর" ফেরেশ্‌তাদিগকে হুকুম দিলেন আদমের জন্য ছিজদাহ্ করিতে।

(৪) তাফ্‌ছীরকারগণের অনেকেই আদমকে আল্লাহ্‌র রাছুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি অন্ততঃ কাবীরা গোনাহ্ হইতে মাছুম, এ-কথাও তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু যুগপৎভাবে এই আদমকে একটিমাত্র ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করায় তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে, তাঁহাদের কল্পিত আদম—কোর্‌আনে স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ্‌র নাফরমান, গোমরাহ্। এমন কি, (মাআজাল্লাহ্) তাঁহাকে মোশ্‌রেক পর্যন্ত বানান হইয়াছে। (দেখুন আ'রাফ, ১৮৯, ৯০ ও ৯১ আয়াত এবং তা'হা, ১২১ আয়াত)।

আদমের জান্নাত ঃ

জান্নাত শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রচ্ছন্ন হওয়া বা আচ্ছাদিত করা। জেন জিনিন (ভ্রূণ) প্রভৃতি শব্দ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বাগ-বাগিচার গাছ-গুলির ছায়ার দ্বারা সংলগ্নস্থানগুলি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে বলিয়া, তাহাকেও জান্নাত বলা হয়। এই তাৎপর্য ও তাহার এইরূপ ব্যবহারের সঙ্গতি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আখেরাতের যে জান্নাত, কোর্‌আনে তাহাকেও নানাবিধ ফল বা মেওয়ার বাগান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। এই জন্য তাহাকেও জান্নাত বলা হইয়াছে।

৩৫ আয়াতে আদমকে তাঁহার স্ত্রীসহ জান্নাত বা কানন বিশেষে অবস্থান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আদমকে যে জান্নাতে অবস্থান করিতে বলা হয়, সে কি পরকালের জান্নাত, না দুনিয়ার কোনও কাননমালা শোভিত অঞ্চল? সাধারণ তাফ্‌ছীরকারগণ প্রথম মতের সমর্থক। তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, এখানে জান্নাত শব্দের সঙ্গে আল্ article

ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং উহা দ্বারা একটি বিদিত জান্নাতকে বুঝিতে হইবে, এবং আখেরাতের دار الثواب বা পুণ্যফল ভোগের স্থান যে জান্নাত, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও বিদিত জান্নাত নাই। (বায়জাভী, কাবীর প্রভৃতি)। প্রমাণের হিসাবে তাঁহারা শাফাআতের হাদীছটির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ملاحم বা ভাবী ঘটনা সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীছ। এ-সম্বন্ধে এখানে এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে, এই শ্রেণীর হাদীছগুলিকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ মোহাদ্দেছরা لا اصل لها বা ভিত্তিহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্ত এই রেওয়ায়তের দ্বারা নবীগণের মাছুম না হওয়াই প্রমাণিত হয়।

এ-সম্বন্ধে আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সাধারণ তাফ্‌ছীরকারগণের উপরোক্ত যুক্তিবাদের মূলে কোন সঙ্গতি নাই। কারণ —

(১) আখেরাতের জান্নাত ছাড়া অন্য কোনও জান্নাতের কথা মানুষের বিদিত নহে, ইহা বাস্তব সত্যের বিপরীত কথা। কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে দুনিয়ার কাননমালাকেও জান্নাত جنات বলা হইয়াছে। (দেখুন—ইছরাইল, ৯১, ছাবা, ১৫, ১৬, ফোরকান, ৮, কাহাফ, পঞ্চম রুকুর বিভিন্ন আয়াত, প্রভৃতি)।

(২) অন্য পক্ষ নিজেরাই আয়াতে বর্ণিত জান্নাতকে دار الثواب বা পুণ্যফল ভোগের স্থান বলিয়া নির্ধারিত করিতেছেন। পরকালের জান্নাতের যে ইহাই সর্বপ্রধান বিশেষণ, তাহাতেও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই যে, কর্মের পূর্বেই কর্মফল ভোগ করা কি সম্ভব হইতে পারে? দুনিয়াই তো কর্মক্ষেত্র। এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আদম সম্বন্ধে যাহা বলা হইতেছে, তাহা নিশ্চয় এই দুনিয়ারই ঘটনা।

(৩) আদমকে ছিজদাহ্‌ করিতে ইব্‌লীছ বা শয়তান অস্বীকার করিয়াছিল—অহঙ্কারভাবে (৩৪ আয়াত)। "যাহার মনে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার থাকে, সে বেহেশ্‌তে কদাচ প্রবেশ করিতে পারিবে না।"—ইহা স্বয়ং হযরত রাছুলে কারীমের এরশাদ (বোখারী, কাছীর)। অথচ আদমকে শয়তান অছঅছা দিয়া ভ্রষ্ট করিতেছে, আয়াতের বর্ণিত এই জান্নাতে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহা পরকালের বেহেশ্‌ত নহে।

(৪) কোর্‌আন মাজীদে পরকালের জান্নাত্‌কে দারুল্‌-কারার, দারুল্‌-মাকামা ও দারুল্‌-খোলদ অর্থাৎ চিরস্থায়ী আবাস বলা হইয়াছে। বেহেশ্‌তে মানুষ যে অনন্তকালের জন্য স্থায়ী হইবে এবং তাহারা যে সেখান হইতে বাহির হইবে না বা হইতে পারে না, কোর্‌আন মাজীদের বহু আয়াতে ইহা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, আলোচ্য আয়াতের বর্ণিত জান্নাত

হইতে আদমকে বহির্গত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং এ জান্নাত্ পরকালের জান্নাত্ কখনও হইতে পারে না।

(৫) আদমকে আল্লাহ্ পয়দা করিয়াছিলেন দুনিয়ার মাটি হইতে, তাঁহাকে তিনি খলীফা করিতে চাহিয়াছিলেন এই দুনিয়ার মানুষের জন্য এবং ফেরেশ্তারা আদম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলেন তাঁহার দুনিয়ার জীবনকে উপলক্ষ করিয়া। সুতরাং তিনি আছমানে উঠিয়া গেলেন কবে, আর নামিয়া আসিলেন কবে, উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা অন্যপক্ষের কর্তব্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এই কর্তব্য পালন করেন নাই।

আদম সম্বন্ধে অন্যান্য কথা সূরা আ'রাফের এবং তা-হা ও সূরা বানি-ইছ্‌রাইল প্রভৃতির তাফ্ছীরে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহুদীদের তালমুদে বলা হইয়াছে যে, প্রথমে আদমের বিরাট মূর্তি ছিল। তিনি দাঁড়াইলে তাঁহার মাথা আছমানে ঠেকিত। তাঁহার আরও অনেক অদ্ভুত কথা তালমুদে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া পামার (Palmer) বলিতেছেন যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে এখানে যে সব Tradition বা প্রবাদ বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেগুলি তালমুদিক বা পৌরাণিক উপকথার সহিত সমঞ্জস। খুব সম্ভব এগুলি সমসাময়িক আরব-ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

পামার সাহেবের এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। দুঃখের বিষয়, আমাদেরই এক শ্রেণীর তাফ্ছীরকার খ্রীষ্টান অনুবাদকদিগের জন্য এই প্রকার মন্তব্য করার যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্কলিত বিবরণগুলি জ্ঞানের হিসাবে অগ্রহণীয়, রুচির হিসাবে অকহনীয়। কোর্‌আনের, হাদীছের ও ইতিহাসের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ সেগুলি ভিত্তিহীন উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার নমুনা হিসাবে বিজ্ঞ পাঠকগণকে ইমাম ছায়ূতী প্রণীত তাফ্ছীরের প্রথম খণ্ডের ৫২ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

শাজারাঃ বা নিষিদ্ধ বৃক্ষ

শাজারাঃ শব্দের অর্থ বৃক্ষ। আয়াতে এইটুকু মাত্র জানা যাইতেছে যে, আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে কোনও একটা বৃক্ষের নিকটে যাইতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের নাম কোর্‌আনে বা হাদীছে উল্লেখ করা হয় নাই। তবে আমাদের রাবীরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতে এক ডজন বৃক্ষের নাম বলিয়া দিয়াছেন।

৩১। টীকাঃ হোবুত, চলিয়া যাওয়া

হোবুত শব্দের অর্থ নামিয়া যাওয়া বা চলিয়া যাওয়া, উভয় হইতে পারে। ---এই সূরার ৬১ আয়াতে প্রায় সকলেই উহাকে "চলিয়া যাওয়া" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। (আয়াতের অনুবাদ সম্বন্ধে এবন-কাছীর দেখুন)।

আদমের জান্নাত্ সম্বন্ধে ৩০ টীকায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, আদম ও হাওয়া উভয়কে চলিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে হাফেজ এবন-কাছীর বলিতেছেন :

و سياق الاية يقتضى ان حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة -
و قد صرح به ابن اسحاق ' الخ

অর্থাৎ—"আয়াতের বর্ণনা ধারা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হাওয়া আদমকে প্ররোচনা দিয়াছিলেন, তাঁহার(আদমের)জান্নাতে দাখেল হওয়ারপূর্বে, এবন-ইছ্‌হাক স্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।" আদমকে "আছমানে স্থিত" জান্নাতে নিয়া যাওয়া হয় কখন, আর কখনই বা তাঁহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহার নিদর্শন কোর্‌আনের কোনও আয়াতে বা হযরতের কোনও হাদীছে পাওয়া যায় না। অজ্ঞ আরব-ইহুদীদের মধ্যে প্রচারিত উপকথাগুলিকে অবলম্বন করিয়া, একদল দায়িত্বজ্ঞানহীন রাবী নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে, এখানে নানা প্রকার উদ্ভট কেচ্ছা-কাহিনীর সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—"আল্লাহ্ আদমকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিয়া দেন, তাঁহাকে পয়দা করার পূর্বে।" অন্যরা এবন-আব্বাছের নাম-করণে রেওয়ায়ত করিতেছেন যে, "আল্লাহ্ আদম্‌কে জমিন হইতে জান্নাতে লইয়া গিয়াছিলেন, আছরের নামায ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ের জন্য।" ফলতঃ তাঁহাদের এইসব বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন, প্রমাণহীন ও পরস্পর বিপরীত বর্ণনা হইতেই, এগুলির অসারতা স্বয়ংসিদ্ধভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

আদম ও হাওয়া সংক্রান্ত বিবরণ ও নির্দেশগুলিতে যথানিয়মে দ্বিবচন সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহার পর, বহুবচনাত্মক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া বলা হইতেছে : "চলিয়া যাও তোমরা।" এইরূপে ৩৮ আয়তেও চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ আছে।

এই আয়াতে জমা'র বা বহুবচনের ছিগা ব্যবহৃত হওয়ায় উপরোক্ত শ্রেণীর রাবীরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং সমস্যার সমাধানের জন্য সাপ ও

শয়তানের কেচ্ছা আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু সাপের কল্পনাটা ইহুদীদিগের বাইবেল ও তালমুদের অন্ধ অনুকরণ মাত্র, ইহার সমর্থনে কোনও দলিল-প্রমাণ নাই। শয়তান যখন আদমকে অছঅছা দেওয়ার জন্য আকুলি ব্যাকুলি করিয়া বেড়াইতেছিল, অবশেষে গরুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া এক বিচিত্র সর্পরূপে তাহার মুখে প্রবেশ করিতেছিল, এবং সেই সাপকে পেটে পুরিয়া গরুটা যখন সকলকে ফাঁকি দিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সব সময় রাবীদের কেহ সেখানে নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন না। হযরত রাছুলে কারীমও এ বার্তা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন নাই এবং জিব্‌রাঈল ফেরেশতাও তাঁহাদের উপর নামিয়া আসেন নাই। পক্ষান্তরে ইহুদীদের পুরাণ পুস্তকগুলিতে অবিকল এইসব উপকথার উল্লেখ আছে! এবন-ইছহাক প্রভৃতি রাবীরাও এ-কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন (এবন-কাছীর)। এ অবস্থায় কোরআন মাজীদের তাফ্‌ছীরে ঐগুলির উল্লেখ করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

এই উভয় সঙ্কট পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, আমাদের দেশের কয়েকজন বিজ্ঞ লেখক, আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়াছেন। একজন বলিতেছেন—মিছমেরিজমকারীরা যেমন দূর হইতে অদৃশ্যশক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শয়তান জমিনে অবস্থান করিয়া আছমানস্থিত বেহেশ্‌তের অধিবাসী আদমের প্রতিও সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। পরবর্তী আর একজন লেখক বলিতেছেন: টেলিফোন, রেডিও Wireless-telegraphy দ্বারা দূর-দূরান্তরে নিজের আওয়াজ পৌছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, শয়তানের অছঅছা এইরূপে আদমের অন্তরে পৌঁছাইয়া থাকিলে, তাহা সম্ভব হইবে না কেন?

শয়তান Telepathy বা অন্য কোনও প্রকারের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করুক বা না করুক, সে যে আদমকে অছঅছা দেওয়ার জন্য বেহেশ্‌তে উপস্থিত ছিল, অথবা সেখানে সে অছঅছা দিয়াছিল—তাহা যে বেহেশ্‌ত নহে, উক্ত লেখকগণ এ-কথা স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। আমাদের আসল বক্তব্যও তাহাই। তাহার পর, "সম্ভব ও সংঘটিত" দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। আজ তাঁহারা যেসব ব্যাপারকে ধর্মীয় আকীদা হিসাবে বিশ্বাস করার জন্য আমাদিগকে হুকম দিতেছেন, তাহার সম্ভবপরতা প্রমাণ করাই যথেষ্ট হইবে না। তাঁহাদিগকে অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, তাহা বস্তুতঃ সংঘটিত হইয়াছিল। এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

হাফেজ এবন-কাছীর ৩৮ আয়াতের তাফ্‌ছীর প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

المراد الذرية—অর্থাৎ "জান্নাত" হইতে বহির্গত হওয়ার পর আদমের আও-লাদকে এইসব উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

৩৬ ও ৩৮ আয়াতে দুইবার আদমের "হোবুত" বা চলিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রথমবারে এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে—পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থান ও জীবন-উপকরণের ব্যবস্থা থাকিবে —অবধারিত সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ তোমাদের এই জীবন চিরস্থায়ী হইবে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবসান হইয়া যাইবে। ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে ঐরূপ আদেশ দেওয়ার পর বানি-আদমকে তাহাদের পরবর্তী জীবনের সন্ধান দেওয়া হইতেছে। মধ্যে ৩৭ আয়াতে আদমের তাওবার কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। মানব জাতি তাহার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, উত্থান-পতনের যে বিভিন্ন স্তরকে অতিক্রম করিয়া উৎকর্ষের পরম স্তরে গিয়া উপনীত হইবে, ইহা তাহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত।

আদম ও ইবলীছের দীর্ঘ বিবরণের সার শিক্ষা হইতেছে, অনুতাপ ও বিদ্রোহ। অপরাধ করিয়া তাহাকে অন্যায় বলিয়া মনে-প্রাণে অনুভব করা ও সে জন্য অন্তরে অনুতাপের সৃষ্টি হওয়া —এইভাবের প্রতীক হইতেছেন আদম। আর অপরাধ করিয়া অন্যায় বলিয়া তাহাকে অনুভব না করা, সেজন্য অনুতপ্ত না হওয়া, বরং হঠকারিতার সহিত তাহার সমর্থন করিয়া যাওয়া—এই মনো-বৃত্তির নিদর্শন হইতেছে—ইব্লীছ।

---

৫ রুকু

৪০। হে ইছ্রাইল সন্তানগণ! আমি তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছিলাম যে সব নিয়ামতের দ্বারা —তাহা স্মরণ কর, আর আমার কাছে তোমাদের যে অঙ্গীকার, তাহাকে তোমরা পূরা কর— তোমাদের কাছে আমার যে সব প্রতিশ্রুতি আমিও তাহা পূরা করিব, আর ভয় করিয়া চল আমাকে, কেবল মাত্র আমাকে! (৩২)

يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ۝

৪১। এবং যে কালাম আমি নাজেল করিলাম—যাহা তোমাদের সঙ্গেকার কালামের সত্যতার প্রতিপাদক—তাহাতে তোমরা বিশ্বাস কর এবং তোমরাই যেন তাহার প্রথম মোন্‌কের হইয়া যাইও না, (৩৩) এবং আমার আয়াতগুলিকে তোমরা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না, আর তোমরা সংযত হইয়া চলিও আমার সম্বন্ধে।

৪১ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ص وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ٥

৪২। আর তোমরা হক্‌কে বাতিলের দ্বারা আচ্ছন্ন করিও না এবং হক্‌কে গোপন করিয়া রাখিও না—অথচ তোমরা অবগত আছ। (৩৪)

৪২ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

৪৩। আর নামাযকে তোমরা কায়েম করিয়া রাখ এবং যাকাত প্রদান কর, আর নামায আদায়কারীদের সঙ্গে তোমরাও নামায আদায় করিতে থাক। (৩৫)

৪৩ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٥

৪৪। কী! লোকদিগকে তোমরা নির্দেশ দিবে সততা অবলম্বন করিতে, কিন্তু আপনাদিগকে ভুলিয়া যাইবে, অথচ তোমরা (নিজেদের) কেতাব পাঠ করিয়া থাক ; তবে কি তোমরা বুঝিয়া দেখ না। (৩৬)

৪৪ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥

৪৫। আর তোমরা শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিবে ছবর ও ছালাতের

৪৫ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط

সাহায্যে ; বস্তুতঃ নিবেদিতচিত্ত বান্দারা ব্যতীত অন্যদের পক্ষে ইহা অতিশয় কঠিন—

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

৪৬। (সেইসব বান্দাহ্—) যাহারা বিশ্বাস করে যে, একদিন তাহাদিগকে নিজেদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুরে হাজির হইতে হইবে, আর তাহাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে তাঁহারই পানে। (৩৭)

٤٦ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

তাফ্‌ছীর

৩২। টীকা ঃ ইছরাইল

ইছ্‌রা—এবরানী শব্দ। অর্থ কাহাকে আটক বা বন্দী করা। ঈল-অর্থে খোদা। আরবীতেও এই অর্থের ব্যবহার আছে। যেমন আছীর অর্থে বন্দী। পূর্বে এই ইছ্‌রাইলের নাম ছিল ইয়াকুব। ইনি হযরত ইবরাহীমের পৌত্র। ইঁহার ইয়াকুব নাম বদলাইয়া গেল কি কারণে, সে সম্বন্ধে বাইবেলে একটা আশ্চর্য রকমের গল্প বর্ণিত হইয়াছে ঃ "এবং এক পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন ; কিন্তু জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের শ্রোণী ফলকে আঘাত করিলেন। তাহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরু ফলক স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, "তোমার নাম কি ?" তিনি উত্তর করিলেন—'যাকোব'। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, "তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল (ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী) নামে আখ্যাত হইবে ; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।" (আদি পুস্তক, ৩৩ ; ২৪—২৮)। এই যাকোব তাঁহার পিতা ইছ্‌হাকের নিকট হইতে কিরূপে ছলপূর্বক 'আশীর্বাদ' লাভ করিয়াছিলেন, ঐ

পুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে, ইছলাম ও কোর্‌আনের সহিত এই সব গল্প-গুজবের কোনও সম্বন্ধ নাই।

বানি-ইছ্রাইল বলিতে অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ইহুদ সমাজকে বুঝায়।

৩৩। টীকা : মোছাদ্দেক্, সত্যতার সমর্থক

আয়াতে ইহুদীদিগকে কোর্‌আনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। কোর্‌আনের একটা বিশেষণ হিসাবে বলা হইতেছে যে, বানি-ইছ্রাইল জাতির নবী ও রাছুলগণের নিকট আল্লাহ্‌র যে সব কালাম প্রেরিত হইয়াছিল, কোর্‌আন তাহার তাছ্‌দীককারী বা তাহার সত্যতার সমর্থনকারী ও প্রমাণকারী। আল্লাহ্‌র প্রেরিত সমস্ত নবীর ন্যায় তাঁহার সমস্ত কেতাবের প্রতি ঈমান আনা মুছলমানের আকীদা বা creed হিসাবে গৃহীত হইয়া আছে। এই বিধান কেবল ইহুদীদের জন্য সীমাবদ্ধ নহে।

কিন্তু ইহার পূর্বে প্রতিপন্ন হওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌র কেতাব হওয়ার দাবী করিতেছে যে পুস্তকখানি, তাহা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত, তাহা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত, তাহাতে কোনও প্রকার পরিবর্ধন, পরিবর্জন বা পরিবর্তন ঘটে নাই। এ অবস্থায় আমরা তাহাকে আল্লাহ্‌র কেতাব বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইব।

বিশ্বজনীন ধর্মসমাজ গঠনের প্রথম উপকরণ হইতেছে এইটি। ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু প্রভৃতি সমাজের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা ব্যতীত দুনিয়ার আর কোনও দেশে নবী আসিতে পারে না, তাঁহাদের ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় আল্লাহ্‌র কোনও কালাম প্রকাশিত হইতে পারে না, ঐসব ধর্মের ও ধর্মসমাজের একটা প্রধান শিক্ষা ইহাই।

আল্লাহ্‌র নিয়ামত :

আল্লাহ্ ইহুদীদিগকে নানা প্রকার নিয়ামত দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে দুইটি—নবুয়ৎ ও হুকুমৎ (মায়দা, ২০ আয়াত)।

বানি-ইছরাইলের অঙ্গীকার :

বানি-ইছ্রাইল জাতির দীর্ঘ জীবন-ইতিহাসে বহুবার তাহারা নিজেদের নানা অনাচার ও উচ্ছৃংখলার ফলে বিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র দরগাহে তাওবা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের জন্য নূতন নূতন একরার-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে। কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় তাহার মধ্যকার কতকগুলি নিয়ামতের ও কতকগুলি অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হইয়াছে।

عهد শব্দ এখানে এছমে-জেন্‌ছ বা common noun হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ; ফলতঃ উহার অর্থ হইবে عهود বা অঙ্গীকারগুলি (বায়জাভী)।

এই শ্রেণীর বর্ণনার বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সময়, মুছলমান হিসাবে আমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল ইহুদী জাতিকে তাহাদের পুরাতন ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্যই কোর্‌আনে এইসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় নাই। মুছলমান জাতি, বিশেষতঃ তাহাদের আলেম সমাজ যাহাতে ধর্মে-কর্মে ইহুদী মানসিকতার বশবর্তী না হইয়া পড়েন, সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়াও এই বিবরণগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, এই সত্যটা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছি এবং ইহার ফলে কাছাছুল-আম্বিয়ার কাহিনীগুলির মধ্যে তাহার মূল শিক্ষাটাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। আজিকার ফিলিস্তীন সমস্যা এবং আজিকার ইছরাইলী হুকুমৎ, ইহারই জীবন্ত প্রতিফল।

আয়াতের শেষ অংশের তাফ্‌ছীরে মারহুম মাওলানা থানভী ছাহেব বলিতেছেন : اپنے عوام الناس معتقدین سے مت ڈرو کہ انکو اعتقاد نہ رهیگا ان سے آمدنی بند هو جائیگی—"সত্যকথা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলে অনেক সময় জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, মুরীদ মোতাকেদ্‌রা বিগড়াইয়া যায়, আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায়, ইহাতে ভীত হইবে না—ইহাই আয়াতের সারশিক্ষা।"

তাওরাতের সমর্থন :

তাওরাতের যে ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে 'মোশির পঞ্চ-পুস্তক' নামে বাজারে প্রচলিত আছে, তাহাতে দেখা যায় : সদাপ্রভু মূছাকে কহিলেন—"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সব বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিব (দ্বিতীয় বিবরণ—১৮ অধ্যায় ; ১৮, ১৯)।

ইছমাইল হযরত ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ইছহাক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। ইহুদীরা ইছহাকের পুত্র ইয়াকুব বা ইছরাইলের সন্তান। সুতরাং উদ্ধৃতাংশে ইছরাইল সন্তানগণের ভ্রাতা বলিতে বানি-ইছমাইলকেই বুঝাইতেছে। উদ্ধৃতাংশে বলা হইতেছে যে, সেই প্রতিশ্রুত রাছুল হইবেন, "মূছার অনুরূপ"। সূরা

মোজাম্মেলের ১৫ ও ১৬ আয়াতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা হইতেছেন "মূছার অনুরূপ সেই রাছুল।" হযরত মূছার জীবন-আদর্শের ও কর্মপদ্ধতির সহিত হযরত ঈছার জীবন-আদর্শের ও কর্মপদ্ধতির কোনই সামঞ্জস্য দেখা যায় না। সে দিক দিয়াও হযরত রাছুলে কারীমের সহিত মূছার যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখা যায়। এইরূপে, কোর্‌আন তাওরাতের সমর্থন করিতেছে, তাহার প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া দেখাইতেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদিগকে ঈমানের দাওআত দিতেছে।

সত্যকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় যে স্বার্থের বিনিময়ে, দুনিয়ার হিসাবে তাহার মূল্য যতই অধিক হউক না কেন, বাস্তবে তাহা অতি নগণ্য। দুনিয়ার সকল মাল-মাত্তার মূল্যও এদিক দিয়া খুবই সামান্য। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যাহা হক কথা, লোভে বা ভয়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহা প্রকাশ না করা, অথবা তাহার বিপরীত কথা প্রকাশ করা যে মহাপাপ, তাহা প্রকাশ করাই এই আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য।*

৩৪। টীকা: ইহুদীদের অনাচার

সত্যার্থী মানুষকে প্রবঞ্চিত করা হয় দুই প্রকারে।

প্রথমতঃ, সত্যের সহিত কতকগুলি মিথ্যাকে এমনভাবে মিশাইয়া দেওয়া হয় যে, ঐ মিথ্যার দ্বারা সত্যের প্রকৃত স্বরূপটা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ফলে তাহা দ্বারা শ্রোতার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। দ্বিতীয়তঃ, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব যুক্তি-প্রমাণ আছে, সেগুলিকে গোপন করিয়া ফেলা। ইহুদীরা অবস্থা বুঝিয়া উভয়বিধ উপায় অবলম্বন করিত।

বর্তমান যুগে আমাদের সাধারণ আচরণ যে, কোর্‌আন মাজীদের এই শিক্ষার অনুকূল নহে, ইহা আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস। আমরা অনেক সময় কোর্‌আন-হাদীছের তাৎপর্য নির্ধারিত করিতে প্রবৃত্ত হই, পূর্ব হইতে নিজেদের এক-একটা মত দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়া এবং তাহারই অনুকূলে প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সুতরাং তখন আমরা বিচারকের আসন হইতে উকীল-মোক্তারের আসনে নামিয়া আসি। আমাদের এই মানসিক অধঃপতন না ঘটিলে সমাজের অবস্থা এতদিন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইত।

৩৫। টীকা: ঈমান ও আমল

৪১ আয়াতে ইহুদীদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে। মধ্যে

---

* হযরত সম্বন্ধে বাইবেলে আরও যে সব ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যথাযথ স্থানে তাহার উল্লেখ করা হইবে।

দুইটি অন্যায় বা অকরণীয় কাজের পরিচয় দেওয়ার পর, এখানে ইছ্‌লামের দুইটি প্রধান আমল পালন করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান হইতেছে। ইছ্‌লামের শিক্ষা অনুসারে নামায ও যাকাত হইতেছে মানুষের সেই প্রধান আমল।

আয়াতের শেষভাগে রুকুকারীদের সঙ্গে মিশিয়া রুকু করার আদেশ দেওয়া হইতেছে। রুকু শব্দের ধাতুগত অর্থ—অবনমিত হওয়া। ধর্মীয় পরিভাষায় নামাযের একটা বিশেষ অঙ্গকে রুকু বলা হয়। রুকুকারীদের সঙ্গে মিলিয়া রুকু কর—অর্থাৎ জামাতে শামিল হইয়া নামায পড়। হাফেজ এবন-কাছীর বলিতেছেন, এই আয়াত অনুসারে বহু আলেম জামাতে নামায পড়াকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। বহু ছহী হাদীছে জামাত সম্বন্ধে বিশেষ তাকীদ করা হইয়াছে। সূরা এম্‌রানের ৪২ আয়াতে বিবি মরিয়মকেও জামাতে শামিল হইয়া নামায আদায় করার নির্দেশের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

৩৬। টীকা : যাজকদের আত্মবিস্মৃতি

ইহুদীদের সমাজ-জীবনে সাধারণভাবে এবং তাহাদের পণ্ডিত, পুরোহিত ও প্রধানবর্গের অবলম্বিত বিধিব্যবস্থায় যে সব অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, কোর্‌-আনের বহুস্থানে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে—তাহাদের চেতনা সঞ্চারের ও মুছলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য। এখানে প্রশ্নচ্ছলে তাহাদের একটা গুরুতর অপরাধের কথা উল্লেখ করা হইতেছে।

যিনি ওয়ায়েজ বা প্রচারক, এবং আল্লাহ্‌র কেতাব পাঠ করিয়া যিনি সমাজকে সকল প্রকার সৎকর্ম সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেন, অথচ সেই নির্দেশগুলিকে তিনি নিজে পালন করেন না, তাঁহার ন্যায় ঘৃণিত জীব জগতে আর কে হইতে পারে? তাঁহার প্রচারের একটা মারাত্মক কুফল এই দাঁড়ায় যে, জনসাধারণ যখন দেখিতে পায় যে, উপদেষ্টা নিজে নিজের উপদেশ অনুসারে কাজ করিতেছেন না, অথবা বাস্তবক্ষেত্রে নিজের নছীহত ও উপদেশের বিপরীত কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহার প্রচারিত বিষয়টাকেই অসার ও ভিত্তিহীন বলিয়া সন্দেহ করিতে থাকে। অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ্‌র কেতাবকে প্রকাশ্যভাবে অমান্য করিয়া সত্যের প্রসারকে যতটা বাধাগ্রস্ত করিতে পারে, কপট পীর, পুরোহিত ও প্রচারকদিগের এই শ্রেণীর আচরণে সত্যের প্রসার বাধাগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ।

এই জন্য কোর্‌আন মাজীদের অন্যান্য স্থানে প্রত্যক্ষভাবে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া এই আচরণকে كبر مقتا عند الله বা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে গুরুতর জঘন্য আচরণ বলিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (ছাফ্‌ ও মোমেন, প্রথম

রুকু)। হযরত রাছুলে কারীমের বহু ছহী হাদীছে এই শ্রেণীর লোকদিগের বিরুদ্ধে যে সব কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে শরীর শিহরিয়া ওঠে।

আল্লাহ্ আমাদিগকে এই অভিশাপ হইতে রক্ষা করুন।

৩৭। টীকাঃ ছবর ও ছালাত

ছবর অর্থে—ধৈর্য ধারণ করা, ভয় ও লোভকে অতিক্রম করিয়া অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকা। ছালাত শব্দের মূল অর্থ—দোওয়া, মোনাজাত বা প্রার্থনা। যেহেতু নামাযের প্রধান অঙ্গ হইতেছে দোওয়া ও মোনাজাত, সেইজন্য ধর্মীয় পরিভাষায় নামাযকেই সাধারণতঃ ছালাত বলা হয়। এখানে ছালাত অর্থে নামায অথবা দোওয়া-মোনাজাত উভয় হইতে পারে।

ইহা যে একটা কঠিন সাধনা, আয়াতেই তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৪ আয়াতে বর্ণিত আত্মবিস্মৃতির প্রতিকার হিসাবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সাধনার কথাও মুছলমানদিগকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। "অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাকার জন্য প্রাণপণ সঙ্কল্প নিয়া মজবুত হইয়া থাক, এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র হুজুরে মোনাজাত করিতে থাক—তাঁহার সাহায্য লাভের জন্য"—তাহা হইলেই সব আপদ কাটিয়া যাইবে, সব দুর্বলতা দূর হইয়া যাইবে। ইহাই হইতেছে আয়াতের প্রধান শিক্ষা।

---

৬ রুকু

৪৭। হে বানি-ইছ্‌রাইল সমাজ! যেসব নিয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম এবং যেভাবে তোমাদিগকে (সমসাময়িক) জগতের উপর শ্রেষ্ঠতা দিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ কর। (৩৮)

৪৭ يٰبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعٰلَمِينَ ۝

৪৮। এবং সেই (অবধারিত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চল, যে দিন কোনও মানুষই অন্য কোনও মানুষের (ত্রাণ) সম্বন্ধে আদৌ যথেষ্ট হইবে না, আর কোনও

৪৮ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا

মানুষের পক্ষ হইতে কোনও ছোপারেশই কবুল করা হইবে না, আর কোনও মানুষের পক্ষ হইতে কোনও ফিদিয়া (ক্ষতি-পূরণ)-ও গ্রহণ করা হইবে না এবং অন্য কোন প্রকারেও সাহায্য করা হইবে না তাহাদিগকে।

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৯। আর (স্মরণ করিয়া দেখ সেই সময়ের কথা) যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ফেরআওনের স্বজনগণের (দাসত্ব) হইতে, যাহারা তোমাদিগকে উৎপীড়িত করিয়া চলিয়াছিল কঠোর দণ্ডের দ্বারা—তোমাদিগের পুত্রগুলিকে তাহারা জবেহ করিয়া ফেলিত আর তোমাদের নারীদিগকে জীবিত থাকিতে দিত; বস্তুতঃ এই ব্যাপারে (নিহিত) ছিল তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে (সমাগত) এক গুরু-তর আজমায়েশ। (৩৮ক)

৪৯ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ
سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ
اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

৫০। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন তোমাদের জন্য জলাশয়-বিশেষকে বিযুক্ত করিয়া দিলাম, সেমতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম ও ফেরআওনের স্বজনবর্গকে ডুবাইয়া মারিলাম—তোমাদের দৃষ্টির গোচরে। (৩৯)

৫০ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ
فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৫১। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন মূছাকে আমরা চল্লিশ

৫১ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ

রাত্রের ওয়াদা দিয়াছিলাম, তখন তাহার (প্রস্থানের) পর, একটি গোবৎসকে তোমরা (ঈশ্বররূপে) গ্রহণ করিলে এবং সে অবস্থায় তোমরা ছিলে জালেম।

لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ
ظٰلِمُوْنَ ۝

৫২। এই পরিস্থিতির পরেও তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিলাম—যেন তোমরা শোকরগোজারী করিতে থাক। (৪০)

৫২ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৫৩। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন মূছাকে আমরা প্রদান করিয়াছিলাম কেতাব ও ফোরকান—যেমতে তোমরা হেদায়ত লাভ করিতে পার। (৪১)

৫৩ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۝

৫৪। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন মূছা নিজের কওমকে বলিয়াছিল : হে আমার কওম! গোবৎসকে (মা'বুদরূপে) গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করিয়াছ নিশ্চয়ই, অতএব তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার হুজুরে তাওবা কর, সেমতে নিজেদের নাফছ(কু-প্রবৃত্তি)গুলিকে সংযত করিয়া রাখ; তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে ইহাই উত্তম;

৫৪ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ
اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ
فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ

অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করিলেন; বস্তুতঃ তিনি হইতেছেন মহা ক্ষমাশীল, কৃপা-নিধান। (৪২)

فتاب عليكم ط انه هو التواب الرحيم ○

৫৫। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন তোমরা বলিয়াছিলে: হে মূছা, আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না-করা পর্যন্ত কোনো মতেই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব না, ফলে এক "সশব্দ ভূমিকম্পের" দ্বারা আক্রান্ত হইলে তোমরা, এবং অবস্থা এই যে, তোমরা সে পরিস্থিতিকে নিজেরাই দর্শন করিতেছিলে। (৪৩)

৫৫ واذ قلتم يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصعقة وانتم تنظرون ○

৫৬। অতঃপর তোমাদিগকে আবার অভ্যুত্থিত করিলাম তোমাদের মওতের পরে, যেমতে তোমরা শোকরগোজার হইয়া চলিতে থাক। (৪৪)

৫৬ ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ○

৫৭। এবং (ছীনা-প্রান্তরে) মেঘপুঞ্জ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া করিলাম, আর তোমাদের জন্য নাজেল করিয়া দিলাম মান্না ও ছাল্‌ওয়াকে ;—(বলিয়াছিলাম) : "আমার দেওয়া এই পাক রুজী হইতে তোমরা ভোগ করিতে থাক।" বস্তুতঃ তাহারা আমাদের উপর কোনও জুলুম করে নাই—বরং জুলুম করিতেছিল নিজেদেরই আত্মার উপর। (৪৫)

৫৭ وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى ط كلوا من طيبت ما رزقنكم ط وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ○

৫৮। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন আমরা (তোমাদিগকে) বলিয়াছিলাম : "সকলে এই জনপদে প্রবেশ কর আর তাহার যেস্থান হইতে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দ মনে আহার করিতে থাক, এবং তোমরা নগরদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে অবনমিতভাবে, আর আল্লাহ্‌র হুজুরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে ; তোমাদের খাতা-কছুরগুলি আমরা মাফ করিয়া দিব ; অধিকন্তু সৎ-কর্মপরায়ণ লোকদিগকে প্রদান করিব ইহা ছাড়াও আরও অনেক কিছু। (৪৬)

৫৮ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ط وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ٥

৫৯। কিন্তু যে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল এই জালেম-দিগকে, তাহাকে তাহারা অন্য কথায় পরিবর্তন করিয়া নিল—সুতরাং ঐ সব জালেমের উপর আছমান হইতে এক বিশেষ আপদ নামাইয়া দিলাম, তাহাদের চিরাচরিত অনাচারের প্রতিফলে। (৪৭)

৫৯ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ع

তাফ্ছীর

৩৮। টীকা : বানি-ইছরাইলের কৃতঘ্নতা

বানি-ইছরাইল সমাজকে আল্লাহ্ নবুয়তের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন, দীর্ঘকালের দাসজীবন হইতে উদ্ধার করিয়া একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিনায়ক করিয়া দিয়াছিলেন। এই ও এই শ্রেণীর অনুগ্রহ এবং ইহুদী জাতির

কৃতঘ্নতা ও নাশোকরগোজারীর কথা, এই রুকুতেও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে।

৪৮ আয়াতে বলা হইতেছে যে, সেই অবধারিত দিবসের অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথাও তাহাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিয়ামত্‌ সম্বন্ধে এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, সেই মহা বিচারের দিন কাজে আসিবে শুধু বান্দাহ্‌র আমল। যাহারা অনাচারী ও আল্লাহ্‌র নাফরমান, তাহাদিগকেও সেদিন নিজ নিজ আমলের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। তাহাদের কেহ কাহারও কোনো উপকারে আসিবে না। বলা বাহুল্য, কাফের ও নাফরমানদিগের শাফায়াত বা ছুফী-ছোপারেশেরও সেদিন কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।

৩৮ ক। টীকা : ইহুদী জাতির দুরবস্থা

ইহুদী জাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া মিসরে দাস-জীবনের অশেষ অভিশাপ ভোগ করিয়া আসিতেছিল ; এমন কোনও নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অমানুষিক উৎপীড়ন ছিল না, যাহা তাহাদিগকে বহন করিতে হয় নাই। দৈহিক উৎপীড়ন ছাড়াও, তাহাদিগকে সদাসর্বদা যে হেয়তা ও অবমাননার অভিশাপ বহন করিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহা ইহার উপর অধিকন্তু। এখানে ইহার একটা উদাহরণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বলা হইতেছে—ফেরআওনের স্বজনবর্গ ইহুদীদের পুরুষদিগকে কতল করিয়া ফেলিত আর স্ত্রীলোকদিগকে জীবিত রাখিত। একটা বিরাট জনসমাজের পক্ষে ইহা অপেক্ষা জঘন্য অভিশাপ আর কিছুই হইতে পারে না। তাহাদিগকে এই অভিশপ্ত জীবন হইতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুছাকে, মিসরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এখানে আছে يذبحون ابنائكم তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে তাহারা "জব্‌হ" করিয়া ফেলিত। জব্‌হ শব্দের অর্থ যেমন "জবাই" করা হয়, সেইরূপ নিহত করা বা কতল করা অর্থেও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। আরবী সাহিত্যে এই ব্যবহারেরও যথেষ্ট নজীর আছে। মিঃ H. Salmone ও F. Steinggass তাঁহাদের আরবী-ইংরেজী অভিধানে যথাক্রমে Slay ও Kill অর্থও প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য সূরা আ'রাফের ১৪১ আয়াতে يذبحون শব্দের পরিবর্তে يقتلون শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।*

---

* জনৈক খ্রীষ্টান বন্ধুর ভ্রান্তি দূর করার জন্য কেবল তাঁহাদের স্বধর্মীয় দুইজন অভিধানকারের উক্তি উদ্ধৃত করা হইল।

৩৯। টীকা ঃ ইহুদীদিগের মুক্তিলাভ

৪৯ আয়াতে মিসরীয় ইহুদী সমাজের জাতীয় জীবনের নানাবিধ বিড়ম্বনার প্রতি ইঙ্গিত করার পর, এই আয়াতে তাহাদের মুক্তিলাভের ঘটনার কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

মিসরীয় ইহুদীদিগের এই উদ্ধারের ব্যাপার এবং তাহার পূর্বেকার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে কোর্‌আন মাজীদের নেছা, মায়েদা, আন্‌আম, আ'রাফ, ইউনোছ, তা-হা, শোআরা প্রভৃতি সূরায় সংক্ষেপে বা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আ'রাফ, ইউনোছ, তা-হা, শোআরা ও কেছাছ প্রভৃতি অধিকাংশ সূরাই মক্কায় নাজেল হইয়াছিল। সুতরাং এই বিবরণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে হইলে যথাক্রমে মাক্কী সূরাগুলির বিবরণ উদ্ধৃত করার পর মাদানী সূরার আয়াতগুলি সম্বন্ধে যুগপৎভাবে আলোচনা করার দরকার হয়। বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব হইতেছে না। *

আয়াতে প্রত্যক্ষতঃ বানি-ইছ্‌রাইল সমাজকে সম্বোধন করা হইতেছে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত বা অনুগ্রহ-দানের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। তাহারা ছিল একটা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত দাস সমাজ। আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেই দাস জীবনের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই মুক্তির ইতিহাসে সবচাইতে বড় ব্যাপার হইতেছে, মিসর হইতে বানি-ইছ্‌রাইলের হিজরত, পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্নগুলিকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের নিরাপদ-স্থানে উপস্থিতি আর সঙ্গে সঙ্গে জালেম সমাজের বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া। বানি-ইছ্‌রাইলের সকল মঙ্গল-ভষ্যিতের সূচনা হইতেছে এখান হইতে।

এই আয়াতে ও এই শ্রেণীর অন্যান্য আয়াতগুলিতে বানি-ইছ্‌রাইলের দরিয়া পার হওয়ার বিবরণে যে কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত রাছুলে কারীমের কোনও নির্ভরযোগ্য হাদীছ, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমার নজরে পড়ে নাই। পক্ষান্তরে যেসব উদ্ভট গল্প-গুজব এই প্রসঙ্গে আমাদের এক শ্রেণীর তাফ্‌ছীরগুলিতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহা ইহুদী বাইবেলের যাত্রা পুস্তক অথবা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তিগুলির অবিকল নকল ব্যতীত আর কিছুই নহে। আলোচনার সুবিধার জন্য রাবীদের বর্ণিত এই সব কেচ্ছার সংশ্লিষ্ট অংশের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি —

"হযরত মূছা আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে রাত্রিযোগে মিসর হইতে বাহির

---

* কোর্‌আন মাজীদের সূরাগুলি যে তরতীবে নাজেল হইয়াছিল, খোলাফায়ে রাশেদীনের সঙ্কলনে সে তরতীব রক্ষা করা হয় নাই। উভয়ের সঙ্গত কারণও আছে।

হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল ৬ লক্ষ ৪০ হাজার বানি-ইছ্‌রাইল। ২০ বা তাহার কম বয়সের এবং ৬০ বা তাহার উর্ধ্ব বয়সের লোকদিগকে এই গণনায় শামিল করা হয় নাই। সুতরাং কম-বেশী বার লক্ষ নরনারী ও বালক-বালিকা লইয়া হযরত মূছা নিজ গন্তব্যস্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইহা ব্যতীত অনেক উট, ভেড়া, বকরীও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। পানাহারের ব্যবস্থাও নিশ্চয় করা হইয়াছিল।''

এই বিপুল অভিযান লইয়া হযরত মূছা গিয়া উপস্থিত হইলেন লোহিত সাগরের উপকূলে। সাগর পাড়ি দেওয়ার কোনও উপায় নাই, অন্যদিকে ফেরআওনের বিপুল সৈন্যবাহিনী একেবারে মাথার উপর উপস্থিত। মূছা তখন আল্লাহ্‌র কাছে দোওয়া করিলে হুকুম আসিল: তুমি তোমার হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে "প্রহার কর"। কিন্তু সমুদ্র তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। সে বলিল, —"উপরের হুকুম পাই নাই।" তখন এই চরম সঙ্কট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত মূছা আল্লাহ্‌র দরগাহে পুনরায় দোওয়া করিলেন। তখন অহি আসিল: মূছা। তুমি সমুদ্রকে ডাক দাও তাহার ''কুন্নিয়ত" ধরিয়া। হযরত মূছা তদনুসারে "ইয়া আবা-খালেদ" বলিয়া দ্বিতীয়বার সমুদ্রের উপর আঘাত করিলেন। যেমনই আঘাত করা, অমনি বিশাল লোহিত সাগরের বিপুল অম্বুরাশি আকাশের দিকে উঠিয়া গেল, সমুদ্রতল হইতে উর্ধ্বগগন পর্যন্ত "বারটি" অম্বুপ্রাচীর খাড়া হইয়া উঠিল। পূরবী বাতাস বহিয়া সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রতলগুলিকে শুকাইয়া দিল। বানি-ইছ্‌রাইলের বারটি গোত্র এই বারটি সড়ক ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে লোহিত সাগর পার হইয়া গেল। বলিতে ভুলিয়াছি, পাছে তাহারা অন্য স্বজাতীয়দিগকে না দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যায়, এইজন্য ঐ প্রাচীরগুলির ফাঁকে ফাঁকে জানালাও বসিয়া যায়।"

"ফেরআওন সাগর কূলে আসিয়া এসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখিয়া একে-বারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মূছার পশ্চাদ্ধাবন করিতে তার আর সাহস হইল না! কিন্তু আল্লাহ্‌র মর্জী ছিল ফেরআওনের লোক-লস্করগুলিকে ডুবাইয়া মারার। তাই জিব্‌রাইল ফেরেশতাকে পাঠাইয়া দিলেন একটা মেয়ে ঘোড়ার উপর ছওয়ার করিয়া। জিব্‌রাইল ঘোটকীর উপর ছওয়ার হইয়া মিসরী সেনাবাহিনীর সম্মুখ ভাগ দিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া চলিলেন, আর একদম নামাইয়া দিলেন সমুদ্রের সুড়ঙ্গ পথে। আর যায় কোথায়, ফেরআওনের দশ লাখ সৈন্যের সমস্ত ঘোড়া ঘোটকীকে দেখিয়া, কাম-উন্মত্ত হইয়া, নামিয়া গেল ঐ সুড়ঙ্গ পথে। আর দেখ, অম্বুপ্রাচীর তখন লোহিত সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে মিশিয়া গেল। স্বজনগণসহ ফেরআওন ডুবিয়া মরিল।"

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এইসব বিবরণের সমর্থনে কোনও হাদীছের সমর্থন নাই। ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়া আলোচনা করিতে চাহিলে প্রথমেই সকলের মনে ওঠে, ইহুদীদের জাতীয় ইতিহাসের কথা। কিন্তু সেদিক দিয়াও আমাদিগকে সম্পূর্ণ হতাশ হইতে হইয়াছে। কারণ, কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর বিরোধী জনশ্রুতি ও উপকথা ব্যতীত ইতিহাস বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই। অধিকন্তু শিলালিপি, স্তম্ভ, মুদ্রা প্রভৃতি যে সব উপকরণের অনুশীলন দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সম্ভব হইয়া থাকে, তাহাও উহাদের কোনও আবাসস্থান হইতে আজও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। মিসর, ইয়ামন, বাবেল ও আছীরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদগুলির সহিত তুলনা করিলে ইহুদী ইতিহাসের চরম দৈন্যই প্রকটিত হইয়া ওঠে।*

ইহুদী জাতির ধর্মশাস্ত্র নামে কথিত পৌরাণিক পুথি-পুস্তকগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দার্শনিক বিচারে অনৈতিহাসিক ও নির্ভরের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এখানকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের আজ প্রধান অবলম্বন হইতেছে ইহুদী বাইবেলের سفر الخروج বা যাত্রা পুস্তক।

এই পুস্তক সম্বন্ধে Britanica বিশ্বকোষের লেখক বলিতেছেন:

The book of Exodus, Like other books Hexatuech, is a composite work which was passed, so to speak, through many editions; hence the order of events which it sets forth can not lay claim to any higher authority than that of the latest editor. Moreover, the documents from which the book has been compiled belong to different periods in the history of Israel, and each of them, reflects the stand of the age in which it was written. (Ency. Britanica, vol. 8, Exodus)।

সুতরাং বর্তমান অবস্থায় আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে কোর্আনের উপর, তথা আরবী অভিধানের উপর। এ-সম্বন্ধে হাদীছে আমরা এইটুকুমাত্র জানিতে পারিতেছি যে, বানি-ইছ্রাইল তাহাদের শত্রুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, চান্দ্রমাসের আশুরা বা দশম তারিখে (বোখারী, মোছ্‌লেম প্রভৃতি—মনছুর)। আয়াতের বিচার আলোচনা করার সময় আমাদিগকে এই বৃত্তান্তটাকে প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

* দেখুন-Historians History of the World. ২য় খণ্ড, প্রথম হইতে ২৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

৬—

আলোচ্য আয়াতের প্রথম অংশে فرقنا ও البحر। শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে এই শব্দ দুইটির প্রকৃত অর্থ সর্বপ্রথমে নির্ধারিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে আয়াতের তাৎপর্য স্বতঃসিদ্ধভাবে পরিস্ফুট হইয়া যাইবে। فرق (ফার্ক্ন) শব্দের অর্থ—কোনও বস্তুর এক অংশকে অন্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা, انفصال । 'جدا کردان' বা বিচ্ছিন্ন করা(জাওহারী, মিছবাহ, রাগেব)।

بحر বাহ্র শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অভিধানকারর৷ বলিতেছেন:

(١) البحر الماء الكثير او الملح فقط - (قاموس)

(٢) البحر خلاف البر ' يقال سمى لعمقه و اتساعه ---- كل نهر عظيم بحر -

(٣) البحرخلاف البر - الماء الملح - كل نهر عظيم - كل متوسع من الشئى - (موارد)

(٤) اصل البحر كل مكان واسع جامع الماء الكثير ' هذا هو الاصل --- و سموا كل متوسع فى شئى بحرا ' حتى قالوا فرس بحر باعتبار سعة جريه ' و قال عليه السلام فى فرس ركبه "وجدته بحرا" ' و للمتوسع فى علمه بحر - (راغب)

(٥) دريا و جوى بزگ - (صراح)

অর্থাৎ:

(১) অধিক পরিমাণে সঞ্চিত পানি, অথবা কেবল লোনা পানি। (কামূছ)।

(২) বাহ্র—স্থলের বিপরীত শব্দ, গভীরতা ও বিশালতার জন্য এই নামকরণ···এবং প্রত্যেক নহরই বাহ্র (জাওহারী)।

(৩) বাহ্র—স্থলের বিপরীত শব্দ—লোনা পানি, প্রত্যেক বড় নহর, যে কোন প্রশস্ত বস্তু। (মাওয়ারেদ)।

(৪) যে কোনো প্রশস্ত স্থানে অধিক পরিমাণে পানি সঞ্চিত থাকে, তাহার প্রত্যেকটিই বাহ্র بحر, ইহাই হইতেছে মৌলিক অর্থ। প্রত্যেক সুপ্রশস্ত বিষয় বা বস্তুর সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। এমন কি, চালের হিসাবে ঘোড়াকেও বাহ্র বলা হয়। এইরূপে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারীকেও বাহ্র বলা হইয়া থাকে। (যেমন, বাহ্রুল ওলুম বা বিদ্যাসাগর)। সুতরাং প্রামাণ্য অভিধানগুলি হইতে নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক প্রশস্ত জলাশয়কে, এবং প্রত্যেক নহর বা নদ-নদীকে বাহ্র বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, সমুদ্রও ইহার অন্তর্গত। কিন্তু সমুদ্র ব্যতীত আর কোনও নহর, নদ-নদী বা জলাশয়কে বাহ্র বলা যাইতে পারে না, এরূপ দাবী

আরবী সাহিত্যের হিসাবে আদৌ সমীচীন হইতে পারে না।

• এইসব প্রমাণ অনুসারে আমরা আয়াতের অনুবাদ করিয়াছি—"যখন তোমাদের জন্য জলাশয়-বিশেষকে বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম।" জলাশয় বিশেষ বলিয়া এখানে কোন্ জলাশয়কে বুঝাইতেছে, তাহার নির্ধারণ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিচার সর্বাগ্রে করিয়া নিতে হইবে :

(১) হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত বানি-ইছরাইল জাতি বসবাস করিতেছিল মিসর দেশের কোন্ অঞ্চলে এবং সেখান হইতে পলাইয়া এই লক্ষ লক্ষ নরনারী আশ্রয়লাভের আশায় যাইতে চাহিয়াছিল কোন্ দেশে ? কোর্‌আন-হাদীছে বা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণে তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কি-না ? জলাশয় বা সমুদ্র পার হওয়ার পর বস্তুতঃ তাহারা উপনীত হইয়াছিল কোন্ দেশের কোন্ অঞ্চলে ?

(২) পূর্ব আবাসভূমি হইতে ঐ গম্যস্থানে উপস্থিত হইতে কোন্ পথ তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল ও নিরাপদ হইতে পারিত ? কোর্‌আন মাজীদ হইতে তাহার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ বা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি-না ?

(৩) বাহ্‌র শব্দের অর্থ—নদ-নদী, নহর, প্রশস্ত জলাশয় ও সমুদ্র প্রভৃতি সবই হইতে পারে, আরবী অভিধানের সমবেত সাক্ষ্য ইহাই। কিন্তু ঐগুলির মধ্যে কোন্ অর্থ উপস্থিতক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মীমাংসা হইবে কি প্রকারে ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর :

ইছরাইলরা হিজরতের পূর্বে মিসর রাজ্যের কোন্ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল, কোর্‌আনে তাহার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ আমি দেখিতে পাই নাই। কিন্তু কোর্‌আন হইতে একথা খুবই স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, হযরত মূছা জন্মগ্রহণের পর, তাঁহার মাতা তাঁহাকে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে, কোনও এক দরিয়ায় ভাসাইয়া দেন। সেই নদীর কোনও এক ঘাটে ফেরআওনের স্ত্রী (বা কন্যা) স্নান করিতে আসিয়া তাহা দেখিতে পান ও প্যাটারাটা তুলিয়া নেন। মূছার ভগ্নী সেই নদীর কূল ধরিয়া ঐ প্যাটারার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন এবং মাতাকে ডাকিয়া আনিয়া মূছার ধাত্রীর কাজে নিযুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন।*

* সূরা কাছাছ, ৭ আয়াত।

ঐ বিশ্বকোষে হযরত ইয়াকুব (Jacob) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : "অবশেষে তিনি ইসাউর সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করিয়া নিলেন ও কান্‌আনে অবস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় তিনি সেখান হইতে মিসরে গমন করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ও তাঁহার পুত্ররা, মিসরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, "গোশেন" অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন।" (Britanica. Jacob)।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, হযরত মূছার পরিজনবর্গের অবস্থান স্থল হইতে ফেরআওনের রাজপ্রাসাদ অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। সেই নদীটা নীল-নদ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ বস্তুতঃ মিসর দেশে অন্য কোনও নদ-নদীর অস্তিত্বই নাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে নীল-নদের তীরবর্তী কোনও এক অঞ্চলে ইছ্‌রাইলীদের বসবাস ছিল।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সাধারণ মত এই যে, হযরত ইয়াকুবের আগমনের সময় হইতে হযরত মূছার এই হিজরত পর্যন্ত, বানি-ইছ্‌রাইল সমাজ "গোশেন" নামক স্থানে বাস করিয়া আসিয়াছে।*

বাইবেলীকার লেখক বলিতেছেন : "The freshwater Timsah Lake with its large marshes, full of reeds, exactly at the entrance of Goshen, would fullfil all conditions for the Exodus and for the Hebrew name. অর্থাৎ—"গোশেনের ঠিক প্রবেশপথে অবস্থিত তাজা পানি সমন্বিত ও reed বা নলখাগড়ায় পরিপূর্ণ তিমছাহ হ্রদ ও তাহার বৃহৎ জলাভূমিগুলি ইহুদীদিগের পলায়ন পথের এবং এই এবরানী নামের (য়াম্‌ছুফ নামের) সমস্ত শর্ত যথাযথভাবে পূরা করিয়া দিতে পারে।**

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর খুবই সহজ। তাহারা যাইতেছিল পূর্ব-পুরুষের দেশে—ارض مقدس বা পুণ্যভূমিতে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন-গণের কাছে। "ইহুদী দেশ," "ইছ্‌রাইল দেশ," ফিলিস্তিন ও যিরূশালেমই ছিল তাহাদের গন্তব্যস্থান। মিসর-সীমা অতিক্রম করার পরেই তাহারা উপস্থিত হইয়াছিল Sinai peninsula বা ছীনা উপদ্বীপে এবং তীহ প্রান্তরে। কোর্‌আন মজীদে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ মওজুদ আছে। (তা-হা, ৮০ আয়াত, প্রভৃতি)।

সুতরাং ইহা সন্দেহাতীতভাবে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে যে, হযরত মূছা বানি-ইছ্‌রাইলদিগকে লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন গোশেন অঞ্চল হইতে, এবং তাঁহাদের প্রথম কর্মক্ষেত্র হইয়াছিল ছীনা উপদ্বীপ ও ছীনা পর্বত (কোহতূর) বা তীহ পর্বত ও তাহার প্রান্তর ভূমি।

---

* Ency, Britanica, Vol-10 "Goshen." ** Art. Red Sea.

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ

পলায়নের সংবাদ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পরাক্রান্ত মিসর রাজ যে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে, আর একবার নাগাল পাইলে তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া ফেলিবে—ইহা হযরত মূছার, তাঁহার ভ্রাতা হারুনের এবং তাঁহাদের সহযাত্রী ইহুদীদিগের কাহারও অবিদিত ছিল না। ফেরআওন যে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্যোগ করিতেছে, হযরত মূছা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সে সম্বন্ধে এ অহি-ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (শোআ'রা, ৫৬ আয়াত)। এ অবস্থায় হযরত মূছা যে রক্ষা পাওয়ার এবং যত সত্বর সম্ভব মিসরের সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এখন আমি আলোচনাধীন অঞ্চলগুলির মানচিত্রের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। একটা পথ গোশেন হইতে সোজা ছীনা উপদ্বীপ ও তীহ-প্রান্তর পর্যন্ত, আর একটা পথ হইতেছে গোশেন হইতে বাহির হইয়া, সুয়েজ উপসাগরকে বামে রাখিয়া, কমবেশী পাঁচশত মাইল স্থলপথ অতিক্রম করিয়া "লোহিত সাগরের" মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া। তাহার পর আরব দেশের পশ্চিম সীমা ধরিয়া আবার পাঁচ শত মাইল অতিক্রম করিয়া ছীনায় পৌছান। মরু প্রান্তরের এই (অন্ততঃ পক্ষে) এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে দীর্ঘ সময়ের দরকার এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বহুগুণে অধিক। অন্যদিকে গোশেন হইতে ছীনা-উপদ্বীপের সীমানায় পৌছিতে ৫০-৬০ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করিতে হয় না, মিসরীয় সৈন্যের হাতে ধরা পড়ার ভয়ও শীঘ্র ঘুচিয়া যায়। পক্ষান্তরে প্রথম পথে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে লোহিত সাগরের ন্যায় একটা বিশাল সমুদ্রকে, আর দ্বিতীয় পথে একটা হ্রদ বা তাহার বেলাভূমিকে। সুতরাং এই পথই সহজ, সরল ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং অল্পতম সময়ের মধ্যে তাহাদের গম্যস্থানে পৌছিবার একমাত্র পথ।

প্রশ্নের শেষ অংশের উত্তরে সূরা তা-হার ৭৭ আয়াতের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেখানে হযরত মূছাকে একটি শুষ্কপথ অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছ। (৩য় প্রশ্নের উত্তর দেখুন)

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে প্রথমতঃ কোর্‌আন মাজীদের দলিল প্রমাণের দ্বারা এবং তাহার পর মানুষের সাধারণ জ্ঞান-বিবেকের ফৎওয়া অনুসারে।

আমরা কোর্আন মাজীদে দেখিতেছি যে, ফেরআওনের লোক-লস্কর যে জলাশয়ে ডুবিয়া মরিয়াছিল, তাহাকে "বাহ্র" না বলিয়া "ইয়াম" (يم) বলা হইয়াছে। সাধারণ লেখকগণ বলেন, ইয়াম্ অর্থে সমুদ্র—লোহিত সাগর। ফেরআওন ডুবিয়া মরিয়াছিল এই সমুদ্রে। আমি এই দাবীর সঙ্গতি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণঃ

(ক) ফেরআওন যে লোহিত সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছিল, ইহা ইহুদী বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের বর্ণনা মাত্র। কোর্আন বা হাদীছে এই দাবীর কোন সমর্থন নাই। সুতরাং উহাকে "স্বীকৃত বিষয়" রূপে গ্রহণ করা কোনও প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না।

(খ) হযরত মূছার শৈশবকালে তাঁহার মাতার প্রতি আল্লাহ্র অহি আসিয়াছিল, শিশুটাকে কোনো বাক্স-প্যাটারায় রাখিয়া দরিয়ার পানিতে ভাসাইয়া দিতে। সূরা আ'রাফের ১৩৬ আয়াতে, সূরা কাছাছের ৭ আয়াতে এবং সূরা তা-হার ৩৯ আয়াতে এই ব্যাপারের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত দুই আয়াতে (বাহ্র না বলিয়া) "ইয়াম" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং সকলেই ইহার অর্থ নীল দরিয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। লোহিত সাগরে ভাসাইয়া দেওয়ার কথা কেহই বলেন নাই। পূর্বে বাহ্র শব্দের তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, উহার অর্থ বৃহৎ জলাশয়ও হইতে পারে। সমুদ্র ঐ শব্দের একমাত্র অর্থ নহে। উপরোক্ত আয়াত দুইটি হইতে এই দাবীর সঙ্গতি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে।

আ'রাফ (১৩৬), কাছাছ (৩৯), জারীয়াত (৪০) এবং তা-হা সূরার ৭৮ আয়াতেও ঠিক এইরূপে বলা হইয়াছে যে, ফেরআওন ও তাহার লোক-লস্কর ডুবিয়া মরিয়াছিল ইয়াম-এ। সুতরাং এই আয়াতগুলিতেও আমরা উহার অর্থ—নদী, হ্রদ বা জলাশয় বলিয়া নিশ্চয় গ্রহণ করিতে পারি—বিশেষতঃ লোহিত সাগর সম্বন্ধে যখন কোনো যুক্তিও নাই, কোনো প্রমাণও নাই।

হযরত মূছার প্রতি অহি নাজেল হইয়াছিল এবরানী ভাষায়, ইহা সকলে অবগত আছেন। ঐ ভাষাবিদ বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন—The word 'sea' used of lakes in most oriental languages, especially in Hebrew. (Number 34-11) অর্থ sea বা বাহ্র শব্দ অধিকাংশ প্রাচ্যদেশে, বিশেষতঃ হিব্রু ভাষায়, হ্রদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।* লেখক গণনা পুস্তকের যে বরাত দিয়াছেন, হিব্রু হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলে তাহাকে

---

* Ency, Biblica, Art, "Red Sea."

بحر قلزم বলা হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করা হইয়াছে "কিন্নেরৎ" বলিয়া। উপরোক্ত মন্তব্য করার পর, লেখক লোহিত সাগর কল্পনার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়াতের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করিতেছি। এ-সম্বন্ধে সূরা ত্বা-হা, সূরা আ'রাফ, সূরা কাছাছ্ ও সূরা শোআ'রা প্রভৃতির তাফ্ছীরে অবশিষ্ট কয়েকটা বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। ফল্‌কুন্, জার্বুন ও আছা প্রভৃতির বিচার পাঠক-গণ সেখানে দেখিতে পাইবেন। এখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমার মতে হযরত মূছার লোহিত সাগর পার হওয়ার অনুকূলে কোনও যুক্তি-প্রমাণ নাই। তিনি নিজের স্বজাতীয়দিগকে নিয়া বাহির হইয়াছিলেন মিসরের গোশেন অঞ্চল হইতে এবং সম্মুখের তিমছাহ্ হ্রদের তীরবর্তী একটা শুষ্ক পথ ধরিয়া ছীনা অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুয়েজ খাল কাটার পূর্বে, ভূমধ্যসাগর হইতে সুয়েজ শহর পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে একশত মাইল এই ভূভাগটা ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন হ্রদ, বিল ও হাওড় ও নানা শ্রেণীর জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল, এবং বহুস্থানে এখনও আছে। মরা কোটালের সময় এই অঞ্চলের পানি স্বাভাবিক নিয়মে অনেক কম হইয়া যাইত। এই সময় অপেক্ষাকৃত উঁচু চরগুলি ভাসিয়া উঠিত, তাহার পার্শ্ববর্তী অগভীর জলাভূমিগুলি শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার ভরা কোটালের সময় জোয়ারের পানি দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া ঐস্থানগুলিকে ডুবাইয়া ফেলিত। এরূপ অবস্থায় সমুদ্রে অধিক পরিমাণে জলস্ফীতি ঘটিলে, তাহা উচচ স্তম্ভরূপ ধরিয়া তীরবেগে উপকূলের দিকে ছুটিয়া আসে এবং আকস্মিকভাবে সেই সকল স্থানকে ডুবাইয়া ফেলে। ইহাকে বান বা Tide bore বলা হয়। ইহা কুদরতের শাশ্বত ও সার্বভৌম নিয়ম। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই জলাভূমিগুলি লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায়, অল্প সময়ের মধ্যে উহার জোয়ার-ভাটা সম্পন্ন হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। হযরত মূছা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারেই ঠিক সময় অর্থাৎ উপযুক্ত তিথিতে মিসর হইতে যাত্রা করিয়া-ছিলেন, এবং তিনি পথের নির্দেশও লাভ করিয়াছিলেন আল্লাহ্‌রই হুজুর হইতে। তাই বানি-ইছ্‌রাইল রক্ষা পাইয়াছিল এবং সেইজন্যই ফেরআওন ডুবিয়া মরিয়াছিল। আমার মতে, হযরত মূছার নবী জীবনের প্রধানতম মো'জেজা ইহাই।

৪০। টীকা ঃ গো-বৎস পূজা

বানি-ইছ্‌রাইল কওমকে ফেরআওনের দাসত্ব হইতে মুক্ত করাই ছিল হযরত মূছার প্রথম কর্তব্য। কারণ একটা পরাধীন জাতির পক্ষে আল্লাহ্‌র দীনকে

যথাযথভাবে পালন করা নানা কারণে সম্ভব হইতে পারে না। এতদিনে হযরত মূছার সেই কর্তব্য সমাধিত হইয়াছে, বানি-ইছ্‌রাইল জাতি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। তাই এখন তাহাদের জন্য একটি শরীয়ত প্রদান করার ব্যবস্থা হইতেছে। এই জন্য মূছার প্রতি আহ্বান আসিল ৪০ দিবারাত্র নিভৃত সাধনার —যেমন আহ্বান আসিয়াছিল আমাদের হযরতের প্রতি।

এই নির্দেশ অনুসারে হযরত মূছা, ভ্রাতা হারুনকে নিজের খলীফা নিযুক্ত করিয়া "তুর-ছীনা" বা ছীনা পর্বতে চলিয়া যান। এই সময় বানি-ইছ্‌রাইল কওম জনৈক দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় হযরত হারুনের নিষেধ সত্ত্বেও—একটি গো-বৎস নির্মাণ করিয়া তাহার পূজা-অর্চনা আরম্ভ করিয়া দেয়। আয়াতে সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য সূরা আ'রাফের ১৭ ও ১৮ রুকু এবং সূরা তা-হার ৮৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।)

৪১। টীকা ঃ কেতাব ও ফোরকান

কেতাব—অর্থে যাহা কিছু লিখিতে হয় ; তাহা কাগজে লিখিত হউক অথবা প্রস্তর ফলকে খোদিত হউক। এই জন্য চিঠিপত্রকেও কেতাব বলা হয়। ফোরকান অর্থে বিভেদক, যাহা কোনো বিষয় বা বস্তুকে অন্য বিষয় বা বস্তু হইতে পৃথক করিয়া দেয়। মিথ্যাকে সত্য হইতে পৃথক করিয়া দেয় বলিয়া কোর্‌আনের এক নাম ফোরকান। বদর যুদ্ধের দিনকেও এই হিসাবে يوم الفرقان বা ফোরকান-দিবস বলা হইয়াছে। ফেরআওন নিজেকে জনগণের ربكم الاعلى বা "মহেশ্বর" বলিয়া দাবী করিতেছিল। ইহার মোকাবেলায় হযরত মূছা মিসরী ও ইহুদীদিগের সম্বন্ধে فذالكم الله ربكم الحق সেই সত্য সনাতন বার্হাক আল্লাহ্‌কে পেশ করিতেছেন। ফেরআওন একটা নগণ্য কীট-পতঙ্গের মত একান্ত লাচারীর অবস্থায় এক মুহূর্তে বিধ্বস্ত ও চিরতরে নস্যাৎ হইয়া গেল, আর মূছার পূজিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পূর্বের মতই অবিনশ্বর হইয়া আছেন। মিথ্যা ঈশ্বর ও সত্য ঈশ্বরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া দেখান হইয়াছিল হযরত মূছার মারফতে। এই হিসাবে তাঁহার এই মো'জেজাকে এখানে ফোরকান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৪২। টীকা ঃ কত্‌ল ও নাফ্‌ছ

কত্‌ল্ করা অর্থে মারিয়া ফেলা অথবা জীবন নাশের উপকরণগুলি ব্যবহার করা — তা বিষ খাওয়াইয়া হউক, ইট-পাথর মারিয়া হউক, ফাঁসি দিয়া হউক, আর ছুরি বা তলোয়ার দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া হউক। (তাজুল্-আরূছ)।

"কতল্" অর্থে জীবন নাশ করা। قتل الشراب মদকে কতল্ করিল— অর্থাৎ তাহাতে পানি মিশাইয়া দিল (কামূছ, জাওহারী)। রাগেব বলিতেছেন:

و قوله فاقتلوا انفسكم - قيل معناه ليقتل بعضكم بعضا ' و قيل عنى بقتل النفس اماطة الشهوات ' و عنه استعير على سبيل المبالغة : قتلت الخمر بالماء اذا مزجته - و قتلت فلانا و قتلته اذ ذللته - (مفردات)

এই সব প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, কতল্-শব্দের ধাতুগত অর্থ জীবন নাশ করা। কিন্তু কোনও ব্যক্তির তেজ খর্ব করা, গুরুত্ব নাশ করা, কুপ্রবৃত্তির বিনাশ সাধন প্রভৃতি সম্বন্ধেও কতল্ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করিয়া ইমাম রাগেব বলিতেছেন—এই আয়াতের দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। কেহ কেহ বলেন: উহার অর্থ, 'তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নিহত করুক।' অন্যদের মতে, নাফ্ছকে কতল্ করার অর্থ কু-প্রবৃত্তিকে অপসারিত করা। এই হিসাবে বলা হয়: আমি মদ্যকে কতল্ করিলাম, অর্থাৎ উহার সঙ্গে পানি মিশাইয়া দিলাম। এইরূপে আমি তাহাকে কতল্ করিলাম, অর্থাৎ তাহাকে দমন বা অপদস্ত করিলাম (রাগেব)।

হাদীছের স্বনামখ্যাত অভিধানকার মোল্লা মোহাম্মদ তাহের মরহুম বলিতেছেন: কতল শব্দের অর্থ সর্বত্র নিহত করা গৃহীত হইতে পারে না। এ-সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন হাদীছের বহু নজীর ও ছাহাবীগণের বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না (দেখুন—মাজমাউল-বেহার, কতল্)। নাফ্ছ শব্দের অর্থ— ব্যক্তি, আত্মা, প্রবৃত্তি। এখানে বহুবচন انفسكم শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ—নিজেদের প্রবৃত্তি দমন কর, বা তোমরা নিজেরা নিজদিগকে নিহত করিয়া ফেল।

আমি প্রথম তাৎপর্যকে সর্বতোভাবে সঙ্গত ও আয়াতের বর্ণনা ধারার সহিত সুসমঞ্জ বলিয়া মনে করি। আয়াতের তরজমাও সেইভাবে করিয়াছি। দ্বিতীয় অর্থের সমর্থকরা বলিতেছেন: 'এই আদেশ অনুসারে বানি-ইছ্রাইলরা সকলে একত্র সমবেত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। ফলে ৭০ হাজার লোক নিহত হওয়ার পর, আল্লাহ্ তাহাদের তাওবা কবুল করিলেন। সেমতে হত্যাকারীরা গাজীর দরজা লাভ করিল এবং নিহত ব্যক্তিরা শহীদ হিসাবে পরিগণিত হইল।' কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহাদের এই বিবরণের কোনও প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই আয়াতের শেষভাগে বলা হইতেছে—"নিশ্চয় তিনি হইতেছেন মহা-ক্ষমাপরায়ণ, কৃপানিধান।" ৭০ হাজার বান্দাহ্‌র নির্মম বলিদানের পর আল্লাহ্‌র এই দুইটি বিশেষণ ব্যবহারের কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। তৃতীয়তঃ, এই তাৎপর্য গ্রহণ করার জন্য আমরা কোন হিসাবেই বাধ্য নহি। বস্তুতঃ "নাফ্‌ছকুশী" বা "নাফ্‌ছ মারা" বলিতে যাহা বুঝায়, আয়াতের মর্ম তাহাই। জনৈক কবি বলিয়াছেন:

نهنگ و اژدها و شیر نر مارا تو کیا مارا
بڑے موذی کو مارا ' نفس امارہ کو گر مارا -

৪৩। টীকা : ছায়েকা

ছা'কুন (صعق) প্রচণ্ড শব্দ, ভূমিকম্প, বজ্রগর্জন ও বিদ্যুৎপাত এবং ভীষণ ঝঞ্ঝাপ্রবাহ অর্থে কোর্আনে বিভিন্ন সূরায় ব্যবহৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার ফলিত অর্থ—কোনও প্রচণ্ড নৈসর্গিক আপদ। এই ঘটনা উপলক্ষে সূরা আ'রাফে الرجفة শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ, ভূমিকম্প। যথাসম্ভব সব ভাবকে বুঝাইবার জন্য আমি ছায়েকার অনুবাদ করিয়াছি 'সশব্দ ভূমিকম্পন' বলিয়া। (পরবর্তী টীকা দেখুন)।

৪৪। টীকা : মওত ও অভ্যুত্থান

আরবী সাহিত্যে, বিশেষতঃ কোর্আন মাজীদে "মওত" ও "হায়াত" শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—মানুষ ও অন্য সকল জীবজন্তুর ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা উর্বরা শক্তি লোপ পাইয়া যাওয়া, অনুভূতি শক্তির বিলোপ, বুদ্ধির বা বিচার শক্তির বিপর্যয় ও দুঃখ-দুর্ভাবনার জন্য জীবন দুর্বহ হইয়া দাঁড়ান, স্বাভাবিক নিদ্রা এবং স্বাভাবিক মৃত্যু। ইমাম রাগেব মওত শব্দের এইসব তাৎপর্য দেওয়ার পর, কোর্আন মাজীদ হইতে প্রত্যেক ব্যবহারের নজীর উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। (মোফরাদাত, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)।

ইমাম রাজী বলিয়াছেন, মওত শব্দকে এখানে মৃত্যু অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কারণ,—(১) আয়াতের শেষভাগে বলা হইতেছে—وانتم تنظرون অর্থাৎ, তখন তোমরা এই ঘটনাকে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, আয়াতের লক্ষ্য ইহুদীরা তখন বাঁচিয়াছিল এবং সে ঘটনা তাহারা লক্ষ্য করিতেছিল। (২) সূরা আ'রাফে এই ঘটনা উপলক্ষে বলা হইতেছে—فلما صعق موسى "অতঃপর মূছা যখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল" এবং সঙ্গে সঙ্গে

বলা হইতেছে—فلما أفاق "অতঃপর মূছা যখন সংজ্ঞা লাভ করিল।" এই আয়াত হইতে জানা যাইতেছে যে, ক্ষণিক অচৈতন্যকেই(মৃত্যুকে নহে) এখানে "ছায়েকা" বলা হইয়াছে। (কাবীর)। মওত শব্দের ন্যায় হায়াত শব্দও অনুরূপ বিভিন্ন অর্থবাচক। এখানে উহার অর্থ হইবে জাতীয় জীবন। (সূরা আ'রাফ দেখুন)।

৪৫। টীকাঃ মেঘের ছায়া

ছীনা-উপত্যকার একটি মরু-প্রান্তরের নাম তীহ্। মিসর-সীমা অতিক্রম করার পর বানি-ইছ্রাইলকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই প্রান্তরে অবস্থান করিতে হয়। এই সময় বানি-ইছ্রাইলদিগের অবস্থান স্থানের উপর মেঘপুঞ্জের ছায়া হইয়াছিল—আল্লাহ্র হুকুমে। দুনিয়ার সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের ন্যায়, মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি হয় তাঁহারই হুকুম অনুসারে। তাহার স্থিতি ও গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁহারই অলঙঘ্য বিধান মতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদল লোক ধারণা করিয়া নিয়াছেন যে, একটা অসাধারণ বা অস্বাভাবিক ধরনের কাণ্ডকারখানা না ঘটিয়া গেলে, আল্লাহ্র কুদ্রতের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ ক্ষেত্রেও তাঁহারা একটা উদ্ভট রকমের মেঘপুঞ্জের কল্পনা করিয়া নিয়াছেন। এই কেচ্ছার স্রষ্টাই মূলতঃ ইহুদী পূরাণকাররা এবং তাহার বাহক ও প্রচারক হইতেছেন আমাদেরই একদল রাবী।

৪৬। টীকা ঃ মান্না ও ছাল্ওয়া

মান্না—এক প্রকার ছোট ছোট দানা। এগুলি রাত্রে এক শ্রেণীর গাছের পাতার উপর শিশির বিন্দুর মত জমিয়া থাকে। স্বাদ মিষ্ট, অল্প উত্তাপে গলিয়া যায়। ছাল্ওয়া—ইবরানীতে Salwim, ইংরাজীতে Quail। বাংলা ও সংস্কৃতে ভারুই, ভরত পক্ষী ও ফনি খেল এবং আরবীতে سمانى— শস্য ও মাংস হিসাবে বানি-ইছ্রাইল এই দুইটি বস্তুর ব্যবহার করিত। (বিস্তারিত, সূরা আ'রাফ ১৬০ আয়াতের তাফ্ছীরে দেখুন)।

৪৭। টীকা ঃ এই নগরে প্রবেশ কর

বানি-ইছ্রাইলকে তিনটি আদেশ দেওয়া হইয়াছিল ঃ

(১) তোমরা তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য পৈতৃক আবাস ভূমি ও পুণ্যস্থান বায়তুল মোকাদ্দাছে প্রবেশ কর। অর্থাৎ পরস্ব অপহরণকারী আমালেকাদিগের সহিত জেহাদ করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে বিদূরিত করিয়া দাও। এই

জেহাদই হইতেছে জাতীয় জীবনের প্রধান পরীক্ষা। (২) বিজয়লাভের পর তোমরা নগরে প্রবেশ করিবে বিনয়নম্র মস্তকে, অজ্ঞ ও শক্তি মদমত্ত দাম্ভিক বিজয়ীর মত নহে। (৩) নগরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহ্‌র হুজুরে, নিজেদের অপরাধগুলির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে।

হেত্তাতুন—অর্থ পাপ মোচনের প্রার্থনা। তাহারা বলিল—হেন্‌তাতুন। গম চাই, (পারাটা ও কাবাব কোফ্‌তার আয়োজন চাই) কারণ, তাহাদের অনেকেই মূছার অনুসরণ করিয়াছিল শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে, কোনও আদর্শের বালাই তাহাদের ছিল না।

ইহার পরিণামের কথা ৫৯ আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আয়াতগুলি নাজেল করা হইয়াছে মোছলেম জাতির চক্ষু দানের জন্য—অন্য উম্মতগুলিকে ভর্ৎসনা করার জন্য নয়। (সূরা মায়েদার ৪র্থ রুকু দেখুন)।

---

৭ রুকু

৬০। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), মূছা যখন আপন কওমের জন্য পানির প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন বলিয়াছিলাম : তুমি নিজের জামাআত্‌কে সঙ্গে নিয়া পাহাড়ে পর্যটন কর; সেমতে তাহা হইতে ১২টা প্রস্রবণ বাহির হইয়া পড়িল; (দ্বাদশ গোত্রের)প্রত্যেকেই তখন নিজের নিজের ঘাট জানিয়া নিল; (৪৮) (বলিলাম)—আল্লাহ্‌র দেওয়া রুজী হইতে পানাহার করিতে থাক; আর দুনিয়ায় ফেৎনা-ফাসাদ ঘটাইয়া বেড়াইও না।

৬০ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৬১। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন তোমরা বলিয়াছিলে : হে মূছা! একই

৬১ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ

খাদ্যের উপর আমরা কোন
মতে ছবর করিয়া থাকিব না—
অতএব তুমি তোমার প্রভুকে
ডাকিয়া বল, তিনি আমাদের
জন্য জমিন হইতে উৎপন্ন খাদ্য
—তাহার শাক-সব্জী, কাঁকুড়,
গম, পিঁয়াজ ও মসুর (প্রভৃতি)
—উদ্‌গত করিয়া দিন। মূছা
বলিল: কী (সর্বনাশ),
তোমরা কি তবে উৎকৃষ্টের
বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করিতে
চাহিতেছ। (বেশ কথা,) তোমরা
যে-কোনও এক শহরে চলিয়া
যাও, তোমাদের প্রার্থিত সমস্ত
বস্তুই তোমরা (সেখানে) পাইতে
পারিবে; এবং অবস্থা এই যে,
হেয়তার জীবন ও দারিদ্র্যের
ক্লেশকে চিরন্তন করিয়া দেওয়া
হইল তাহাদের জন্য, অধিকন্তু
নিজদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌র
গজব-ভাজন বানাইয়া নিল,
এরূপ প্রতিফলের কারণ এই
যে, আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে
তাহারা অমান্য করিয়া আসিতে
ছিল এবং নবীগণকে তাহারা
নাহক্ হত্যা করিয়া ফেলিত;
ইহা তাহাদের নাফরমানীর ও
সীমা লঙ্ঘনেরই পরিণাম। (৪৯)

عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا
وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط
قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ
اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ط اِهْبِطُوْا
مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ط
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللّٰهِ ج ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ
كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ع

তাফ্‌ছীর

৪৮। টীকাঃ দ্বাদশ প্রস্রবণ

সাধারণতঃ এই আয়াতের অনুবাদ করা হয়ঃ "আমরা মূছাকে বলিলাম, তুমি নিজের লাঠির দ্বারা প্রস্তরকে প্রহার কর, সেমতে সেই প্রস্তর হইতে ১২টি প্রস্রবণ বাহির হইয়া পড়িল।" আমি অনুবাদ করিয়াছি—"হে মূছা, তুমি নিজের জামাআত্‌কে নিয়া পর্বতে পর্যটন কর, সেমতে তাহা হইতে অর্থাৎ সেই পর্বত হইতে, ১২টা প্রস্রবণ বাহির হইয়া পড়িল। এই দুই অনুবাদের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, সর্বাগ্রে আয়াতে ব্যবহৃত ৪টা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করার দরকার হইবে।

(১) ضرب জর্‌বুন—ইহার অর্থ, প্রহার করা, কোনো স্থানে পরিভ্রমণ করা, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাওয়া, টাকার উপর ছাপ দেওয়া, কোনও বিষয়ের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। আমি পর্যটন বা পরিভ্রমণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কোর্‌আন মাজীদের বহু আয়াত হইতে এই তাৎপর্যের স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। যেমন—اذا ضربوا فى الارض , لا يستطيعون ضربا فى الارض ' و اذا ضربتم فى الارض ' فاضرب لهم طريقا فى البحر ইত্যাদি। মোফরাদাত, কামূছ প্রভৃতি অভিধানে গমন করা ও পরিভ্রমণ করা অর্থের নজীর উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ এই তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই।

একজন বিশিষ্ট আলেম লিখিয়াছেন জার্বুন শব্দের অর্থ গমন করা, পরিভ্রমণ করা প্রভৃতি হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য ঐ শব্দের পর "ফী" ছেলা আসা চাই। অন্যথায় এ তাৎপর্য গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। আমার মতে, ইহা সঙ্গত অভিমত নহে। "ফী" না থাকিলেও জার্বুন শব্দের "গমন করা" অর্থ হইয়া থাকে। যেমন--- و ضرب الغايط - ضربت الطير - ذهبت تبغى الرزق কামূছ, তাজুল আরূছ। হাদীছে আছে—"اى سيروا فيها كلها", فاضربوا مشارق الارض و مغاربها (মাজ্‌মাউল-বেহার)। ফী-ছেলা না থাকায় যদি জার্ব শব্দের অর্থ গ্রহণ করা অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত অংশগুলির অর্থ হইত—"সে পায়খানাকে প্রহার করিল।" "পাখী প্রহার করিল রুজী অন্বেষণের জন্য।" "অতএব তোমরা জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তগুলিকে প্রহার কর।" কিন্তু আরবী ভাষার হিসাবে উহার প্রকৃত অর্থ হইবে—সে পায়খানায় গিয়াছে; পাখীটা গিয়াছে খাদ্য অন্বেষণের জন্য, সে পায়খানায় গিয়াছে; তোমরা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়াও।

(২) আছা عصا —ইহার অর্থ—লাঠি, দল বা জামাআত্ উভয় হইতে পারে। কোনও কোনও অভিধানকারের মতে উহার মূল অর্থ হইতেছে সংঘ, সংহতি বা জামাআত্। আঙ্গুলগুলি একত্রভাবে লাঠিকে ধরিয়া রাখে বলিয়া লাঠির নাম হইয়াছে "আছা"। সে যাহা হউক, আছা শব্দের জামাআত্ অর্থ সমস্ত অভিধানে স্বীকৃত হইয়াছে (রাগেব, জাওহারী, মেছ্বাহ, প্রভৃতি)। জাওহারী ইহার নজীর দিতেছেন—

اذا كانت الهيجاء و انشقت العصا فحسبك و الضحاك سيف مهند -

হাদীছেও এই ব্যবহারের অনেক নজীর আছে। যেমন—

(١) من شق العصا ' اى فارق الجماعة -

(٢) اياك و قتيل العصا ' اى اياك ان تكون قاتلا او مقتولا فى شق عصا المسلمين -

(٣) ان الخوارج شقوا عصا المسلمين اى فرقوا جماعتهم (مجمع البحار)

আছার পূর্বে বে-বর্ণ আছে। এখানে উহার অর্থ হইবে "সঙ্গে নিয়া"। যেমন সূরা শো'আরায় বলা হইয়াছে— اسر بعبادى অর্থাৎ আমার বান্দাহ্দিগকে সঙ্গে নিয়া রাত্রিযোগে চলিয়া যাও। এই হিসাবে আমরা অনুবাদ করিয়াছি: তুমি নিজের দলবলকে সঙ্গে নিয়া পর্বতে (বা পার্বত্য অঞ্চলে) পরিভ্রমণ কর।

(৩) এখন বাকী থাকিতেছে حجر হাজার্ ও عين আয়েন শব্দের তাৎপর্য। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। উৎস, প্রস্রবণ, নহর প্রভৃতি প্রবহমান জলধারাকে "আয়েন" বলা হয়।

"হাজার্" শব্দের এক অর্থ প্রস্তর। কিন্তু আরবী ভাষায় ইহা আরও কয়েক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন—

(ক) পর্বত ও পার্বত্য প্রদেশ। দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীছে হযরত রাছুলে কারীম বলিতেছেন— تبعه اهل الحجر و المدر অর্থাৎ হাজার ও মাদরের লোকেরা তাহার অনুসরণ করিবে। "হাজরের অধিবাসীরা অর্থে প্রান্তরের অধিবাসীরা, যাহারা প্রস্তরসঙ্কুল স্থানে বা পর্বতে বাস করিয়া থাকে। (মাজ্মাউল্-বেহার)। মাদরের অধিবাসী অর্থে গৃহস্থ, যাহারা গ্রামে বা নগরে বাস করিয়া থাকে। (কামূছ)। সুতরাং হাদীছের ব্যবহার হইতে নিঃসন্দেহভাবে জানা যাইতেছে যে, পর্বত বা পার্বত্য অঞ্চলকেও "হাজার" বলা হয়।

কামূছে হাজার শব্দের তাৎপর্যে বলা হইতেছে :

نقاة الرمل و محجر العين - و المحجر كمجلس و منبر , الحديقة
و من العين ما دارها - و الحاجر الأرض المرتفعة و سطها و ما يمسك
الماء من شفة الوادى - (قاموس ' اقرب الموارد)

কামূছের গ্রন্থকার বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ফিরোজাবাদী হাজার শব্দের বিভিন্ন ব্যবহারিক অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম—একটি উচ্চ ভূভাগ, যাহার মধ্যস্থল নীচু এবং যাহা ওয়াদীর ধার হইতে পানি নিয়া তাহা আবদ্ধ করিয়া রাখে। ওয়াদী শব্দের অর্থ— جاے کشادہ میان کوهستان و تلها و پشتها که سیلاب ازان روان شود "পার্বত্য প্রদেশের ও উচ্চভূমির পানি যে প্রশস্ত ভূভাগ দিয়া বহিয়া যায়, তাহাকে ওয়াদী বলা হয়.(منتخب اللغات)।

এই অর্থ অনুসারে আয়াতের সুস্পষ্ট তাৎপর্য এই দাঁড়াইতেছে যে, আল্লাহ্ হযরত মূছাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি বানি-ইছ্‌রাইলদিগকে সঙ্গে লইয়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্থান কর। সেখানে উৎস আছে, প্রস্রবণ আছে, জলাশয় আছে। উহারা চেষ্টা করিয়া নিজেদের বার-গোত্রের জন্য বারটা পানির জায়গা ঠিক করিয়া লউক।

ফেরআওন লোক-লস্করসহ ডুবিয়া মরিল, আর ইহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নিরাপদে পার হইয়া আসিল, চারিশত বৎসর ব্যাপী দাস-জীবনের দুর্বহ অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং অদূরভবিষ্যতে ইহারাই আবার নিজেদের পবিত্র আবাস ভূমির বাদশাহ্ হইতে যাইতেছে। কিন্তু দারুন কৃতঘ্ন ইহুদী জাতি সে সব কিছু মনে না রাখিয়া নবীর সঙ্গে পিঁয়াজ রসুন নিয়া কোন্দল বাধাইতেছে। মান্না ও ছাল্‌ওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল, যেমতে এই অনায়াস লব্ধ খাদ্য খাইয়া তাহারা আল্লাহ্‌র শোকরগোজারী করিবে, ভবিষ্যতের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের তৃপ্তি হইল না। তাহারা মনে করিল—আমরা তো উদ্ধার হইয়া গিয়াছি। এখন গরজ মূছার ও তাহার আল্লাহ্‌র। নিজেদের দীন-ধর্মকে যদি বাঁচাইতে চায়, তাহা হইলে—"আমাদের দাবী মানতে হবে!"

কিন্তু কুদ্‌রতে খোদাঅন্দীর চিরন্তন কানুন অনুসারে, এই শ্রেণীর আবদারের যুগ শেষ হইয়া গেল। তাই বানি-ইছ্‌রাইলকে তাহাদের প্রত্যেক আবদারের উত্তরে এখন বলা হইতেছে—আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাহ্‌দের জন্য সমস্ত আসবাব ও উপকরণ দুনিয়াতে পয়দা করিয়া রাখিয়াছেন—খাদ্য চাও, গ্রামে শহরে চলিয়া

যাও, আমার দেওয়া উপকরণগুলির ব্যবহার কর। পানি চাও, পরিশ্রম করিয়া যথাস্থানে তালাশ করিয়া দেখ। আলোচ্য আয়াতের শেষ অংশে ও পরবর্তী আয়াতে সম্পূর্ণভাবে এই নীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে।

৪৯। টীকাঃ مصرا মেছ্রান

মেছ্র শব্দের সাধারণ অর্থ—নগর, শহর। এই হিসাবে ফেরআওনের রাজধানীকেও মেছ্র বলা হয়। কিন্তু ফেরআওনের শহর বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হইলে, আরবী ব্যাকরণ অনুসারে উহা غير منصرف হইয়া যায়। সুতরাং উহাতে تنوين বা দুই জবর, দুই জের বা দুই পেশ (Nunation) বসিতে পারে না। এইজন্য কোর্‌আনের যত স্থানে ফেরআওনের দেশ বা রাজধানী অর্থে উহার ব্যবহার হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে শব্দটি غير منصرف হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—أليس لى ملك مصر' قال ادخلوا مصر' ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ' و قال الذى اشتراه من مصر (যথাক্রমে জোখ্‌রোক ৫১, ইউছুফ ৯৯, ইউনুছ ৮৭, ইউছুফ ২১)। অথচ এখানে বলা হইতেছে اهبطوا مصرا। —কারণ, مصر মেছরা বলিতে একটা নির্দিষ্ট শহর অর্থাৎ মেছ্র বা ফেরআওনের দেশ বা রাজধানীকে বুঝাইতেছে। ইহাকে اسم معرفه (মা'রেফা Proper noun) বলা হয়। পক্ষান্তরে মেছরান্ نكره সুতরাং ইহার অর্থ হইবে, "যে কোনও একটা শহর"।

আবু-মোছলেম এখানে ফেরআওনের রাজধানী মেছ্র শহর বলিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ ও কোর্‌আনের ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া আয়াতের মেছরান্ শব্দকে "মেছরা" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ এই গ্রহণ করার কোনও অধিকারই তাহার ছিল না। কোর্‌আন হযরত রাছুলে কারীমের জীবনে নানা উপাদানের উপর সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার এন্‌তেকালের পর প্রথম খালীফা আবু-বাকারের সময় তাহার একটা নকল করা হয়। হযরত ওছমান বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইবার জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার আরও কয়েকখানা নকল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ১৪ শত বৎসর ধরিয়া মোছলেম জগতের প্রত্যেক প্রান্তে ইহার লক্ষ লক্ষ নকল প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এবং ইছলামের অতি বড় শত্রুরাও অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া আসিতেছে যে, আজ পর্যন্ত তাহার কোথাও একটি বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটে নাই। নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, مصر শব্দের পরবর্তী আলেফকে বাদ দিয়া ফেলা একটা গুরুতর অপরাধ।

অবশ্য আবু-মোছলেম তাঁহার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আলেফ বর্ণকে বাদ দিয়াছিলেন। ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, মতনে مصراً শব্দ লিখিয়াও অনুবাদে "মিসর শহর" লিখিতেও আমাদের দেশে কুণ্ঠা বোধ করা হইতেছে না।

হাফেজ এবন-কাছীর উপরোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

(اهبطوا مصراً) هكذا هو منون مصروف مكتوب بالالف فى المصاحف الائمة العثمانية - قال ابن جرير لا استخير القراة بغير ذلك لاجماع المصاحف على ذلك ...... و الحق ان المراد مصر من الامصار كما روى عن ابن عباس و غيره ' و المعنى على ذلك الخ -

মর্মানুবাদ—হযরত ওছমানের সময়কার ইমামগণের নকলে মেছ্রান্ শব্দ আলেফ বর্ণ তানভীন (দুই জবর) সহ লিখিত হইয়াছে। এবন-জারীর বলেন : "অন্য প্রকার পাঠ গ্রহণের অনুমতি নাই, কারণ সমস্ত কোর্আনে এইরূপই লিখিত হইয়া আসিয়াছে।...হক কথা এই যে, মেছ্রান-অর্থে 'যে কোনও একটা নগর—এই হিসাবেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।" দুনিয়ার সমস্ত মুছলমান অনুবাদক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

---

৮ রুকু

৬২। নিশ্চয় মোমেনদিগের জামাআতভুক্ত হইয়া আছে যাহারা ও ইহুদী হইয়াছে যাহারা এবং নাছারা ও ছাবেয়িগণ—যে কেহ আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহাদের পুণ্য ফল অবধারিত আছে তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে, অধিকন্তু কোনও আশঙ্কা থাকিবে না তাহাদের, আর দুঃখ-দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইবে না তাহারা। (৫০)

٦٢ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

৬৩। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), আমরা যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ও তূর (পাহাড়)-কে তোমাদিগের ঊর্ধ্বদেশে উত্থাপন করিয়াছিলাম ; (বলিয়াছিলাম), তোমাদিগকে যাহা দান করিলাম —তাহাকে মজবুতভাবে ধারণ করিয়া রাখিও আর তাহাতে যেসব নির্দেশ রহিয়াছে, সেগুলিকে সর্বদা স্মরণ করিও, যেমতে তোমরা পরহেজগার হইতে পারিবে। (৫১)

٦٣ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

৬৪। ইহার পর আবার তোমরা বিমুখী হইয়া গেলে, সে অবস্থায় আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত যদি না (সমাগত) হইত তোমাদের উপর, তাহা হইলে তোমরা হইয়া পড়িতে সর্বনাশ-গ্রস্তদের অন্যতম।

٦٤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬৫। আর বিশ্রামদিবসে (শরীয়তের) সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল তোমাদের সমাজের যেসব লোক, তাহাদের বিষয় তোমরা নিশ্চয় অবগত আছ, তখন তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম — লাঞ্ছিত বিতাড়িত বাঁদর হইয়া থাক তোমরা। (৫২)

٦٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ○

৬৬। যেমতে এই বিষয়টাকে আমরা তাহাদের সমসাময়িক ও পরবর্তী

٦٦ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ

জনগণের পক্ষে একটা আদর্শ দণ্ডরূপে (স্থাপন) করিলাম, আর পরহেজগার লোকদিগের জন্য করিয়া রাখিলাম মহা-উপদেশ। (৫৩)

يديها وما خلفها وموعظة
للمتقين ○

৬৭। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), মূছা যখন তাহার কওমকে বলিয়াছিল : নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গরু জবেহ করিবার হুকুম দিতেছেন। তাহারা (উত্তরে) বলিল—তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের অবলম্বন-রূপে গ্রহণ করিতেছ? মূছা বলিল : আল্লাহ্ রক্ষা করুন, যেন জাহেলদিগের দলভুক্ত হইয়া না পড়ি। (৫৪)

٦٧ وإذ قال موسى لقومه إن
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ط
قالوا أتتخذنا هزوا ط قال
أعوذ بالله أن أكون
من الجاهلين ○

৬৮। তাহারা (মূছাকে) বলিল : আমাদের পক্ষ হইতে তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন—সে গরুটা কি রকম? মূছা বলিল, তিনি বলিতেছেন যে, গরুটা বৃদ্ধও হইবে না এবং বাছুরও হইবে না—(বরং হইবে) এই দুয়ের মাঝামাঝি মধ্যবয়স্ক; অতএব তোমাদিগকে যে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা (অবিলম্বে) পালন কর।

٦٨ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا
ما هي ط قال إنه يقول إنها
بقرة لا فارض ولا بكر ط
عوان بين ذلك ط فافعلوا
ما تؤمرون ○

٦٩ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○

৬৯। ইহুদীরা (তবুও) বলিল: তুমি আমাদের পক্ষ হইতে তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেন যে, গরু-টার রঙ কিরূপ হওয়া চাই? মূছা বলিল, তিনি বলিতেছেন —সেটা হইবে পীতবর্ণের এমন একটা গরু, যাহার গাঢ় উজ্জ্বল (সোনালী) রঙ দর্শক-গণের জন্য হইবে প্রীতিকর।

٧٠ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ لا إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ط وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○

৭০। ইহুদীরা (পুনরায়) বলিল: তুমি নিজ পরওয়ারদেগারের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেন যে, কি প্রকারের গরু হইবে সেটা, কারণ গরু-গুলি সমস্তই আমাদের কাছে একই রকম বলিয়া বোধ হইতেছে; আর আল্লাহ্‌র মর্‌জী হইলে আমরা ইহার একটা সুরাহা করিতে পারিব।

٧١ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ

৭১। মূছা বলিল, তিনি বলিতেছেন —যে গরু জমি চাষ করিয়া অথবা ক্ষেতে পানির সেচ দিয়া শ্রমকাতর হইয়া পড়িয়াছে, ইহা সেরূপ গরু হইবে না, (বরং হইবে) সম্পূর্ণ সুস্থ,

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ؏ ط قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا

সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক ; তাহারা বলিল —এতক্ষণে তুমি সঠিক বিবরণ প্রদান করিলে ; অতঃপর গরুটাকে তাহারা জবেহ্ করিল, অথচ করার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না।

তাফ্ছীর

৫০। টীকাঃ অনুবাদের ব্যতিক্রম

ان الذين آمنوا আয়াতের সাধারণতঃ সঙ্গত অর্থ হইতেছে—"নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে।" কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম করিয়া আমি অনুবাদ করিয়াছি—যাহারা মোমেনদিগের দলভুক্ত হইয়া আছে। যাহারা মোমেন সমাজ-ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের একদল ছিল সত্যকার মোমেন, আর একদল ছিল ছদ্মবেশী মোমেন, অর্থাৎ মোনাফেক। আয়াতের প্রথমে বলা হইয়াছে যে, মোমেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে "যাহারা ঈমান আনিবে।" মোমেনরা তো পূর্বেই ঈমান আনিয়াছে, সুতরাং নূতন করিয়া তাহাদের ঈমান আনার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই তথ্যটা বুঝাইবার জন্য আয়াতের মর্মাভাস অনুসারে অনুবাদে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে (কাবীর, বায়জাভী)।

صابئی ছাবেয়ী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ ঘটান হইয়াছে। হযরতের সময় কোরেশরা তাঁহাকে ও অন্যান্য মুছলমানকে ছাবেয়ী বলিত। ধর্মান্তর গ্রহণকারীকেই যে, তখন صباء বলা হইত, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ছাবাউন শব্দের অর্থ—বালকের মত কাজ করা, কোনো বিষয় হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। ব্যবহারে এক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করা (রাগেব)। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে যাহারা পৌত্তলিক ধর্ম বর্জন করিয়া, অন্য কোনও ধর্মে যোগদান করিয়াছিল, অথবা যাহারা স্বাধীনভাবে তাওহীদ ধর্মের সন্ধানে ছিল, তাহাদিগকে ছাবেয়ী বলা হইত।

এই আয়াতকে অবলম্বন করিয়া একদল লোক মুছলমান সমাজকে গোমরাহ করার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অছ্অছার সারমর্ম এই যে, এখানে মাত্র তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া

দেওয়া হইয়াছে যে, ইহুদী হউক, খ্রীষ্টান হউক অথবা অন্য যে কোন ধর্ম-সমাজের লোক হউক, এই বিষয় তিনটির অনুসরণ করিলে তাহারাও নাজাত লাভের অধিকারী হইবে। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করিলে ও পরকালে আস্থাবান হইলে এবং তাহার সঙ্গে কিছু কিছু সৎ কর্ম করিলেই আর কোনও ভয় ভাবনার কারণ থাকিবে না। কোনও রাছুলের কোনও কেতাবের বা বাঁধাধরা কোনও শরীয়তের অনুসরণ করার কোনও দরকারই নাই। তাঁহাদের মতে ইহাই হইতেছে কোর্‌আনের বর্ণিত মৌলিক সত্য।

ইহা নিছক প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, সূরা বাকারার ৬২ আয়াতকে অবলম্বন করিয়া এই অছ্‌অছার প্রচার করা হইয়াছে। অন্য কোনো সূরার কোনো আয়াতের বরাত না দিয়া, আমি এই সূরারই প্রথম সাতটি আয়াতের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, "যাহারা মোহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে (কোরআনে) বিশ্বাসবান, এবং মোহাম্মদের পূর্বে অন্য যেসব কিতাব নাজেল হইয়াছে তাহাতেও বিশ্বাসবান, এবং যাহারা আখেরাত্‌ বা পরকালের প্রতি প্রত্যয়শীল, তাহারাই হইতেছে আল্লাহ্‌র সত্যপথের অনুসারী এবং মানব জীবন সর্বতোভাবে সফল হইবে কেবল তাহাদেরই। ইহার পরেই ৬ ও ৭ আয়াতে বলা হইতেছে যে, যাহারা এই মূল সত্যকে অমান্য করে, তাহারা কোনও প্রকারেই ঈমান আনিতে পারিবে না এবং তাহাদের জন্য অবধারিত আছে গুরুতর আজাব।

বলা বাহুল্য, এই প্রসঙ্গে সূরার পরবর্তী আয়াতগুলির বিচার করিতে হইবে, উপরোক্ত আয়াতগুলির শিক্ষাকে সম্মুখে রাখিয়া এবং তাহারই নির্দেশ অনুসারে। তাহা হইলে এই অছ্‌অছার যাদুঘর আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া পড়িবে।

৫১। টীকা : তুরকে উত্থাপন

তাফ্‌ছীরের রাবীরা বলিতেছেন—আল্লাহ্‌ হযরত মূছাকে তাওরাত দিয়াছিলেন তূরে-ছীনা বা ছীনাই পর্বতে। কিন্তু ইহুদীরা তাঁহার হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নির্দেশ মান্য করিয়া চলিতে অস্বীকৃত হয়। তখন এই "শক্তগ্রীব" জাতিকে বশে আনার জন্য, আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র হুকুমে, জিব্‌রাইল ফেরেশতা—ঐ পাহাড়টাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ইহুদীদের মাথার উপর শূন্যে লটকাইয়া রাখিলেন, আর বলিলেন—ولاتاخذن امری اولا رمینکم আমার

হুকুম মান্য কর তো ভাল,' অন্যথায় পাহাড়টা তোমাদের উপর ফেলিয়া দিব।' এই পাহাড়টা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কত বড় ছিল, আর ইহুদীদের মাথার উপর কতটা ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, আমাদের এই রাবীরা, ঘটনার বহু সহস্র বৎসর পরে, তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন।

এই শ্রেণীর গল্প-গুজবের সহিত কোর্‌আন মাজীদের বর্ণনার বা তাহার তাফ্‌ছীরের কোনও সম্বন্ধ-সংশ্রব নাই। পরবর্তী যুগের রাবীরা ইহুদীদের পৌরাণিক পুঁথি-পুস্তক দেখিয়া অথবা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি শুনিয়া,প্রত্যেক স্থানের জন্য কতকগুলি প্রাসঙ্গিক কেচ্ছা-কাহিনী রচনা করিয়া দিয়াছেন এবং আমাদের তাফ্‌ছীর লেখকগণের অনেকেই বিনা বিচারে সে-গুলিকে নিজেদের তাফ্‌ছীরে স্থান দিয়াছেন।

আয়াতে رفع (উত্থাপন) ও فوق (উর্ধ্ব) দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রাফ্‌ওন শব্দের অর্থ—উত্থাপন করা, উত্তোলন করা, উচচ মর্যাদা দান করা, ইত্যাদি। আমি একখানা ঘর তুলিয়াছি, তুমি একটা পাঁচিল খাড়া করিয়াছ— বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, আমরা ঘর বা পাঁচিলকে তুলিয়া বা শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছি।

এই সূরার ১২৭ আয়াতে বলা হইয়াছে :

و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل -

"ইব্‌রাহীম ও ইছমাইল যখন কা'বা-গৃহের ভিতগুলি (গাঁথিয়া) তুলিতে-ছিল" এখানেও একই রাফ্‌উন-ধাতুগত يرفع শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কেহ কি বলিতে পারিবেন যে,ইব্‌রাহীম ও ইছমাইল খানা কা'বার ভিতগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিতেছিলেন? বেহেশ্‌তী লোকদিগের জন্য থাকিবে سرر مرفوعة ও فرش مرفوعة—ইহা কোর্‌আনেই বর্ণিত হইয়াছে। বেহেশ্‌তী লোকদিগের "তখতপোশ" ও বিছানাপত্রগুলি শূন্যে তুলিয়া রাখা হইবে—একথা কি কেহ বলিতে পারিবেন? আবু-বাকার ছিদ্দীক হিজরতের সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—প্রখর রৌদ্র হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা ছায়ার তালাশে বাহির হইলাম, فرفعت لنا صخرة রাবীদের বর্ণনা অনুসারে ইহার অর্থ হইবে, "তখন একটা চাটান (Rock) আমাদের জন্য শূন্যে তুলিয়া ধরা হইল। হাদীছের অভিধানে ইহার অর্থ করা হইয়াছে اى ظهرت لابصارنا অর্থাৎ "তোমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইল।" ফওক শব্দের অর্থ—উর্ধ্বদেশ বা উচচভূমি, উভয় হইতে পারে। সূরা

আহ্জাবে পরিখা-সমর সম্বন্ধে বলা হইতেছে اذ جاؤكم من فوقكم অর্থাৎ শত্রু বাহিনী যখন তোমাদের ফওক হইতে সমাগত হইয়াছিল। সকলে স্বীকার করিতেছেন যে, ফওক-অর্থে উর্ধ্বদেশ; উচ্চভূমি বা High land কে বুঝাইতেছে। রাবীদের উপকথাগুলি গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, শত্রু বাহিনী উড়িয়া আসিয়া শূন্য হইতে তাহাদের মাথার উপর আপতিত হইতেছিল।

অতএব "তূরকে তোমাদের উর্ধ্বদেশে উত্থাপন করিলাম"-পদের মর্ম ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, পাহাড়টাকে যখন তোমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশমান করিলাম। (আ'রাফ ১৭১ আয়াতের টীকা দেখুন)।

৫২। টীকাঃ বাঁদর হইয়া থাক

এক মোজাহেদ ব্যতীত তাফ্ছীরের অন্য সব রাবী বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র এই হুকুম অনুসারে আয়াতের বর্ণিত বানি-ইছ্রাইলরা সকলে দৈহিক-ভাবে বাঁদর হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের মতে বিশ্রাম-দিবসে এই মাছ্ ধরার ঘটনা হযরত দাউদের সময় ঘটিয়াছিল এবং এই বাঁদরগুলি তিন দিনের মধ্যেই মরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণিত এইসব বিবরণের কোনও প্রমাণ কোর্আনে নাই, হযরতের কোনও হাদীছেও নাই। এই গল্প-গুজবগুলির বর্ণনাকারীদের কেহই হযরত দাউদের সময় ঈলা-দরিয়ার উপকূলে উপস্থিতও ছিলেন না, এবং তাঁহাদের উপর জিব্রাইল ফেরেশ্তাও নাজেল হন নাই। সুতরাং ৭০ হাজার ইহুদীর বাঁদর হইয়া যাওয়ার এইসব কেচ্ছা-কাহিনীর মূলে কোনও যুক্তি-প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে এই ও অন্যান্য আয়াতের বর্ণনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুতঃ বিশ্রাম-দিবসের মর্যাদাহানি করার (ও অন্যান্য বহু পাপের) প্রতিফলে বানি-ইছ্রাইল দৈহিকভাবে বাঁদর হইয়া যায় নাই, বরং তাহাদের প্রকৃতি বাঁদরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল।

যাঁহারা বলেন যে, বানি-ইছ্রাইলরা সত্যসত্যই বাঁদর হইয়া গিয়াছিল তাঁহা-দের খেদমতে একটি প্রশ্ন পেশ করিতেছি। প্রশ্নটি এইঃ قردة স্ত্রী-বাচক শব্দ তাহার ছেফৎ বা বিশেষণ مذكر বা পুরুষ-বাচক খাছেয়ীন (خاسئين) শব্দ ব্যবহার করা হইল, যথানিয়মে খাছেআৎ خاسئات ব্যবহার করা হইল না, ইহার কারণ কি? কোন কোন তাফ্ছীরে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছেঃ

قيل فيه تقديم و تاخير ' معناه كونوا خاسئين قردة - فتح البيان -

"কথিত হইয়াছে যে,আয়াতের বর্ণনায় অগ্র-পশ্চাতের ব্যতিক্রম হইয়াছে। অর্থাৎ

খাছেয়ীন শব্দ আগে ও কেরাদাতুন শব্দ পরে বসা উচিত। অতএব আয়াতের অর্থ এই হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।" দুঃখের বিষয় ৭০ হাজার মানুষকে বাঁদর বানাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহারা এইরূপ অসঙ্গত কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে কোর্‌আনের বর্ণনা ধারার সঙ্গতি অস্বীকার করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবী ব্যাকরণের প্রতি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইতেছে। কারণ কোর্‌আনের বর্ণনা অনুসারে অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে "বাঁদর হইয়া থাক—" আদেশের পরেও ইহুদীরা দৈহিকভাবে মানুষই ছিল—বাঁদর হইয়া যায় নাই। এখানে আরও একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করার দরকার। আরবী ভাষার একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, ذوي العقول বা Rational being-দের জন্যই বহুবচনের লক্ষণ হিসাবে শব্দের শেষভাগে ين বা ون ব্যবহৃত হইতে পারে। এখানেও ى ن প্রয়োগ করিয়া বহুবচন প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং কোর্‌আনের এই ব্যবহার হইতেও জানা যাইতেছে যে, আদেশের পরেও ইহুদীরা আকারে মানুষই ছিল, বাঁদর হইয়া যায় নাই।

এই দাবীর অনুকূলে কোর্‌আন মাজীদ হইতে আরও একটা অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। হযরত রাছুলে কারীমের সমসাময়িক ইহুদী সমাজকে সম্বোধন করিয়া সূরা নেছার ৪৭ আয়াতে বলা হইয়াছে: তাহারা কোর্‌আনের প্রতি ঈমান না আনিলে তাহাদের মুখগুলিকে পিঠের দিকে ফিরাইয়া দিব "অথবা, نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت বিশ্রাম-দিবস সংক্রান্ত অনাচারীদিগকে যে প্রকারে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, তাহাদিগকেও সেই প্রকারে অভিশপ্ত করিব।

হযরতের সমসাময়িক ইহুদীরা যদি কোর্‌আনের প্রতি ঈমান না আনে তাহা হইলে তাহাদের জন্য দুইটির মধ্যে কোনও একটি দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী এই আয়াতে প্রকাশ করা হইতেছে: হয় তাহাদের বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে ও তাহাদের মুখ চলিয়া যাইবে তাহাদের পশ্চাৎ দিকে অথবা বিশ্রাম-দিবসের নিয়ম লঙ্ঘনকারীদিগকে যেরূপে লা'নৎ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে সেইরূপে লা'নৎ করা হইবে। হযরতের সমসাময়িক ইহুদীরা যে ঈমান আনে নাই এবং হযরতের পায়গামের সর্বপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হন নাই, এমন কি তাঁহাকে হত্যা করার উদ্যোগ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাহাদের মুখ ঘুরিয়া পিঠের দিকে যায় নাই, অথবা তাহারা দৈহিকভাবে বাঁদরে পরিণত হয় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত, বিশ্রাম-দিবসের নিয়ম লঙ্ঘন-

কারীরাও আকৃতিতে মানুষই ছিল।

ইমাম রাজী ন্যায় ও দর্শনের নানা প্রকার সূক্ষ্মাতিতমসূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া সাধারণ মতের সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বিচারের উপসংহারে তিনি বলিতেছেন:

و بما قررنا جواز المسخ امكن اجراء الاية على ظاهرها و لم يكن بنا حاجة الى التاويل الذى ذكره مجاهد رحمه الله ' و ان كان ما ذكره غير مستبعد جدا - لان الانسان اذا اصر على جهالته بعد ظهور الايات و جلاء البينات ' فقد يقال فى العرف الظاهر انه حمار و قرد - و اذا كان هذ المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة ' لم يكن فى المصير اليه محذور البتة -

"যেমতে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, এই প্রকার রূপান্তর ঘটা সম্ভব, সুতরাং আয়াতের শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া মোজাহেদের ন্যায় রূপক বা ভাবার্থ গ্রহণ করার কোনও দরকারই আমাদের থাকিতেছে না—যদিও মোজাহেদের ব্যাখ্যা খুব অসংলগ্ন নহে। কারণ, যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনগুলি প্রকাশ পাওয়ার পরও মানুষ যখন নিজের অজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া থাকার হঠ করিয়া বসে, তখন সাধারণ Idiom বা পরিভাষা অনুসারে তাহাকে গর্দভ বা বাঁদর বলা হয়। এবং এই রূপক পরিভাষাটা যখন সুস্পষ্ট ও সুবিদিত, তখন এই অর্থ গ্রহণ করাতে কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না—নিশ্চয়ই। (কাবীর, ১—৫৫৫)।

আয়াতের শিক্ষা:

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে পয়দা করিয়াছেন সুন্দরতম আকার ও শ্রেষ্ঠতম উপকরণ দিয়া। কিন্তু মানুষ সেইসব অবদান উপকরণের সদ্ব্যবহার না করিয়া অথবা তাহার অপব্যবহার করিয়া, তাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে, উপনীত হইয়া যায় অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে (তীন ৪,৫)। এই শ্রেণীর অধঃপতিত মানুষ সম্বন্ধে সূরা আ'রাফে বলা হইতেছে: "তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তাহা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করে না, তাহাদের চক্ষু আছে কিন্তু তাহা দ্বারা দর্শন করিতে চায় না এবং তাহাদের কান আছে কিন্তু তাহারা শ্রবণ করার চেষ্টা পায় না; ইহারা হইতেছে চতুষ্পদ পশুর ন্যায়, বরং অধিকতর অজ্ঞ" (১৭৯)।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদিগের এই প্রকার মানসিক ও আধ্যাত্মিক de-

generation বা বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। আরবরা কামাতুরতার চরম উদাহরণ হিসাবে বাঁদরের উল্লেখ করিয়া থাকে। এইদিক দিয়া ইহুদী জাতির কতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তাহাদের ধর্মশাস্ত্র হইতে তাহার একটা বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যিহিস্কেল ২২ অধ্যায়ে ইহুদী জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছেঃ "...তুমি আমার পবিত্র বস্তু সকল অবজ্ঞা করিয়াছ ও আমার বিশ্রাম দিনগুলি নাপাক করিয়াছ... তোমার মধ্যে লোকে মাতার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, * তোমার মধ্যে লোকে ঋতুবতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে....প্রতিবেশী স্ত্রীর সহিত ঘৃণিত কার্য করিয়াছে, কেহ আপন পুত্র-বধূকে কুকর্মে অশুচি করিয়াছে....আপনার ভগিনীকে বলাৎকার করিয়াছে। ...আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ও নানা দেশে বিকীর্ণ করিয়া দিব...।" ইহা অপেক্ষা পশুত্বের জঘন্যতর উদাহরণ আর কি হইতে পারে।

৫৩। টীকাঃ আদর্শ-দণ্ড ও মহা-উপদেশ

অর্থাৎ, ইহুদীদিগের ন্যায় নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটিবে যেসব জাতির, আল্লাহ্‌র এই ন্যায়-দণ্ড তাহাদের জন্যও সর্বদা বলবৎ থাকিবে। ইহার কোনও ব্যতিক্রম কাহারও সম্বন্ধে সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং পরহেজগার লোকসমাজগুলির ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। মোছলেম জগৎ কি উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে? করে নাই, এবং তাহার প্রতিফলের সূচনা হইয়াছে ফিলিস্তিন হইতে, সেই লাঞ্ছিত বিতাড়িত ইহুদীদের হাতে। ইহা অপেক্ষা মর্মবিদারক দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে।

৫৪। টীকাঃ গো-কোরবানীর আদেশ

এই আয়াতে ইহুদীদের সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। সেই জন্য প্রত্যেক নূতন ঘটনার বর্ণনার ন্যায়, এখানেও আয়াতের প্রথমে وإذ বা (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), পদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

আয়াত হইতে এইটুকুমাত্র জানা যাইতেছে যে, কোনও এক সময় হযরত মূছা বানি-ইছ্‌রাইলকে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে একটা গরু কোরবানী করিতে বলেন। কিন্তু বানি-ইছ্‌রাইল নানা প্রকার টালবাহানা করিয়া গো-কোরবানীর দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে বাধ্য হইয়া ঐ আদেশ পালন করে। এই সূরার ৫৩, ৫৪ আয়াতে বানি-ইছ্‌রাইলের গো-বৎস পূজার বিবরণ

* দেখুন, হেন্‌রী ও স্কট কৃত বাইবেলের টীকা।

দেওয়া হইয়াছে। ৯৩ আয়াতে বলা হইতেছে যে, গো-পূজার সংস্কার ইহুদী-দিগের অন্তরে ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

এই বদ্ধমূল কুসংস্কারের প্রতিকারের জন্যই বানি-ইছরাইলকে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন উপলক্ষে গরু কোরবানী করার আদেশ দেওয়া হয়। বাইবেলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ইহুদীদের নৈতিক জীবনের এমন অধঃপতন ঘটিয়াছিল যে, তাহারা নর-হত্যা অপেক্ষা গো-হত্যাকে অধিকতর অন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাই গুপ্ত হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে ইহুদীদের বাইবেলে গো-কোরবানীর ব্যবস্থা দেওয়া হয় (দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ অধ্যায়)। গণনা পুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে এইরূপ গো-কোরবানীর একটা সাধারণ আদেশ দেওয়া হইয়াছে: "ইস্রায়েল সন্তান-গণকে বল, তাহারা নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, যোয়াল বহন করে নাই, এমন একটা রক্তবর্ণ গাভী কোরবানী করিতে এবং তাহার রক্ত, মাংস ও অস্থিচর্ম সমস্তই জনগণের দৃষ্টিগোচরে পুড়াইয়া ফেলিতে"। হযরত মূছার এন্তেকালের দীর্ঘকাল পরে, ইহুদীদের মধ্যে "যোশয়" নামক একজন ভাববাদীর আবির্ভাব হয়। "যোশয় ভাববাদীর পুস্তক" নামক একখানি কিতাব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। ঐ পুস্তক হইতে জানা যাইতেছে যে, এই ভাববাদীর সময় পর্যন্ত, গো-বৎস পূজা ও তাহার জন্য দস্তুরমত প্রতিমার প্রতিষ্ঠা সমানভাবে প্রচলিত ছিল (৮—৫, ১০—৫)। *

এই রুকুর শেষভাগের আয়াতগুলিতে যে গো-কোরবানীর কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর একটা সাধারণ ঘটনা হইতে পারে।

---

৯ রুকু

৭২। আরও (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), যখন তোমরা একজন (মহৎ) ব্যক্তিকে (নিজেদের ধারণা মতে) কতল করিয়া ফেলিয়াছিলে এবং সে সম্বন্ধে বিসংবাদ ঘটাইয়াছিলে ও অন্যের উপর দোষারোপ করিতেছিলে ;

٧٢ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ
فِيْهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

---

* ইহুদী পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলির স্বীকার উক্তি হইতে সূরা বাকারার ৯৩ আয়াতের পূর্ণ সমর্থন হইয়া যাইতেছে, শুধু এই হিসাবে এই বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

تَكْتُمُوْنَ ۝

অথচ তোমরা যাহা গোপন করিয়া আসিতেছিলে, আল্লাহ্ ইচ্ছুক ছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে। (৫৫)

٧٣ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى لا وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

৭৩। অতঃপর আমরা বলিলাম—এই ব্যাপারকে ঐ ব্যক্তির জীবন-ইতিবৃত্তের যে কোনো একটা অংশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ; এইরূপে মৃতদিগকে আল্লাহ্ জীবন্ত করিয়া তোলেন এবং নিজের নিদর্শনগুলি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা বুঝিয়া দেখ। (৫৬)

٧٤ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ط وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ ج مِنْهُ الْمَآءُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

৭৪। ইহার পরও তোমাদের অন্তর-গুলি কঠিন হইয়া থাকিল, ফলতঃ তাহা হইতেছে প্রস্তরের ন্যায়, অথবা প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন; বস্তুতঃ কোনো কোনো প্রস্তরপুঞ্জ এরূপ আছে, যাহা হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে; আর কতকগুলি এরূপ আছে, যাহা বিদীর্ণ হইয়া যায় ও তাহা হইতে পানি বাহির হইয়া আসে; আর কতকগুলি এরূপও আছে—যাহা খসিয়া পড়ে আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে; বস্তুতঃ তোমাদের কৃত-কর্মগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদৌ গাফেল নহেন। (৫৭)

৭৫। (হে মোছ্‌লেম সমাজ!) তবুও কি তোমরা আশা করিতে পার যে, এই ইহুদীরা তোমাদিগের (ধর্মের) প্রতি ঈমান আনিবে—অথচ তাহাদের সমাজের একদল লোক এরূপ ছিল, যাহারা আল্লাহ্‌র কালামকে শ্রবণ করিত, তাহার পর তাহাকে অদল-বদল করিয়া ফেলিত—তাহাকে বোধগম্য করার পরও জানিয়া-শুনিয়া।(৫৮)

৭৫ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

৭৬। অবস্থা এই যে, মোমেনদিগের সহিত সাক্ষাৎকালে ইহারা বলে: আমরা তো ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু যখন তাহারা নিভৃতে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তখন (তাহাদের একদল অন্য দলকে) বলে: আল্লাহ্ যেসব তথ্য তোমাদের প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা কি সে সম্বন্ধে মুছলমানদিগকে বলিয়া দিয়া থাক?—যেহেতু তাহারা তোমাদের প্রভুর সন্নিধানে তোমাদিগকে প্রমাণ-বলে পরাস্ত করিতে পারিবে। তোমাদের কি জ্ঞানবোধ কিছুই নাই?

৭৬ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ط وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৭৭। তবে কি তাহারা অবগত নহে যে, তাহারা যাহা গোপন রাখিতে চায় ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে, সে সমস্তই আল্লাহ্ সুবিদিত থাকেন? (৫৯)

৭৭ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

৭৮। অবস্থা এই যে, তাহাদের মধ্যে আছে এমন সব নিরক্ষর লোক —নিজেদের খেয়াল ও সংস্কার ব্যতীত কিতাবের কিছুই যাহারা অবগত নহে, বস্তুতঃ শুধু কল্পনা-জল্পনাই করিয়া থাকে তাহারা। (৩০)

78 وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ o

৭৯। অতএব সর্বনাশ সেই সব লোকের জন্য, যাহারা নিজেরাই নিজ হাতে কেতাবকে লিখিয়া নেয়, তাহার পর (জাহেলদিগকে) বলিয়া থাকে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে (সমাগত), ইহার বিনিময়ে যৎসামান্য লাভ পাওয়ার উদ্দেশ্যে; অতএব ধিক্ তাহাদিগকে এই লেখার জন্য, আর ধিক্ তাহাদের এই কামাই-রোজগারকে।

79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ o

৮০। তাহারা আরও বলিয়াছে, (জাহান্নামের) আগুন আমাদিগকে কদাচ স্পর্শ করিবে না— গণিত কতিপয় দিবস ব্যতীত; (হে রাছুল,) তুমি জিজ্ঞাসা কর: "তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোনও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছ—যেমতে তিনি নিজ অঙ্গীকারের বরখেলাফ করিতে পারিবেন না; বরং

৮০ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ط قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ

تقولون على الله ما لا تعلمون ০

প্রকৃত কথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এমন কথা বলিতেছ, যে সম্বন্ধে কোনই জ্ঞানবোধ নাই তোমাদের। (৬১)

٨١ بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحب النار هم فيها خلدون ০

৮১। হাঁ, যাহারা ইচ্ছাপূর্বক পাপ-কার্য সম্পন্ন করে এবং যাহা-দের পাপগুলি তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলে, তাহারাই তো হইতেছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে চিরস্থায়ী হইবে তাহারা।

٨٢ و الذين امنوا وعملوا الصلحت اولئك اصحب الجنة هم فيها خلدون ع

৮২। কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্মগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহারাই হইতেছে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী। (৬২)

তাফ্‌ছীর

৫৫। টীকাঃ মহৎ ব্যক্তিকে হত্যা করা

এই আয়াতের প্রথমে اذ و শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ—"আরও স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন"—ইত্যাদি। একটা ঘটনার বিবরণ শেষ হওয়ার পর, অন্য একটা নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করার সময়, এই শব্দের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই সূরার প্রথম হইতে এ পর্যন্ত মোট ১২টি স্থানে এই শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। এই আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত কোর্‌আন মাজীদের অন্যান্য বহু স্থানেও এই ব্যবহারের নজীর পাওয়া যাইবে।

এই রুকুর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এবং ইহার পরবর্তী রুকুতে ধারাবাহিক-ভাবে হযরতের সমসাময়িক ইহুদীদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাহাদের

কতকগুলি গুরুতর দোষক্রটির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। তাফ্‌ছীরকারগণও ইহা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু, কোনো রাবীর বর্ণিত একটা যুক্তি-প্রমাণহীন আজগুবী গল্পকে বজায় রাখার জন্য, তাঁহারা ৭২ ও ৭৩ আয়াতকে হযরত মূছার সমসাময়িক ইহুদীদের বিবরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিচার আলোচনার সুবিধার জন্য, গল্পটার একটা সংক্ষিপ্ত আভাস নিম্নে প্রদান করিতেছি।

"বানি-ইছ্‌রাইল কওমের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিল। তাহার কোনও সন্তান-সন্ততি না থাকায় একমাত্র ভাতিজাই ছিল তাহার ভাবী ওয়ারিস। ভাতিজা চাচার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু চাচা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া রহিল। মতান্তরে, চাচার একটি কন্যা ছিল। ভাতিজা তাহাকে বিবাহ করার প্রত্যাশী, কিন্তু চাচা তাহাতে অসম্মত। এই অবস্থায় ভাতিজা ছল-চাতুরী করিয়া চাচাকে অন্যত্র লইয়া গেল এবং তাহাকে খুন করিয়া ফেলিল। খুন করার পর সে চাচার লাশটাকে নিয়া অন্য এক নগরের বা পল্লীর প্রাচীরদ্বারে রাখিয়া আসিল। সকালে উঠিয়া সে চাচার খোঁজে বাহির হইল এবং উক্ত প্রাচীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার আর্তনাদ শুনিয়া নগরবাসীরা নগরদ্বার মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। ভাতিজা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তোমরা আমার চাচাকে খুন করিয়া পল্লী প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার শোণিত-পণ তোমাদিগকে দিতে হইবে। কিন্তু নগর-বাসীরা আল্লাহ্‌র নামে কছম করিয়া বলিতে লাগিল—আমরা খুন করি নাই, খুন করার কোন কারণও আমাদের ছিল না। আমরা এ-সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি। সন্ধ্যার পর হইতে আমাদেয় নগরদ্বার এক মুহূর্তের জন্যও মুক্ত করা হয় নাই। অবশেষে এই মোকদ্দমার বিচার-ভার পড়িল হযরত মূছার উপর। সেমতে তিনি তাহাদিগকে একটি গরু জবেহ্ করিতে এবং তাহার কোনও অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করিতে নির্দেশ প্রদান করিলেন। ৮ রুকুতে এই গরুর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে।"

ইহার পর উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। এহেন বিশেষ লক্ষণযুক্ত গরুটা সংগ্রহ করা সম্ভব হইল কি করিয়া, সে সম্বন্ধে আমাদের রেওয়ায়ত-শিল্পী রাবীরা বলিতেছেন—"বানি ইছ্‌রাইল কওমের মধ্যে একজন লোক ছিলেন খুব সাধু প্রকৃতির। তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী। আল্লাহ্‌র মর্জি, সাধু ব্যক্তিটি একটি মাত্র বালক পুত্র ও স্ত্রীকে রাখিয়া মরিয়া যান। বিধবা অতি কষ্টে বালক পুত্রের লালন-পালন করিতে লাগিলেন, এবং

ক্রমে ক্রমে সে জোয়ান হইয়া উঠিল। পাহাড় ও জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া সে বাজারে বিক্রয় করিত এবং তাহা দ্বারা সে বিধবা জননীর ভরণ-পোষণ করিত। বাপ-মা'র মত বেটাও ছিল নেক-বখ্ত। মায়ের খেদ্মত ও আল্লাহ্র এবাদত করা ছাড়া তার আর কোনও ধ্যান-জ্ঞান ছিল না।"

"একদিন মা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন: বাবা! তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে একটি গো-বৎসকে আল্লাহ্র ছোপর্দ্দ করিয়া জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তুমি জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া, ইবরাহীম, ইছহাক ও ইয়াকুবের খোদার নামে তাহাকে ডাক দিবে, এবং সে উপস্থিত হইলে তাহাকে আমার কাছে নিয়া আসিবে। মাতার আদেশ মত যুবক জঙ্গলে গিয়া ডাক দিলে, গরুটা তার কাছে উপস্থিত হইল। যুবক মায়ের হুকুম অনুসারে গরুটাকে নিয়া আসিতে চাহিলে, গরুটা বলিয়া উঠিল—হে মাতৃসেবক সাধু যুবক! তুমি ক্লান্ত, আমার পিঠে চড়িয়া বস, আমি তোমাকে বহিয়া নিয়া যাইব। কিন্তু যুবকটি উত্তর করিল:—হে সৎ পশু! তোমার পিঠে চড়িবার হুকুম মা আমাকে দেন নাই। সুতরাং আমি তাহা পারিব না। গরুটা তখন বলিল—হে মাতৃভক্ত সাধু যুবক, তুমি ঠিক কাজই করিয়াছ। আমার পিঠে চড়িলে, আমি তোমার বশ্যতা স্বীকার করিতাম না।"

ইহার পর ছলনা করার জন্য আল্লাহ্র দুশ্মন ইবলীছের কৃষকরূপে আবির্ভাব, গরুটা হরণ করিয়া পক্ষীরূপে তাহার অন্তর্ধান, অন্তরীক্ষে ইবলীছের সহিত ফেরেশতার যুদ্ধ এবং অবশেষে ফেরেশতার জয় ও গরু উদ্ধার, ইত্যাদি। অবশেষে যুবক গরুটা নিয়া মায়ের কাছে উপস্থিত হইল এবং মা তাহাকে গরু বিক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। গো-হাটার মধ্যেও ইবলীছ ও ফেরেশতার সংঘর্ষ। গরুর মূল্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, কারণ নির্দিষ্ট লক্ষণের গরু দুনিয়ায় ঐ একটি মাত্রই ছিল। অবশেষে ৪০ বৎসর পরে গরুর এক চামড়াভর সোনার বিনিময়ে, বানি-ইছরাইলরা এই গরুটা খরিদ করিল, এবং আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাহাকে জবেহ করিল। তাহার কোনও এক অঙ্গ (রাবীরা বহু মতে বিভক্ত) দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করিল, সে বাঁচিয়া উঠিয়া বলিয়া দিল—"আমার ভাতিজাই আমাকে খুন করিয়াছে" আর সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গেল।

তাফ্ছীরের কেতাবগুলিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত গল্পটির সংক্ষিপ্ত আভাস উপরে উদ্ধার করিয়া দিলাম। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে, ইহা একটা ভিত্তিহীন উপকথা মাত্র। দুঃখের বিষয়, এই ভিত্তিহীন উপকথাটিকে রক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্যে, আমাদের তাফ্ছীর লেখকগণের অনেকেই দুইটা স্বতন্ত্র ঘটনাকে এক ঘটনায় পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গল্পটি

যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহার প্রমাণ কোর্আনের আয়াতে ও রাবীদের বর্ণনার মধ্যেই বিদ্যমান আছে ঃ

(১) আল্লাহ্র কোর্আনে, রাছুলের কোনও হাদীছে অথবা বিশ্বাসযোগ্য কোনও ইতিহাসে এই উপাখ্যানের সামান্য একটু আভাস-ইঙ্গিতও বিদ্যমান নাই। রাবীদের কেহই এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীও নহেন।

(২) রাবীদিগের বর্ণনা মতে, বানি-ইছরাইল সমাজের একজন লোক নিহত হইয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত অপরাধী কে, তাহা নির্ণয় করার জন্য গরু জবেহ করার আদেশ দেওয়া হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, হত্যাকাণ্ড আগে ঘটিয়াছিল এবং গরু জবেহ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরে। কিন্তু কোর্আন মাজীদে গরু জবেহ করার আদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে আগে এবং হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা হইতেছে তাহার পরে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ৯ রুকুর বর্ণিত ব্যাপার ও ১০ রুকুর ৭২,৭৩ আয়াতের বিবরণ, দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনা। সুতরাং রাবীদের বর্ণনা কোর্আন মাজীদের তরতীবের সম্পূর্ণ বিপরীত, অতএব অগ্রহণীয়।

(৩) নরহত্যা কোনও নূতন বা অসাধারণ ব্যাপার নহে। ইহুদীরা তো আল্লাহ্র নবীদিগকে হত্যা করিতেও কখনো কুণ্ঠিত হইত না। ইহা ব্যতীত ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্রে এই শ্রেণীর গুপ্ত-হত্যার জন্য একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে। তাহাতে কেবল একটা গো-বধের ব্যবস্থা আছে। নিকটবর্তী পল্লীর প্রধানরা যাজকদের সম্মুখে সেই নিহত গো-বৎসের উপর হাত ধুইয়া দিবে, আর আল্লাহ্কে সাক্ষী করিয়া বলিবে—আমরা এ হত্যা করি নাই, সে সম্বন্ধে কোনো কিছুই আমরা অবগত নহি। (দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ অধ্যায়, ১—৯ পদ)। ৮ রুকুর বর্ণনার সহিত ইহার অনেকটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কিন্তু গরু জবেহ করিয়া তাহার মাংস দিয়া মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করা ইত্যাদির সামান্য আভাস ইঙ্গিতও তাহাতে বর্তমান নাই। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, দুই রুকুর দুইটি স্বতন্ত্র ঘটনাকে একত্রে মিশাইয়া দিয়া, রাবীরা ইহুদীদের ধর্মীয় ব্যবস্থারও বিপরীত কথা বলিয়াছেন।

(৪) ৯ রুকুর আয়াতগুলি এক সঙ্গে পড়িয়া ফেলিলে দেখা যাইবে যে, এই রুকুর সমস্ত আয়াতে ধারাবাহিকভাবে হযরতের সমসাময়িক ইহুদীদের অনাচার-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই বর্ণনাধারা দ্বারা আমরা সঙ্গতভাবে অনুমান করিতে পারি যে, ৭২ ও ৭৩ আয়াতেও হযরতের সময়কার কোনো ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(৫) কতলের ঘটনা উল্লেখ করার পরই ৭৩ আয়াতে বলা হইতেছে فقلنا اضربوه ببعضها তখন বলিলাম, "তাহাকে উহার কোনও অংশ দ্বারা আঘাত কর।" এখানে দ্রষ্টব্য হইতেছে فقلنا اضربوه ক্রিয়াপদের পূর্বে ফে-বর্ণের ব্যবহার। ইহাকে فاء تعقيب বলা হয়। উহার অর্থ—সঙ্গে সঙ্গে, বিনা ব্যবধানে, অব্যবহিত পরে। রাবীদিগের বর্ণনা মতে নরহত্যার ৪০ বৎসর পরের ঘটনাকে অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা কোনো মতেই বলা যাইতে পারে না। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, রাবীদের বর্ণনা ভিত্তিহীন। অধিকন্তু ৭২, ৭৩ আয়াতে অন্য একটা স্বতন্ত্র ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(৬) নরহত্যা ও গুপ্তহত্যা সব দেশে ও সকল সমাজে সচরাচরই ঘটিতে দেখা যায়। ইহুদীদের তো কথাই নাই। এই শ্রেণীর একটা সাধারণ ঘটনা সম্বন্ধে কোর্‌আন মাজীদের কুত্রাপি আলোচনা করা হয় নাই। ইহাতেও জানা যাইতেছে যে, আয়াত দুইটিতে হযরত রাছুলে কারীমের সমসাময়িক কোনও গুরুতর ঘটনার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

(৭) হাফেজ এব্‌ন-কাছীর উপরোক্ত গল্প-গুজবগুলির উল্লেখ করার পর বলিতেছেন—والظاهر انها ماخوذة من كتب بنى اسرائيل — "ইহা যে ইহুদীদের পুঁথি-পুস্তকগুলি হইতে সঙ্কলিত, তাহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে।" কিন্তু "মোশীর পঞ্চপুস্তক" বলিয়া যেসব শাস্ত্রীয় পুস্তক ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার কোথায়ও রাবীদিগের বর্ণিত এই উপকথার অস্তিত্ব আমি দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, গল্পটা যে বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছে, ভক্তিভাজন হাফেজ এব্‌ন-কাছীরের উক্তি হইতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

(৮) কোর্‌আন হইতে মাত্র এইটুকু প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে "গরুর কোনও অংশ দ্বারা আঘাত করিতে" নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু রাবীরা ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেছেন : "সেমতে তাহারা আঘাত করিল। ফলে নিহত ব্যক্তি জীবন্ত হইয়া উঠিল এবং বলিয়াছিল যে, আমার ভাতিজা আমাকে খুন করিয়াছে। পরক্ষণে সে আবার মরিয়া গেল।" এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অংশটা আয়াতের তাৎপর্যে যোগ দেওয়ার অধিকার তাঁহারা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন ?

(৯) লোকটা তো প্রথম রাত্রেই মরিয়া গিয়াছিল, তাহার পর দীর্ঘ ৪০ বৎসর পরে মাংসাঘাতের পর্ব আরম্ভ হইল। এই ৪০ বৎসর ধরিয়া নিহত ব্যক্তির লাশটা কি মাটির উপরে পড়িয়া ছিল, না তাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল ? সেই

দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত মূছা কি বাঁচিয়া ছিলেন? হাশরের পূর্বে কোনও মৃত ব্যক্তির জীবন্ত হইয়া দুনিয়ায় ফিরিয়া আসার কোনও দলিল বা নজীর কি কোর্আনে বা হাদীছে মওজুদ আছে?

(১০) আরবী ভাষায় নাফছ্ স্ত্রীবাচক শব্দ। ৭২ আয়াতে উহার সর্বনাম ও সেই হিসাবে স্ত্রী বাচক ها ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু ৭৩ আয়াতে পুরুষ বাচক ه সর্বনাম ব্যবহার করা হইতেছে, এই ব্যতিক্রমের কি কোনও কারণ বা সার্থকতা নাই? নিশ্চয় আছে, পরে তাহা আরজ করিতেছি।

আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য:

বদর যুদ্ধের পর হইতে হযরতের শেষ জীবন পর্যন্ত মদীনার ইহুদীরা তাঁহাকে হত্যা করার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ খায়বার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণের পর, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মোহাম্মদকে গুপ্তভাবে খুন করিয়া ফেলিতে না পারিলে তাহাদের রক্ষা নাই। আমি নিজের সামান্য শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে; যথাসাধ্য বিচার আলোচনা করার পর, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আলোচ্য আয়াত দুইটিতে সাধারণভাবে এই সকল হত্যা চেষ্টার এবং বিশেষভাবে খায়বারের বিষদানের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই সব অপচেষ্টার বিবরণ পাঠকগণ হযরতের জীবন-চরিতে দেখিতে পাইবেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে কেবল বিষদানের ঘটনাটার উল্লেখ করিতেছি।

খায়বার অভিযান সুসম্পন্ন হওয়ার পর, বিশ্রামলাভের জন্য হযরত কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। রাছুলে কারীম, পরাজিত ইহুদীদের প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিলেও এই পরাজয়ের ফলে তাঁহাদের মর্মজ্বালা ও হিংসা-বিদ্বেষ শতগুণে বাড়িয়া চলিয়াছিল। তাই তাহারা প্রকাশ্যভাবে হযরতের সদ্ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং গোপনে তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। এই সময় তাহারা একটা ছাগলের মোছাল্লাম প্রস্তুত করিল এবং তাহাতে মারাত্মক হলাহল মিশাইয়া দিল। জয়নাব নাম্নী একজন ইহুদী স্ত্রীলোক তাহা নিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহা কবুল করার জন্য তাঁহাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করে। এই গোশ্‌তের এক টুকরা খাইয়াই হযরত প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারেন এবং চীৎকার করিয়া ছাহাবীদিগকে সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু 'বেশর' নামক জনৈক ছাহাবী তাহার পূর্বেই কিছুটা মাংস খাইয়া ফেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়

এবং তিন দিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বোখারী, মোছ্লেম প্রভৃতি হাদীছের কেতাবগুলিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

ইছ্লামের ইতিহাসে ইহা একটি গুরুতর ঘটনা। এই ঘটনার তদন্তের সময় ইহুদী প্রধানরা প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিল: "আমরা আপনাকে বিষ দিয়াছিলাম, পরীক্ষা হিসাবে। যদি আপনি ঝুটা নবী হন, তাহা হইলে এই বিষের সামান্য অংশ আপনার জিহ্বাকে স্পর্শ করিলেও আপনার মৃত্যু নিশ্চিত; আর সত্য নবী হইলে বিষে আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না—ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। কিন্তু জয়নাবকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সে স্পষ্টভাবে বলিয়া দিল যে, "আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই আমরা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম"। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে হযরতের সমসাময়িক ইহুদীদিগের এই ষড়যন্ত্র ও তাহাদের নিজস্ব কার্যের এবং এই ঐতিহাসিক মো'জেজার কথাই ইহুদীদিগের স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

আয়াতে যথাক্রমে قتلتم ' فادارئتم ও اضربوه ببعضها শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কতল শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ হইতেছে জীবন নাশ করা বা জানিয়া-শুনিয়া হত্যা করার উদ্দেশ্যে জীবননাশক উপকরণের প্রয়োগ করা। তাহাতে বস্তুতঃ কাহারও জীবননাশ না হইয়া থাকিলে, অথবা যাহাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল, সে ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি ব্যবহৃত উপকরণের দ্বারা নিহত হইয়া থাকিলেও, এই কার্য হত্যা বা কতল বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং আমাদের দণ্ডবিধি আইনের ২৯৯ ধারা অনুসারেও ইহুদীদের এই কর্ম Culpable homicide পর্যায়ভুক্ত। এই হিসাবে আয়াতে বলা হইতেছে—যখন তোমরা এক (বিশিষ্ট) ব্যক্তিকে কতল করিয়াছিলে।

ইদ্দারা'তুম ক্রিয়ার ধাতু হইতেছে درء দার্উন। উহার অর্থ—নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা, নিজের দোষ অন্যের উপর চাপাইয়া দেওয়া, বিসংবাদ করা, মতভেদ ঘটান। ইহুদীরা বলিয়াছিল—সত্য-মিথ্যা বিচারের শেষ অবলম্বন হিসাবে সৎ উদ্দেশ্যে আমরা বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সত্যনবী হইলে ইহাতে তোমার কোনও ক্ষতি হইবে না, ইহা আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সরগানা আসামী জয়নাবের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, ইছ্লামের প্রতি জঘন্য বিদ্বেষবশতঃ এবং মোস্তফার মহামিশনকে বিধ্বস্ত করার একমাত্র

প্রাসঙ্গিকতার হিসাবে এখানে শেষ অর্থই গ্রহণীয়। কোর্‌আন মাজীদেও এই ব্যবহারের নজীর আছে। যেমন, كذالك يضرب الله الحق و الباطل —
"এইরূপে আল্লাহ্ সত্য ও মিথ্যার তুলনায় সমালোচনা করেন" (রা'দ, ১৭) আল্লাহ্ হক ও বাতেলকে প্রহার বা আঘাত করেন, এইরূপ অর্থ কেহই গ্রহণ করেন নাই। সূরা জোখরফের ৫৮ আয়াতেও এইরূপ ব্যবহারের নজীর আছে।

সমসাময়িক ইহুদীরা বদর যুদ্ধের পর হইতে হযরতকে হত্যা করার জন্য সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিয়াছিল, খায়বার বিজয়ের পর বিষাক্ত মাংস খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণবধ করার আয়োজন করিয়াছিল, এবং একজন ছাহাবী সেই মাংসের একটুকরা মাত্র খাইয়া তৃতীয় দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন—এ-সমস্তই সর্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সত্য। আমার মতে, আয়াতে এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা সকলের জানা ও টাটকা ঘটনা বলিয়া ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নাই।

একদিকে নীচতা ও কাপুরুষতার এই ক্রমাগত হীন প্রচেষ্টা, জয়নাবের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, বিজয়ী মোছলেম বীরগণ হযরতের একটিমাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষায় উলঙ্গ তরবারি হস্তে প্রস্তুত। কিন্তু এ অবস্থাতেও প্রাণের বৈরীরা সকলে ক্ষমালাভ করিল, পুনরায় স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যে অনুপম স্বর্গীয় আদর্শ, মোহাম্মদ মোস্তাফার নবী-চরিত্রের এই যে মহানুভবতা—আর তাঁহার এই সদাজীবন্ত অতুলনীয় মো'জেজা, এই দুইটার মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিতে ইহুদীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

৭৪ আয়াতের উপসংহারে বলা হইতেছে— و ما الله بغافل عما تعملون
"এবং তোমরা যাহা করিতেছ (বা করিবে), আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে গাফেল নহেন।" تعملون মোজারের ছিগা। বর্তমান বা ভবিষ্যৎকাল ব্যতীত মাজী বা অতীত কালের জন্য এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ কোনও প্রকারেই হইতে পারে না। সুতরাং তিন হাজার বৎসর পূর্বেকার কোনও ঘটনা সম্বন্ধে এই ক্রিয়াপদের ব্যবহারও সঙ্গত হইতে পারে না। (পরবর্তী টীকা দেখুন)।

"এইরূপে আল্লাহ্ মৃতদিগকে জীবনদান করেন"—এই আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, "আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে মৃতদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন—আয়াতে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।" يحي শব্দের অর্থের হিসাবে এ তাৎপর্য সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ আয়াতটাকে একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে, এই অর্থের সমীচীনতা স্বীকার করিয়া

হইতেছে—"এইরূপে আল্লাহ্ মৃতদিগকে জীবনদান করেন এবং তোমাদিগকে নিজের নিদর্শনগুলি প্রদর্শন করেন—যেন তোমরা বুঝিয়া দেখ।" হাশরে অবস্থিত লোকদিগের সম্বন্ধে শেষোক্ত কথা দুইটি আদৌ প্রযোজ্য হইতে পারে না। এখানে বস্তুতঃ হযরতের দেহে মারাত্মক হলাহলের ক্রিয়া ব্যর্থ হওয়াকেই আল্লাহ্র নিদর্শন বা নবীর মো'জেজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমতে ইহুদীরা বুঝিয়া দেখে যে, আল্লাহ্র নূরকে মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। বস্তুতঃ জয়নাব যখন স্বীকার করে যে, হযরতকে হত্যা করিয়া সে তাঁহার বাহিত পয়গামকে নস্যাৎ করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, তখন হযরত প্রকাশ্যভাবে তাহাকে বলিয়াছিলেন,—"জয়নাব। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে, তাহা কখনও হইবার নহে। আল্লাহ্ কখনই তোমার উদ্দেশ্যকে সফল হইতে দিবেন না।" ইহাই নিদর্শন, আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন্ত মো'জেজা। কিয়ামতের ময়দানে এই মো'জেজা উপস্থিত করার এবং ইহুদীদিগকে তাহা বুঝিয়া দেখিতে আহ্বান করার সার্থকতা কি থাকিতে পারে?

উপরোক্ত সাধারণ তাৎপর্য গ্রহণ করিলে, আয়াতে আর একটা সমস্যার উদ্ভব হইয়া যায়। ঐ তাৎপর্যের সমর্থনে বলা হইয়াছে যে, নিহত ইহুদীর পুনর্জীবন লাভের উদাহরণ দিয়া পরকালের পুনর্জীবন লাভের সত্যতা বা সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করা হইতেছে। কিন্তু একদল তাফ্ছীরকার ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ইহুদীরা তো পরকালে ও পুনর্জীবনে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের জন্য এইরূপ উদাহরণ পেশ করার কোনও দরকারই ছিল না।

প্রকৃত কথা এই যে, মওত ও হায়াত (বা মৃত্যু ও জীবন) শব্দ কোর্‌আন মাজীদের বহু আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—দেহের জীবন-মরণ, আধ্যাত্মিক জীবন-মরণ, জ্ঞান ও অনুভূতিগত জীবন-মরণ, জাতির হিসাবে জীবন-মরণ ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকটা আয়াতের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি:

(১) يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم

"হে মোমেনগণ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্র ডাকে, এবং রাছুলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন এমন বিষয়ের প্রতি, যাহা তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে" (আনফাল, ২৪)।

(২) او من كان ميتا فاحييناه (আন্‌আম),

(৩) انك لا تسمع الموتى (নাহাল),

(৪) ولكم فى القصاص حيوة (বাক়ার),

(৫) فاحيا به الارض بعد موتها (আন্‌কাবূত) প্রভৃতি। হায়াত ও মওতের বিভিন্ন তাৎপর্য ও তাহার কোর্‌আনিক ব্যবহার সম্বন্ধে ইমাম রাগেবের مفردات দ্রষ্টব্য।

৫৬। টীকাঃ তুলনায় সমালোচনা করা

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর ইহুদীদিগকে বলা হইতেছে اضربوه ببعضها। ضرب শব্দের অর্থ আঘাত করা, পর্যটন করা ও কোনও একটা বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের তুলনা বা তুলনায় সমালোচনা করা। আমি শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কোর্‌আন মাজীদের অন্যত্রও এই ব্যবহারের নজীর আছে। যেমন, كذالك يضرب الله الحق والباطل "এইরূপে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের তুলনায় আলোচনা করেন" (রাআ'দ, ১৭)। আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যকে "প্রহার বা আঘাত করেন"—এখানে এরূপ অনুবাদ কেহই করেন নাই।

৫৭। টীকা ঃ পাথর অপেক্ষাও কঠিন

ইহুদীরা হযরতের অনুপম মো'জেজা প্রত্যক্ষ করিল, তাঁহার অতুল মহিমা ও উদার মনোভাবের পরিচয় লাভ করিল এবং তাহাদেরই স্বীকারোক্তি অনুসারে, মারাত্মক হলাহল গলাধঃকরণ করিয়াও হযরত সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকায় তাঁহার নবুয়তের সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়া গেল, তবুও তাহারা ঈমান আনিল না। এই প্রসঙ্গে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—ইহার পরও তোমাদের অন্তরগুলি পূর্বের মতই কঠিন হইয়া রহিল। অতঃপর তাহাদের অন্তরগুলির তুলনা করা হইতেছে "আল্-হেজারাহ্" বা বিশেষ শ্রেণীর প্রস্তরপুঞ্জের সহিত। এই সঙ্গে বলা হইতেছে—"বরং তাহা হইতেছে প্রস্তরপুঞ্জ অপেক্ষাও কঠিন।" সঙ্গে সঙ্গে তিন শ্রেণীর প্রস্তরপুঞ্জের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, এই উক্তির বাস্তব প্রমাণ হিসাবে।

আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা নামিতেছে, ভূ-ত্বক ভেদ করিয়া তাহা শিলাস্তরে প্রবেশ করিতেছে। যেখানে Pervious ও impervious শিলাশ্রেণীর আত্ম-সমর্পণের ও প্রতিরোধের খেলা অবিরাম চলিতেছে। একদিকে আগ্নেয়শিলা, অন্যদিকে তুষারশিলা। কিন্তু সকলেই কুদ্‌রতের নিয়ম-কানুনের বশীভূত।

বহু কার্যকারণ পরম্পরার যৌগপতিক কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে, অবশেষে কোথায় আগ্নেয়গিরির সমুদগম, আর কোথায় বা পরম উপাদেয় প্রস্রবণের স্ফুরণ। আবার কোথায় বা পর্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আসিতেছে প্রপাত-ধারা, আবার কোথায়-বা পর্বতশৃঙ্গ হইতে ভীষণ শব্দে নামিয়া আসিতেছে গুরুভার শিলাখণ্ড। এক কথায়, শিলাখণ্ডের উপরও প্রকৃতির নিয়ম সর্বদা সুচারুভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। তাহাতেও অনুভূতি আছে এবং সে অনুভূতির প্রকাশও আছে। সে দেশের যত সংহার ও সংগঠন, যত হিমতাপ এবং যত হিমবাহ ও অনল প্রবাহ, সে সমস্তই একটা গভীর অনুভূতির ও তাহার বাস্তব প্রকাশেরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু ইহুদীদের ও ইহুদী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের হৃদয়গুলি এই অনুভূতি হইতেও বঞ্চিত।

৫৮। টীকাঃ তাহ্‌রীফ বা অদল-বদল করা

হযরত মূছার প্রতি আল্লাহ্‌র যেসব কালাম নাজেল হইয়াছিল, ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতরা তাহাতে নিষ্ঠুরভাবে তাহ্‌রীফ করিয়া আসিয়াছে। এই পরিবর্তন বা corruption এর বিষয় আজ সর্বতোভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদের বর্তমান ধর্মপুস্তকগুলি হইতেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

৫৯। টীকাঃ ইহুদীদের সমস্যা

ইহুদীদের একদল উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুছলমানদিগের সাক্ষাতে নিজ-দিগকে "মোছলেম" বলিয়া প্রকাশ করিত, মুছলমানদের ভিতরের অবস্থা জানার জন্য কখন কখন হযরতের মজলিছেও উপস্থিত হইত। পক্ষান্তরে হযরত রাছুলে কারীম অহির মারফতে অবগত হইয়া তাহাদের সমস্ত কুক্রিয়া, দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের বিষয় সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিতেন। ইহা ব্যতীত, "মোহাম্মাদীম্" বা মহামান্য মোহাম্মদের আগমন সম্বন্ধে তাহাদের স্বীকৃত ধর্মপুস্তকে যে সকল সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী তখনও বিদ্যমান ছিল, হযরত তাহাও ব্যক্ত করিয়া দিতেন, এবং ইহার ফলে ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতরা নিরুত্তর হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইত। তাহারা মনে করিত যে, হয় তো তাহাদেরই মধ্যকার কোনও কোনও লোক এইসব তথ্য মোহাম্মদকে জানাইয়া আসে। আয়াতে তাহাদের এই উভয় সঙ্কট পরিস্থিতির উল্লেখ করা হইয়াছে। ৭৭ আয়াতে এই অজ্ঞদিগকে আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে:

گفتۂ او گفتۂ الله بود
گرچه از حلقوم عبدالله بود

৬০। টীকা : চরম অধঃপতন

এই আয়াতে ইহুদী সমাজের চরম অধঃপতনের একটা চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ, আল্লাহ্‌র কেতাব সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোনও জ্ঞানই তাহাদের নাই—নিজেদের খোশ-খেয়ালের বশবর্তী হইয়া, গতানুগতিক সংস্কার অনুসারে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি কল্পনা-জল্পনা করিয়া নিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেতাবের প্রকৃত শিক্ষা যাহা, তাহার কোনও ধারই তাহারা ধারে না।

সমাজের জনসাধারণ যখন অধঃপতনের এই চরম স্তরে গিয়া উপনীত হয়, তাহাদের পণ্ডিত-পুরোহিতরা তখন, পার্থিব স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে, নূতন নূতন পুঁথি-পুস্তক রচনা করিতে থাকে ও সমাজকে বুঝাইতে চায় যে, এ সমস্তই আল্লাহ্‌র বিধান।

ইহাকে আমরা পৌরাণিক যুগ বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে ধর্ম সমাজগুলির চরম অধঃপতনের যুগ। দৃঢ়সঙ্কল্প, অদম্য সাহস ও আত্মসত্যে সম্পূর্ণ প্রত্যয়শীল সংস্কারকের আবশ্যক হইয়া থাকে এই অন্ধকার যুগেই।

ধর্মসমাজ হিসাবে মোছলেম জাতিও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই মারাত্মক অভিশাপে আক্রান্ত হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র ফজলে আমাদের সত্যদর্শী ও কর্তব্য-পরায়ণ আলেমগণ এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁহাদের কঠোর সাধনা ও অনুপম ত্যাগ স্বীকারের ফলে মুছলমান সমাজে আবার সত্যের যুগ—আল্লাহ্‌র কেতাবের ও রাছুলের হাদীছের যুগ—ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাদের প্রবর্তিত সাধনাকে সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত করিয়া তোলাই হইতেছে আজিকার দিনে আমাদের প্রধান কর্তব্য। শুষ্ক তৃণের মত স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া কাপুরুষের কাজ। স্রোতকে ফিরাইয়া আনাই সত্যদর্শী সংস্কারকগণের কর্তব্য।

৬১। টীকা : আল্লাহ্‌র বিধান সার্বজনীন

ইহুদীরা বলিত : "জাহান্নামের আগুন গণিত কয়েকটা দিনের অতিরিক্ত আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" কোর্‌আন ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, পাপের দণ্ড আল্লাহ্‌র বিধান। ইহুদী বা মুছলমান প্রভৃতি বলিয়া

ইহাতে কোনও তারতম্য হইতে পারে না। সকলের পক্ষে ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে। রুকুর শেষ আয়াতগুলিতে এই বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

১০ রুকু

৮৩। আরও স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), যখন আমরা বানি-ইছ্‌রাইলের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম (আর বলিয়াছিলাম) যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত্ করিবে না, আর তোমরা 'সদয় ব্যবহার' করিতে থাকিবে পিতা-মাতার প্রতি, আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতি এবং ইয়াতীমগণের প্রতি, আর মিছ্‌কীনদিগের প্রতি এবং লোকদিগকে বলিবে সঙ্গত কথা— সঙ্গে সঙ্গে নামাযকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে আর যাকাত প্রদান করিতে থাকিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে (এই প্রতিজ্ঞা পালনে) পরাঙ্মুখ হইয়া গেলে, বস্তুতঃ ইহাই তোমাদের চিরন্তন রীতি। (৬২)

٨٣ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ
اِسْرَآئِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا
اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ
حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ
اٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا
قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৮৪। (হে ইহুদ সমাজ। তোমরা নিজেদের অবস্থাই স্মরণ করিয়া দেখ), যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে (এই মর্মের) অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম

٨٤ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا
تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا

যে, তোমরা কেহ কাহারও রক্ত-পাত করিবে না ও নিজেদের লোকজনকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে না। সেমতে তোমরা একরার করিয়াছিলে, আর তোমরাই হইতেছ তাহার সাক্ষী।

৮৫। সেই তোমরাই তো এখন স্বজন-গণকে হত্যা করিতেছ, আর নিজেদের একদলকে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতেছ —তাহাদের বিরুদ্ধে (শত্রু-পক্ষকে) সাহায্য করিতেছ— অপরাধ ও অত্যাচারভাবে; অথচ তাহারা বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলে, মুক্তি পণ দিয়া তাহাদিগকে উদ্ধারও করিয়া থাক—অথচ তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়াই তো তোমাদের পক্ষে আদৌ হারাম ছিল! তবে কি তোমরা নিজে-দের ধর্মপুস্তকের কতক অংশে বিশ্বাস করিয়া থাক—আর কতক অংশকে অবিশ্বাস করিয়া থাক। (৬৩) অতএব তোমাদের যেসব লোক এইরূপ কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের একমাত্র প্রতি-

تخرجون انفسكم من
دياركم ثم اقررتم و انتم
تشهدون ○

٨٥ ثم انتم هؤلاء تقتلون
انفسكم و تخرجون فريقا
منكم من ديارهم تظهرون
عليهم بالاثم والعدوان ط
وان ياتوكم اسرى تفدوهم
وهو محرم عليكم اخراجهم ط
افتؤمنون ببعض الكتب
وتكفرون ببعض ج فما جزاء
من يفعل ذلك منكم الا
خزى في الحيوة الدنيا

ফল হইতেছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ভোগ, অধিকন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে কঠিনতর আজাবের পানে।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৮৬। ইহারাই তো হইতেছে সেইসব (অবোধ) লোক, আখেরাতের (শাশ্বত) জীবনের বিনিময়ে দুনিয়ার (নশ্বর) জীবনকে কিনিয়া নিয়াছে যাহারা, অতএব তাহাদিগের আজাবের লাঘব করা হইবে না, এবং কোনও প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে না তাহারা।

৮৬ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ع ○

তাফ্ছীর

৬২। টীকা ঃ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা

হযরত মূছা ও হযরত ঈছা এবং অন্যান্য নবিগণের মারফতে ইহুদী জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র যেসব কিতাব ও ছাহীফা নাজেল হইয়াছিল, সেগুলির ধ্বংসাবশেষে, আজও ইহুদী শরীয়তের এই সব মৌলিক আদেশ-নিষেধের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার কয়েকটা নজীর উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(১) و قال الله كل هذا القول : انى انا الرب الاهك الذى اخرجتك من ارض مصر من بيت العبودية ـ لا يكن لك الاه آخر غيرى ـ لاتتخذ لك صورة ولا تمثيل كل ما فى السماء من فوق' وما فى الارض من اسفل' ولا فى الماء من تحت الارض ـ لا تسجد لهن ولا تعبد هن' فانى انا ربك العزيز الغيور... سفر الخروج' الا صحاح العشرون ـ

"আর আল্লাহ্ এই সমস্ত কথা কহিলেন ঃ আমি, হাঁ একমাত্র আমিই

হইতেছি তোমার সেই প্রতিপালক প্রভু, মিসর হইতে—সে দাস নিবাস হইতে—তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছি। আমি ব্যতিরেকে তোমার জন্য কোনও মা'বুদ যেন না থাকে। উর্ধ্ব আছমানে যাহা কিছু আছে, নিম্নে জমিনে যাহা কিছু আছে, আর জমিনের অধস্থ পানিতে যাহা কিছু আছে, নিজের জন্য তাহার কোনও মূর্তি গঠন করিবে না, কোনও প্রতীক বানাইয়া নিবে না — তাহাদিগকে ছিজ্দাহ্ করিবে না, তাহাদের এবাদত করিবে না – সাবধান। আমিই তোমার প্রভু পরাক্রান্ত, মহা-গায়রতশীল – (যাত্রা পুস্তক, ২০ অধ্যায়)। *

(২) তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও (২য় বিবরণ ১২)।

(৩) আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতি সদ্ব্যবহার (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ – ১২)।

(৪) 'ওশর' বা ক্ষেত্রজ ফল-শস্যের দশমাংশ যাকাত হিসাবে আদায় দেওয়ার আদেশ—(দ্বিতীয় বিবরণ,—১৪ অধ্যায় ২২—২৯)।

ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্র কেতাবে ধর্মের যেসব মৌলিক নীতির বিষয় নাজেল করা হইয়াছিল এবং যেগুলিকে উপেক্ষা করার ফলে তাহারা আল্লাহ্র লা'নৎভাজন হইয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। মুছলমানদিগের জন্যও অনুরূপ মৌলিক নীতিগুলির বিষয় কেরাআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন: "হে মোছলেম সমাজ! তোমরা এবাদত করিবে একমাত্র আল্লাহ্র এবং তাঁহার এবাদতে আর কাহাকেও কোনো প্রকারে শরীক করিও না, আর এহ্ছান করিবে পিতামাতার প্রতি, স্বজনগণের প্রতি, ইয়াতীমদিগের প্রতি, মিছকিনগণের প্রতি, আত্মীয়-হাম্ছায়ার প্রতি, অনাত্মীয় হাম্ছায়ার প্রতি, (বিপন্ন) মোছাফেরদিগের প্রতি এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত (দাস-দাসী)দিগের প্রতি ; নিশ্চয় জানিও আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারীদিগকে আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করেন না" (নেছা, ৩৬)।

এই আয়াতের শিক্ষার আলোকে নিজের ও নিজ সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কোর্আনের শিক্ষা হইতে আমরা আজ কতদূর সরিয়া পড়িয়াছি এবং অভিশপ্ত ইহুদী জাতির আদর্শের দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি।

---

* বাইবেলের বাংলা অনুবাদ পৌত্তলিকতার পরিভাষায় পরিপূর্ণ। সে জন্য প্রাচীন আরবী সংস্করণে মূল এবারত্ ও তাহার সঠিক বাংলা তরজমা প্রদান করা হইল।

৬৩। টীকাঃ মদীনার গণতন্ত্র

হিজ্‌রতের কিছুদিন পরে মদীনার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইহুদী প্রধানরা হযরত রাছুলে কারীমের সহিত কতকগুলি শর্তে সন্ধি স্থাপন করে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই সন্ধিপত্র লিখিত হয়। মদীনার সমসাময়িক ইহুদীরাই ছিল তাহার এক পক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এই সন্ধিপত্রের একটা প্রধান শর্ত এই ছিল যে, ইহুদী ও মুছলমানগণ একই সংহতিভুক্ত নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু প্রথম সুযোগেই ইহুদীরা এই সব একরার-অঙ্গীকার ভাঙ্গিয়া ফেলে। বহুবার তাহারা অর্থ দিয়া কোরেশদিগের সাহায্য করিয়াছে। মোশরেকদিগের সঙ্গে মিলিয়া মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিয়াছে। আনছারদিগের দুই গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইয়া দিয়াছে। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং হযরতের বিরুদ্ধে মারণ-উচচাটনাদি যাদুমন্ত্রের ব্যবহার করিয়াছে। হলাহল বিষ প্রয়োগ এবং অন্যান্য প্রকারে, তাঁহাকে খুন করার আয়োজন করিয়াছে। আমার ধারণা, আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদিগের এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কথাই বলা হইয়াছে।

---

১১ রুকু

৮৭। বস্তুতঃ মূছাকে আমরা দিয়াছিলাম (তাওরাত) কেতাব এবং তাহার পশ্চাতে পর পর অন্য রাছুলগণকেও প্রেরণ করিয়াছিলাম, আর মরিয়ম-তনয় ঈছাকে প্রদান করিয়াছিলাম কতিপয় সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ এবং তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম "রূহুল-কুদুছের" দ্বারা ; (৬৪)(হে ইহুদী জাতি!) যখনই কোনও রাছুল, এমন কোনো বিষয় নিয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে— যাহা তোমাদিগের মনঃপূত নহে, তখনই তোমরা অহঙ্কার আরম্ভ

٨٧ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز
وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ

করিয়া দিলে, সেমতে(নবিগণের) একদলকে তোমরা ঝুটলাইয়া দিলে, আর একদলকে তোমরা কতল্ করিয়া আসিতেছ। (৬৫)

اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ○

৮৮। তাহারা আরও বলে: আমাদের অন্তরগুলি হইতেছে সুরক্ষিত (ভাণ্ডার); না, না, বরং কোফরের প্রতিফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নৎ করিয়াছেন, ফলে তাহাদের অল্প লোকই ঈমান আনিয়া থাকে। (৬৬)

৮৮ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ○

৮৯। আর যখন আল্লাহ্র তরফ হইতে (এমন) এক কেতাব তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল—যে কেতাব হইতেছে তাহাদের সঙ্গেকার কেতাবের তাছ্দীককারী, অধিকন্তু পূর্ব হইতে তাহারা কাফের-মোশরেকদিগের উপর বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু তাহাদের পরিচিত বিষয়টা যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাদের নিকট, অমনি তাহারা তাহাকে অমান্য করিয়া দিল, সেমতে আল্লাহ্র লা'নৎ বর্তিয়া গেল অমান্যকারী কাফেরদিগের উপর।

৮৯ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا صلے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ○

৯০। কতই না নিকৃষ্ট সেই বস্তুটা— যাহার বিনিময়ে আত্মবিক্রয়

৯০ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ أَنْفُسَهُمْ أَنْ

করিয়া দিয়াছে তাহারা, সে মতে আল্লাহ্‌র নাজেল করা সত্যকে তাহারা অমান্য করিয়া দিয়াছে শুধু জেদের বশবর্তী হইয়া, এই কারণে যে,—আল্লাহ্‌ নিজ রহমতে নিজের বান্দাগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা (নিজের কালাম) নাজেল করেন। অতএব তাহারা নিজেদের উপর বর্তাইয়া নিল গজবের উপর গজব; বস্তুতঃ অমান্যকারীদের জন্য রহিয়াছে হেয়স্কর আজাব (৩৭)	يَّكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ج فَبَاءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○
৯১। আর যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, "আল্লাহ্‌ যেসব কালাম নাজেল করিয়াছেন, সেগুলির প্রতি ঈমান আন" তাহারা উত্তরে বলে: "আমরা তো ঈমান আনিব সেই (কালামগুলির) প্রতি, যাহা নাজেল হইয়াছে আমাদের উপর" —তাহা ব্যতিরেকে আর সমস্তকে তাহারা অমান্য করিয়া থাকে, অথচ তাহাও বারহাক্‌ কেতাব এবং তাহাদের সঙ্গেকার কেতাবের তাছদীককারী; (হে রাছুল।) তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমরা নিজেদের কেতাবে যদি বিশ্বাসী হইবে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই	৯১ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ

নবীদিগকে কতল করিয়া আসিতেছ, কি কারণে? (৬৮)

قبل ان كنتم مؤمنين ٥

৯২। "আর মূছা তো তোমাদিগের নিকট বহু সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার (অনুপস্থিত হওয়ার পর,) হে জালেম সমাজ, তোমরাই তো গো-বৎসকে (ঈশ্বররূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে।" (৬৯)

٩٢ ولقد جاءكم موسى بالبينت
ثم اتخذتم العجل من بعده
وانتم ظلمون ٥

৯৩। আরও স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), আমরা যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তূর (পাহাড়)-কে তোমাদের উর্ধ্বদেশে উত্থাপন করিয়াছিলাম; (বলিয়াছিলাম:) তোমাদিগকে যে কালাম দান করিলাম, তাহাকে তোমরা মজবুত ভাবে ধারণ করিয়া রাখিও, এবং (তাহার নির্দেশগুলি) মান্য করিয়া চলিও; (৭০) তাহারা বলিয়াছিল—(কানে) শুনিলাম এবং (মনে) অমান্য করিলাম—বস্তুতঃ অবস্থা এই যে, তাহাদের সত্যদ্রোহী মানসিকতার ফলে, গো-বৎসের মোহ তাহাদের হৃদয়গুলিকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল; (৭১) তুমি বল: তোমাদের ঈমানের বাস্তব স্বরূপ যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে তোমাদের "ঈমান" তো অতি নিকৃষ্ট বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছে তোমাদিগকে।

٩٣ واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا
فوقكم الطور ط خذوا ما
اتينكم بقوة واسمعوا ط
قالوا سمعنا وعصينا ق
واشربوا في قلوبهم العجل
بكفرهم ط قل بئسما
يامركم به ايمانكم ان كنتم
مؤمنين ٥

৯৪। বল : (তোমাদের ধারণা অনুসারে) পরকালের আবাস যদি, অন্য সব লোকসমাজ ব্যতিরেকে, কেবল তোমাদের জন্য একচেটিয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু-কামনা করিতে থাক— তোমরা যদি (নিজেদের দাবীতে) সত্য বাদী হও। (৭২)

৯৪ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৯৫। বস্তুতঃ এ কামনা তাহারা কস্মিনকালেও করিতে পারিবে না— নিজেদের স্বহস্ত অর্জিত পূর্বসঞ্চিত পাপাচারগুলির কারণে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন জালেমদিগের সম্বন্ধে সম্যক বিদিত।

৯৫ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৯৬। বস্তুতঃ তুমি তাহাদিগকে (দেখিতে) পাইবে, সকল লোকের (এমন কি) মোশরেকদের অপেক্ষাও, নগণ্য পার্থিব জীবনের প্রতি অধিকতর আসক্ত, তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকার, কিন্তু ঐ হাজার বৎসরের বয়সও তো তাহাকে (মৃত্যুর কবল হইতে ও আখেরাতের) আজাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন তাহাদিগের কৃতকার্য সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

৯৬ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ج يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ج وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ع

তাফ্ছীর

৬৪। টীকাঃ রূহুল-কুদুছ

কোর্আন মাজীদে "রূহ" শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—প্রাণ বা আত্মা, এলহাম বা inspiration, জিব্রাইল ফেরেশতা ইত্যাদি। দেখুন নহল ২, মোমেন ১৫, মোজাদালা ২২, শূরা ৫২ ইত্যাদি। শেষোক্ত আয়াতে কোর্আনকে روحا من امرنا বলা হইয়াছে। এইরূপে হযরত ঈছাকেও আল্লাহ্ অহি, এলহাম ও প্রেরণা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। বাইবেলের বর্ণিত "Holy ghost" বা পবিত্র প্রেতাত্মার সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। সূরা হাশরে শয়তানের জামাআতের মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র জামাআতের উল্লেখ প্রসঙ্গে মোমেনদিগের সম্বন্ধে বলা হইতেছে ايدهم بروح منه। অর্থাৎ—আল্লাহ্ মোমেনদিগকে নিজের তরফ হইতে প্রেরিত রূহের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। (২২ আয়াত)। শাহ আবদুল কাদের ছাহেব রূহ-শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "গায়বী ফয়েজ" বলিয়া। কবি হাচ্ছান সম্বন্ধে হযরত দোওয়া করিতেছেনঃ اللهم ايده بروح القدس। "হে আল্লাহ্ তুমি উহাকে সাহায্য কর রূহুল-কুদুছের দ্বারা (আহ্মাদ, আবু-দাউদ, তিরমিজী, বোখারী)।

আমরা হযরত ঈছাকে একজন মহামানব বলিয়া স্বীকার করি, অতিমানব বলিয়া স্বীকার করি না। আমাদের ধর্মে খ্রীষ্টানদিগের এই শ্রেণীর দাবী-দাওয়াগুলির কোনও সমর্থন নাই, বরং আছে কঠোর প্রতিবাদ। যথাযথ স্থানে এইসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ ঘটিবে।

হযরত ঈছাকে মরিয়মের পুত্র বলিয়া কোর্আনে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার পিতার নামের উল্লেখ কোথায়ও করা হয় নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার "বে-বাপের পয়দা" হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পিতার নাম উল্লেখ না করার কতকগুলি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক কারণ আছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

৬৫। টীকাঃ নবী হত্যা

হযরত মূছার পরে ও হযরত ঈছার পূর্বে, আরও কয়েকজন নবী ইহুদীদের কাছে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের মানসিকতার এমনই অধঃপতন ঘটিয়াছিল যে, সেই নবিগণের শিক্ষার বিচার তাহারা করিত, নিজেদের কৌলিন্যের অভিমান ও পরম্পরাগত সংস্কারের মধ্য দিয়া। নবাগত নবীর শিক্ষা তাহার বিপরীত হইলে, ইহুদীরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যাত করিত এবং অবস্থা

বিশেষে তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা পাইত—হত্যা করিয়া ফেলিত। হযরত ইব্‌রাহীমকে তাহারা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, হযরত মূছার জীবনকালেই তাহারা গো-পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, অবশেষে মোয়াব প্রদেশের কোনো পর্বত শৃঙ্গের অজ্ঞাতবাসে তাঁহাকে প্রাণরক্ষা বা প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। হযরত ঈছাকে ও তাঁহার সতীসাধবী জননীকে তাহারা নানা কটুবাক্যে জর্জরিত করিয়াছিল। এবং অবশেষে—নিজেদের জ্ঞান বিশ্বাসমতে—তাঁহাকে শূলে দিয়া হত্যা করিয়াছিল। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে হত্যা করার জন্যও তাহারা পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াছিল।

ইহাই হইতেছে ইহুদী সমাজের জাতীয় চরিত্রের একটা চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। তাহারা আল্লাহ্‌র গজব ও লা'নৎ ভাগী হইয়াছিল নিজেদের এই বিকৃত মানসিকতার জন্য। পক্ষান্তরে খেলাফতের পরিবর্তে বা তাহার নামকরণে, মুছলমানদিগের মধ্যে বাদশাহী খেয়ালের সূচনা হইয়াছিল যে দিন হইতে, সেই-দিন হইতে তাহাদের একটি বিশিষ্টদল এই ইহুদী মানসিকতার লা'নতে নিজ-দিগকে অভিশপ্ত ও নিজেদের জাতীয় ইতিহাসকে শোচনীয়ভাবে কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছে।

৬৬। টীকাঃ সুরক্ষিত (ভাণ্ডার)

মূলে غلف শব্দ আছে। আমাদের গেলাফ (বালিশের গেলাফ, লিহাফের গেলাফ) ইহারই ধাতুমূল হইতে উৎপন্ন। অর্থ—আচ্ছাদন। অর্থাৎ, মোশরেক ও মোনাফেক এবং আহ্‌লে কেতাব সমাজের সত্যদ্রোহীরা হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলিতঃ তুমি যাহাই বল না কেন, আর যত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত কর না কেন, তোমার কোনো কথাই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (হা-মীম, ছাজদা, ৫ আয়াত দেখুন)। অর্থাৎ যে বিচারবুদ্ধি হইতেছে মানব জীবনে আল্লাহ্‌র প্রধানতম দান, এই অজ্ঞ লোকগুলা তাহাকেই পঙ্গু ও আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই বিচার বিরোধীতাকেই ধর্ম জীবনের প্রধান সম্পদ বলিয়া মনে করিতেছে। আয়াতের শেষ অংশে বলিয়া দেওয়া হইতেছে, ইহা সম্পদ নহে—অভিসম্পাৎ।

৬৭। টীকাঃ শেষ নবীর খোশ-খবর

সকল যুগের রাছুলগণ আল্লাহ্‌র শেষনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমনের খোশ্-খবর দিয়া গিয়াছেন। ইছরাইল বংশের শেষ নবী হযরত ঈছা বিশেষ করিয়া এই "সুসমাচার" জগৎবাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন। বাইবেলের প্রচলিত

পুরাতন ও নূতন নিয়মের সঙ্কলক ও রচয়িতারা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত বা বিকৃত করিতে পারেন নাই।

কিন্তু তাঁহাদের পরিচিত সেই মহানবীর যখন দুনিয়ায় আবির্ভাব হইল, তখন বানি-ইছ্‌রাইল সমাজ ক্ষোভে, বিস্ময়ে ও অভিমানে আত্মহারা হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল: ইঁনি তো ইছ্‌মাইলের বংশধর। নবী আসার কথা তো একমাত্র ইছ্‌রাইলের গোত্রে! আয়াতে বানি-ইছ্‌রাইল গোত্রের এই জঘন্য কৌলিন্য গর্বের প্রতিবাদ করা হইতেছে। নিজের বান্দাগণের কল্যাণের জন্য যখন হউক, যে দেশে হউক, যে গোত্রের মধ্য হইতে হউক এবং নিজের যে বান্দাহ্‌র প্রতি হউক, আল্লাহ্‌ নিজের কালাম নাজেল করিবেন, নিজের রেছালাত অর্পণ করিবেন, তাহাতে আপত্তি করার অধিকার কাহারও নাই। আল্লাহ্‌ কেবল বানি-ইছ্‌রাইলের ঈশ্বর নহেন, কেবল আর্যাবর্তের অধিপতিও নহেন!!

৬৮। টীকা: ধর্মের নামে ভণ্ডতা

ইহুদীদিগকে যখন বলা হইল যে, আল্লাহ্‌ যে সব কালাম নাজেল করিয়াছেন সেগুলির উপর ঈমান আন। তাহারা বলিল, "আমাদের প্রতি যে কালাম নাজেল করা হইয়াছে, আমরা বিশ্বাস করি কেবল তাহাতে।" আর তাহা ব্যতিরেকে আর সকলকে তাহারা অমান্য করিয়া থাকে।

আল্লাহ্‌র কালামে মানুষ বিশ্বাস করে—যেহেতু তাহা আল্লাহ্‌র কালাম। ইহাতে, হিন্দু ও ইহুদীর মত, যাহারা এই প্রতিজ্ঞায় কোনও শর্তের আরোপ করে, তাহারা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কালামকেই মানে না। দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগাইবার জন্য তাহারা একটা প্রবঞ্চনার সৃষ্টি করিয়া থাকে মাত্র। আয়াতে উদাহরণ দিয়া দেখান হইতেছে যে, ইহুদীদের মধ্যে নবী হত্যার রেওয়াজ দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অথচ তাহা তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে অবৈধ ও নিষিদ্ধ। হিন্দু অর্থাৎ আর্য জাতির শাস্ত্রীয় ইতিহাসেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

৬৯। টীকা: দ্বিতীয় প্রশ্ন

আল্লাহ্‌ হযরতকে ইহুদীদের নিকট দুইটি প্রশ্ন উপস্থিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রথমটি পূর্ব আয়াতের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নের উল্লেখ করা হইতেছে। ইহুদীরা যে বস্তুতঃ নিজেদের ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস রাখে না, এই উদাহরণের প্রতিপাদ্যও তাহাই। -

আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে, হযরত মূছা বানি-ইছ্‌রাইলের নিকট البينات উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহার মূল অর্থ দলিল, প্রমাণ, নজীর ও

নিদর্শন। মো'জেজার দ্বারাও সত্য প্রমাণিত হয়—এই অজুহাতে অনেকে ইহাকে শুধু মো'জেজা অর্থে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকেন। কোর্আন মাজীদের সাধারণ ব্যবহার অনুসারে, "বাইয়েনা" শব্দের এইরূপ অর্থসঙ্কোচ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রমাণ হিসাবে সংক্ষেপে কয়েকটা আয়াতের বরাত দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি :

(১) ليهلك من هلك عن بينة و يحى من حى عن بينة - انفال ٤٢

"যেমতে যুক্তি-প্রমাণের হিসাবে যাহার হালাক হওয়ার কথা—সে হালাক হইয়া যাইবে, এবং যুক্তি-প্রমাণের হিসাবে যাহার বাঁচিয়া থাকার কথা, সে বাঁচিয়া থাকিবে।" (আনফাল, ৪২)।

(২) افمن كان على بينة من ربه - هود ١٧

"তবে কি যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে নিজ পরওয়ারদেগারের (প্রদত্ত) দলিল-প্রমাণের উপর……(হূদ, ১৭)।

(৩) فيه آيات بينات مقام ابراهيم - عمران ٩٦

"তাহাতে (কা'বায়) রহিয়াছে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন ও ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থান……(এমরান, ৯৬)।

(৪) হযরতের বহু হাদীছ্ হইতেও এই ব্যবহারের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—البينة على المدعى و اليمين على من انكر (او مدعى عليه) —প্রমাণের ভার বাদীর উপর, প্রতিবাদী ইনকার করিলে তাহাকে হলফ লইতে হইবে (মোছলেম, তিরমিজী)।

৭০। টীকা : তুরকে উত্থাপন করা

এই সূরার ৬৩ আয়াত ও ৫১ টীকা দেখুন।

৭১। টীকা : গো-পূজার মোহ

দীর্ঘকাল যাবৎ মিসর দেশে অবস্থান করার ফলে, ইহুদীদের অন্তরগুলি গো-ভক্তি ও গো-পূজার মোহে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট ও অভিভূত হইয়াছিল। ফেরআওনের ও তাহার স্বজনগণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমে কিছুকাল মুক্তিলাভের জন্য তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে। সে সময় কিছুকাল তাহারা আল্লাহ্‌র নাম করিয়াছিল, হযরত মূছার তাবেদারী করিয়াছিল এবং বাচনিকভাবে তাওহীদের শিক্ষাকেও গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই বিপদ হইতে মুক্তি লাভের পর, তাহাদের মধ্যে সেই পুরাতন রোগের পুনরাক্রমণ প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হইয়া যায়।

গাঁজা ও আফিমের মত, শেরেকেরও একটা মোহ বা নেশা এখনও বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। কারণ আদিম যুগের অসভ্য মানুষের অন্তর্নিহিত কুসংস্কার ও মোশরেকী ভাবধারার উত্তরাধিকার হইতে মুক্ত হওয়ার মত সংজ্ঞান অর্জনের সৌভাগ্য তাহাদের অনেকের পক্ষে, যে কোনো কারণে হউক, আজও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এই চিরাগত সংস্কার বা সংস্কৃতির মোহকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলাই মুছলমানের একান্ত কর্তব্য। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐতিহ্য ও সভ্যতা আর সংস্কৃতি এক কথা নহে।

৭২। টীকা ঃ "মৃত্যু কামনা কর"!

অর্থাৎ সত্বর মরিয়া যাওয়ার চেষ্টা কর, সদাপ্রভুর নিকট সেজন্য প্রার্থনা করিতে থাক! বেহেশ্‌ত যখন তোমাদের জন্য একচেটিয়াভাবে রিজার্ভ হইয়া আছে, তখন আর ভয়ের কারণ কি? কোনও গতিকে মরিয়া যাইতে পারিলেই বেহেশ্‌তের অনন্ত সুখ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজেদের অপকর্মগুলি তাহারা অবগত আছে। সুতরাং তাহার প্রতিফলের আশঙ্কায় তাহারা অতিমাত্রায় বিচলিত। তাই মরণের নামে তাহারা শিহরিয়া ওঠে, দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু দীর্ঘকাল তো অনন্তকাল নহে। একদিন তাহাদিগকে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে। আল্লাহ্‌র হুজুরে নিজেদের কৃতকর্মগুলির হিসাব দিতে ও সেই কর্মের প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে। রুকুর শেষ আয়াত দুইটিতে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

১২ রুকু

৯৭। (হে রাছুল!) তুমি বল ঃ কে হইতে পারে জিব্‌রীলের শত্রু! জিব্‌রীল তো কোর্‌আনকে তোমার অন্তরে নাজেল করিয়াছে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে, তাহার পূর্ববর্তী (কিতাবের) তাছ্‌দীককারীরূপে, এবং পথ-প্রদর্শক ও মোমেনগণের জন্য সুসমাচার হিসাবে। (৭৩)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ٩٧
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ
اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৯৮। যাহারা দুশ্‌মন হইবে আল্লাহ্‌র, তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণের, তাঁহার রাছুলগণের এবং জিব্‌রীল ও মীকাইলের, (তাহাদের জানা উচিত যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে এই দুশ্‌মনীর প্রতিফল প্রদান করিবেন। (১৪)

٩٨ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ٥

৯৯। এবং আমরা তোমার প্রতি নাজেল করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত-গুলিকে, বস্তুতঃ অনাচারী (ফাছেক)-গণ ব্যতীত আর কেহই এগুলিকে অমান্য করিতে পারে না।

٩٩ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ٥

১০০। তবে কি যখনই কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবে তাহারা — তাহাদের একদল সেই অঙ্গীকার ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। বরং প্রকৃত কথা এই যে, তাহাদের অধিকাংশ লোকই হইতেছে বে-ঈমান।

١٠٠ اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥

১০১। আর দেখ, যখনই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাছুল তাহাদের নিকট সমাগত হইল, যে রাছুল হইতেছে তাহাদের সঙ্গেকার (কেতাবের) তাছদীককারী, আহ্‌লে-কেতাবদিগের একদল তখনই আল্লাহ্‌র কেতাবকে ফেলিয়া দিল নিজেদের পিঠের

١٠١ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لا كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ

পশ্চাতে, যেন তাহারা কিছুই অবগত নহে —

১০২। এবং তাহারা অনুসরণ করিয়া চলিল সেই সব মিথ্যা রচনা, কতকগুলি শয়তান ছোলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যাহার প্রচার করিত ; আর প্রকৃত কথা এই যে, ছোলায়মান কোনও কোফরী কাজ করে নাই, পরন্তু শয়তানগুলি কোফরী কাজ করিয়াছিল—লোকদিগকে তাহারা যাদু শিক্ষা দিত ; আর বাবেলের (তথাকথিত) দুই ফেরেশতার, অর্থাৎ হারূত ও মারূতের প্রতি কিছুই নাজেল করা হয় নাই ; আর প্রকৃত পক্ষে কোনও লোককেও তাহারা কিছু শিক্ষা প্রদান করিত না, যেমতে তাহারা (শিক্ষার্থীকে) বলিতে পারিত যে, "আমরা হইতেছি আজমায়েশ—অতএব তুমি (যাদু শিখিয়া) কাফের হইও না" —যাহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারিত ; আর অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোনও একজন মানুষেরও কিছু মাত্র ক্ষতি করার ক্ষমতাও তো তাহাদের ছিল

ظهورهم كأنهم لا يعلمون ○

١٠٢ واتبعوا ما تتلوا الشيطين
على ملك سليمن وما
كفر سليمن ولكن
الشيطين كفروا يعلمون
الناس السحر وما انزل
على الملكين ببابل هاروت
وماروت ط وما يعلمن من
احد حتى يقولا انما نحن
فتنة فلا تكفر ط فيتعلمون
منهما ما يفرقون به بين
المرء وزوجه ط وما هم
بضارين به من احد الا

না ; আর (ইহুদীরা) এমন বিষয় শিখিতেছে—যাহা তাহাদের ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু কোনও উপকার করিতে পারে না ; এবং ইহাও তাহারা নিশ্চয়ই অবগত আছে যে, এই বৃত্তিকে অবলম্বন করে যে ব্যক্তি, পরকালে তাহার কিছুই প্রাপ্য নাই ; আর যে বস্তুর বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহারা, কতই না নিকৃষ্ট তাহা - যদি তাহারা বুঝিয়া দেখিত।

بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَ يَتَعَلَّمُوْنَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط
وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَالَهٗ
فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ
اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ۝

১০৩। এবং তাহারা যদি ঈমান আনিত আর পরহেজ করিয়া চলিত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র হুজুর হইতে উত্তম পুণ্যফল তাহারা লাভ করিতে পারিত—যদি তাহারা বুঝিয়া দেখিত।

١٠٣۔ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا
لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

তাফ্‌ছীর

৭৩। টীকা : জিব্‌রীলের দুশ্‌মন

হযরতের সমসাময়িক ইহুদীরা যখন শুনিল যে, হযরতের প্রতি কোর্‌আন নাজেল হইয়া ~~থাকে~~ জিব্‌রীল ফেরেশ্‌তার মারফতে, তখন, তাহারা ইছলামের প্রতি আরও বিদ্বিষ্ট হইয়া গেল। কারণ, তাহাদের ধারণা মতে জিব্‌রীল হইতেছেন আজাব ও অশান্তির "অধ্যক্ষ"-ফেরেশতা। শান্তি, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যতার অধ্যক্ষ ফেরেশতা হইতেছেন মীকাইল। জিব্‌রীল যে ইহুদী জাতির প্রতি বিদ্বিষ্ট, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করিত এবং সেজন্য তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। পক্ষান্তরে নিজেদের পৌরাণিক পুঁথি-

পুস্তক অনুসারে, তাহারা ইহাও বিশ্বাস করিত যে, আখেরী জামানায় একমাত্র মীকাইল ফেরেশতাই তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। (দেখ—দানিয়াল ৮—১৬, ১৭; ১০—১৩, ২০, ২১; ১২—১ প্রভৃতি)। হযরতের সময়ে এই বিষয় নিয়া মুছলমানদিগের সহিত ইহুদীদিগের যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে (কাছীর)। আয়াতে তাহাদের এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করা হইতেছে। তাহারা জিব্‌রাইল ও মীকাইল উভয়কে আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ ফেরেশতা বলিয়া স্বীকার করিতেছে, অথচ ধূয়া তুলিতেছে—"মীকাইল অহি আনিলে তাহা মান্য করিতাম, কিন্তু জিব্‌রাইলের আনিত অহি মানিতে রাজী নহি। কারণ তিনি আমাদের জাতির প্রতি বৈরভাবসম্পন্ন।" এই হঠকারিতার কি তুলনা আছে?

জিব্‌রীল আরবী শব্দ নহে বলিয়া অনেক সাহিত্যিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। "জিব্‌রাইল" প্রভৃতি ইহার আরও কয়েক প্রকার পাঠ আছে।

৭৪। টীকাঃ আল্লাহ্‌র শত্রুতা

আল্লাহ্‌র শত্রুতা-অর্থে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধের অবাধ্য হওয়া, তাঁহার হুকুম-আহকামের বাহক ও প্রচারক ফেরেশ্‌তা ও নবী-রাছুলগণের বৈরিতা করা। "আল্লাহ্‌ তাহাদের শত্রু হইবেন"—পদের ব্যবহারিক তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে এই প্রকার শত্রুআচরণের দণ্ড প্রদান করিবেন।

"ফেরেশতাগণের" বলিতে জিব্‌রীল ও মীকাইলও তাহার মধ্যে আসিয়া যান। কিন্তু তবুও তাহার পর এই দুইজন ফেরেশতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের জন্য। আমার মতে ইহার আর একটা কারণও আছে। ইহুদীরা কোন্দল আরম্ভ করিয়াছিল দুই ফেরেশতার মধ্যে ইতর-বিশেষ-ভাবের সৃষ্টি করিয়া। আয়াতে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, যুক্তির হিসাবে জিব্‌রাইলের দুশ্‌মন হওয়া ও মীকাইলের দুশ্‌মন হওয়া, আর আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন হওয়া, বস্তুতঃ একই কথা।

৭৫। টীকাঃ রাছুলগণকে প্রত্যাখ্যান করা

অঙ্গীকার করিয়া তাহা ভঙ্গ করা এবং আল্লাহ্‌র রাছুলগণকে অমান্য করা, এই দুইটি অনাচার হইতেছে বানি-ইছরাইল সমাজের জাতীয় ইতিহাসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। হযরত ঈছাকেও তাহারা অমান্য করিয়াছিল এবং তাঁহার পরে হযরত মোহাম্মদকে অমান্য করিতেছে। অথচ ইঁহাদের আগমনের অনাবিল সুসমাচার, তাহাদেরই প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র কেতাবগুলিতে সুস্পষ্ট ভাষায়

সন্নিবেশিত হইয়া আছে। কিন্তু নিজেদের সংস্কার ও প্রবৃত্তির অনুকূল না হওয়াতে, তাহারা সেই কেতাবগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল—যেন মছীহ্ ও মোহাম্মদের আগমন সম্বন্ধে কোনও সংবাদই তাহারা অবগত নহে। এদিকে তো এই অনাচার, অন্যদিকে যেসব অনাচারে তাহারা লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হইতেছে।

৭৬। টীকাঃ হযরত ছোলায়মান, হারুত, মারুত

আয়াতের বর্ণিত বিষয়গুলি সহজভাবে বুঝাইবার জন্য কয়েকটা দরকারী বিষয় ভূমিকা হিসাবে প্রথমে উল্লেখ করিতেছিঃ

(১) এই আয়াতটি উপরের আয়াতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য পূর্ব আয়াতের শেষে (;) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

(২) হযরত ছোলায়মান আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ছিলেন। সূরা নেছার ১৬৩ আয়াতে, হযরত মোহাম্মদ, হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ঈছা প্রমুখ মহামান্য নবিগণের সহিত একত্রে তাঁহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাঁহাকে নবুয়ৎ ও বাদশাহাৎ উভয় নিয়ামতে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। "তিনি নবী ছিলেন"—এই কথার স্পষ্ট অর্থ এই যে, কোনও প্রকারের শের্‌ক, কোফর বা জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কল্পনাও তাঁহার সম্বন্ধে করা যাইতে পারে না।

(৩) কোর্‌আনে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেন না, তাঁহাদিগকে যে হুকুম দেওয়া হয়, তাহা তাঁহারা পালন করিয়া থাকেন (সূরা তাহ্‌রীম, ৬ আয়াত)।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, হযরত ছোলায়মানের এবং দুইজন ফেরেশতার বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর যেসব জঘন্য অপবাদ রটনা করা হইয়াছে, তাহা কোনও অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে না।

(৪) و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان—পদের অনুবাদ করিয়াছি—'কতকগুলি শয়তান ছোলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যে সব অপবাদের প্রচার করিত'—বলিয়া। তেলাঅৎ শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করিয়া শুনান, অনুসরণ করা, ইত্যাদি। কিন্তু فلان يتلو على فلان বাক্যের অর্থ হইবে—অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা প্রচার কারিয়াছে (রাগেব)। আমি এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ একটা রাজত্বের কাছে আবৃত্তি করার কোনও অর্থই হইতে পারে না।

আয়াতে বর্ণিত "মা" শব্দগুলিকে মাউছুলা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, কি, নাফীয়া হিসাবে, এখন একমাত্র বিচার্য বিষয় থাকিয়া যাইতেছে এইটি। নাফীয়া হইলে অর্থ হইবে নেতিমূলক। যেমন ما كفر سليمان পদের অর্থ হইবে ছোলায়মান কোনও কোফরী করে নাই। কিন্তু মাউছুলা বলিয়া গ্রহণ করিলে উহার অর্থ হইবে—ছোলায়মান যেসব কোফরী কাজ করিয়াছিল। তাফ্‌ছীরকারগণের অনেকে এই আয়াতের কয়েক স্থানে নাফীয়া ও কয়েক স্থানে মাউছুলা হিসাবে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ইহুদী ও পার্সিকদিগের রচিত গল্পগুলি বজায় থাকিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ভূমিকায় বর্ণিত কোর্‌আনের মৌলিক নীতিগুলির উপর নিষ্ঠুর অবিচার করা হইতেছে। আমি ছোলায়মানের প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া আনুষঙ্গিক আয়াতগুলির উপসংহার পর্যন্ত সর্বত্রই "মা"কে নাফীয়া হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে ব্যাকরণের কোনও ব্যতিক্রম না করিয়াও, কোর্‌আনের নীতিগুলির মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহা বলিয়া দেওয়াও আবশ্যক যে, সাহিত্যের হিসাবে উপরে যে সব আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা আমার নূতন আবিষ্কার নহে। পূর্ববর্তী তাফ্‌ছীরকারগণের মধ্যেও এই মতবাদের প্রচলন ছিল। ইমাম রাজী এই তাৎপর্যকে "সর্বোত্তম" বলিয়া স্বীকার না করিলেও, উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন 'কাবীর'।

হযরত ছোলায়মান সম্বন্ধে নামল্, ছাবা ও আম্বিয়া প্রভৃতি সূরায় অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। সেগুলির তাফ্‌ছীরও যথাযথ স্থানে দেওয়া হইবে। এখানে আলোচ্য প্রশ্ন হইতেছে হযরত ছোলায়মানের প্রতি যাদুগরীর অভিযোগ এবং তাঁহার রাজত্বের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র। আমাদের দেশের শাস্ত্র বিশেষে যেমন "মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ" প্রভৃতি সংক্রান্ত মন্ত্রতন্ত্রের ও যাগযজ্ঞের বাহুল্য দেখা যায়, ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতগণের মধ্যেও সেইরূপ বহু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচলন ছিল। তাহারা এইসব বিদ্যা দ্বারা জনসাধারণকে নানা প্রকারে প্রবঞ্চিত করিত। অধিকন্তু তাহারা সকলকে বুঝাইত যে, ছোলায়মান নিতান্ত জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিল। এই "চরিত্রহীন ও বেঈমান" লোকটা শুধু যাদু দ্বারা জিন-ভূত ও মানব-দানব সকলের উপর হুকুমৎ চালাইয়াছিল। তাহার সেই "বিদ্যার ভাণ্ডার" আমাদের পূর্বপুরুষগণের হস্তগত হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই তাঁহারা ছোলায়মানের বিরাট সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই خزائن العلم বা বিদ্যাভাণ্ডার আমাদের অধিকারে রহিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নিজেদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করার জন্য, ইহুদীরা এই শ্রেণীর কতকগুলি বহি-পুস্তক নিজেরা রচনা করিয়া হযরত ছোলায়মানের নামে চালাইয়া দিয়াছিল। অধুনিক যুগের অনুসন্ধানের ফলে Solomons Book of Magic, Testament of Solomon প্রভৃতি কয়েকখানা পুরাতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুঁথি সম্বন্ধে Rodwell ৩৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় পুঁথি সম্বন্ধে বাইবেল-বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে :

Practically magic book, though interpersed with large haggadic sections ......it narrates the circumstances under which Solomon attained power over the world of spirits, detailed his interviews with the demons, and ends with an account of his fall and loss of power. (Ency. Biblica, col 254,No 14 —Apocrypha.)

"মধ্যে মধ্যে বড় বড় তালমুদিক উপকথার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হইলেও বস্তুতঃ ইহা একখানা যাদুপুস্তক। ছোলায়মান কি উপায়ে প্রেতজগতের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহার বর্ণনা, জিন-ভূত ও দৈত্য-দানবদিগের বিস্তারিত বিবরণ, এবং অবশেষে তাঁহার পতন ও রাজ্যচ্যুতির কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া আছে।" (Apocrypha বা জাল পুঁথি-পুস্তকের বিবরণ, ২৫৪ কলম)। ফলতঃ হযরত ছোলায়মানের নামে যাদুগরী করা ও তাহা দ্বারা জিন-ভূত ইত্যাদির উপর আধিপত্য করার যে সব কাহিনী ইহুদীরা প্রচার করিয়া আসিতেছে—সে সমস্তই পরবর্তী যুগের জঘন্য জালিয়াতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইতিহাসের অবিসংবাদিত সাক্ষ্য এই যে, নিজেদের ইহুদাদেশ ও যেরুশেলম ত্যাগ করিয়া ইহুদীরা বাবেলে নিজেদের আবাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। (Hachingson's History of Notions, ৫৫০ পৃষ্ঠা)। পারস্যরাজ কর্তৃক তাহাদের দেশ অধিকৃত ও ধর্মমন্দির বিনষ্ট হওয়ার পর, দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে পারস্যদেশে নিকৃষ্ট দাস-জীবন যাপন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত ছোলায়মানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করিয়া এবং বিভিন্ন প্রদেশের বানি-ইসরাইলের মধ্যে আঞ্চলিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াই তাহারা হযরত ছোলায়মানের পতন ঘটাইয়াছিল। দাস-জীবনে প্রথমে গ্রীকদিগের এবং পরে পারসিক ও বাবেলীদিগের নিকট হইতে তাহারা ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানবদের নানা উপকথা সংগ্রহ করে। (বিস্তারিত বিবরণ, ঐ, Art. Demon.)। হারূত-মারূতের উৎকট কেচ্ছা-কাহিনীগুলি তাহারা পার্সিকদের সংশ্রবে আসিয়া

জানিতে পারে। পাদ্রী সেল এই আয়াতের টীকায় বলিতেছেন যে, বস্তুতঃ এই গল্পটা গৃহীত হইয়াছে পারস্যের মাজী বা জরদশ্‌তের বর্ণনা হইতে। তিনিই হারূত ও মারূতের উপাখ্যানটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের পছন্দ বা Authority-ও উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন।

মুছলমান হিসাবে এইসব আলোচনার প্রতি দৃকপাত করিবার বিশেষ কোনও দরকার নাই। কোর্‌আন মাজীদে প্রতিবাদ হিসাবে এই নাম দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে। কোর্‌আনের শিক্ষা অনুসারে এই গল্পের ভূমিকা হইতে শেষ অক্ষর পর্যন্ত সমস্ত নিছক মিথ্যা। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি পাপকার্য হইতে বিরত থাকার সাধ্য মানুষের নাই। ফেরেশতারাও দুনিয়ায় আসিয়া এক্ষেত্রে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন। কোর্‌আন মাজীদে এই গল্পের সমর্থন নাই—বরং প্রতিবাদই আছে। হযরত রাছুলে কারীমের নির্ভরযোগ্য হাদীছেও এই কিচ্ছার ইঙ্গিত-আভাসও পাওয়া যায় না। হযরত আলী ও ইবন-ওমরের নামকরণে যে কয়টা অভিমত তাফ্‌ছীরের কেতাবে (দুর্ভাগ্যবশতঃ) স্থান লাভ করিয়াছে, বস্তুতঃ সেগুলি তাঁহাদের উক্তি নহে, তাঁহাদের পরবর্তী যুগে রচিত। হাফেজ ইবন-কাছীর এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

এই কাহিনীটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করার পর ইমাম রাজী বলিতেছেন :

و اعلم ان هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لانه ليس فی
كتاب ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من وجوه الخ -

"জানা আবশ্যক যে, এই বিবরণটি ফাছেদ, মরদূদ ও অগ্রহণীয়। কারণ কোনও কিতাবে ইহার সত্যতার কোনো প্রমাণ নাই, বরং তাহার বাতিল হওয়ার প্রমাণ আছে, ইত্যাদি। ইহার পর ইমাম ছাহেব ছয়টা অকাট্য যুক্তি প্রদান করিয়া এই কিচ্ছার বাতিল হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। আল্লামা আলুছী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—

فقد انكره جماعة منهم القاضی عياض ' و ذكر ان ماذكره اهل
الاخبار و نقله المفسرون فی قصة هاروت و ماروت ' لم يرد منه شیء
لا سقيم و لا صحيح - عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - ......
و نص الشهاب العراقی ' على ان من اعتقد فی هاروت و ماروت
انهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله العظيم الخ
روح المعانی ١ — ٣٢١ -

ইমাম ইবন-হাইয়ান তাঁহার তাফ্‌ছীরে বলিয়াছেন :

و هذا كله لا يصح منه شيء و الملائكة معصومون لا يعصون الله - الخ بحر المحيط ١—٣٢٩

উপরের উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইমাম রাজীর মন্তব্যেরই পূর্ণ সমর্থন হইতেছে। এই শ্রেণীর ভিত্তিহীন, জঘন্য ও ক্ষতিজনক রেওয়াতগুলিকে তাফ্‌ছীরে স্থান দিয়া কোর্‌আনের বিরুদ্ধে যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার কাফ্‌ফারা করিতে অনেক দিন লাগিবে। লেখক ও ওয়ায়েজগণের এখনও সাবধান হওয়া উচিত। সেল বলিতেছেন—মোহাম্মদ প্রত্যক্ষভাবে পার্সিকদিগের নিকট হইতে এই মিথ্যা কাহিনীটা গ্রহণ করিয়া কোর্‌আনে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। Historians History of the World-এর সম্পাদক এই শ্রেণীর উপকথাগুলি দুনিয়াময় প্রচার করার জন্য ইছলামকে প্রধান অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন (২—৭৮, ১৭১)। অবশ্য এজন্য মোহাম্মদও দায়ী নহেন এবং ইসলামও প্রকৃত পক্ষে দায়ী নহে। কিন্তু যে সব উপাখ্যানকে প্রধান প্রধান তাফ্‌ছীরকার 'ইছরাইলী উপকথা" ইত্যাদি বলিয়া ধিকৃত করিতেছেন, সেগুলিকে তাঁহারাই আবার নিজেদের তাফ্‌ছীরে স্থান দিতেছেন—এ অবিচারের কোনও কারণ বা কৈফিয়ত কি আমরা দুনিয়ার সামনে পেশ করিতে পারি?

---

১৩ রুকু

১০৪। হে মোমেনগণ! (রাছুলকে সম্বোধন করার সময়) তোমরা "রায়েনা" বলিও না, বরং "ওন্‌জোরনা" বলিও, আর (তাঁহার কথা) মানিয়া চলিও; বস্তুতঃ কাফেরদিগের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।(৭৭)	١٠٤ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
১০৫। তোমাদিগের প্রতি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিকট হইতে	١٠٥ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ

اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

কোনও কল্যাণ নাজেল করা হউক — আহ্‌লে-কেতাবদিগের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে —তাহারা, এবং মোশরেকগণ, কেহই তাহা পছন্দ করে না; অথচ নিজ রহমত অনুসারে আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা (সেই কল্যাণের জন্য) নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হইতেছেন মহা-প্রসাদশীল। (৭৮)

১০৬ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ط
اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১০৬। অবস্থা এই যে, যে কোনো "আয়াত"-কে আমরা রহিত করি অথবা তাহাকে বিস্মৃত করিয়া দেই—তাহা অপেক্ষা উত্তম অথবা তাহার অনুরূপ (অন্য) আয়াত উপস্থিত করিয়া থাকি; (হে মোমেন!) তুমি কি অবগত নহ যে, আল্লাহ্‌ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? (৭৯)

১০৭ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا
لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ
وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১০৭। (হে মোমেন!) তুমি কি অবগত নহ যে, আল্লাহ্‌,—আছমান ও জমিনের কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁহারই অধিকারভুক্ত! বস্তুতঃ তিনি ব্যতিরেকে না আছে তোমাদের (অন্য) কোনও অভিভাবক, আর না আছে (অন্য) কোনও সাহায্যকারী।

১০৮ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا

১০৮। ইতিপূর্বে মূছাকে ছওয়াল করা হইয়াছিল যে প্রকারে, (হে মোমেনগণ!) তোমরাও কি

রسولكم كما سئل موسى
من قبل ط ومن يتبدل
الكفر بالايمان فقد ضل
سواء السبيل ○

নিজেদের রাছুলের নিকট তদ্রূপ ছওয়াল উপস্থিত করিতে চাও? নিশ্চয় জানিও, ঈমানের বদলে কোফরকে গ্রহণ করিবে যে ব্যক্তি, সরলপথকে সে নিশ্চয় হারাইয়া ফেলিয়াছে। (৮০)

١٠٩ ود كثير من اهل الكتب
لو يردونكم من بعد ايمانكم
كفارا ج حسدا من عند
انفسهم من بعد ما تبين
لهم الحق ج فاعفوا واصفحوا
حتى ياتى الله بامره ط ان
الله على كل شىء قدير ○

১০৯। আহ্লে-কেতাবদিগের মধ্যে এমন বহু লোক আছে, যাহারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, ঈমান আনার পর (আবার) তোমাদিগকে কাফের বানাইয়া দিবে —নিজেদের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ, সত্য তাহাদের কাছে সুপ্রকাশিত হওয়ার পরে; অতএব আল্লাহ্ নিজের কোনও ব্যবস্থা উপস্থিত না করা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা করিয়া যাইবে ও (প্রতিবিধান সম্বন্ধে) নিবৃত্ত থাকিবে; নিশ্চয় জানিও যে, আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৮১)

١١٠ واقيموا الصلوة واتوا
الزكوة ط وما تقدموا
لانفسكم من خير تجدوه

১১০। আর নামাযকে তোমরা যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিও ও যাকাত দিতে থাকিও; আর তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য পূর্ব হইতে যেসব (মঙ্গল কর্মের) সংস্থান করিয়া রাখিবে, আল্লাহ্র হুজুরে তাহার সুফল

عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥

নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে ; নিশ্চয় জানিও তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ হইতেছেন সম্যক পর্যবেক্ষক।

١١١ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

১১১। এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা (যথাক্রমে) বলিয়া থাকে যে, ইহুদী না হইলে বা খ্রীষ্টান না হইলে কেহই জান্নাতে দাখেল হইতে পারিবে না ; এ গুলি হইতেছে তাহাদের খোশ-খেয়াল ; তুমি বল : নিজেদের দলিল-প্রমাণ উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

١١٢ بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ع ٥

১১২। হাঁ, যে কোনও ব্যক্তি হউক না কেন, সে যদি আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করে এবং বাস্তবক্ষেত্রে সে হয় সৎকর্মপরায়ণ, সে তাহার পরওয়ারদেগারের সমীপে নিজের কর্মফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে, আর কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না এই শ্রেণীর লোকদিগের জন্য এবং মর্মাহত হইবে না তাহারা। (৮২)

তাফ্‌ছীর

৭৭। টীকা : রায়েনা

'রায়েনা' শব্দের অর্থ—আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের কথা শ্রবণ করুন, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ইত্যাদি। কিন্তু ইহুদীরা ঐ শব্দকে মন্দ

অর্থে ব্যবহার করার জন্য উহার আ'য়েন বর্ণের জেরকে ঈকারের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া বলিত রায়ীনা। অর্থাৎ, হে আমাদের রাখাল। (সূরা নেছার ৪৬ আয়াত দেখুন)। কোনো জাতির সভ্যতা ও সাধারণ আদব-কায়দার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের প্রাথমিক আলাপ-কুশলের এবং সম্বোধন ও অভিবাদন প্রভৃতির মধ্য দিয়া। ইহুদী জাতি যে সে সময় সাধারণ ভব্যতার দিক দিয়াও কতদূর অধঃপাতে গিয়াছিল, তাহাদের এই শ্রেণীর সম্বোধন হইতে তাহা জানা যাইতেছে। আমাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, সুসভ্য, সমুন্নত বা প্রগতিশীল হওয়ার জন্য বে-আদব হওয়ার মোটেই দরকার করে না।

৭৮। টীকাঃ আহ্‌লে কেতাব ও মোশরেক

আহ্‌লে-কেতাব বলিতে প্রধানতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বুঝাইয়া থাকে। মোশ্‌রেক অর্থে শরীকবাদী—যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জাত বা সত্তায় এবং ছেফাৎ বা গুণে অন্য কোনও ব্যক্তিকে, বস্তুকে বা বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাঁহার শরীক বলিয়া কাজের বা বিশ্বাসের দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকে। প্রথম যুগে প্রায় সমস্ত নর-সমাজের মধ্যে শের্‌ক্‌ ও পৌত্তলিকতার প্রচলন ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতেছেন ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজ।

আয়াতে মুছলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তোমাদের কোনও মঙ্গল হউক, আল্লাহ্‌র হুজুর হইতে কোনও বিশেষ কল্যাণের অধিকারী তোমরা হইয়া যাও, এই তিন শ্রেণীর লোক তাহা সহ্য করিতে পারে না। নিজেদের ১৪ শত বৎসরের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার বহু বাস্তব নিদর্শন আমরা দেখিতে পাইব। কল্যাণ শব্দের মূল অর্থ—সকল প্রকারের পার্থিব ও পারলৌকিক মঙ্গল, ভাবার্থ নবুয়ত, এবং ইহার একটা আনুষঙ্গিক তাৎপর্য হইতেছে বাদ্‌শাহাত্‌। আল্লাহ্‌ দুনিয়ার এই শ্রেষ্ঠ নি'য়ামত আমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু তাহার যথাযথ কদর করিতে আমরা সমর্থ হইতেছি না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কোর্‌আনকে আমরা, مهجور বর্জন করিয়াছি, তাঁহার রাহমতের নবী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতিষ্ঠিত আদর্শগুলিকে আমরা শোচনীয়ভাবে ভুলিয়া বসিয়াছি। ইহার পরিণাম? উত্তরটা পাঠকগণ নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন।

৭৯। টীকাঃ নাছেখ মান্‌ছুখ

নাছেখ ও মান্‌ছুখ শব্দ দুইটি (نسخ) নাছ্‌খ মাযদার হইতে উৎপন্ন। ইহার মূল অর্থ—বিবর্তিত করা, নকল করা, লিপিবদ্ধ করা, ইত্যাদি। এখানে বিবর্তিত

করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব আয়াতের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যায়। মুছলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র কোনও কেতাব বা শরীয়ত নাজেল হইবে—মোশরেক ও আহ্‌লে-কেতাবগণ তাহা পছন্দ করে না। ১০৬ আয়াতে তাহাদের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, পূর্বের কোনও কেতাব মানুষ ভুলিয়া গিয়া থাকিলে, অথবা আল্লাহ্‌ তাহাকে বা তাহার কোনও অংশকে রহিত করিয়া দিলে, তাহা অপেক্ষা উত্তম কেতাব দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। অবস্থা বিশেষে ঠিক পূর্বের ব্যবস্থা বহাল না থাকিলেও, তাহার অনু-রূপ ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হয়। ইহাতে কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ থাকিতে পারে না।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কেতাব ও শরীয়তগুলি প্রেরিত হয় সাময়িক ও আঞ্চলিকভাবে। তখনকার নবিগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন প্রধানতঃ নিজেদের নির্দিষ্ট গোত্র ও সমাজগুলির হেদায়তের জন্য। কাজেই আল্লাহ্‌র উদ্দিষ্ট বিশ্বজনীন ইছলাম ধর্মকে পূর্ণরূপ প্রদান করার জন্য, সকল বানি-আদমের সমবায়ে এক সর্বব্যাপী ভ্রাতৃসমাজ গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে, কোর্‌আন নাজেল করা হইয়াছে।

আমি যতটুকু বুঝি, কোর্‌আনের কোনও আয়াতকে মান্‌ছুখ করা-না-করা সম্বন্ধে আয়াতে কোনও কথা বলা হয় নাই। বস্তুতঃ কোর্‌আন মাজীদে রহিত, abrogated বা মানছুখ আয়াত একটিও নাই। পূর্বে কোর্‌আনের পাঁচশত আয়াতকে মান্‌ছুখ বলিয়া গণ্য করা হইত। আমাদের বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্বন্ধে বরাবরই বিচার আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ফলে ইমাম ছায়ূতী প্রমুখ আলেমরা স্বীকার করেন যে, যে-সব আয়াতকে মান্‌ছুখ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহার অধিকাংশই বস্তুতঃ মান্‌ছুখ নহে। তিনি উহার সংখ্যা ২০টি বলিয়া সাব্যস্ত করেন (এৎকান ৪৭ বাব)। পরবর্তী যুগে স্বনামখ্যাত মোজ্‌তাহেদ শাহ অলীউল্লাহ্‌ ছাহেব উহার মধ্য হইতে ১৫টি বাদ দিয়া ৫টি মাত্র আয়াতকে মান্‌ছুখ বলিয়া ধার্য করেন। আল্লামা ছিদ্দীকুল হাছান খাঁ, শাহ ছাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন: ولیکن ان پانچ مین بهی نظار هے—"কিন্তু এই পাঁচটা সম্বন্ধেও আলোচনার বিষয় আছে।" (তারজুমান)। এই মহামান্য আলেমগণের উপর আল্লাহ্‌র রহমত সহস্রধারে বর্ষিত হউক, তাঁহাদের প্রদর্শিত বিচার পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, আজ আমরা বলিতে সমর্থ হইয়াছি যে, আল্লাহ্‌র কালামে মান্‌ছুখ আয়াত একটিও নাই।

"আয়াত"-শব্দের অর্থ চিহ্ন, লক্ষণ, প্রকাশ্য নিদর্শন, ইত্যাদি। এই হিসাবে

কোর্‌আনের এক-একটি ছেদকে, মো'জেজাকে, এবং নবুয়ত ও রেছালতকেও আয়াত বলা হয় (রাগেব, তাজুল-আরূছ প্রভৃতি)।

বলা হইতেছে—কোনও আয়াতকে যদি বিবর্তিত করি অথবা ভুলাইয়া দেই, ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার অবধারিত নিয়ম অনুসারে লোকে যদি তাহা ভুলিয়া যায়। এখানে একটা প্রশ্ন উপস্থিত করা হইতেছে যে, "রহিত করা" অর্থে যদি কোর্‌আনের কোনও আয়াতকে রহিত করা বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত বা মুছলমানগণ অথবা উভয়, কোর্‌আনের কতগুলি আয়াত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অথচ কোর্‌আনে স্পষ্ট ভাষায় হযরতকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে سنقرئك فلا تنسى "আমরাই তোমাকে পড়াইয়া দিব, সুতরাং তুমি তাহা (কোর্‌আন) বিস্মৃত হইবে না"(৮৭—৬)। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,এই আয়াতে রহিত করা ও বিস্মৃত হওয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, কোরআন সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের একদল রাবী কয়েকটা রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে,—

مما ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى بالليل ينساه بالنهار - عكرمه عن ابن عباس -

অর্থাৎ-"হযরতের উপর রাত্রে যে অহি নাজেল হইত, তিনি দিনে তাহা ভুলিয়া যাইতেন।" (এবনে কাছীর)। হাদীছের বিরুদ্ধে সমাজে আজ যে অজ্ঞতার অভিযান উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা যতই অসঙ্গত হউক না কেন, এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলি যে তাহার জন্য যথেষ্ট উপকরণ সঞ্চয় করিয়া দিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

৮০। টীকাঃ অসঙ্গত ছওয়াল করা

হযরত মূছাকে ইহুদীরা কিরূপ উদ্ভট ছওয়াল করিত, এই সূরার ৫৫ ও ৬৭— ৭১ আয়াতে তাহার পরিচয় আছে। বিনা দরকারে মছলার খুঁটিনাটি নিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা, বরযাত্রী ঠকান প্রশ্নের মত হায়রাতুল-ফেকার ছওয়াল ফাঁদিয়া মৌলবী জব্দ করার চেষ্টা পাওয়া, খুবই অন্যায়। বানি-ইছরাইলরা এইরূপে দীনকে কঠিন করিয়া নিয়াছিল। অন্যদিকে যখন জেহাদের হুকুম হইল তাহাদের উপর, তখন তাহারা বিনাদ্বিধায় হযরত মূছাকে বলিয়া দিয়াছিল—আমরা কস্মিনকালেও আদিষ্ট শহরে প্রবেশ করিব না, "অতএব তুমি যাও আর তোমার প্রভু যাউন, তোমরা গিয়া লড়াই-ভিড়াই কর,আমরা এইখানে বসিয়া রহিলাম।" (মায়েদা, ২৪)।

৮১। টীকা : মোর্তেদ করার চেষ্টা

খ্রীষ্টান সমাজ গত তিনশত বৎসর হইতে মুছ্‌লমানদিগকে মোর্তেদ করিবার বা খ্রীষ্টান বানাইয়া নেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এজন্য তাহারা প্রতি বৎসর আমাদের দেশে প্রকাশ্যভাবে বা প্রকারান্তরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছে। ইহুদীরা সেভাবে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সমাজে আবির্ভূত একচক্ষু দজ্জালের চেলাচামুণ্ডারা, এখন মোছ্‌লেম দেশগুলিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই করি নাই। খ্রীষ্টানদিগকে মুছ্‌লমান করিতে পারি বা না পারি, যে মোছ্‌লেম সন্তান-দিগকে তাহারা গোমরাহ করিয়া ফেলিয়াছে, সঙ্গতভাবে তাহাদিগকে তো আবার ইছ্‌লামের ছায়ায় ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু আজ ইহা আর দীনের কাজ বলিয়া গণ্য হইতেছে না!

৮২। টীকা : নামায ও যাকাত

উপরে যে সাধনার প্রতি মোছ্‌লেম জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, এই আয়াতে তাহার উপায় ও উপকরণের কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। এজন্য মনের বা ঈমানের দৃঢ়তা প্রথম আবশ্যক এবং তাহার উপায় হইতেছে নামায। আর দ্বিতীয়টা হইতেছে তাবলীগের ও জেহাদের জন্য বায়তুল মাল তহবিলের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ-সবের নামগন্ধও আজকাল আর শোনা যায় না।

৮৩। টীকা : মিথ্যা দাবী

ইহুদী বা খ্রীষ্টান ব্যতীত আর কেহ বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না—এরূপ কথা বলার ন্যায় মহাপাপ আর কি হইতে পারে? আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁহার জান্নাত এতদূর সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না। সত্য কথা এই যে, যে কোনও ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিবে এবং মোছ্‌লেম বান্দাহ্ হিসাবে তাহার পালনীয় সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়া যাইবে, সে-ই হইতেছে মুক্তি লাভের অধিকারী।

---

১৪ রুকু

১১৩। ইহুদীরা বলিয়া থাকে : খ্রীষ্টানরা কোনও যুক্তি-প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত) নহে, পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানরাও বলে : ইহুদীরা কোনও যুক্তি-প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত) নহে, অথচ উভয়ে

١١٣ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ
النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ
النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى

شَیۡءٍ لا وَّهُمۡ یَتۡلُوۡنَ الۡکِتٰبَ ط کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ مِثۡلَ قَوۡلِهِمۡ ج فَاللّٰهُ یَحۡکُمُ بَیۡنَهُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ فِیۡمَا کَانُوۡا فِیۡهِ یَخۡتَلِفُوۡنَ ○

তাহারা (আল্লাহ্‌র) কেতাব পাঠ করিয়া থাকে, (৮৪) এইরূপে অজ্ঞ লোকেরাও তাহাদের কথার অনুরূপ কথা বলিয়া থাকে, সে-মতে যে বিষয় তাহারা মতবিরোধ ঘটাইতেছে, কিয়ামতের সময় আল্লাহ্‌ই সে সম্বন্ধে ফায়ছালা করিয়া দিবেন।

১১৪ وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنۡ یُّذۡکَرَ فِیۡهَا اسۡمُهٗ وَسَعٰی فِیۡ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَهُمۡ اَنۡ یَّدۡخُلُوۡهَاۤ اِلَّا خَآئِفِیۡنَ ط لَهُمۡ فِی الدُّنۡیَا خِزۡیٌ وَّلَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ○

১১৪। আর আল্লাহ্‌র মাছজিদগুলিতে তাঁহার জেকের (এবাদত্-বান্দেগী) করা হইবে—ইহাতেও বাধা প্রদান করে আর সেগুলিকে বীরান করার চেষ্টা করে যাহারা, তাহাদের অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হইতে পারে? (৮৫) এই যে লোকগুলি, সশঙ্ক অবস্থায় ব্যতীত ইহাদের পক্ষে মাছজিদে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে না; ইহাদের জন্য দুনিয়াতে (অবধারিত) আছে হীন জীবন, আর আখেরাতে আছে গুরুতর আজাব। (৮৬)

১১৫ وَلِلّٰهِ الۡمَشۡرِقُ وَالۡمَغۡرِبُ ق

১১৫। আর সকল প্রাচ্য ও সকল প্রতীচ্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই অধিকারভুক্ত, অতএব যে দিকে মুখ

ফিরাও না কেন, সেই দিকেই আল্লাহ্‌র নজর বিদ্যমান; কারণ জ্ঞানে ও করুণায় সকল দিক-দিগন্তরকে ব্যাপন করিয়া আছেন তিনি। (৮৭)

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

১১৬। তাহারা বলে : আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি আছে! (ছুব্‌হানাল্লাহ!) পবিত্রতায় মহান তিনি; না, না; (মিথ্যা কথা), বরং সমগ্র আছমানের ও জমিনের অধিপতি তিনি; এবং (উহাদের) প্রত্যেকটিই হইতেছে তাঁহার ফরমাবরদার। (৮৮)

১১৬ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا لا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝

১১৭। আকাশ মণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক তিনি, কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিলে তৎসম্বন্ধে বলেন—"হউক," অমনি হইয়া যায়। (৮৯)

১১৭ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

১১৮। এবং (অজ্ঞ) লোকেরা বলিয়া থাকে : আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না অথবা আমাদের কাছে কোনো "আয়াত" উপস্থিত হয় না, কারণ কি? এইরূপে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিয়াছিল; তাহাদের অন্তরগুলি পরস্পরের অনুরূপ হইয়া গিয়াছে; প্রত্যয়শীল

১১৮ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ط تَشَابَهَتْ

قلوبهم ط قد بينا الايت لقوم يوقنون ۝

সমাজের জন্য আমরা তো আয়াত-গুলিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

١١٩ انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن اصحب الجحيم ۝

১১৯। (হে মোহাম্মাদ।) নিশ্চয় তোমাকে আমরা প্রেরণ করিয়াছি বারহাক্ রাছুলরূপে সুসমাচারদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে— বস্তুতঃ জাহান্নামের লোকদিগের সম্বন্ধে তোমার কাছে কোনো কৈফিয়ত তলব করা হইবে না। (৯০)

١٢٠ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم ط قل ان هدى الله هو الهدى ط ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم لا مالك من الله من ولى ولا نصير ۝

১২০। প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইহুদ জাতি অথবা খ্রীষ্টান সমাজ, ইহাদের কেহই তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবে না—যাবৎ না তুমি তাহাদের শরীয়তের অনুগামী হও, বলিয়া দাও : আল্লাহ্‌র (প্রদর্শিত) যে পথ, তাহাই তো হইতেছে প্রকৃত পথ ; (৯১)আর যে সত্যজ্ঞান তোমার কাছে সমাগত হইয়াছে, তাহার পরও যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনু-গামী হও, তাহা হইলে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করার মত কেহই থাকিবে না "তোমার" অলী-অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী।

١٢١ الذين اتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته ط اولئك

১২১। এবং যাহাদিগকে আমরা কেতাব প্রদান করিয়াছি,তাহারা সেই কেতাবের "তেলাঅৎ" করিয়া থাকে যথাবিহিতভাবে ;

তাহাতে সত্যকারভাবে বিশ্বাসী হইয়া থাকে তাহারাই ; পক্ষান্তরে তাহাকে অমান্য করে যাহারা, তাহারাই হইতেছে সর্বনাশগ্রস্ত।

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

তাফ্‌ছীর

৮৪। টীকাঃ ইহুদ নাছারার আত্মকলহ

ইহুদীরা খ্রীষ্টানদিগকে গোমরাহ বলে, আবার খ্রীষ্টানরাও ইহুদীদিগকে গোম্‌রাহ বলিয়া থাকে। অথচ উভয়ে তাহারা একই ইছ্‌রাইল বংশসম্ভূত, তাহাদের কাছে আল্লাহ্‌র কেতাব আসিয়াছে বলিয়া উভয়ই দাবী করে। ইহুদীরা অবশ্য যীশুকে নবী বলিয়া ও তাঁহার ইন্‌জীলকে আল্লাহ্‌র কেতাব বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু খ্রীষ্টানরা হযরত মূছাকে আল্লাহ্‌র নবী ও ইহুদীদের "পঞ্চপুস্তক"-কে আল্লাহ্‌র কেতাব বলিয়া স্বীকার করে। তাহাদের বাইবেলে পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম বলিয়া উভয়কে স্থান দান করা হইয়াছে।

কিন্তু মুখে মান্য করিলেও খ্রীষ্টানরা ঐ পঞ্চপুস্তকের আদেশ-নিষেধ একদম অমান্য করিয়া থাকে। পুরাতন নিয়ম হইতে যীশু সম্বন্ধে কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী সঙ্কলন করিয়া নেওয়াই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের কেতাবও যথাবিহিতভাবে, ও সত্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে "তেলাঅৎ" করে না। তেলাঅৎ অর্থে, পাঠ করা ও তাহার অনুসরণ করা। তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য জ্ঞানলাভ করার সঙ্কল্প নিয়া এবং সেই সত্যের অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে, যথাবিহিতভাবে—অর্থাৎ পক্ষপাতের মনোভব বর্জন করিয়া—আল্লাহ্‌র কালামের অনুশীলন করিবে, সেই শ্রেণীর নীচ দলাদলি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

মুছলমান সমাজকে চক্ষুদান করার জন্যই এই শ্রেণী বিবরণগুলি কোর্‌আনে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের তাফ্‌ছীর প্রসঙ্গে ইমাম রাজী বলিতেছেন :-

واعلم ان هذه الواقعة بعينها قد وقعت فى امة محمد صلى الله عليه و سلم، فان كل طائفة تكفر الاخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن –

"বুঝিয়া দেখ, ঠিক এই ঘটনা মোহাম্মদ মোস্তফার ওম্মতেও ঘটিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেক দল অন্য দলকে কাফের বানাইয়া চলিয়াছে, অথচ তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই কোর্আনকে আল্লাহ্র বারহাক কালাম বলিয়া পাঠ করিয়া থাকে" (কাবীর, ১—৬৮০)।

খুবই সত্য কথা। আমরা যদি যথাবিহিতভাবে—অর্থাৎ শুধু সত্য উদ্ধারের জন্য, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন ও মস্তিষ্ক নিয়া, কোর্আন মাজীদের অনুশীলন করি এবং বিভিন্নদলের বিরোধিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে হযরত রাছুলে কারীমের ছহীহ্ হাদীছগুলির বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে এই শোচনীয় পরিস্থিতির অবসান অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া যাইতে পারে। দরকার শুধু বর্তমান মানসিকতার পরিবর্তনের, উকীলের পদ বর্জন করিয়া বিচারকের আসন বির্বাচন করিয়া লওয়ার।

৮৫। টীকাঃ আল্লাহ্র মাছজিদে এবাদতে প্রতিবন্ধকতা

আল্লাহ্র মাছজিদ অর্থে, আল্লাহ্র জেকের ও এবাদত্ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত মাছজিদ। যেমন বায়তুল্লাহ্ অর্থে, "আল্লার এবাদতের ঘর"।

অতীতের কোন্ ঘটনা উপলক্ষে এই আয়াত নাজেল হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইবন-আব্বাছের নামকরণে বলা হইয়াছে যে, জনৈক খ্রীষ্টান বাদ্শাহ বায়তুল মোকাদ্দাছের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে পারস্যরাজ বাখ্ত নাছরের, একদল খ্রীষ্টানের সাহায্যে বায়তুল-মোকাদ্দাছ ধ্বংস করার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি মতই অসঙ্গত। "কারণ, ঈছার জন্মের দীর্ঘকাল পূর্বে বাখ্ত-নাছরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। আর খ্রীষ্টান সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে ঈছা হইতে। সুতরাং ঈছার পরবর্তী খ্রীষ্টানদের পক্ষে কয়েক শত বৎসর পূর্বে বাখ্ত নাছরকে সাহায্য করা সম্ভব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্টানরাও বায়তুল মোকাদ্দাছের সম্মান করিয়া থাকে। সুতরাং কোনও খ্রীষ্টান বাদশাহের পক্ষে তাহাকে ধ্বংস করার কল্পনাও করা যাইতে পারে না" (আবু-বাকার রাজী, আহ্কাম)। ইমাম রাজীও এই যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। আবু-মোছলেম বিভিন্ন যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, আয়াতটিতে হোদায়বীয়ার ঘটনারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু সুসঙ্গত কথা এই যে, হোদায়বীয়ার সন্ধির পূর্বেও কোরেশগণ হযরত রাছুলে কারীমকে ও তাঁহার ছাহাবীদিগকে মক্কার মাছজিদে অথবা অন্য কোনও মাছজিদে—যেমন আবু-বাকার ছিদ্দীকের মাছজিদে—আল্লাহর এবাদত্-বন্দেগী

করিতে দিত না। যথাসাধ্য তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করিত। মক্কা-যুগের ইতিহাসে ইহার বহু উদাহরণ বিদ্যমান আছে।

প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর অন্য সব আয়াতের ন্যায়, এই আয়াতের হুকুমও "আম" — অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষ মাছজিদে গিয়া আল্লাহ্‌র জেকের করিবে, তাঁহার এবাদত্ বন্দেগী করিবে, ইহাতে যাহারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রধানতম জালেম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, পতন যুগের প্রথম সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুছলমান সমাজ সাধারণতঃ এই নির্দেশের অমর্যাদাই করিয়া আসিয়াছে। এই জন্যই সাময়িক শাসনকর্তারা মক্কার ঘরেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চারিটা মোছাল্লা কায়েম করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদের বাল্যকালে এক শ্রেণীর পীর ও আলেমগণের প্ররোচনায় جامع الشواهد فى اخراج الوهابين عن المساجد নামক, শতাধিক মোহরযুক্ত একখানা ফাৎওয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ওহাবীদিগকে মাছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে, ইহাই ছিল ফাৎওয়ার প্রতিপাদ্য বিষয়। যুগের মোজাদ্দেদ ছৈয়দ আহমাদ বেরেলিভী মার্‌হূমের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে, তখনকার বৃটিশ রাজনীতিকরা এই "ওহাবী" শব্দটার প্রচার করিতে থাকেন এবং মোজাহেদীনের বিরুদ্ধে কয়েক-জন নিমক-হালাল মৌলবী সাহেবের সাহায্যে তাহার প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহাদের এই প্রচার যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

জোরে আমীন বলা ও নামাযে রাফ্‌য়াই-য়াদান করা, এই দুইটাই ওহাবীদের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ফাৎওয়ায় বর্ণিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ফাৎওয়ার প্রতিবাদ হিসাবে, ১২৮৯ হিজরীর রজব মাসে صراط الاهتدا فى بيان الاقتدا নামে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের মোহর দস্তখত সম্বলিত একখানা রেছালা প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাতে হানাফী মজহাবের বহু প্রামাণ্য কিতাব হইতে বহু দলিল-প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়। ইহার পর, উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আলেম ও জননায়কগণের চেষ্টার ফলে, জনমত ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়।

জেক্‌র (জেকের) শব্দের অর্থ—স্মরণ করা, মুখে উল্লেখ করা, কোর্‌আন হাদীছের নির্ধারিত এবাদত-বন্দেগীগুলি সমাধা করা।

৮৬। টীকাঃ সশঙ্ক অবস্থায় মাছজিদে প্রবেশ করা

আয়াতের এই অংশে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইতেছে যে, অতঃপর এমন এক অবস্থা উপস্থিত হইবে যে, আজ মুছলমানদিগকে আল্লাহ্‌র মাছজিদে তাঁহার

জেকের করিতে বাধা দিতেছে যেসব কোরেশ, অদূরভবিষ্যতে তাহারা পরাজিত হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগকেই মাছ্জিদুল-হারামে প্রবেশ করিতে হইবে মুছলমানদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া। ৯ম হিজ্রীর হজ্ মওছুমে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়। ইহা হইতেছে অধিকাংশ তাফ্ছীরকারের গৃহীত তাৎপর্য। অন্য তাৎপর্য অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হইবে—"এই যে লোকগুলি, বিনয় নম্র মন নিয়া মাছ্জিদে প্রবেশ করাই তাহাদের পক্ষে উচিত।" কোন্দল-কোলাহল সৃষ্টি করার ও অন্য কাহাকে উৎপীড়ন করার মানসিকতা নিয়া মাছ্জিদে প্রবেশ করা কাহারও পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। আমার মতে ইহা ব্যাপক ও অপেক্ষাকৃত অধিক সঙ্গত অর্থ।

৮৭। **টীকাঃ সবদিকেই আল্লাহ্র নজর**—মাছ্জিদে উপস্থিত হইতে যদি কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্র প্রশস্ত জমিনের উপর, যেখানে সুবিধা হয়, নামায পড়িয়া নিও। অধিকন্তু অন্ধকারের জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে যদি কেবলা নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, সে অবস্থায় আন্দাজমত যে কোনো একদিকে মুখ করিয়া নামায সম্পন্ন করিও। এই আয়াতে বিশেষ করিয়া কেবলা পরিবর্তনের আভাস দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে করার কোনও কারণ নাই। সুতরাং নাছেখ-মনছুখের কোনও প্রশ্নই এখানে উঠিতে পারে না।

৮৮। **টীকাঃ আল্লাহ্র সন্তান গ্রহণ**—বিভ্রান্ত মানব সমাজের মধ্যে এমন বহু লোক আছে, যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ এই জড়জগতে সন্তানের জনক হইতে গেলে যেসব উপায় ও উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, আল্লাহ্ তাহা করিয়াছেন। আয়াতে "অলাদ্" শব্দ আছে। উহার অর্থ "সন্তান" অর্থাৎ পুত্র-কন্যা উভয়ই। এখানে দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম সমাজকে লক্ষ্য করিয়া "সন্তান" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইব্ন বা পুত্র বলা হয় নাই।

খ্রীষ্টানরা তাঁহাদের কল্পিত যীশুখ্রীষ্টকে আল্লাহ্র begotted son বা ঔরসজাত পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহুদীদের ধর্মীয় পুঁথি-পুস্তকে আল্লাহ্র পুত্রদের সংখ্যা অনেক বেশী। মক্কার মোশরেকরা ফেরেশ্তাদিগকে আল্লাহ্র "কন্যা" বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করিত। হিন্দু সমাজের তো কথাই নাই।

"ছুব্হানাল্লাহ্"—আশ্চর্যব্যঞ্জক বাক্যে, কোনও অতিশয় আশ্চর্যজনক কথা শুনিলে বা ঐরূপ কোনও ব্যাপার দেখিলে, এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া

থাকে। এখানে মানুষের অজ্ঞতাকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই বাক্যের ব্যবহার করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র শান সম্বন্ধে কতদূর অজ্ঞ হইলে মানুষ বলিতে পারে যে, জীবজগতের অতি নগণ্য উপকরণগুলির ন্যায়, আল্লাহ্‌ও "সন্তান" উৎপাদন করিয়া থাকেন। তিনি জনক নহেন—স্রষ্টা, মালেক, অধিপতি—সকলেই তাঁহার বান্দাহ্‌, আজ্ঞাবহ—বিশ্বচরাচরের সবকিছু সর্বদা ও সর্বত্র তাঁহার আইন-কানুনের ফরমাবরদারী করিয়া চলিয়াছে।

৮৯। **টীকা: কুন্‌-ফাইয়াকুন**—"আল্লাহ্‌ 'বলেন' হউক, আর তৎক্ষণাৎ হইয়া যায়"—পদের অর্থ এই যে, তিনি যখনই কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। ফলতঃ মুখে "কুন্‌" বা "হও" বলার দরকার হয় না (কাবীর)। কওলশব্দের একমাত্র অর্থও তাহা নহে। (রাগেব)।

৯০। **টীকা: নিদর্শনের দাবী**—আরবের ইহুদী ও মোশরেক প্রভৃতি কিরূপ নিদর্শন দেখার দাবী উপস্থিত করিত, এই সূরার ৫০ আয়াত ও সূরা বানি-ইছ্‌রাইলের ৯০—৯৩ প্রভৃতি আয়াত হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৯১। **টীকা: আহ্‌লে-কেতাবদের দুরভিসন্ধি**—ইহুদী হউক, খ্রীষ্টান হউক, অথবা অন্য কোনও বিধর্মী জাতি হউক, মুছলমানদিগকে তাহাদের নিজস্ব আদর্শ, নীতি ও জাতিগত ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলাই হইতেছে তাহাদের সকলের সমবেত অভিসন্ধি। আয়াতে হযরতের মধ্যবর্তিতায় মুছলমান সমাজকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, বারহাক রাছুল, বারহাক কেতাব ও বারহাক শরীয়ত লাভ করার পরও তোমরা যদি এইসব বিধর্মীর ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র দণ্ড হইতে কেহই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র এই সতর্কবাণী সকল মুছলমানের জন্য সমানভাবে সত্য।

---

১৫ রুকু

১২২। হে বানি-ইছ্‌রাইল সমাজ! যেসব নিয়ামতের দ্বারা আমি তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছিলাম এবং যেভাবে তোমাদিগকে

।। يٰبَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اذْكُرُوْا

نِعْمَتِيَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

(সমসাময়িক) জগতের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছিলাম—তাহা স্মরণ করিয়া দেখ।

وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১২৩।—এবং সেই (মহাবিচারের) দিন সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চল, কোনও মানুষই যেদিন অন্য কোনও মানুষের (রক্ষার) জন্য যথেষ্ট হইবে না, আর কাহারও পক্ষ হইতে কোনো সুপারেশও সেদিন কবুল করা হইবে না, এবং কাহারও পক্ষ হইতে কোনো ক্ষতিপূরণও গৃহীত হইবে না আর কোনওপ্রকার সাহায্য করা হইবে না তাহাদিগকে। (৯২)

١٢٣ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

১২৪। আরও স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), ইবরাহীমকে যখন তাহার প্রভু আজ্‌মায়েশ করিলেন কতকগুলি বাক্যের দ্বারা, সেমতে ইবরাহীম সেগুলিকে সুসম্পন্ন করিল; (৯৩) (তখন) আল্লাহ্ বলিলেন—আমি তোমাকে জনগণের ইমাম বানাইতেছি; সে বলিল: "আর আমার বংশধরগণের মধ্য হইতে?" বলিলেন: জালেম লোকদিগের প্রতি আমার "নিয়ম" বর্তিতে পারে না।(৯৪)

١٢٤ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○

১২৫। আরও স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), যখন আমরা এই (কা'বা)

١٢٥ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا
مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط
وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ ٥

গৃহকে জনগণের পুনর্মিলনস্থল ও শান্তিধামরূপে (প্রতিষ্ঠিত) করিয়া দিলাম, (৯৫) আর (বলিলাম)—তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে মোছাল্লারূপে গ্রহণ করিবে? (৯৬) এবং ইবরাহীম ও ইছমাইলের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিলাম: উভয় তোমরা আমার গৃহকে পাকছাফ করিয়া রাখিবে, তাওয়াফকারী ও এ'তে-কাফকারী এবং রুকু-ছিজ্‌দা-কারীদিগের জন্য। (৯৭)

١٢٦ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط قَالَ
وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا
ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ط
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ٥

১২৬। আর (স্মরণ কর,) ইবরাহীম যখন (দো'আ করিয়া) বলিয়াছিল: হে আমার প্রভু, হে আমার পরওয়ারদেগার! এই (মক্কা) নগরকে তুমি শান্তিধাম করিও, আর তাহার বাশিন্দাদিগকে প্রচুর ফল-মেওয়া হইতে রুজী প্রদান করিও—তাহাদের মধ্যকার ঈমানদার ও আখেরাতে বিশ্বাসী লোকদিগকে—; (৯৮) আল্লাহ্ বলিলেন: আর অমান্য করিবে যে ব্যক্তি, তাহাকেও আমরা (পার্থিব জীবনের) কিছুকাল উপভোগ করিতে দিব, তাহার পর তাহাকে আমরা জাহান্নামের আজাব ভোগ করিতে বাধ্য করিব; বস্তুতঃ তাহা হইতেছে অতি নিকৃষ্ট আশ্রম।

১২৭। আরও স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), ইবরাহীম যখন (ক'বা)-গৃহের প্রাচীরগুলি (গাঁথিয়া) তুলিতেছিল—এবং তাহার সঙ্গে (ছিল) ইছমাইল; (৯৯) (তাহার প্রার্থনা করিয়াছিলঃ) হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের (এই খেদমতকে) তুমি কবুল কর। নিশ্চয় তুমি হইতেছ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

١٢٧ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ط
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১২৮।—আর, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তুমি তোমার প্রতি (নিবেদিত চিত) মোছলেম করিয়া রাখিও, এবং আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে একটি মোছলেম উম্মত (কায়েম) করিয়া রাখিও, আর আমাদের এবাদত্ বন্দেগীর স্থান ও পদ্ধতিগুলি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিও এবং আমাদের প্রতি রহমতের নজর রাখিও, নিশ্চয় তুমি হইতেছ মহা ক্ষমাশীল, কৃপানিধান। (১০০)

١٢٨ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
لَّكَ ص وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبْ عَلَيْنَا ج إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১২৯। আর, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন একজন রাছুলকে অভ্যুত্থিত করিও, যিনি তাহাদের কাছে তোমার আয়াতগুলির তেলাঅত্ করিবেন আর তাহাদিগকে শিক্ষা

١٢٩ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

দিবেন কেতাব ও প্রজ্ঞা (হেকমত) আর তাহাদিগকে পাকছাফ করিয়া তুলিবেন ; নিশ্চয় তুমি হইতেছ প্রবল, প্রজ্ঞাময়। (১০১)	وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

তাফ্ছীর

৯২। **টীকা: সতর্ক বাণী**—এই সতর্কবাণী ঘোষণা করা হইতেছে বানি-ইছ্রাইল সমাজের, বিশেষতঃ ইহুদী জাতির প্রতি। সূরা বাকারায় ইহুদীদিগের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, আর খ্রীষ্টানদিগের প্রসঙ্গ আসিয়াছে সংক্ষিপ্তভাবে। কিন্তু সূরা আল-এমরানে খ্রীষ্টানদিগের বিষয়ই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আয়াত দুইটিতে "সেদিন" বলিয়া কিয়ামতের দিনকে বুঝান হইতেছে।

৯৩। **টীকা: ইব্রাহীমের আজ্মায়েশ**—ইবরাহীম হিব্রু ভাষার শব্দ। বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, প্রথমে তাঁহার নাম ছিল আবরাম। সদাপ্রভু পরে তাহা বদলাইয়া "আবরাহাম" নাম রাখিয়া দেন। আরবী ভাষায় ইবরাহীম নামই প্রচলিত। বাইব্লেকা-বিশ্বকোষে ইবরাহীম নামের বানান-বিভেদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে ইবরানী বাইবেলে হিব্রু ভাষার একটা অক্ষর সম্বন্ধে ভ্রান্ত অনুলিখনের প্রশ্রয় দেওয়ায়, এই বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। পার্সী ভাষায় স্থান বিশেষে আদি অক্ষর লোপ করিয়া ইবরাহীমের স্থলে "ব্রাহীম" লেখা হইয়া থাকে।

আল্লাহ্ ইবরাহীমের আজমায়েশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার অন্তর্নিহিত সদ্ভাবগুলিকে নানা আপদ-বিপদের মধ্য দিয়া পুষ্ট, পূর্ণ ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীমের এই সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণ কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কলেমা শব্দের অর্থ—শব্দ, বাক্য, ফরমান, অনুজ্ঞা ইত্যাদি (রাগেব)।

৯৪। **টীকা: ইমাম বা আদর্শ নায়ক**—বহু বিপদ-আপদকে সার্থক-ভাবে অতিক্রম করিয়া এবং বিভিন্ন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসার পর, আল্লাহ্ ইবরাহীমকে ইমাম বা জনগণের নায়করূপে মনোনীত করিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহাকে পূর্ব পুরুষের অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে হইয়াছিল। পুরোহিত বংশের সন্তান হইয়াও পিতৃগণের নির্মিত বোৎগুলির

মাথায় তিনি কুঠার হানিয়াছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রগুলির পূজা-অর্চনা প্রকাশ্য-ভাবে বর্জন করিয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণের অত্যাচারে তাঁহাকে অবশেষে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। নাম্রূদের অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হইতেও তিনি তাওহীদের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্র হুকুমে বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র তরুণ পুত্রের গলায় ছুরী বসাইয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। এই সমস্ত ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর, আল্লাহ্র হুজুরে তাঁহার এই মনোনয়ন। এই জন্যই কোর্আনে তাঁহাকে "মহান আদর্শ" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহা হইতেছে ইমামতের মহত্তম ও সুন্দরতম পর্যায়। এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর আল্লাহ্ তাঁহাকে নবুয়ত দিয়াছিলেন। ইহার পরবর্তী পর্যায়গুলিতে ইমামতের বিভিন্ন শ্রেণী ও দরজা আছে।

৯৫। **টীকাঃ মাছাবা, ও আম্না বা শান্তিধাম**—কা'বার দুইটি বিশেষণ এখানে বর্ণিত হইয়াছে—মাছাবা, ও আম্না বা শান্তিধাম। মাছাবা শব্দের অর্থ—বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর জনগণের পুনর্মিলনের স্থান। শব্দের শেষে তে-বর্ণ যোগ করা হইয়াছে, এই বিশেষণের আধিক্য বুঝাইবার জন্য। ফলতঃ মাছাবা শব্দের অর্থ হইতেছে—বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় জনগণের মহা-সম্মিলন ক্ষেত্র। কা'বা গৃহের ও তাহার পরিবেশ বা হারমের এই বিশেষণ যে বাস্তবে কতদূর সত্য হইয়া আছে, বোধ হয় তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক জনপদে আজ মুছলমানের বাস। বর্ণে, বংশে ও ভাষায় তাহাদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। অজ্ঞতা বশতঃ আজ তাহারা বিভিন্ন "মাজ্হাবে" বিভক্ত। এসব সত্ত্বেও যখন তাহারা কা'বা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়, ব্যবধানের এই উপকরণগুলি তখন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন (انما المؤمنون اخوة) 'মোমেনগণ একই ভ্রাতৃ সমাজভুক্ত'—কোর্আনের এই আয়াতটির বাস্তবতা উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান হইয়া ওঠে।

আমন-শব্দের অর্থ—নিরাপত্তা। কা'বা গৃহে বা তাহার হারমের ত্রি-সীমায়, কোনও প্রকার উপদ্রব, অশান্তি, নরহত্যা, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রবেশ করিতে পারে না। এমন কি, বন্য পশুরাও এখানে সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিরাপদে বাস করিয়া থাকে। মানুষের তো কথাই নাই। প্রাক্-ইছলাম যুগের দুর্ধর্ষ আরবরাও তাহার এই সম্ভ্রম সর্বদা সততার সঙ্গে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

৯৬। **টীকাঃ মাকামে ইবরাহীম**—খানা কা'বার এক পার্শ্বে মাকামে ইবরাহীম নামে একটি স্থান আছে। তাওয়াফ শেষ করার পর এখানে দুই

রাক্‌আত নফল নামায পড়িতে হয়। হযরত ইবরাহীমের বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে প্রাক-ইছলাম যুগের আরবরাও ইহাকে সম্ভ্রমের সহিত স্মরণ করিত। আবু-তালেবের এক টা কবিতায় কা'বার মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে বলা হইতেছে :

و موطئ ابراهيم فى الصخر رطبة   على قدميه حافيا غير ناعل

হযরত রাছুলে কারীমের সময়েই উহার স্থান ও সীমা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, (বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি) এবং সমস্ত খলীফা ও ছোলতান এবং সমগ্র মোছলেম জগৎ আজ পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস ও স্বীকার করিতেছে।

মাকাম—অর্থে দাঁড়াইবার স্থান। ধর্মীয় পরিভাষায় দাঁড়ান মানে—দাঁড়াইয়া নামায পড়া। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম যেখানে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন, তোমরা সেই-স্থানকে মোছাল্লা বা নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করিবে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় মাজহাবী সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে, মাকামে-ইবরাহীমকে বর্জন করিয়া, অন্য চারিটি স্থানে চারি মাজহাবের লোকদিগের জন্য চারিটা স্বতন্ত্র মোছাল্লা কায়েম করিতে হইয়াছিল এবং প্রত্যেক অক্তে একই সময় ঐ চারিস্থানে চারিটা স্বতন্ত্র জামাআত্‌ কায়েম করা হইত। আল্লাহ্‌র হাজার হাজার শোকর, ছোলতান ইবন-ছাউদের হুকুমত কায়েম হওয়ার পর হইতে, আবার যেখানে চারি মোছাল্লার স্থলে এক মোছাল্লা কায়েম হইয়া গিয়াছে।

৯৭। **টীকাঃ তাওয়াফ ও এ'তেকাফ**—আল্লাহ্‌র ঘরকে অর্থে—আল্লাহ্‌র ঘরকে ও তাহার পরিবেশকে। পাকছাফ করা—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারের তাহারাত্‌কে বুঝাইতেছে। বাহিরের জঞ্জাল বা জঘন্য বস্তু হইতে কা'বার পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার যেমন দরকার হইবে, সেইরূপ শের্ক, বেদ্‌আত্‌, অশ্লীলতা বা অন্য প্রকার কদাচার যাহাতে তাহার ত্রি-সীমায় প্রবেশ করিতে না পারে, সেদিকেও তাঁহাদিগকে নজর রাখিতে হইবে।

আল্লাহ্‌র ফজলে মুছলমান সমাজ সাধারণতঃ এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু স্থানে স্থানে না বুঝিয়া এমন দুই-একটা অন্যায় কাজ করা হয়, তাওহীদের শিক্ষার দিক দিয়া যাহা খুবই অসঙ্গত। মাছ্‌জিদের মেহরাবগুলিতে বেশী "নকশাই" না করাই ভাল। কিন্তু এ ছাড়া অনেক স্থানে তাহাতে আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে সঙ্গে "মোহাম্মাদ বা ইয়া মোহাম্মাদ, আলী বা ইয়া আলী" প্রভৃতি নামও লিখিত হইয়া থাকে। আমাদের আলেম ও ইমাম ছাহেবেরা বিষয়টা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন না কেন?

বাংলায় তাওয়াফ—শব্দের অনুবাদ হইতেছে "প্রদক্ষিণ"। কিন্তু উহার

মধ্যে একটা শুষ্কতর রকমের মোশরেকী ঐতিহ্য লুকাইয়া আছে বলিয়া মুছলমানের পক্ষে উহা অব্যবহার্য। বিশেষতঃ প্রদক্ষিণ অপেক্ষা তাওয়াফ কথাটা সাধারণ মুছলমানের সহজ বোধ্য। মছ্‌জিন পাপ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মন ও মস্তিষ্ককে এই শ্রেণীর নাপাক আকীদা হইতে পাকছাফ করাও দরকার।

হজের মওছুমে এবং অন্য সময় কা'বার তাওয়াফ করার ব্যবস্থা আছে। হাজরে-আছ্‌ওয়াদ হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত কা'বা বেড়িয়া আবার সেখানে উপস্থিত হইলে একবার তাওয়াফ করা হয়। নর-নারী নির্বিশেষে সকলে তাওয়াফ করিয়া থাকেন। এ'তেকাফ শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিভৃত সাধনা। রামজ্বান শরীফের শেষ দশ দিন এ'তেকাফে বসিবার ব্যবস্থা আছে। রুকু-ছিজ্‌দাকারী অর্থে নামাযী, অর্থাৎ যাহারা নামায পড়িতেছে বা পড়িবে।

৯৮। টীকাঃ মক্কা নগর—প্রথমে ইবরাহীম দোআ করিয়াছিলেন—কা'বা গৃহের নিরাপত্তার জন্য, এখন দোআ করিতেছেন মক্কা শহরের ও তাহার বাশিন্দাদিগের নিরাপত্তা বা ছালামতের জন্য। হযরত ইবরাহীমের উভয় দোআই আল্লাহ্‌র হুজুরে মঞ্জুর হইয়াছিল। প্রাক্-ইছলামী সাহিত্যে দেখা যাইতেছে যে, কোরেশ প্রধানগণও মক্কা ও কা'বার নিরাপত্তা সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিত। আব্রাহার আক্রমণের সময়, মক্কার পুরোহিত বংশের অন্যতম প্রধান পুরুষ আবু-তালেব, আব্রাহার কাছে গিয়া নিজের উটগুলি ফেরত পাওয়ার দরবার করিলে, আব্রাহা বলেনঃ "কি আশ্চর্যের কথা, অনতি-বিলম্বে আমি আপনাদের ধর্ম-মন্দির(কা'বা)ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, আপনি নিজের উট কয়টা ফেরত পাওয়ার জন্য দরবার করিতে আসিয়াছেন।" আবু-তালেব বলিলেন—"সেনাপতি! উটগুলির মালিক আমি, তাই ফেরত নিতে আসিয়াছি। আর কা'বার যিনি মালিক, তাহাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা তিনিই করিবেন।"

এই মরুনগরে দুনিয়ার প্রায় সব রকম ফল ও মেওয়া সর্বদাই আমদানী হইতেছে। খেজুর ও আঙ্গুরের তো অভাব নাই। রাজভাণ্ডারে অর্থেরও এখন অভাব নাই। পেট্রোলিয়মের বিনিময়ে কোফরুস্তানের ধন কুবেররা রাঁশি রাশি সোনা লোহিত সাগরের উপকূলে ঢালিয়া দিয়া যাইতেছেন। মনোযোগ করিয়া কাজে নামিলে আর পাশ্চাত্য বিলাস-ব্যসনের মোহ কাটাইতে পারিলে, পানির অভাবও ইন্‌শাআল্লাহ্ অনতিবিলম্বে দূর হইয়া যাইবে।

৯৯। টীকাঃ কা'বা গৃহের নির্মাণ—আয়াত হইতে জানা যাইতেছে

যে, হযরত ইবরাহীম, নিজের তরুণ পুত্র হযরত ইছ্‌মাইলকে সঙ্গে নিয়া কা'বার নির্মাণ কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের রাবীরা বলিতেছেন, প্রথমে কা'বা নির্মাণ করেন ফেরেশতারা, তৎপর হযরত আদম, হযরত শীশ। কিন্তু এই বিবরণগুলি রাবীদের ব্যক্তিগত মত। তাহা ছাড়া হাদীছ পরীক্ষার নিয়ম অনুসারে অগ্রহণীয়। "এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলির অধিকাংশই ইহুদ-নাছারাদের পুরাণ পুঁথি হইতে গৃহীত হইয়াছে।" (ইবন-কাছীর)। দুনিয়াতে ইহাই সর্বপ্রথম এবাদাত্‌খানা (এমরান, ৯৫)।

কা'বা নির্মিত হওয়ার পর উভয় পিতাপুত্র তাহাকে পেশ করিতেছেন আল্লাহ্‌র হুজুরে, আর প্রার্থনা করিতেছেন—তুমি ইহা কবুল কর। সব এবাদতের মূল কথা হইতেছে নিয়ত, নাফ্‌ছানিয়তের মোকাবেলায় লিল্লাহিয়তের এই অনভূতি। আজকাল স্থানে স্থানে দলাদলির জন্য মাছ্‌জিদ তৈরী করা হয়। খোশনাম অর্জনের জন্যও করা হয়। এই শ্রেণীর বিষয়গুলি হইতেছে নাফছানিয়ত। ইহার সংস্পর্শ ঘটিলে সৎকর্ম ব্যর্থ হইয়া যায়।

১০০। **টীকা : তৃতীয় প্রার্থনা**—ইহা হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় প্রার্থনা। আমরা যেন মোছ্‌লেম হইয়া থাকি এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতে যেন একটি মোছ্‌লেম উম্মতের অভ্যুত্থান হয়—ইহা ছিল এই আদর্শ পিতা-পুত্রের সমবেত প্রার্থনা। মোছ্‌লেম শব্দের অর্থ—সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী। মহানবী ইবরাহীম ও তাহার যোগ্য পুত্র পূর্ণ মোছ্‌লেমরূপে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদেরই বংশধরগণের মধ্য হইতে যে সেই মোছ্‌লেম-উম্মতের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, দুনিয়ার পঞ্চাশ কোটি মুছলমানই তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

১০১। **টীকা : চরম প্রার্থনা**—মোনাজাতের শেষভাগে তাঁহারা আল্লাহ্‌র দরগাহে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের, অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইছ্‌মাইলের বংশধরদিগের মধ্যে একজন রাছুল প্রেরণ করিতে। সঙ্গে সঙ্গে সেই রাছুলের তিনটি বিশেষণের উল্লেখ করিতেছেন :

(১) তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত আয়াতগুলি জনসাধারণের নিকট তেলাঅৎ করিবেন,

(২) তাহাদিগকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ কেতাবের মর্ম বুঝাইয়া দিবেন, এবং হেমকত বা প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতে থাকিবেন,

(৩) তিনি তাঁহাদিগকে নিজের আদর্শ ও শিক্ষার দ্বারা সকল প্রকার অপবিত্রতা ও অজ্ঞতা হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন।

প্রথম বিশেষণে বলা হইতেছে কোর্‌আনের আয়াতগুলি পড়িয়া শুনাইবেন। দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হইতেছে : তিনি শুধু আবৃত্তি করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, বরং সকলকে তাহা শিখাইয়া ও বুঝাইয়া দিবেন। ইহার পর واو عاطفه আনিয়া বলা হইতেছে—এবং হেকমতের বা প্রজ্ঞার শিক্ষাও তাহাদিগকে প্রদান করিবেন। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, কেতাবের শিক্ষা ও হেকমত শিক্ষা দুইটি এক বস্তু নহে। অন্যথায় ঐ শব্দ দুইটির মধ্যে "ওয়াও" বর্ণ ব্যবহার করা হইত না। আমি ফকীরকে একটা টাকা ও একখানা কাপড় দিলাম—বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, টাকা ও কাপড় এক বস্তু নহে "পার্সী শিক্ষক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন—গুলিস্তান ও আমদনামা"—বলিতে ইহাই বুঝাইবে যে, গুলিস্তাঁ ও আমদনামা কখনও এক কেতাব নহে। "গুলিস্তাঁ অর্থাৎ আমদনামা"—এরূপ ব্যাখ্যা পাগলেও করিতে পারে না। সেই রাছুল আসিয়া শিক্ষা দিবেন কোর্‌আন ও হেকমত বলিতেও "কোর্‌আন অর্থাৎ হেকমত" বলাও এইরূপ অসঙ্গত হইবে।

হেকমত শব্দের অর্থ — اصابة الحق بالعلم و العقل অর্থাৎ বিদ্যা ও জ্ঞানের—এলেম ও আকলের সাহায্যে সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া (রাগেব)। জ্ঞান মানুষের সহজাত বৃত্তি, বিদ্যা সেই বৃত্তির বিকাশ ও বিবর্তনের প্রধান সহায়। কোর্‌আনের শিক্ষায় সবই আছে, নীতিগতভাবে ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনার নিয়ামতটাও আল্লাহ্‌র দান। কোর্‌আনে বিভিন্ন স্থানে এই عقل বা বুদ্ধি বিবেচনার সদ্ব্যবহার করিতে ও অপব্যবহার না করিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। এই দুইয়ের যুগপৎ সমবায়ে মানুষের অন্তরদেশে যে আলোকের উদ্ভব হয়, তাহাকে বলা হয় হেকমত। আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি "প্রজ্ঞা" বলিয়া। ইহাই হেকমত শব্দের প্রকৃত অনুবাদ।

আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র রাছুল মোহাম্মদ মোস্তফা প্রেরিত হইয়াছেন, মানব সমাজকে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত কেতাবের তা'লীম দিতে এবং তাঁহার প্রদত্ত হেকমতের শিক্ষা দিতে। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, হেকমত বলিতে কেতাব ছাড়াও আরও কিছুকে বুঝাইতেছে। এই "আর কিছুর" বাস্তব তাৎপর্য বলিতে কোনও একটা বিষয়কে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। ইহার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদিগকে সন্ধান করিতে হইবে, মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন ইতিহাসের, বিশেষতঃ তাঁহার ২৩ বৎসর ব্যাপী নবী জীবনের, সাধনা ও সিদ্ধিগুলির অনুপম ও সুরক্ষিত ইতিবৃত্তের। কোর্‌আনের তা'লীম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হযরত রাছুলে কারীম

উম্মতকে তাহার ধর্ম জীবনের কর্মসাধনা সম্বন্ধে আরও যেসব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির সমষ্টিগত নাম হইতেছে হেকমত এবং মোহাদ্দেছগণের পরিভাষায় ইহারই বিশেষণ হইতেছে ছুন্নাহ্—পথ বা পদ্ধতি। পথ বা পদ্ধতির নাম ছুন্নাহ্, আর এই পদ্ধতির যে বাস্তব স্বরূপ, তাহাকেই আমরা বলিয়া থাকি "হাদীছ" اسم ও مسمى বা নাম ও বিশেষ্যের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও পার্থক্য থাকে না। সুতরাং ছুন্নাহ্ বা হাদীছের মধ্যেও কোনও পার্থক্য নাই। আমাদের পরম ভক্তিভাজন মোহাদ্দেছগণ, বহু যুগব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, এই হাদীছগুলি আমাদের জন্য বিভিন্ন পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে কোনও প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে তাঁহারা ত্রুটি করে নাই। রাবীদিগের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য এবং হাদীছের আভ্যন্তরীণ ও ঐতিহাসিক বিচার আলোচনার জন্য, তাঁহারা রেজাল ও উছুলে হাদীছের যেসব মহামূল্য জ্ঞানভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাস-দর্শনের অমূল্য ও অতুল্য সম্পদ। ইউরোপের মনীষীরাও এই সত্যটি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কতকগুলি ভিত্তিহীন বিবরণ ও জাল রেওয়ায়ৎ হাদীছের নামকরণে আমাদের ধর্মীয় সাহিত্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহা সত্য কথা। কিন্তু আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি মোহাদ্দেছগণ সেগুলিরও সন্ধান আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর দুষ্ট লোক নোট ও টাকা জাল করিয়া থাকে, আর তাহা চালাইয়া দেওয়ারও যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদেব খাঁটি টাকা ও নোটগুলিকে আমরা নদীতে ফেলিয়া দেই না, টাকশাল ও ট্রেজারীগুলিকেও পুড়াইয়া ফেলি না।

---

১৬ রুকু

১৩০। বস্তুতঃ নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে যে ব্যক্তি, সে ব্যতীত ইবরাহীমের (অবলম্বিত) ধর্ম পথ হইতে আর কে বিমুখ হইতে পারে? অথচ দুনিয়াতে তাহাকে আমরা নির্বাচন করিয়া নিয়াছিলাম এবং আখেরাতেও সে হইতেছে সাধুসজ্জনগণের অন্যতম।	১৩০ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১৩১। তাহার পরওয়ারদেগার যখন, বলিলেন : "আত্মসমর্পণ কর!" সে বলিল, "সারাজাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুরে নিজেকে সমর্পণ করিলাম।" (১০২)

١٣١ إذ قال له ربه أسلم لا قال
أسلمت لرب العلمين ○

১৩২। আর ইবরাহীম নিজ পুত্র-গণকে ইহারই অছিয়ত করিয়া গিয়াছিল এবং (তাহার পৌত্র) ইয়াকুবও সেই অছিয়ত করিয়া-ছিল : 'হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য এই দীনকে নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং সাবধান (আত্ম-সমর্পিত) মোছলেম অবস্থাতেই যেন তোমাদের মৃত্যু হয়!

١٣٢ ووصى بها إبرهم بنيه
ويعقوب ط يبنى إن الله
اصطفى لكم الدين فلا تموتن
إلا وأنتم مسلمون ط ○

১৩৩। (হে ইহুদ সমাজ) ইয়াকুবের মৃত্যুকালে তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল —আমার পরে কিসের এবা-দত্-বান্দেগী করিবে তোমরা? তাহারা বলিয়াছিল : আমরা এবাদত্ করিব তোমার মা'বূদের এবং তোমার পিতৃ-পুরুষগণের —ইবরাহীমের ও ইছমাইলের ও ইছহাকের—একক মা'বূদ আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আমরা হইতেছি তাঁহারই প্রতি (আত্মসমর্পিত) মোছলেম। (১০৩)

١٣٣ أم كنتم شهداء إذ حضر
يعقوب الموت لا إذ قال
لبنيه ما تعبدون من بعدى ط
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك
إبرهم وإسمعيل وإسحق إلها
واحدا ج ونحن له مسلمون ○

১৩৪। সে ছিল এক উম্মত—চলিয়া গিয়াছে তাহারা, তাহাদের অর্জিত কর্মের ফল তাহাদের জন্য এবং তোমাদের অর্জিত কর্মের ফল তোমাদের জন্য, আর তাহাদের কৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না। (১০৪)

١٣٤ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْـَٔـلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥

১৩৫। আর ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা (যথাক্রমে) বলিয়া থাকে: তোমরা ইহুদী বা খ্রীষ্টান হইয়া যাও—সুপথ প্রাপ্ত হইবে; বলিয়া দাও: কখনই নয়, পরন্তু (আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব) একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মপথের, বস্তুতঃ মোশরেকদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তিনি।

١٣٥ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥

১৩৬। তোমরা বল: আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্‌র প্রতি ও আমাদের প্রতি নাজেল হইয়াছে যাহা—তাহার প্রতি এবং ইবরাহীমের, ইছমাইলের, ইছহাকের, ইয়াকুবের ও (তাঁহার) সন্ততিবর্গের প্রতি যাহা নাজেল হইয়াছে—সে সমস্তের প্রতিও (ঈমান আনিয়াছি), —এবং মূছা ও ঈছা এবং অন্যান্য নবিগণ তাঁহাদের পরওয়ার দেগারের তরফ হইতে যেসব কালাম প্রদত্ত হইয়াছেন, সে সমস্তের প্রতিও (ঈমান আনিয়াছি),

١٣٦ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

তাঁহাদের মধ্যে (নবী হিসাবে) কোনও পার্থক্য করি না আমরা, আর আমরা হইতেছি তাঁহার দরগাহে (সমর্পিত চিত) মোছলেম। (১০৫)

احد منهم ۖ ونحن له مسلمون ○

১৩৭। অতএব, তোমরা যেরূপে (সকল নবীর প্রতি) ঈমান আনিয়াছ তাহারাও যদি সেই-রূপে ঈমান আনে, সে অবস্থায় তাহারা তো সুপথ পাইয়া গেল, আর যদি ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে (বুঝিতে হইবে যে,) তাহারা জেদ তুড়িবার চেষ্টায় আছে, সে অবস্থায় তোমাদের জন্য আল্লাহই হইবেন তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট—বস্তুতঃ তিনি হইতেছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা ;

١٣٧ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ج وان تولوا فانما هم فى شقاق ج فسيكفيكهم الله ج وهو السميع العليم ط

১৩৮। (গ্রহণ কর) আল্লাহর "অভিষেক," বস্তুতঃ আল্লাহর অপেক্ষা উত্তম অভিষেক আর কাহার হইতে পারে ? বস্তুতঃ আমরা হইতেছি একমাত্র তাঁহারই এবাদত্-গোজার। (১০৬)

١٣٨ صبغة الله ج ومن احسن من الله صبغة ز ونحن له عبدون ○

১৩৯। বল : তোমরা কি আমাদের সঙ্গে হুজ্জত করিতে আসিতেছ আল্লাহ্ সম্বন্ধে। অথচ তিনি (যেরূপ) আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার, (সেইরূপ) তোমা-

١٣٩ قل اتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ج ولنا اعمالنا

দেরও পরওয়ারদেগার, আর আমাদের আমলগুলি আমাদের জন্য, এবং তোমাদের আমল-গুলি তোমাদের জন্য, অধিকন্তু তাঁহার একনিষ্ঠ উপাসক আমরা।

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ۙ

১৪০। তোমরা কি বলিতে চাও যে, ইব্‌রাহীম, ইছ্‌মাইল, ইছ্‌হাক, ইয়াকুব ও তাঁহাদের বংশধরগণ ইহুদী বা নাছারা ছিলেন? বল, তোমরা অধিক অবগত, না আল্লাহ্‌ (অধিক অবগত)? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সমাগত সাক্ষ্য-সাবুতগুলি তাহাদের কাছে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহা গোপন করিয়া ফেলে যে ব্যক্তি, সে অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হইতে পারে? আর নিশ্চিত জানিও যে, তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ আদৌ উদাসীন নহেন। (১০৭)

١٤٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهِيمَ وَ
إِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا
أَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ
أَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا
اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১৪১। সে ছিল এক উম্মত—চলিয়া গিয়াছে তাহারা, তাহাদের অর্জিত কর্মের ফল তাহাদের জন্য আর তোমাদের অর্জিত কর্মের ফল তোমাদের জন্য, আর তাহাদের কৃত-কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না।

١٤١ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ
وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ○ ع

তাফ্ছীর

১০২। **টীকাঃ ইব্রাহীমের মিল্লাত**—মিল্লাত ও দীন মূলের হিসাবে এক অর্থবাচক শব্দ। আল্লাহ্ নবিগণের মারফতে নিজের যে ধর্মপদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তাহারই নাম মিল্লাত বা দীন। পার্থক্য এই যে, দীনের সম্বন্ধ করা হয় আল্লাহ্র সঙ্গে। যেমন বলা হয় دين الله বা আল্লাহ্র দীন। কিন্তু মিল্লাত শব্দের সম্বন্ধ হইয়া থাকে নবীর সঙ্গে। যেমন বলা হয়—ملة ابراهيم ইব্রাহীমের মিল্লাত ملة رسول الله রাছুলুল্লাহ্র মিল্লাত। কিন্তু আল্লাহ্র মিল্লাত বা রাছুলের দীন বলা যাইতে পারেনা (রাগেব)। সংক্ষেপে, ইব্রাহীমের মিল্লাত অর্থে—ইব্রাহীমের প্রবর্তিত ধর্মপদ্ধতি ও সেই ধর্মপদ্ধতির কর্মপদ্ধতি।

ইব্রাহীমের ধর্মপদ্ধতি হইতেছে খালেছ তাওহীদ, অমিশ্র ও অমিশ্র একেশ্বরবাদ। আর এই ধর্মপদ্ধতির কর্মপদ্ধতি হইতেছে, সেই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার সাধনা—সকল শ্রেণীর জড়পূজা, নরপূজা, প্রেত ও প্রতীক পূজা, অবতারবাদের সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিশাপ হইতে মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে মুক্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা। ইহুদী, খ্রীষ্টান, হেজাজের আরব সমাজ—বিশেষতঃ মক্কার কোরেশ সকলই হযরত ইব্রাহীমকে নিজেদের "কুলপতি" বলিয়া স্বীকার করিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবর্তিত মিল্লাত বা ধর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধাচারণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহুদীরা খোদা বানাইয়া নিয়াছিল (احبارهم ورهبانهم) নিজেদের পণ্ডিত পুরোহিত বা পীর-ফকীরদিগকে। ত্রিত্ববাদের আকীদা মাত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া খ্রীষ্টান সমাজ গির্জায় গির্জায় মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা-অর্চনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এক আল্লাহ্র এবাদতের জন্য প্রতিষ্ঠিত কা'বার মধ্যে, ইছ্মাইলের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী কোরেশ সমাজ ৩৬০টা পুতুল ও প্রতীক প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল। দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত এই অনাচারের প্রতিবাদ করিয়া এই শ্রেণীর আয়াতগুলিতে মিল্লাতে ইব্রাহীমের জয় যাত্রার নূতন অভিযানকে আশীর্বাদ জানান হইতেছে।

এই অভিযানের প্রস্তুতি শেষ হওয়ার ও তাঁহার দো'আ মোনাজাত সমস্তই আল্লাহ্র দরগাহে পেশ হইয়া যাওয়ার পর হুকুম আসিল—"আছলেম," আত্মসমর্পণ কর—"মোছলেম হও।" অবিলম্বে ডাকে সাড়া দিয়া ইবরাহীম বলিলেন—হে সারা জাহানের পোষক, প্রতিপালক ও মালিক, আমি তো তোমারি হুজুরে আত্মসমর্পণ করিয়াই আছি।

১০৩। **টীকাঃ মোছলেম উম্মতের অভিন্ন আদর্শ**—দুনিয়ার যত

নবী রাছুলের বিবরণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সকলেরই আদর্শ ছিল তাওহীদ ও ইছলাম এবং সকল উম্মতের নাম ছিল মোছ্‌লেম। মোছ্‌লেম অবস্থায় মরিবে—কথার অর্থ—মোছ্‌লেমভাবে বাঁচিবে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এইভাবের ব্যতিক্রম হইতে দিবে না।

১০৪। **টীকা: একটা অনর্থক কলহ**—এক জাতি, এক ধর্মাবলম্বী ও একই ধর্মশাস্ত্রের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে ধর্মেরই নামকরণে দীর্ঘকাল হইতে, জঘন্য হিংসা-বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুর সংঘাত-সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। ইহার একটা উদাহরণ হিসাবে পরবর্তী আয়াতে বলা হইতেছে— ইহুদীরা মুসলমানদিগকে বলিয়া থাকে, যদি সত্য পথ পাইতে চাও, তাহা হইলে ইহুদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কর। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানরা বলিতেছে, ইহুদীরা তো হইতেছে পথভ্রষ্ট গোমরাহ সমাজ। সত্যপথ যদি ধরিতে চাও, তাহা হইলে এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তিন খোদায় বিশ্বাস কর, মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর। শুধু এইরূপ বিশ্বাস করিলেই তোমাদের সমস্ত পাপ আপনা আপনি মোচিত হইয়া যাইবে। এই কলহ-কোন্দল উপস্থিত করা হইয়াছে হযরত মূছা ও হযরত ঈছার বোজর্গীর তারতম্য নিয়া।

কোর্‌আন এই শ্রেণীর অনর্থক কলহ-কোন্দলের নিন্দা করিয়া বলিতেছে— অতীতের লোকগুলি কি করিয়াছে, না করিয়াছে, সেসব বিষয় নিয়া আত্মকলহ উপস্থিত করার কোনই সার্থকতা নাই। তাহারা ভোগ করিবে নিজেদের কর্ম-ফল, আর তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে নিজেদের কর্মফল, এবং অতীত কালের লোকদিগের কর্মাকর্মের কৈফিয়ত তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে হইলেও, মুছলমানদের মধ্যেও এই হঠকারিতা বহু শতাব্দী ধরিয়া আসন জমাইয়া আছে। আলী বড়, না আবু-বাকর বড়, ইহা নিয়া মুছলমান জাতির মধ্যে একটা নূতন উম্মতের স্বষ্টি হইয়া গিয়াছে। আবু-হানিফা বড়, না শাফেয়ী বড়, ইহা নিয়া কতকগুলি জাল হাদীছের স্বষ্টিও হইয়া গিয়াছে। অথচ কোর্‌আনের এই আয়াতগুলি আমরা সকলেই অহরহ তেলাঅৎ করিয়া যাইতেছি।

১০৫। **টীকা: বিশ্বধর্মের স্বরূপ**—ইছলাম বাস্তবিকই বিশ্বধর্ম, বিশ্বের সমস্ত মানুষকে নিয়া একটা দুনিয়া জোড়া ভ্রাতৃসমাজ গড়িয়া তোলাই তাহার আদর্শ। ইহার প্রথম প্রমাণ, তাহার উদার মহান নীতি। দুনিয়ার সকল নবী রাছুলকে ইছলাম মাথায় তুলিয়া নিয়াছে। নবুয়ত রূপ আল্লাহ্‌র রহমতকে ইছলাম কোরেশ গোত্রের মধ্যে, আরব দেশের বা আরবী ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ

করিয়া রাখে নাই। কোনও দেশের মানুষকে অনার্য, দস্যু-তস্কর, অসুর বা রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখায় নাই।

মূছা ও অন্যান্য নবী বলিতে দুনিয়ার সকল নবী-রাছুলকে বুঝাইতেছে। কোর্‌আনে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেক নবী-রাছুল আছেন, যাঁদের উল্লেখ কোর্‌আনে হয় নাই (মোমেন, ৭৮ আয়াত)। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান যুগের মুছলমানগণ নিজেদের মতিগতির পরিবর্তন করিয়া নিতে সমর্থ হইলে, অনতিবিলম্বে বিশ্বভ্রাতৃ সমাজ গঠনের এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে পরিণত হইয়া যাইবে। আমার তো মনে হয়, রাশিয়াই হয় তো মুছলমান হইয়া যাইবে—যেমন মোছলেম জাহানের মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেওয়ার পর, বিজেতা তাতারী জাতি আশাতীতভাবে মুছলমান হইয়া গিয়াছিল, এবং পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত উলঙ্গ তরবারি হাতে নিয়া ইছলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এখন শুধু দরকার মুছলমানদের সত্যকারভাবে সম্পূর্ণভাবে মুছলমান হওয়ার। সেই মোছলেম হওয়ার অঙ্গীকারই এই কয়টা রুকুর সমস্ত শিক্ষার প্রাণবস্তু।

১০৬। **টীকাঃ আল্লাহ্‌র অভিষেক**—পার্শী, হিন্দু, ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সংস্কার বা অভিষেকের নিয়ম প্রচলিত আছে। সেই সব নিয়ম পালিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। খ্রীষ্টানরা জর্দান নদীর পানি দিয়া এই অভিষেক কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। ইছলাম ধর্মে এরূপ কোনও নিয়ম নাই।

আলোচ্য আয়াতে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানগুলির প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বিশ্বাস বা ঈমানের দ্বারা অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাই হইতেছে আসল কাজ। মাথায় তেল মাখিলে, দেহের উপর জর্দান বা গঙ্গার পানি ঢালিলে, অথবা বুকের উপর কয়েক গাছা সূতা ঝুলাইয়া দিলে সেদিক দিয়া মানুষের কোনই উপকার হয় না।

আয়াতে (صِبْغَة) ছেব্‌গাতুন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার ধাতুগত অর্থ—রঞ্জন বা রঙ্গান। বিশেষ্যপদে, রঙ্গ করার উপকরণ। ভাবার্থে —কোনও একটা বস্তুকে নূতন রঙ্গে রঙ্গাইয়া ফেলা, পূর্ব সংস্কারমুক্ত করিয়া মানুষের মনপ্রাণকে নূতনভাবে ও নূতন বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। এখানে মানব সাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—তোমরা আল্লাহ্‌র "অভিষেক"কে—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেওয়া অভিষেককে—অবলম্বন কর। ইহার

অর্থ হইতেছে, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যে فطرت বা স্বাভাবি কবিবেক-বুদ্ধি নিহিত করিয়াছেন, তোমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখ। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, দীন-ইছলাম সেই স্বাভাবিক ধর্মের সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১০৭। **টীকা ঃ জ্ঞানবিকারের পরাকাষ্ঠা**—ইহুদীরা বলে ঃ ইহুদ না হইলে কেহই নাজাত পাইবে না। এইরূপে খ্রীষ্টানরাও বলিয়া থাকে যে, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করিলে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নহে। ১৩৫ আয়াতে দুই দলের এই দাবী পেশ করার পর এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, ইবরাহীমকে এবং ইছহাক ও ইয়াকুব প্রমুখ তাঁহার বংশধর নবী ও রাছুলগণকে, তোমরা দুই দলই নিজেদের ধর্মের প্রবর্তক ও মহাপুরুষ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাক। এখন বল দেখি, তাঁহারা কি ইহুদী ছিলেন, না নাছারা (খ্রীষ্টান) ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর তাহাদের কাছে নাই। কারণ মূছা ও ঈছা পয়দা হইয়াছেন ইবরাহীম প্রমুখ নবিগণের বহু শতাব্দী পরে, এবং মূছায়ী ও ঈছায়ী ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়াছে, নিশ্চিতভাবে মূছা ও ঈছার আগমনের পরে। এই দীর্ঘকাল ব্যবধানের মধ্যে যে সকল নবী-রাছুলের আগমন হইয়াছিল এবং যে লক্ষ লক্ষ নেককার বান্দাহ্ তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই কি পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ অবস্থায় ইন্তেকাল করিয়াছেন? ইঁহাদের কেহই কি নাজাত পাইবেন না?

এই শ্রেণীর প্রশ্ন আজ মুছলমান সমাজের সম্মুখে অতিশয় তীব্রভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা আসিয়াছে—আলী ও আবু-বাকর শীয়া ছিলেন, না ছুন্নী ছিলেন? ওমর ও ওছমান শাফেয়ী ছিলেন, না হানাফী?—ইত্যাদি। কেহ যদি বলে—আবু-বাকর, ওমর, ওছমান, আলী, আবু-হানিফা, মালেক, শাফেয়ী, আজমিরী ও জীলানী প্রভৃতি মহাত্মা ব্যক্তিরা যে মজহাবের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, আমিও সেই মজহাবের অনুসরণ করি, তাহা হইলে তাহাকে লা মজহাব বা বেদীন বলা হইবে, কোর্‌আন-হাদীছের কোন্ প্রমাণ এবং ইতিহাসের কোন্ নজীর অনুসারে?

দ্বিতীয় পারা

১৭ রুকু

১৪২। নির্বোধ লোকেরা এখন বলিতে আরম্ভ করিবে: মুছলমানেরা এযাবৎ যে কেবলাকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে বিমুখ হইয়া গেল কি কারণে? বলিয়া দাও, পূর্ব ও পশ্চিম সমস্তই আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত; তিনি যাহাকে ইচ্ছা, সত্য ও সরলপথের পানে পরিচালিত করেন। (১০৮)

١٤٢ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا ط قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥

১৪৩। এবং (হে মোছলেম সমাজ!) এই পদ্ধতিক্রমে তোমাদিগকে আমরা (প্রতিষ্ঠিত) করিলাম একটি "মধ্যস্থ" উম্মতরূপে— যেমতে তোমরা হইয়া থাকিবে পর্যবেক্ষক বিশ্বমানবের উপর, আর রাছুল হইবেন তোমাদের পর্যবেক্ষক; (১০৯) বস্তুতঃ (হে রাছুল!) তুমি যে কেবলাকে এযাবৎ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছ, তাহাকে আমরা কেবলারূপে বহাল রাখিয়াছিলাম—কে রাছুলের অনুসরণ করিয়া চলে, আর কে নিজের দুই গোড়ালীর উপর

١٤٣ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ

ভর দিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়—তাহা বাছাই করিয়া দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যে; যদিও আল্লাহ্‌র হেদায়তপ্রাপ্ত লোকেরা ব্যতীত, অন্য সকলের পক্ষে ইহা ছিল কঠিন (পরীক্ষা); বস্তুতঃ তোমাদের ঈমানকে পণ্ড করিয়া দেওয়া তো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সকল মানুষের প্রতি প্রেমপ্রবণ, করুণানিধান। (১১০)

ممن ينقلب على عقبيه ط وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله ط وما كان الله ليضيع ايمانكم ط ان الله بالناس لرءوف رحيم ○

১৪৪। (হে মোহাম্মদ!) তোমার উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, সেমতে তোমার সন্তোষ জনক হইবে যে কেবলা, তাহার অধিনায়ক আমরা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া দিব, অতএব এখন হইতে তুমি (নামাযে) মাছ্‌জিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাইতে থাক; আর (হে মুছলমানগণ!) তোমরা যে কোন স্থানে অবস্থান কর না কেন মুখ ফিরাইবে তাহারই পানে; (১১১) কেতাব প্রদত্ত হইয়াছিল যাহারা, তাহারাও নিশ্চিতভাবে জানিতেছে যে, ইহা আল্লাহ্‌র অবধারিত বারহাক্ কেবলা; বস্তুতঃ তাহাদের কৃত কর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ্ কখনই গাফেল নহেন। (১১২)

١٤٤ قد نرى تقلب وجهك في السماء ج فلنولينك قبلة ترضها ص فول وجهك شطر المسجد الحرام ط وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ط وان الذين اوتوا الكتب ليعلمون انه الحق من ربهم ط وما الله بغافل عما يعملون ○

١٤٥ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا
قِبْلَتَكَ ج وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ
قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ لا إِنَّكَ إِذًا
لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ٥

১৪৫। অবস্থা এই যে, কেতাব দেওয়া হইয়াছিল যাহাদিগকে, তুমি যদি প্রত্যেকটি আয়াত (দলিল প্রমাণ ও নিদর্শন) তাহাদিগের কাছে পেশ করিয়া দাও, তবুও তাহারা তোমার কেব্‌লার অনুসরণ করিবে না, পক্ষান্তরে তুমিও আর তাহাদের কেবলার অনুসরণ করিতে পারিতেছ না, অধিকন্ত তাহাদের একদলও (কেবলা সম্বন্ধে) অন্য দলের অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক নহে ; * আর দেখ, সত্য সংবাদ লাভ করার পরও যদি তুমি তাহাদের অন্যায় অভিলাষগুলির অনুসরণ করিয়া চলিতে, নিশ্চয় সে অবস্থায় তুমিও হইয়া যাইতে জালেম - দিগের অন্যতম।

١٤٦ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُو-
نَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ط
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥

১৪৬। কিতাব দিয়াছিলাম যাহাদিগকে, উহাকে তাহারা চিনিতেছে— যেভাবে নিজেদের পুত্রদিগের চিনিয়া থাকে ; অবস্থা এই যে, তাহাদিগের মধ্যকার একদল লোক সত্যকে গোপন করিয়া ফেলিতেছে নিজেদের জ্ঞাতসারে।

١٤٧ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُمْتَرِينَ ع

১৪৭। তোমার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে সমাগত এই সত্য, অতএব তুমি দ্বিধাগ্রস্ত লোকদিগের দলভুক্তও হইও না। (১১৩)

* ইহুদীরা যেরূশালেমের দিকে ও খ্রীষ্টানরা পূর্বমুখে উপাসনা করিত। মূর "লাইফ অব মোহাম্মদ" ১০৯ পৃষ্ঠা।

তাফ্‌ছীর

১০৮। **টীকাঃ কেবলার পরিবর্তন**—মানুষ যেদিকে বা যে বস্তুর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়, অভিধানের হিসাবে তাহাকে কেব্‌লা বলা যাইতে পারে। মুছলমানেরা মক্কা শহরের মাছজিদুল-হারাম বা কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়া থাকে, সেই জন্য কা'বাকে মুছলমান জাতির কেব্‌লা বলা হয়।

সব গুরুতর বিষয়ের সমস্ত আদেশ-নিষেধ একই দিনে নাজেল করা হয় নাই, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই আদেশ-নিষেধগুলি প্রকাশ করা হইয়াছিল উম্মতের মানসিক উৎকর্ষের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে। মুছলমানেরা কোন্‌দিকে মুখ করিয়া নামাযে খাড়া হইবে, আমি যতদূর জানি, ইছলামের প্রথম যুগে, এমন কি হিজরতের পর ১৬ বা ১৭ মাস পর্যন্ত, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাহার কোনও বিধান নাজেল হয় নাই। এরূপ অবস্থায় হযরত রাছুলে কারীম সেই নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিতেন এবং অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য নিজে ইজতেহাদ বা বিচার-বিবেচনা করিয়া অথবা সময় ও অবস্থা বিশেষে আহ্‌লে-কিতাবদের অনুসরণ করিয়া, তখনকার মত একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া দিতেন। বায়তুল-মোকাদ্দাছের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ার ব্যবস্থাও প্রথমদিকে এইভাবে প্রবর্তন করা হইয়াছিল।

এইরূপে হিজরতের ১৬, ১৭ মাস পরে এই রুকুর আয়াতগুলি নাজেল হয় এবং ইহার অনুজ্ঞা অনুসারে, কা'বাই চিরকালের জন্য বিশ্ব-মুছলমানের কেবলা-রূপে নির্ধারিত হইয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহাই কেবলা নির্ধারণের প্রথম আয়াত, সুতরাং অন্য কোনও আয়াত রদ বা মানছুখ হওয়ার কোনও প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না। কারণ, ইহার পূর্বে কেবলা নির্ধারণ সম্বন্ধে অন্য কোনও আয়াত নাজেল করা হয় নাই।

উপরে বর্ণিত নির্বোধ লোকগুলির প্রশ্নের উত্তরে আয়াতের শেষ অংশে বলা হইতেছে—পূর্ব ও পশ্চিম সকল দিকের মালিক হইতেছেন আল্লাহ্‌। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিম বলিয়া কোন্দল উপস্থিত করার কোনই কারণ নাই। সেই মালিক যদি তাঁহার বান্দাদের নামায আদা করার জন্য একটা দিক নির্ধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই নির্ধারণে তাঁহার কোনো একটা মঙ্গল ইচ্ছা নিশ্চয় নিহিত আছে। পরবর্তী আয়াতে সেই ইচ্ছার সুস্পষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে।

১০৯। **টীকাঃ কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য**—আয়াতের প্রথমেই বলা হইতেছে كذالك এই প্রকারে। অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তন করিয়া দিয়া, তোমাদিগকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করিলাম এক امة وسطا বা মধ্যস্থ উম্মতরূপে। وسط শব্দের আভিধানিক অর্থ—সমান ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি সীমান্তের মধ্যভাগে বিরাজমান কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়। ব্যবহারে উহার অর্থ—নিরপেক্ষ ও ন্যায়-বিচারক ব্যক্তি, কোনো বস্তুর মধ্যভাগ বা কোনো দুইটি চরমপন্থী মতের সুসঙ্গত সমন্বয়, ইত্যাদি। আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমি উহার অনুবাদ করিয়াছি 'মধ্যস্থ' বলিয়া। আল্লাহ্ মুছলমানদিগকে মধ্যস্থ উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যেমতে তাহারা হইয়া থাকিবে সমগ্র বিশ্বমানবের পর্যবেক্ষক, আর আল্লাহ্‌র রাছুল হইয়া থাকিবেন তাহাদের চিরন্তন পর্যবেক্ষক।

শুহাদা—মূলে "শুহাদা" শব্দ আছে। উহার একবচন শাহেদ ও শহীদ। ইহার ধাতুগত মূল অর্থ—উপস্থিত থাকিয়া কোনো বিষয় দর্শন করা বা অবগত হওয়া; যাহা দেখা বা জানা হইয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করা; ইমাম বা আদর্শ হিসাবে কাহারো পথ-প্রদর্শক হওয়া; ইত্যাদি। আমি "পর্যবেক্ষক" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

মোছলেম সাধক তাহার জাতীয় জীবন-সাধনার সমস্ত আলোক ও প্রেরণা সঞ্চয় করিবে আল্লাহ্‌র কোর্‌আন হইতে, তাঁহার রাছুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার তা'লীম ও আদর্শ হইতে। হযরতের ২৩ বৎসর নরজীবনে এই শিক্ষা ও সাধনা সুসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। নবীজীবনের সমস্ত কর্তব্য সমাধা করিয়া তিনি ইন্‌তেকাল করিয়াছেন দৈহিক হিসাবে। কিন্তু তাঁহার মধ্যবর্তিতায় প্রকাশিত আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁহার অন্যান্য আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদি কোর্‌আন ও হাদীছের মধ্য দিয়া জীবন্ত হইয়া আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু রাছুলের ইন্‌তে-কালের পর, বিশ্বমানবের পর্যবেক্ষণের ও তাহাদিগকে শান্তির ও মুক্তির পথ দেখাইবার ভার অর্পিত হইয়াছে তাঁহার উম্মতের উপর। উম্মত এই কর্তব্য কি পরিমাণে পালন করিয়াছে না করিয়াছে এবং মানব-সাধারণ সেই পায়গামকে কি পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে না করিয়াছে, দুনিয়াতে ও আখেরাতে উম্মতের সকলকে তাহার হিসাব-নিকাশ দিতে ও ফলাফল ভোগ করিতে হইবে।

হযরত ইবরাহীম ছিলেন দুনিয়ায় اول المسلمين অর্থাৎ প্রথম বা প্রধান মোছলেম। বস্তুতঃ মানব সমাজে অমিশ্র ও অনাবিল তাওহীদ-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল সর্বপ্রথমে হযরত ইবরাহীমের দ্বারা এবং তাঁহার পরে, তাঁহারই

আদর্শের অনুসারী ও তাঁহার বংশধর নবী ও রাছুলগণের যুগ যুগ ব্যাপী সাধনা ও সংগ্রামের ফলে। কিন্তু কালক্রমে এবং পণ্ডিত-পুরোহিতগণের অজ্ঞতা ও অনাচারের ফলে, সে শিক্ষা বিকৃত হইয়া যায় এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ নানা দলে বিভক্ত ও নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে সুসংহত ও একত্র সমবেত করার জন্য, একটা সাধারণ ও সর্ববাদীসম্মত কেন্দ্রের দরকার ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে মাছজিদুল-হারাম বা কা'বার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ইবরাহীমের বংশধর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) সেই কা'বার সম্ভ্রমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই অমিশ্র তাওহীদ ধর্মকে পুনঃপ্রবর্তিত করিতেছেন, আয়াতের মূল বক্তব্য হইতেছে ইহাই।

কা'বার মহিমামণ্ডিত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সূরা এমরানের ৯৫, ৯৬ আয়াতের তাফ্‌ছীর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১১০। **টীকা: কেবলা পরিবর্তনের পরীক্ষা**—নবুয়ত লাভের পর তের বৎসর পর্যন্ত হযরত রাছুলে কারীম মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা, দুই চারিজন বাদে, তাঁহারা সকলেই ছিলেন কোরেশ বংশ সম্ভূত, কা'বাই ছিল তাঁহাদের প্রধানতম "ধর্ম মন্দির" এবং তাঁহারাই ছিলেন সেই মন্দিরের সেবাইত ও পুরোহিত। পক্ষান্তরে বানি-ইছরাইল সমাজের সহিত তাঁহাদের ছিল দায়াদ হিসাবে বৈরভাব ও ধর্মের দিক দিয়া মতবিরোধ। একদিকে এই চিরাচরিত সংস্কার ও তজ্জনিত অভিমান, এবং অন্যদিক ছিল ইহুদ সমাজের প্রতি এই বিদ্বেষ ও বৈরভাব। এই অবস্থায় হযরত তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিলেন—ইবরাহীমের প্রতিষ্ঠিত কা'বাকে ছাড়িয়া ইহুদীদের নির্মিত বায়তুল-মোকাদ্দাছের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল, 'মন্দিরের' বোতগুলির পূর্বে মনের বোতগুলির উপর আঘাত করার। এই আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল, এবং ইহার ফলে দুর্বল ঈমানের কয়েকটা লোক ইছলামকে বর্জন করিয়াছিল বটে। কিন্তু আর সকলে পরীক্ষার এই আঘাতকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দান বলিয়া বুক পাতিয়া বরণ করিয়া নিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে মদীনায় হিজরত করার পর মুছলমানদিগের প্রধান সংঘাত-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অঞ্চলের শক্তিশালী ইহুদ গোত্রগুলির সহিত। কিন্তু হিজরতের দেড় বৎসর পরে ঘোষণা করা হইতেছে, বায়তুল মোকাদ্দাছের পরিবর্তে কা'বাকে কেবলারূপে গ্রহণ করার নির্দেশ। এখানেও উদ্দেশ্য হইতেছে অন্যায় সংস্কার ও অসঙ্গত অভিমানের মস্তকে কুঠারাঘাত করার।

খ্রীষ্টান লেখক ও পাদ্রী ছাহেবরা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের

দুষ্টপ্রতিভার অপচয় করিয়া আসিয়াছেন, ইছলাম ধর্মের ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন-চরিতের মধ্যে, যেন-তেন প্রকারে একটা কিছু "কু" আবিষ্কার করার জন্য। কা'বা পরিবর্তনকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা বলিতেন—ইহা ছিল মোহাম্মদের কোরেশদিগকে সন্তুষ্ট করার একটা অভিসন্ধি। কিন্তু অভিসন্ধি থাকিলে হিজরতের পূর্বে মক্কাকে ও তাহার পরে বায়তুল মোকাদ্দাছকে কেবলা-রূপে গ্রহণ করা হইত—যথাক্রমে কোরেশ ও ইহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

১১১। **টীকাঃ হযরতের উৎকণ্ঠা**—আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইবরাহীমের নির্ধারিত কা'বা মোছলেম জাহানের চিরন্তন কেবলা বলিয়া অবধারিত হইল। কিন্তু তাওহীদের সেই প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র আজও পৌত্তলিকদের হস্তগত, কা'বা আজও ৩৬০টি পুতুল-প্রতীকে পূর্ণ হইয়া আছে, এবং ইবরাহীমের রূহানী ওয়ারেছগণ আজও তাহার হজ ও জিয়ারত হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে—এই অনুভূতি স্বাভাবিকভাবে মোস্তফার মন-প্রাণকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই আয়াতের এই অংশে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলা হইতেছে—তোমার অনুভূতি ও উৎকণ্ঠার বিষয় আল্লাহ্‌ অবগত আছেন। মক্কার মাছজিদুল-হারাম নিশ্চয় ইবরাহীমের সত্যকার উত্তরাধিকারীদের আয়ত্তে আসিবে। তোমরাই তাহাকে সকল অনাচার হইতে মুক্ত করিবে। বলা আবশ্যক, কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশের সহিত এই আয়াতের কোনও প্রকার বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। বরং ইহা পূর্ব-নির্দেশের সমর্থক মাত্র।

দুনিয়ার মুছলমান, তা সে যে-কোনো মতের বা মজহাবের অনুসারী হউক না কেন, কা'বাকে নিজেদের কেবলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহ্‌র হুকুম, তাহারা সকলে নামায পড়িবে এই কেবলার দিকে মুখ ফিরাইয়া। মূলতঃ তাহারা যে এক ও অভিন্ন, কোর্‌আন ও কা'বা তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাক্‌আতে এই সত্যটা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

১১২। **টীকাঃ আহ্‌লে-কেতাবদের আচরণ**—"কিতাব প্রদত্ত হইয়াছিল যাহারা" বলিয়া ইহুদী সমাজের পণ্ডিতদিগকে বিশেষভাবে বুঝান হইতেছে।

সূরা এমরানের ৯৫ আয়াতে মক্কাকে "বাক্কা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয় নামই আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (ঐ সূরার ৯৫, ৯৬ আয়াতের টীকাগুলি দ্রষ্টব্য)। এই বাক্কা বা মক্কার "খোদার ঘরের" মহিমা সম্বন্ধে জবুর বা গীত সংহিতায় হযরত দাউদ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছেন:

فطوبى للسكان فى بيتك رامى الابد يسبحونك - مغبوط هو الرجل

الذی نصرته من عندك' مطالع فی قلبه یضع - فی وادی البکا فی المکان الذی وضعته فیه لان البرکات بعطیها واضع الناموس -

"مبارك وہ هیں جو تیرے گهر میں بستے هیں' وہ سدا تیری ستایش کرینگے - مبارك وہ انسان جس میں قوت تجهه سے هے - ان کے دل میں تیری راهیں هیں' وہ بکا کی وادی میں گذر کرتے هوئے اسے ایك کنواں بناتے - پہلی برسات اسے برکتوں سے ڈهانپ لیتی -

Blessed are they that dwell in Thy house ; they will be still praising Thee, Blessed is the man whose strength is in Thee ; in whose heart are ways of Thee. Who passing through the valley of Bacca make it a well ; the rain also filleth the pools.

মোবারকবাদ তাহাদের জন্য, যাহারা তোমার গৃহে বাস করিতেছে, তাহারা সততঃ তোমার তাহ্‌বীহ্‌ (স্তবস্তুতি) করিতে থাকিবে, মোবারক সেই ব্যক্তি, যাহাকে নিজ সন্নিধান হইতে সাহায্য করিয়াছ, তোমার পথগুলি যাহার অন্তরে নিহিত আছে—বাক্কার সমতল ভূমিতে, যে স্থানে তুমি তাহাকে স্থাপন করিয়াছ, কারণ নামূছের প্রতিষ্ঠাতা তাহাকে বহু বরকত প্রদান করিবেন। (৮৩, ৪-৬)।*

১১৩। **টীকাঃ মোহাম্মদ আহ্‌লে-কেতাবদের সুপরিচিত**—পূর্ব বর্তী আয়াতের শেষ অংশে হযরতকে এল্‌ম বা সত্য-সংবিদ দেওয়ার কথা বলা হইতেছে। উহা হইতে তাঁহার নবুয়তকে বুঝাইতেছে। এই আয়াতে বলা হইতেছে—যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারা "উহাকে" চিনিতেছে—যেরূপে চিনিয়া থাকে নিজেদের পুত্রদিগকে। এখানে উহাকে বলিতে ঐ নবুয়তকেই বুঝাইতেছে। কারণ, یعرفونه ক্রিয়াপদের "হু" জমীর বা সর্বনামের ইহাই হইতেছে নিকটতম বিশেষ্যপদ (কাবীর)।

---

১৮ রুকু

১৪৮। প্রত্যেকের জন্য একটা লক্ষ্য আছে—সে সেই লক্ষ্যের অভি-

١٤٨ ولكل وجهة هو موليها

---

* বাইবেলের অনুবাদগুলি ক্রমশঃ কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে উপরের অনুবাদ তিনটি হইতে তাহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। আমি আরবীর অনুসরণে, নিজেই বাংলা অনুবাদ করিয়া দিলাম। কারণ ঐ অনুবাদটিতে বাক্কা নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনুবাদের চরম বিকার করা হইয়াছে।

মুখী হইয়া চলে, অতএব তোমরা (হে মুছলমানগণ!) দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিবে সৎকর্মগুলির পানে; (১১৪)(দুনিয়ার)যে কোনও স্থানে থাক না কেন তোমরা, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে (একত্রে) সমবেত করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১১৫)

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৪৯। এবং তুমি যে স্থান হইতে বহির্গত হও না কেন, নিজের মুখ ফিরাইবে মাছজিদুল-হারামের দিকে; নিশ্চয় ইহা হইতেছে তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে (প্রেরিত) বারহাক (নির্দেশ); বস্তুতঃ তোমরা যেসব আমল করিয়া থাক, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে গাফেল নহেন।

١٤٩ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫০। আবার (বলিতেছি), তুমি যেখান হইতে বহির্গত হও না কেন, মুখ ফিরাইবে মাছজিদুল-হারামের দিকে; এবং তোমরা যেখানে থাক না কেন, নিজেদের মুখ ফিরাইবে তাহারই দিকে—যেন ঐসব লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত করার কিছু না থাকে,—অবশ্য তাহা-

١٥٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لا

لئلا يكون للناس عليكم حجة ق الا الذين ظلموا منهم ق فلا تخشوهم و اخشوني ق ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ۵

দের মধ্যকার জালেম যাহারা, (তাহারা তো হুজ্জত করিবেই); —(১১৬) কিন্তু (সাবধান!) কদাচ তাহাদিগকে ভয় করিও না, পরন্তু ভয় করিয়া চলিও একমাত্র আমার,—এবং সেমতে তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করিয়া দিব, আর সেমতে তোমরা (লক্ষ্যে পেঁাছিবার) পথ প্রাপ্ত হইতে পারিবে—(১১৭)

১৫১ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم ايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ۵

১৫১। সেরূপে তোমাদের মধ্যে একজন রাছুলকে পাঠাইয়াছি তোমাদিগেরই মধ্য হইতে, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতগুলির তেলাঅৎ করিতেছেন, তোমাদিগকে পাক-ছাফ করিয়া দিতেছেন, আর তোমাদিগকে কেতাবের ও জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, অধিকন্তু এমন সব বিষয়ের শিক্ষা তোমাদিগকে প্রদান করিতেছেন, যাহার কোনো খবরই তোমরা অবগত ছিলে না।

১৫২ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ۵ ع

১৫২। অতএব তোমরা স্মরণ করিতে থাকিবে আমাকে—আমিও তোমাদিগকে স্মরণে রাখিব—এবং শোকরগোজারী করিতে থাকিবে আমার, আর কদাচ আমার কৃতঘ্ন হইবে না।

তাফ্ছীর

১১৪। **টীকা ঃ মুছলমানের লক্ষ্য ও আদর্শ**—অমুছলমান জাতিগুলির প্রত্যেকেরই এক-একটা লক্ষ্য আছে। তাহারা সেইসব লক্ষ্যমুখী হইয়া কাজ করিয়া থাকে। জাতি হিসাবে মুছলমানেরও একটা বিশেষ লক্ষ্য ও স্বতন্ত্র আদর্শ আছে। সুতরাং তাহাদিগকে সেই লক্ষ্যমুখী ও আদর্শ-অনুসারী হইয়া চলিতে হইবে। ১৪৩ আয়াতে সেই আদর্শের সুস্পষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই রুকুর ১৫০ ও ১৫১ আয়াতে তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

১১৫। **টীকা ঃ সম্মেলন কেন্দ্র**—এই আয়াতের শেষ অংশে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে তোমরা বিক্ষিপ্ত হইয়া থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে একত্রে সমবেত করিবেন। কিয়ামতের দিন মুছলমানরা হাশরের ময়দানে সমবেত হইবে, অনেকের মতে এখানে তাহারই কথা বলা হইয়াছে। অন্যেরা অন্যান্য প্রকার মতও প্রকাশ করিয়াছেন।

কিয়ামতে দুনিয়ার সকল মানুষকে যে একত্র সমবেত করা হইবে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু "সমবেত হওয়ার" অর্থ যে সর্বত্রই কিয়ামতের ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইবে, ইহা স্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে ইহার কোনও قرينه صارفه বা স্পষ্ট ইঙ্গিতও নাই। আমার মতে হজ মওছুমের বিশ্ব-মোছলেমের সাংবাৎসরিক সম্মেলনের প্রতিই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ১২৫ আয়াতে বর্ণিত "মাছাবা" শব্দের তাৎপর্যও ইহাই। সূরা হজের ২৭ আয়াতে এই বিশ্ব-মোছলেম সম্মেলনের কথাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়াতে বলা হইতেছে যে, কা'বাকে আল্লাহ্তাআলা মোছলেম জাহানের চিরন্তন কেন্দ্ররূপে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দুনিয়ার যে কোনো কেন্দ্রে অবস্থান করুক না কেন, হজের মওছুমে তাহারা দলে দলে এই কেন্দ্রে সমবেত হইয়া যাইবে।

১১৬। **টীকা ঃ "কা'বার দিকে"**—আয়াতে মুছলমানদিগকে মাছ্জিদুল-হারাম বা কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে আদেশ দেওয়া হইতেছে। কা'বার দিকে, অর্থাৎ কা'বা যেদিকে আছে সেইদিকে। প্রধান দিক চারিটি —পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। কা'বা আমাদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তাই আমরা নামায পড়ি পশ্চিম দিকে ফিরিয়া। আমাদের বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকের শত শত ও সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যবধানের মুছলমানরাও পশ্চিম দিকে

মুখ করিয়া নামায পড়িয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যেদিকে কা'বা গৃহের অবস্থান, সেইদিকটাই এখানে লক্ষ্য—ঠিক কা'বা গৃহটাই লক্ষ্য নহে।

আয়াতে পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, বাহ্যতঃ এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু আয়াতগুলির শব্দ বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যাইবে যে, আয়াতগুলিতে বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক অবস্থার জন্য স্বতন্ত্রভাবে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, কা'বার দিকে মুখ ফিরাই-বার। "যেখান হইতে বহির্গত হও না কেন"—বলিয়া ছফরের অবস্থার নামাযকে, এবং "যেখানে অবস্থান কর না কেন"—বলিয়া গৃহে অবস্থান করার সময়ের নামাযকে বুঝান হইতেছে। এইরূপে কোনো আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে কেবল হযরতকে লক্ষ্য করিয়া, আবার কোনো আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্রভাবে, পক্ষান্তরে উপসংহারে তাকীদ দেওয়া হইতেছে নবী ও তাঁহার উম্মতকে একত্রভাবে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য বর্ণনার এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

মদীনার পরিবেশে তিন শ্রেণীর লোকের বাস ছিল—ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক। ইহারা সকলেই হযরত ইবরাহীমকে মান্য করিত এবং তাহাকে প্লাবনের পরবর্তী যুগের আদি গোত্রপতি ও প্রধান ধর্ম-প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিত। মদীনার ও মক্কার পৌত্তলিক সমাজগুলিও কা'বাকে তাহাদের ধর্মীয় কেন্দ্র বলিয়া চিরকাল স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম-পুস্তকেও কা'বার এই মহিমা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই কা'বাকে কেবলারূপে গ্রহণ করা হইলে, ন্যায়তঃ তাহাদের কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য হঠধর্মী জালেমদিগের কথা স্বতন্ত্র। মোছলেম সমাজ তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবে।

১১৭। **টীকাঃ আল্লাহ্‌র নিয়ামত**—কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম ও ইছমাইল আল্লাহ্‌র দরগাহে মোনাজাত করিতেছেন—হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার, এই কাবাকে তুমি কবুল করিয়া নিও, আমাদের পিতাপুত্রকে আর আমাদের উত্তরাধিকারীদিগকে মোছলেম করিয়া রাখিও এবং আমাদিগের বংশধর ও উত্তরাধিকারীদিগকে তোমাতে-আত্মসমর্পণকারী মোছলেম উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিও। (১২৮ আয়াত)। কা'বা কেবলারূপে গৃহীত হওয়াতে এই দোআর প্রথম অংশ বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়। ইহা হইল মোছলেম জাহানের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রথম নিয়ামত বা অনুগ্রহ দান।

রবর্তী (১৫১) আয়াত ইহার সঙ্গে সংলগ্ন। ইহার প্রথমে বলা হইতেছে সেইরূপে" অর্থাৎ যেরূপে ইবরাহীম ও ইছমাইলের প্রথম দোআকে আমরা কবুল করিয়াছি, সেইরূপে তাহাদের দ্বিতীয় দোআকেও কবুল করিয়াছি, এবং তদনুযায়ী তোমাদের মধ্যে একজন রাছুলকে প্রেরণ করিয়াছি। ইহা হইতেছে আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় নিয়ামত। এই দুই নিয়ামতের কল্যাণে মোছলেম উম্মত দুনিয়া ও আখেরাতের অন্য সব নিয়ামতের অধিকারী হইতে পারিবে। (১২৯ আয়াত ও তাহার টীকা দেখুন)।

এই অধিকার লাভের জন্য মোছলেম উম্মতকে জীবন সাধনার কোন্ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, পরবর্তী রুকুতে তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

১১৮। টীকাঃ জেকের ও শোকর—আয়াতে জেকের (জেক্‌র) ও শোকর (শোক্‌র) শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। জেকের শব্দের অভিধানিক অর্থ—মুখে কোনো বিষয়ের উল্লেখ করা অথবা মনে মনে কোনো বিষয়কে স্মরণ করা। ইছলামের বিশেষ পরিভাষায় ইহার অর্থ—মনে মনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, তাঁহার মহিমা অনুভব করা এবং মুখে আল্লাহ্‌র নাম বা মহিমা বর্ণনা করা। অবস্থা বিশেষে উভয় পদ্ধতির দরকার হইয়া থাকে এবং উভয় প্রকার জেকেরের সমর্থন কোর্‌আন ও হাদীছ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ-সম্বন্ধে বাদবিতণ্ডার কোনই কারণ নাই। তবে, প্রকাশ্য জেকেরের নামে হৈ-হল্লা বা নর্তন-কুর্দন করা সর্বতোভাবে অন্যায়। সূরা রা'আদে বলা হইয়াছে:

ألا بذكر الله تطمئن القلوب

"জানিয়া রাখ, মানুষের অন্তরাত্মা স্বস্তিলাভ করিতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র জেকেরে।" এই শান্তি ও স্বস্তিভাবের লাঘব হইতে পারে, জেকেরের নামে এরূপ কোনো কাজ করা উচিত হইবে না।

শোকর-অর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও প্রকাশ। মুখে শোকর আলহামদু লিল্লাহ্ ...ল "কৃতজ্ঞতা প্রকাশ" হইতে পারে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার অন্তরের কথা, তাহার প্রকাশ হয় কাজে। মোছলেম-জীবনের প্রত্যেক স্তরে এইরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তাকীদ আসিয়া থাকে এবং অধিকাংশ সময় আমরা তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকি। অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত স্বজনগণের পরিবেশে, গণ্ডে-পিণ্ডে আহার করার পর, ঢেকুরের সঙ্গে সঙ্গে "শোকর আলহামদু লিল্লাহ্" বলিয়া তৃপ্ত থাকার নাম শোকর নহে, আর জেহাদের কর্তব্য পালনের পরিবর্তে হুজরায় বসিয়া তছবীহ জপার নামও "জেকের" নহে।

১৯ রুকু

١٥٣ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ٥

১৫৩। হে মোমেনগণ। তোমরা শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিবে ছবরের ও ছালাতের মাধ্যমে ; নিশ্চয়, ছবরকারী বান্দাদের সঙ্গে আছেন আল্লাহ্।

١٥٤ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ
اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ٥

১৫৪। আর (সাবধান।) আল্লাহ্‌র রাহে কতল্ করা হয় যাহাদিগকে, তাহাদিগকে তোমরা মৃত বলিয়া উল্লেখ করিও না ; না, না, বরং (সত্যকথা এই যে) তাহারা জীবিত আছে, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতেছ না। (১১৭)

١٥٥ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَ
الثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ٥ لا

১৫৫। নিশ্চয় আমরা তোমাদের আজমায়েশ করিব—কিছুটা ভয়ের দ্বারা, আর কিছুটা ক্ষুধার দ্বারা, আর কিছুটা ধন, প্রাণ ও ফলশস্যাদির ক্ষতি দ্বারা ; এবং (হে রাছুল।) তুমি খোশখবর দিয়া রাখ সেই সকল ছবরকারী লোকদিগকে—

١٥٦ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ
قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ

১৫৬।—তাহাদের উপর কোনও মছিবত উপস্থিত হইলে যাহারা বলিয়া থাকে—"আমরা তো আল্লাহ্‌রই, আর আমাদের সকলকেই

رٰجِعُوْنَ ؕ

তো (একদিন) ফিরিয়া যাইতে হইবে তাঁহারই পানে।" (১২০)

١٥٧ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۫ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

১৫৭। এই যে লোকগুলি, ইহাঁদের উপর (বর্ষিত) হয় তাহাদিগের পরওয়ারদেগারের অশেষ আশীর্বাদ ও রহমত, এবং এই লোকগুলিই হইতেছে হেদায়ত-প্রাপ্ত। (১২১)

١٥٨ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

১৫৮। নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া হইতেছে আল্লাহ্‌র (নিরূপিত) নিদর্শনগুলির মধ্যকার দুইটি নিদর্শন, সেমতে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ বা ওমরা করে, সে ঐ দুইটির মধ্যে যাতায়াত করিলে তাহার প্রতি কোনও পাপ বর্তায় না ; অবস্থা এই যে, কেহ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনো সৎকর্ম সম্পন্ন করে সে অবস্থায় (জানা উচিত যে,) আল্লাহ্ হইতেছেন গুণগ্রাহী ও সর্ববিদিত। (১২২)

١٥٩ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ

১৫৯। আমরা যেসব সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নাজেল করিয়াছি এবং "কেতাবে" যেগুলিকে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি,

بعد ما بينه للناس في الكتب لا اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون ۙ

ইহার পরেও সেগুলিকে গোপন করিয়া রাখিবে যাহারা, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং অন্যসব (সত্যনিষ্ঠ) ব্যক্তিরাও তাহাদের প্রতি লা'নত করিয়া থাকে,— (১২৩)

١٦٠ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم ط وانا التواب الرحيم ○

১৬০। তবে তাওবা করে যাহারা, ও নিজেদের (অতীত) দোষত্রুটিগুলির সংশোধন করে যাহারা, এবং (আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে) স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়া দেয় যাহারা—এইসব লোকের তাওবা আমি কবুল করিব, বস্তুতঃ আমি হইতেছি তাওবা গ্রহণকারী, কৃপানিধান।

١٦١ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملئكة والناس اجمعين ۙ

১৬১। নিশ্চয় যাহারা অমান্য করিয়াছিল এবং সেই কাফের (অমান্যকারী) অবস্থাতেই মৃত্যু হইয়া গেল যাহাদের—সেই লোকদের উপর লা'নত করেন আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ এবং মানবগণ, সকলে—

١٦٢ خلدين فيها ج لا يخفف عنهم العذاب ولا هم

১৬২। সেই লা'নতের মধ্যে তাহারা অবস্থিত হইবে চিরকাল— তাহাদের আজাব হালকা করা হইবে না, আর তাহাদিগকে

অবকাশও দেওয়া হইবে না। | يُنظَرُونَ ۝

১৬৩। আর তোমাদের যে মা'বূদ, তিনি হইতেছেন একক, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই আর কিছু নাই এবাদতের যোগ্য, করুণাময় কৃপানিধান তিনি। (১২৪)

١٦٣ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۝

তাফ্ছীর

১১৯। টীকাঃ ছবর ও ছালাত—৪৫ আয়াত ও ৩৬ টীকা দেখুন। মোটের উপর, সকল প্রকার ভয় ও বিপদ-আপদকে পরাজিত করিয়া সঙ্গত কাজের সমর্থনে দৃঢ়তা অবলম্বন করা, এবং সকল প্রকার প্রলোভনে মোহমুক্ত থাকিয়া কাজ ও কথার দ্বারা অন্যায়ের ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য, ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকার নাম ছবর। ছালাত অর্থে নামায বা দোআ মোনাজাত। এখানে উভয় অর্থই গৃহীত হইতে পারে। সূরা ফাতেহায় আমরা দেখিয়াছি—আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও ফরমাবরদারী করার জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতে হয় তাঁহারই হুজুরে।

পূর্ব রুকুর শেষ আয়াতে জেকের ও শোকরের কথা বলা হইয়াছে। কেবলা পরিবর্তনের দ্বারা মোছলেম উম্মতের জাতীয় জীবনে, যে নূতন স্পন্দন সৃষ্টির সূচনা করা হইয়াছে, তাহার পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হইবে যেসব সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া, পরবর্তী আয়াতগুলিতে তাহারই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

১২০। টীকাঃ অমর শহীদ—"আল্লাহ্‌র রাহে" অর্থে—আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দীনের খেদমতে, তাঁহার নির্দেশগুলিকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার ও বলবৎ করিয়া রাখার জন্য, তাঁহার নিষিদ্ধ পাপ, অনাচার ও অত্যাচারগুলিকে দুনিয়ার পিঠ হইতে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলার জন্য। এই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে, কাফের বা মোনাফেকরা নিহত করিয়া ফেলে যাহাদিগকে, তাহাদিগকে, "মৃত" বলিতে নাই। বরং সত্য কথা এই যে, তাহাদের দেহ নির্জীব হইয়া গেলেও তাহাদের পুণ্য-আদর্শ জাতির সম্মুখে চিরদিনই জীবন্ত হইয়া থাকিবে।

আমাদের দেশে, শহীদের হাজত নায়াজের বা মানসা ও নৈবেদ্যের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার আগ্রহ খুব কমই দেখা

যায়। আকবর বাদশার আমলদারীর পর হইতে এদেশে জেহাদ-আন্দোলনের সূচনা হয়। দিল্লীর স্বনামধন্য শাহ্-পরিবারের মধ্যবর্তিতায় তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইতে আরম্ভ করে এবং যুগের মোজাদ্দেদ ও মোজাহেদ ছৈয়দ আহমাদ্ শহীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে তাহা এক ব্যাপক ও সার্থক জেহাদ-আন্দোলনে পরিণত হইয়া যায়। ভারতের সকল প্রদেশের এবং, আমাদের এই বাংলাদেশের শত শত শহীদের কলিজার রক্ত দিয়া ইহার ইতিহাস লিখিত হইয়া আছে। কিন্তু বাংলার মুছলমান আমরা সেই ইতিহাসকে অতি নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করিয়াছি। এমন কি, আজ আমাদেরই একদল মুছলমান তাহার বিরুদ্ধে কটুক্তি ও অসাধু মন্তব্য প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

১২১। **টীকাঃ আল্লাহ্‌র আজমায়েশ**—মোমেন বান্দাদিগকে ধৈর্য-ধারণের উপদেশ দেওয়ার পর, এই আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, মোছলেম সাধকের সম্মুখে ঈমানের পরীক্ষা বা আপদ-বিপদের আজমায়েশ উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহার কোনও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। তাই তাকীদের জন্য এখানে ক্রিয়াপদে লাম ও নূন উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরীক্ষার বিপদ-আপদ উপস্থিত হইবে কোন্ কোন্ উপলক্ষকে অবলম্বন করিয়া, আয়াতে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে জানের ক্ষতিই হইতেছে সর্বপ্রধান। যাহারা আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের জান কোরবান করিতে পারে, উপরের আয়াতে তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে অমর শহীদের খেতাব।

পরীক্ষার বিপদ-আপদে দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র কাজে তিষ্ঠিয়া থাকিবে যাহারা, ১৫৭ আয়াতের উপসংহারে তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইতেছে—"তাহারাই হইতেছে হেদায়ত প্রাপ্ত।" ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যাহারা পরীক্ষার আশঙ্কা দেখিলেই সরিয়া দাঁড়ায়, এবং ভাবের ঘরে চুরি করার জন্য নানাপ্রকার "হীলা" বাহির করিয়া, কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করার চেষ্টা পাইয়া থাকে, প্রকৃত হেদায়ত হইতে তাহারা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে।

বিপদ-আপদের সময় আমরা সচরাচরই "ইন্নালিল্লাহে—" বলিয়া থাকি। কিন্তু মুখের কথা অপেক্ষা মনের অনুভূতির সহিত ইহার সম্বন্ধ অত্যন্ত অধিক। "লিল্লাহে" শব্দের প্রথমে যে লাম বর্ণ ব্যবহার করা হইয়াছে, আরবীতে তাহাকে লাম্-তাম্লিক বলা হয়। এই হিসাবে "ইন্নালিল্লাহে" পদের অর্থ হইবে—আমরা, অর্থাৎ আমাদের ধনপ্রাণ, বিষয়-সম্পদ ও জীবন-মরণের সব উপাদান ও

যাবতীয় উপকরণের "একমাত্র মালেক" হইতেছেন আল্লাহ্। আমার বা আর কাহারও ইহার উপর কোনও অধিকার নাই। সুতরাং সেই মালেকের দেওয়া বস্তু তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইবে, ইহাতে আমার দুঃখের বা আপত্তির কোনও কারণই থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহা তো একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা। অনতিবিলম্বে আমরা তো "ফিরিয়া" যাইতেছি, সেই করুণাময় কৃপানিধান মালেকেরই সন্নিধানে, অনন্ত জীবনের আনন্দ ধামে। সুতরাং ইহাতে ভয়ের বা আতঙ্কের কি আছে? আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই সৌভাগ্য লাভের তাওফীক দান করুন!

১২২। টীকা: ছাফা ও মারওয়া—বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী দুইটি পরস্পর সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকার পাহাড়কে ছাফা ও মারওয়া বলা হয়। ইহারই তলভূমির নাম ওয়াদী-ইবরাহীম। কা'বা বা বায়তুল্লাহ্ এই তলভূমিতে অবস্থিত। ইহাই বিবি হাজেরার প্রবাস আশ্রম, ইহাই ইছমাইলের সূতিকাগৃহ, ইহাই ইবরাহীম ও ইছমাইলের প্রধান কর্মক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্র। এই পবিত্র ধামে অঙ্কুরিত হইয়াছিল পূর্ণ-ইছলামের শুভসম্ভাবনা, এবং এই পূত-পবিত্র ধর্মধাম হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল রহমতের নবী মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমনের প্রথম স্বর্গীয় সন্দেশ। তাই এই পাহাড় দুইটিকে আয়াতে আল্লাহ্র নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

হজ বা ওমরা সম্পন্ন করিয়া উপরোক্ত পর্বত দুইটির মধ্যে তাওয়াফ করার নিয়ম বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে এবং হযরত রাছুলে কারীমের সময়ও প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রথম কোনো কোনো মুছলমানের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে অতঃপর ঐ স্থানে তাওয়াফ করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, পূর্বে ঐ অঞ্চলে দুইটি প্রতিমূর্তি স্থাপিত ছিল। অধিকন্তু কোর্‌আনে ছাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করার কোনও আদেশ নাজেল হয় নাই। এইরূপ সন্দেহের অপনোদন করিার জন্য এই আয়াত নাজেল করা হয়।

আয়াত হইতে বাহ্যতঃ ইহা মনে হয় যে, উহাতে ছাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে মাত্র, উহাকে ফরয, ওয়াজেব বা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। কিন্তু বোখারী, মোছলেম প্রভৃতির বর্ণিত বিভিন্ন রেওয়ায়ত হইতে জানা যাইতেছে যে, আয়াতের উপরোক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। ইছলামের প্রথম মোজ্‌তাহেদ বিবি আয়েশা, সাহিত্যিক ও দার্শনিক যুক্তি দিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য হাদীছ হইতেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হযরত রাছুলে কারীম নিজে ঐ স্থানের তাওয়াফ করিয়াছেন এবং

উহাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলিয়া ছাহাবাগণকে উহার তাওয়াফ করিবার আদেশ দিয়াছেন (ইবন-কাছীর)।

১২৩। **টীকাঃ সত্য গোপন**—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আগমনের সংবাদ এবং তাঁহার লক্ষণ ও বিশেষণগুলির বিস্তারিত পরিচয়, এমন কি তাঁহার নামের উল্লেখ পর্যন্ত, ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্রে, হিন্দুদের পুরাণ ও উপনিষদাদিতে, পার্সীয়দের আবেস্তাঁতেও বর্ণিত আছে। কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রের বাহক পণ্ডিত-পুরোহিতের দল, স্বার্থবোধ, আভিজাত্যের অভিমানে ও পরজাতি বিদ্বেষে সত্যভ্রষ্ট হইয়া, সেই বিবরণগুলি গোপন করিয়া রাখার চেষ্টা করে। বিশ্ব-মানবের সমবায়ে, একটা ভ্রাতৃসমাজ গঠন করিয়া তোলার ইছলামী আদর্শ, তাই আজও পূর্ণরূপে সফলতালাভ করিতে পারে নাই। ধর্মের নামে মানব জাতির মধ্যে শোচনীয় সংঘাত-সংঘর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও উপশমিত হইতেছে না। বরং দিন দিন আরও ভীষণভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং এই মহাপাতকের জন্য প্রধান অপরাধীরা আল্লাহ্‌র লা'নাত ভাগী হইয়া পড়িতেছে। লা'নত অর্থে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে দূরে অবস্থান করা বা বঞ্চিত হইয়া পড়া। তাওবার স্বরূপ সম্বন্ধে এখানে চিন্তা করিয়া দেখার দরকার। কার্যতঃ প্রমাণ করিতে হইবে যে, বস্তুতঃ আন্তরিক অনুতাপের বশবর্তী হইয়া তাওবা করা হইতেছে। অন্যথায় শুধু মুখে "তাওবা" "তাওবা" শব্দ জপ করিলে অথবা কোনো পীরের পাগড়ীর কেনারা ধরিয়া, দুই-চারিটা বাঁধা বুলির আবৃত্তি করিলে, সে তাওবা আল্লাহ্‌র হুজুরে গ্রাহ্য হইবে না।

১২৪। **টীকাঃ তাওহীদের শিক্ষা**—মুছলমানের প্রভু ওয়াহেদ বা একক। তাঁহাকে ব্যতীত অথবা তাঁহার সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তিকে, অন্য কোনও বস্তুকে, অন্য কোনও ভাব ও বিষয়কে, কোনও মুছলমান সম্পদ বা বিপদের কোনও অবস্থায়, নিজের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে না। ভয়, লোভ ও অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি কিছুর নির্দেশে তাঁহার আদেশ-নিষেধকে সে অমান্য করিতে পারে না —করিলে বাস্তবতার হিসাবে তাহাকেই "এলাহ্" বা পূজ্যপ্রভু বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

---

২০ রুকু

১৬৪। নিশ্চয় আকাশ মণ্ডলের ও ভূ-মণ্ডলের "সৃষ্টিতে" এবং রাত্রের

১٦٤ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

ও দিবসের পরম্পর অনুক্রমণে, এবং সাগরে বহমান—মানুষের উপকারজনক — জলযানগুলির (বিশেষত্বে), এবং আল্লাহ্ আছমান হইতে যে বৃষ্টিধারা নামাইয়া দেন—তাহাতে, সেমতে সেই বৃষ্টি দ্বারা জমিনকে পুনরায় সজীব করিয়া তোলাতে, এবং সেই জমিনে সকল প্রকার জীবজন্তুকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়াতে, আর বায়ু হিল্লোলকে (বিভিন্ন) দিকে পরিবর্তিত করাতে, এবং আছমান ও জমিনের মধ্যে জলদপুঞ্জকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখাতে—জ্ঞান-বান সমাজের জন্য নিহিত আছে (আল্লাহ্‌র) বহু নিদর্শন। (১২৫)

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ص وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

১৬৫। অথচ মানব সমাজে এরূপ লোকও আছে, যাহারা অন্যকে (আল্লাহ্‌র) 'সমকক্ষ' বলিয়া মনে করে এবং তাহাদিগকে মহব্বত করে—যেরূপ মহব্বত করা উচিত আল্লাহ্‌কে ; কিন্তু ঈমান

١٦٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط وَ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا لا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ٥

আনিয়াছে যাহারা, আল্লাহ্‌র মহব্বতে তাহারা সুদৃঢ় ; (১২৬) এবং এই জালেমের দল কোনো আজাবকে প্রত্যক্ষ করার সময় যদি ভাবিয়া দেখিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে, শক্তি সমস্তই আল্লাহ্‌রই অধিকার-ভুক্ত, আরও (বুঝিতে পারিত) যে, আল্লাহ্ হইতেছেন দণ্ড সম্বন্ধে সুদৃঢ়।

١٦٦ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ٥

১৬৬। তাবেদারী করা হইতেছে যাহা-দিগের, তাহারা যখন তাবেদার-দিগের (অপকর্ম) সম্বন্ধে নিজে-দের দায়িত্ব অস্বীকার করিবে এবং আজাবকে তাহারা লক্ষ্য করিবে—আর সমস্ত উপায় উপলক্ষ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে ;—

١٦٧ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ

১৬৭। (অন্ধ) তাবেদারগুলি তখন বলিবে—একটি বার (দুনিয়ায়) ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ যদি আমাদের ঘটিত, তাহা হইলে আমরাও উহাদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিতাম, যেমতে তাহারা আমাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে ; (১২৭) এইরূপে আল্লাহ্ তাহা-দের কর্মফলগুলি তাহাদিগকে

প্রদর্শন করিবেন কেবল মনস্তাপ-রূপে ; বস্তুতঃ সে আগুন হইতে তাহারা কখনও বহির্গত হইতে পারিবে না। (১২৮)

عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ع

তাফ্ছীর

১২৫। **টীকাঃ কুদ্রতের নিদর্শন**—কুদ্রতের প্রদত্ত যে আটটি নিয়ামতের কথা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক সত্যান্বেষী মানুষই বুঝিতে পারিবে যে এই সমস্তের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ামক নিশ্চয় একজন আছেন। এই আয়াতে ও এই মর্মের আরও অনেক আয়াতে বিভিন্ন প্রকারে এই প্রকার যুক্তিবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। সূরা এমরানের ১৮৯ ও ১৯০ আয়াতে বলা হইয়াছে :

আকাশমণ্ডলের ও ভূ-মণ্ডলের সৃজনে এবং দিবারাত্রের পরস্পরের অনুবর্তনে বহু নিদর্শন নিহিত আছে সেই সব তত্ত্বজ্ঞানী লোকদিগের জন্য—যাহারা আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়া থাকে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত (সকল) অবস্থায়, এবং গভীরভাবে চিন্তা করিয়া থাকে আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্বন্ধে, তাহাদের অন্তর ব্যাকুলস্বরে বলিয়া ওঠে : হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এ-সবকে তুমি অনর্থকভাবে সৃষ্টি কর নাই..........।

আয়াতে যে আটটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার যে কোনো একটা নিয়া এইরূপে বিচার-আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক সুস্থবিবেক সত্যসন্ধ মানুষের মন নিজেই সাক্ষ্য দিবে—এ-সবের একজন স্রষ্টা ও নিয়ামক নিশ্চয় আছেন এবং তিনি অনর্থকভাবে এই সৃষ্টির সংস্থা করেন নাই। অতএব মানুষকে ঐগুলির যথাযথ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, তাহার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং মানবের কল্যাণের জন্য সেগুলিকে কাজে লাগাইতে হইবে।

১২৬। **টীকাঃ মোশরেকী মানসিকতা**—একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। ইহাদিগকে বলা হয় "কাফের"

বা নাস্তিক। উপরের আয়াতে ইহাদিগের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করিয়া নিতেও কুণ্ঠিত হয় না—এমনই অজ্ঞ তাহারা।

আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কোনও ইষ্টলাভ করা বা অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে সব অজ্ঞমানব নিজের কোনও হাজত্ পুরা করার জন্য, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ঠাকুর-বিগ্রহ, দেব-দেবী, বা পীর-ফকীরের শরণ প্রার্থী হয়, সে নিশ্চয় সেই ঠাকুর-বিগ্রহ প্রভৃতিকে কার্যতঃ আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ করিতেছে। মুছলমানদিগের এ সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

১২৭। **টীকাঃ অন্ধ অনুকরণের কুফল**—তাক্‌লীদ বা অন্ধ অনুকরণের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে, প্রধানতঃ এক একজন সুধী ও সাধু মহাজনকে কেন্দ্র করিয়া। খ্রীষ্টানরা হযরত ঈছাকে খোদা বানাইয়া নিয়াছেন এই তাক্‌লীদের মোহে আত্মহারা হইয়া। অথচ হযরত ঈছা নিজেই যে এই মারাত্মক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, খ্রীষ্টান সমাজের অনেকে তাহা জানিয়াও সতর্ক হইতে পারিতেছেন না। প্রকৃত সত্যটা যে কি, অনেকে তাহার সন্ধান নেওয়ার দরকারও মনে করেন না। মুছলমান সমাজে "চার ইমাম" বলিয়া প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ সকলেই সৎ, মহৎ, এবং বিশেষজ্ঞ আলেম। এই হিসাবে তাঁহাদের —অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যকার কোনো একজনের—তাক্‌লীদ করিয়া যাওয়াকে আমরা ফরয ও ওয়াজেব বলিয়া দৃঢ়ভাবে নির্ধারিত করিয়া নিয়াছি। ফলতঃ তাঁহাদের নামকরণে প্রচারিত কোনও ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার, এমন কি কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকারও তাঁহার তাবেদারদিগের থাকিবে না—করিলে সে সেই মুহূর্তে ছুন্নত জামাআত হইতে খারিজ হইয়া যাইবে! অথচ এই শ্রেণীর তাক্‌লীদ করিতে এই মহামতি ইমামগণই ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন! এই ব্যাপার নিয়া মোকাল্লেদ ও গায়ের-মোকাল্লেদ-গণের মধ্যে দীর্ঘকাল হইতে কলহ-কোন্দল চলিয়া আসিতেছে। মোকাল্লেদগণের মুখপাত্ররা বলিতেছেন—"ইজ্‌তেহাদের দরওয়াজা বহুপূর্বে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইছলাম সম্বন্ধে কোনও বিষয়ের স্বাধীনভাবে বিচার-আলোচনা করার অধিকার এখন আর কাহারও নাই।" বলা বাহুল্য, মোছলেম জাতির জ্ঞানসাধনার পূর্বধারা, এই সিদ্ধান্তের সময় হইতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে তাক্‌লীদ বিরোধীদলের—আধুনিক প্রচারকগণের

অনেকের কথা শুনিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মতে প্রত্যেক গায়ের-মোকাল্লেদই যেন এক একজন মোজতাহেদ। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই দুইয়ের মধ্যে আর একটা স্তর আছে, সেই স্তরের লোকদিগকে আমরা মোহাক্কেক বা সত্য সন্ধানী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

আমার মতে, এ-সম্বন্ধে শাহ্ অলিউল্লাহ্ মরহুমের নির্ধারিত মূলনীতির অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হওয়াই আমাদের কর্তব্য। উপস্থিতের মত ইহাই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

আয়াতে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্র সে সব নেক বান্দাহ্র দোহাই দিয়া মানুষ এইরূপে অনাচারে লিপ্ত হইতেছে, কিয়ামতের দিন তাঁহারা সকলেই ঘোষণা করিবেন যে, আমাদের সহিত ইহাদের কুকীর্তিগুলির কোনও সম্বন্ধ নাই। অন্য শ্রেণীর অন্ধ অনুকারীদেরও এই পরিণাম ঘটিবে (ফোরকান ১৭, ১৮ আয়াত)।

---

২১ রুকু

১৬৮। হে লোক সকল! পৃথিবীতে যেসব হালাল ও প্রীতিকর বস্তু আছে, তাহারই মধ্য হইতে আহার করিও তোমরা, আর (সাবধান) শয়তানের পদচিহ্ন-গুলির অনুসরণ করিও না; নিশ্চয় সে হইতেছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (১২৯)

١٦٨ يايها الناس كلوا مما في الارض حللا طيبا صلے ولا تتبعوا خطوت الشيطن ط انه لكم عدو مبين ○

১৬৯।—সে তো তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়া থাকে শুধু অশ্লীল ও জঘন্য কার্যের; আরও (নির্দেশ দিয়া থাকে), তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব উক্তি করিতে, যাহার (সত্যতা) তোমরা অবগত নহ। (১৩০)

١٦٩ انما يامركم بالسوء و الفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ○

١٧٠ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط
اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ
شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ٥

১৭০। অবস্থা এই যে, যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ যাহা কিছু নাজেল করিয়াছেন, তোমরা সেগুলির অনুসরণ করিয়া চল। তাহারা (উত্তরে) বলিয়া থাকে : না, না, বরং আমাদের বাপ-দাদাদিগকে যে পথে চলিতে দেখিয়াছি, আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব সেই পথের ; আচ্ছা, তাহাদের বাপ-দাদাদিগের কিছু বুঝিবার শক্তি যদি না থাকে, অথবা তাহারা যদি হেদায়ত কবুল না করিয়া থাকে—তবুও কি (তাহাদের অনুসরণ করিবে)? (১৩১)

١٧١ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا
يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ط
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا
يَعْقِلُوْنَ ٥

১৭১। বস্তুতঃ ইন্‌কার করিয়াছে যাহারা, তাহাদের উপমা—যেমন এক পালরক্ষক চীৎকার করিতেছে, কিন্তু পালের অজ্ঞ জীবগুলি শুধু হাঁক-ডাক ব্যতীত, তাহার (মর্মকথা) কিছুই শুনিতে পায় না ; (সেইরূপ) ইহারা হইতেছে কালা, বোবা ও অন্ধ, কাজেই বুঝিতে পারিতেছে না। (১৩২)

١٧٢ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا

১৭২। হে মোমেনগণ! আমরা তোমাদের জন্য যেসব (হালাল) রুজীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, তোমরা তাহার মধ্য হইতে (নিজেদের) প্রীতিকর বস্তুগুলি আহার করিও এবং আমার শোকর-

لله ان كنتم اياه تعبدون ○

গোজারী করিতে থাক ও—একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী তোমরা যদি করিয়া থাক।

١٧٣ انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله ج فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ط ان الله غفور رحيم ○

১৭৩। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মুরদারকে, রক্তকে ও শূকরের মাংসকে, এবং সেই সকল বস্তুকে—আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নাম ঘোষণা করা হইয়াছে যাহার সম্বন্ধে—(১৩৩) তবে কোনো ব্যক্তি যদি লাচার হইয়া পড়ে, অথচ সে বিদ্রোহীও নহে এবং সীমালঙ্ঘনকারীও নহে, সে অবস্থায় তাহার উপর কোনও অপরাধ বর্তায় না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাপরায়ণ, কৃপানিধান।

١٧٤ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتب و يشترون به ثمنا قليلا لا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار و لا يكلمهم الله يوم القيمة و لا يزكيهم صلے

১৭৪। যে কেতাব আল্লাহ্ নাজেল করিয়াছেন, তাহার কোনও অংশকে গোপন করে ও তাহার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে যাহারা—তাহারা তো নিজেদের উদরগুলিকে পূর্ণ করিতেছে কেবল আগুনের দ্বারা; কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগের সহিত কালাম করিবেন না ও তাহাদিগকে তিনি পাকছাফও করিয়া দিবেন না; এবং তাহাদের জন্য (অব-

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

ধারিত) আছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। (১৩৪)

١٧٥ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

১৭৫। এই যে লোকগুলি, ইহারা হেদায়তের বদলে খরিদ করিয়াছে গোমরাহীকে এবং ক্ষমার বিনিময়ে আজাবকে—কিন্তু (দোজখের) আগুন সম্বন্ধে কতই না অসীম সাহসী ইহারা!

١٧٦ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ○

১৭৬। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাঁহার কেতাবগুলিকে নাজেল করিয়াছেন বারহাক্‌ভাবে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে প্রভেদ ঘটাইয়াছে যাহারা, নিশ্চয় তাহারা লিপ্ত হইয়া আছে পক্ষপাতমূলক দূরপ্রসারী বিচ্ছেদের সাধনায়। (১৩৫)

তাফ্‌ছীর

১২৮। **টীকা: বৈধ ও প্রীতিকর খাদ্য**—আয়াতে মানব সমাজকে সাধারণভাবে আদেশ দেওয়া হইতেছে, হালাল (বৈধ) তাইয়েব (প্রীতিকর) খাদ্য গ্রহণ করিতে। হালাল—অর্থে, যাহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে অথবা শরীয়ত কর্তৃক যাহা নিষিদ্ধ নহে। তাইয়েব শব্দের অর্থ প্রীতিকর, পরিতোষজনক। ভাবার্থে নির্মল বা বিশুদ্ধ বস্তুর প্রতিও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

জটিল তর্ক-বিতর্কের আলোচনা বাদ দিয়া, এখানে শুধু এইটুকু জানিয়া নিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাহা নিষিদ্ধ নহে, তাহা বৈধ এবং যাহা হারাম বা মাকরূহ নহে, তাহা হালাল। এসব বিষয়ের মূলনীতি হইতেছে অনুমতি।

অর্থাৎ নিষেধ না থাকিলে তাহা জায়েয বা হালাল।

১২৯। টীকা : শয়তানের নির্দেশ—শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করিয়া থাকে কেবলই অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যেসব কাজ-কথায় অশ্লীলতা আছে, অথবা যাহা স্বভাবতঃ ঘৃনিত ও কদর্য, সেগুলি হইতেছে শয়তানী কাজ, আয়াতে মানুষকে এই শ্রেণীর কাজ-কথা হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

১৬৮ হইতে ১৭১ আয়াত পর্যন্ত চারিটি আয়াতে মুছলমান-অমুছলমান নির্বিশেষে, সকল মানুষকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতের শেষ অংশে তাহাদিগকে বলা হইতেছে—শয়তান তোমাদিগকে প্ররোচিত করিয়া থাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব উক্তি করিতে, যাহা সম্বন্ধে তোমাদের কোনও "এল্‌ম" নাই। এলেম শব্দের মূল অর্থ, যুক্তি-প্রমাণ সম্মত সত্য জ্ঞান। দুই খোদা, তিন খোদা, ৩৩ খোদা, ৩৩ হাজার বা ৩৩ কোটি খোদার স্বীকৃতি, অবতারবাদ, প্রতীকবাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি নানা অসঙ্গত ধারণার বিষয় স্বীকার করিতে শয়তান মানব সাধারণকে অবিরামভাবে অছঅছা যোগাইয়া আসিতেছে। অথচ যুক্তি-প্রমাণের হিসাবে এই ধারণাগুলির কোনও ভিত্তি নাই। আয়াতে মানুষকে এই শ্রেণীর অজ্ঞতার প্রশ্রয় দিতেও নিষেধ করা হইতেছে।

যাহারা মানুষকে এইসব অন্যায় কাজ ও কথায় লিপ্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদের প্রতেকটিই শয়তান পদবাচ্য, তা সে স্বার্থপর পণ্ডিত-পুরোহিত হউক, গোমরাহ পীর-ফকীর হউক, তাহার নিজস্ব কুপ্রবৃত্তি বা নাফ্‌ছে আম্মারাই হউক, দুষ্ট সহচর হউক, অথবা মাল্‌উন ইবলীছ খান্নাছই হউক। সকলেই তাহারা সমধর্মী ও সমকর্মী।

১৩০। টীকা : বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ—তাক্‌লীদ বা অন্ধ অনুকরণ সম্বন্ধে ১৬৭ আয়াতে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বাপ-দাদার রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণের মানসিক ব্যাধিটা মোছলেম সমাজের মধ্যে আজও ব্যাপকভাবে বদ্ধমূল হইয়া আছে। যাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে ইছলামের অনুজ্ঞাগুলিকে আগ্রহের সহিত পালন করিয়া থাকেন, পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শরীয়ত-বিরোধী রছম-রেওয়াজগুলিকে তাহাদের অনেকেও বর্জন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অন্যদিকে জ্ঞানের ও যুক্তিবাদের দোহাই দিয়া যাঁহারা আল্লাহ্‌কে, রাছুলকে ও কোর্‌আনকে পর্যন্ত অমান্য করিতে কুণ্ঠিত হন না, কৃষ্টি বা সংস্কৃতির নামে, কুসংস্কার ও অপকর্মগুলির অনুকরণ

করিয়া চলিতে তাঁহাদের মনেও কোনো কুণ্ঠা বা দ্বিধার উদ্রেক হয় না। উদাহরণস্বরূপ সমাজের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত তীজা-চেহলমের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। ইহা হিন্দু সমাজের শ্রাদ্ধ-স্বস্ত্যয়নাদির অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু মোত্তাকী মুছল্লী মুছলমানদিগের ধার্মিকতার অভিমান ইহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইতেছে না, এবং জ্ঞানসেবক প্রগতিশীল যুক্তিবাদীর বিবেক-বুদ্ধির জয়জয়কারও এ সময় ক্ষুণ্ণ হইতেছে না। বিবাহের উৎসবে, "আশরাফ-আতরাফের" স্বতন্ত্র পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থায়, বংশগত কৌলিন্য অকৌলিন্যের (كفر কুফুর) ফাৎওয়ায় মোহর ছবত করার সময়, এবং এইরূপে আধ্যাত্মিকতার নামে হিন্দুর দর্শন ও তন্ত্রের অন্ধ অনুকরণে—প্রকৃত ও প্রধান সত্য হইতেছে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ। প্রকরণ ভেদে ইহাকেই আজকাল কোন কোনও অঞ্চলে সংস্কৃতি এমন কি তামদ্দুন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়া থাকে।

কোর্‌আন মাজীদ মানুষকে এই জ্ঞান-বিকারের অভিশাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দিতেছে। (তাওবা, ৩১ আয়াত ও তাহার টীকা দেখুন)।

১৩১। টীকা ঃ পালরক্ষকের উপমা—উপরের তিনটি আয়াতে দুষ্ট নেতা ও তাহাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে ঐ সঙ্গে একটা উপমা দিয়া এই অনুকরণকারীদের অজ্ঞতার অবস্থা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

পালরক্ষক বলিয়া দলের নেতাকে বুঝান হইতেছে। তাহাদের অনুসরণ-কারীদিগকে, পালের মেষ প্রভৃতি বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞান বর্জিত অজ্ঞ জীব-গুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখান হইতেছে যে, ইহারা পালরক্ষকের ডাক হাঁকের মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতেও চায় না। আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞান-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার তাহারা করে না। শুধু আওয়াজ বা "শ্লোগান" শুনিয়া সেই দিকে ছুটিয়া যায়। আল্লাহ্‌র নবী কি বলিতেছেন, তাহা তাহারা শ্রবণ বা গ্রহণ করে না। সৃষ্টি জগতের দিকে দিকে কুদরতের যে অসংখ্য নিদর্শন বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, সেগুলির প্রতিও তাহারা লক্ষ্য করে না। কাহারও সঙ্গে বিচার-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেও তাহারা নারাজ। তাই তাহাদিগকে মূক, বধির ও অন্ধের সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

১৩২। টীকা ঃ ৪টি হারাম বস্তু—রুকুর প্রথমে, ১৬৮ আয়াতে সম্বোধন করা হইয়াছে "হে লোক সকল" বলিয়া। এই আয়াতে কেবল মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া নূতন আলোচনার সূচনা করা হইতেছে। সূরার

প্রথম হইতে এই আয়াত পর্য্যন্ত, কেবল কোর্‌আন, নবুয়ত ও মোনকেরদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আদেশ-নিষেধ বা নিয়ম-কানুনের মধ্যে মধ্যে অবতারণা করা হইয়াছে, প্রাসঙ্গিকভাবে। এখান হইতে আরম্ভ করিয়া সূরার প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত, হারাম, হালাল, খাদ্য-অখাদ্য রোযা, হজ, অছিয়ত, বিবাহ, তালাক প্রভৃতি বিশেষ আইন-কানুন ও এবাদত্-বন্দেগী সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রুকুর প্রথম আয়াতে মুছলমান-অমুছলমান সকলকে হালাল ও প্রীতিকর খাদ্য গ্রহণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখানে রুজী বলিতে সেই হালাল-রুজীকেই বুঝাইতেছে।

আয়াতের প্রথমে انما শব্দ আছে। ইহা حصر বা কৈবল্যবাচক শব্দ। তাই সাধারণতঃ উহার অর্থ করা হয়—ছেরেফ বা কেবল বলিয়া। এই হিসাবে আয়াতের অনুবাদ দাঁড়ায়ঃ আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, কেবল মৃত, রক্ত, শূকর মাংস ও শোনিতকে। বাহ্যতঃ এখানে এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, এই আয়াত অনুসারে ঐ চারিটা বস্তু ব্যতীত অন্য সমস্তই হালাল। কিন্তু "ইন্নামা" শব্দের অর্থ সর্বত্র কৈবল্যসূচক হয় না।

হযরতকে সম্বোধন করিয়া কোর্‌আনে বলা হইতেছে—

انما انت نذير - (هود)

انما শব্দের অর্থ সর্বত্র حصر বা কৈবল্যসূচক হইলে, এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াইবে—"কেবল তুমি" হইতেছ সতর্ককারী (বা নবী)। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, দুনিয়ায় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ব্যতীত অন্য কোনও নবী আগমন করেন নাই। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ শব্দটির দ্বারা এখানে গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে হযরতের নবী হওয়ার সত্যতাকে। তাৎপর্য হইতেছে, "হে মোহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌র সত্য নবী ছাড়া আর কিছু নহ—কবি নহ, যাদুগর নহ, এবং গণৎকার বা বিকৃত মস্তিষ্ক প্রভৃতি কিছুই নহ।"

এইরূপে আলোচ্য আয়াতেও বলা হইতেছে—উল্লেখিত ৪টি বস্তুকে আল্লাহ্ "নিশ্চয়ই" হারাম করিয়াছেন। চারিটা ব্যতীত আর কিছুই হারাম করেন নাই—এই ভাব আয়াত হইতে আদৌ প্রতিপন্ন হইতেছে না। এই প্রসঙ্গে সূরা আল-এমরানের ৫৩ আয়াত ও তাহার তাফ্‌ছীর বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

সূরা আন'আম নাজেল হইয়াছিল সূরা বাকারার কম বেশী দুই বৎসর পূর্বে। ঐ সূরার ১৪৬ আয়াতে ঠিক এই প্রসঙ্গে دم বা রক্ত-শব্দের সঙ্গে مسفوحا বা

"বহমান" বিশেষণ যোগ করা হইয়াছে। সুতরাং গোশ্‌তের সঙ্গে যে রক্ত লাগিয়া থাকে, আয়াতে তাহাকে হারাম করা হয় নাই। যে রক্ত জীবদেহ হইতে বহিয়া বাহির হইয়া যায়, কেবল সেই রক্তকে হারাম করা হইয়াছে।

আয়াতে বলা হইতেছে যে, যে সব জিনিস বা জীবজন্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কাহারও বা কোনো কিছুর নাম ঘোষণা করা হয়, মোরদার ও শূকর মাংসের ন্যায় তাহাও হারাম। বিছমিল্লাহ্‌ বলিয়া জবেহ করিলেও ঐগুলির গোশ্‌ত হালাল হয় না—যেমন চুরি করা খাসী বিছমিল্লা বলিয়া জবেহ করিলে হালাল হয় না।

১৩৩। **টীকা: জ্ঞান-পাপীদের অপরাধ**—আল্লাহ্‌ [illegible] নাজেল করিয়াছেন, সেই কেতাবের "এক অংশকে" গোপন করিয়া [illegible] যাহারা, আয়াতে সেই জ্ঞান-পাপীদিগের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা কর[illegible]তেছে। এক অংশ গোপন করার অর্থ—যে অংশে তাহাদের স্বার্থবিরোধী ব[illegible]স্কারের বিপরীত কোনো আদেশ-নির্দেশ আছে, তাহা জন সমাজে প্রকাশ [illegible]রে না। কারণ তাহাতে তাহাদের জনপ্রিয়তা কমিয়া যাইতে পারে, অথবা রুজী-রোজগারের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রুকুর শেষ আয়াতে বিশেষভাবে বলা হইতেছে, আহ্‌লে কেতাব সমাজ-গুলির পণ্ডিত-পুরোহিতদিগের অনাচারের কথা। আল্লাহ্‌ তাঁহার কেতাবগুলি নাজেল করিয়াছেন, বিভিন্ন দলে বিভক্ত বিশ্বমানবকে এক ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করার জন্য। যে সমস্ত সমাজ কেবল নিজেদের কেতাবকে ও নবীকে মান্য করার দাবী করে, আর আল্লাহ্‌র প্রেরিত অন্যান্য নবীদিগকে ও তাঁহার নাজেল করা অন্য কেতাবগুলিকে অমান্য করে—মানব জাতির মধ্যে বিভাগ ও বিচ্ছেদ জিয়াইয়া রাখাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

---

২২ রুকু

১৭৭। তোমরা পূর্বদিকে ও পশ্চিম-দিকে মুখ ফিরাইবে—ইহাই কেবল পুণ্য নহে, বরং পুণ্যের (যথার্থ) অধিকারী হইতেছে সেই ব্যক্তি—যে ব্যক্তি ঈমান	١١ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى
الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ
وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا
عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى
الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ
الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ ۝

রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, রোজ-কিয়ামতের প্রতি, ফেরেশতা-গণের প্রতি, সমস্ত কেতাবের প্রতি ও যাবতীয় নবিগণের প্রতি —এবং (যে ব্যক্তি) ধনের মায়া সত্ত্বেও, অর্থদান করে—আত্মীয় স্বজনগণকে, এতীমদিগকে, কাঙ্গালদিগকে, (দুস্থ) পথিক-দিগকে, ছায়েলদিগকে এবং দাসদিগের মুক্তিদানের কাজে ; —এবং যে ব্যক্তি নামাযকে যথাযথভাবে কায়েম রাখে ও যাকাত প্রদান করিয়া থাকে, —এবং ওয়াদা একরার করিলে যাহারা সেগুলিকে পুরাপুরিভাবে পালন করে,—এবং অর্থাভাবে, আপদে-বিপদে ও রণবিভীষিকায় অবিচলিত থাকে যাহারা, ইহারাই হইতেছে সেই সমস্ত লোক—নিজেদের ঈমানকে যাহারা বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়াছে; এবং এই যে লোকগুলি, পরহেজগার হইতেছে ইহারাই। (১৭৪)

১৭৮। হে মোমেনগণ! নিহত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি "কেছাছ"কে ফরয (অপরিহার্য) করা হইল; (১৩৫) হত্যাকারী "স্বাধীন" হইলে তাহাকেই, গোলাম হইলে তাহাকেই এবং নারী হইলে তাহাকেই দণ্ডদান করিতে হইবে; (১৩৬) তবে হত্যাকারীকে যদি তাহার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হইতে কিছু মা'ফ করিয়া দেওয়া হয়, সে অবস্থায় যথাযথভাবে চেষ্টা করা এবং সেই (ক্ষমাকারী) ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য সততার সহিত পরিশোধ করা আবশ্যক; ইহা হইতেছে তোমাদিগের প্রভু-পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে (প্রদত্ত) দণ্ড লাঘবের ব্যবস্থা এবং তাঁহার রহমত, কিন্তু ইহার পরও ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করিবে যে ব্যক্তি, তাহার জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

১৭৮ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ج

১৭৯। এবং, হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ! কেছাছে (নিহিত) আছে তোমাদের জীবন রক্ষার উপায় যেমতে তোমরা সংযত হইয়া থাকিতে পারিবে।

১৭৯ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৮০। তোমাদের জন্য ফরয (অপরিহার্য) করা হইল যে, তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যুকাল (নিকটবর্তী হইয়া) আসিবে আর সে যদি কিছু মাল-দওলত ছাড়িয়া যাইতে থাকে, সে অবস্থায় পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য তাহাকে যথারীতি অছিয়ত করিতে হইবে, পরহেজগার লোকদিগের জন্য ইহা হইতেছে অবশ্য কর্তব্য। (১৩৭)

١٨٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

১৮১। কিন্তু এই অছিয়তের বিষয় জ্ঞাত হওয়ার পর কেহ যদি তাহা বদলাইয়া ফেলে, সে অবস্থায় তাহার অপরাধ বর্তিবে বদলকারী দিগের উপর; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বশ্রোতা, সর্ববিদিত।

١٨١ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ

১৮২। তবে অছিয়তকারী পক্ষপাত বা অন্যায় করিয়াছে বলিয়া যদি কাহারও আশঙ্কা হয়, ফলে সে যদি ওয়ারেছদিগের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দেয়, তবে তাহার উপর কোনও গোনাহ্ বর্তিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন, ক্ষমাশীল, কৃপানিধান। (১৩৮)

١٨٢ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ع

তাফ্‌ছীর

১৩৪। **টীকা ঃ "বের্‌" বা পুণ্যকর্ম**—কেবলা পরিবর্তন নিয়া ইহুদীদের বাদবিতণ্ডার তখনও অবসান ঘটে নাই। মুছলমান সমাজের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদও চলিতেছিল। এমন সময় এই আয়াতটি নাজেল হয়। আয়াতে বলা হইতেছে যে, পুণ্য কর্মের একটা মৌলিক নীতি আছে। সেই নীতি সংবলিত কাজগুলি হইতেছে প্রত্যক্ষ পুণ্য এবং তাহাই ইছলাম ধর্মের মূল লক্ষ্য। কিন্তু, মন্‌জিলে পৌঁছার জন্য যেমন পথকে তাহার উপলক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হয়, মূল পুণ্য হাছেল করার জন্যও এক-একটা উপলক্ষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সেইরূপ কা'বাকে কেবলারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, বিশ্বমানবকে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজে সমবেত করার মহান উদ্দেশ্যে।

কিন্তু তবুও সকলের জানা উচিত যে, ইহা উপলক্ষ হিসাবে পরোক্ষ পুণ্য। লক্ষ্য হিসাবে মৌলিক পুণ্য নিহিত আছে যেসব সত্যের উপলব্ধিতে এবং যে-সকল সৎকর্মের সাধন পালনে, আয়াতে সেগুলিও বিশদভাবে ও পর্যায়ক্রমে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহার প্রথম অংশে বলা হইয়াছে ঈমান বা বিশ্বাসের কথা। কারণ ঈমান না থাকিলে কোনো আমলে খলূছ বা আন্তরিকতা আসিতে পারে না। তাহার পর নামাযের কথা, যাকাতের কথা, অন্যান্য সদ্ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। অতঃপর বাকধারার পরিবর্তন করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে আর দুইটি মহান পুণ্যকর্মের উল্লেখ করা হইতেছে।

বলা হইতেছে—'আর প্রকৃত পুণ্যের অধিকারী হইতেছে সেই সকল লোক, কাহারো সঙ্গে কোনো ওয়াদা একরার করিলে সেই একরারকে পুরাপুরিভাবে পালন করিয়া থাকে যাহারা।' হযরত রাছুলে কারীম বলিয়াছেন, মোনাফেকের আলামত হইতেছে তিনটি : কথা বলিলে মিথ্যা বলিবে, কিছু আমানত রাখিলে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এবং কাহারও সহিত কোনো একরার অঙ্গীকার করিলে তাহা ভঙ্গ করিবে (কাছীর)।

১৩৫। **টীকা ঃ কেছাছ**—কেছাছ শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ—সমীকরণ, দুইটি বিষয়ের মধ্যে আনুপাতিক সাম্যের বিধান করা। ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যায় যে অপরাধ ঘটে, সেই অপরাধের অনুপাত অনুসারে তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে বিধানে, ইসলামের পরিভাষায় তাহাকে কেছাছ (قصاص) বলা হয়।

আয়াতে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—তোমাদের জন্য কেছাছের বিধান "লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে" অর্থাৎ এই বিধানকে তোমাদের জন্য ফরয বা অবশ্য পালনীয় ও অপরিহার্য আইন হিসাবে প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

১৩৬। টীকা ঃ নরহত্যার মূল দণ্ড—প্রাক-ইসলামী যুগে অন্যান্য বহু দেশের ন্যায়, নরহত্যার দণ্ড সম্বন্ধে প্রবল ও দুর্বল এবং কুলীন-অকুলীন হিসাবে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোনো সম্ভ্রান্ত বা শরীফ লোক কোনো গোলাম বা নিম্ন শ্রেণীর লোক কর্তৃক নিহত হইলে, হত্যাকারীর সঙ্গে তাহার সমাজের আরও কতিপয় লোককে কতল্ করা হইত। দুর্বল সমাজের কোনো নারী প্রবল সমাজের কাহাকেও হত্যা করিলে, সেই নারীর পরিবর্তে দুর্বল সমাজের কয়েকজন পুরুষের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইত। মোটের উপর, তখনকার দণ্ডবিধানের ভিত্তি ছিল প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির এবং ব্যক্তিগত ও গোত্রগত আভিজাত্যের অভিমানের উপর।

কোর্‌আন নির্দেশ দিতেছে: কোনো মানুষ ইচ্ছাপূর্বক অন্য কোনো মানুষের প্রাণহানি করিলে, সেই হত্যাকারীকে—এবং কেবলমাত্র তাহাকে—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে—তা সে যে কেহ হউক না কেন। এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার 'ইতর বিশেষ' করা যাইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই দণ্ডের বিধান দেওয়া হইতেছে, প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাবের ইহার মধ্যে কোনো স্থান নাই। সুতরাং দাস কাহাকেও হত্যা করিলে একমাত্র সেই দাসকে, স্বাধীন মানুষ কাহাকেও খুন করিলে সেই স্বাধীন মানুষটিকেই, নারী কাহাকেও হত্যা করিলে সেই নারীকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। একজন অপরাধীর জন্য একাধিক লোককে দণ্ডিত করা যাইবে না।

আইনের এই মূল ধারাটা ঘোষণা করার পর সমাজ জীবনের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইতেছে যে, হত্যাকারী বা তাহার স্বজনবর্গ যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারেছদিগকে কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়া রাজী করিতে পারে, আর তাহারা যদি সেই শর্তে নিজেদের দাবী পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে হত্যাকারীকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের মাল বা টাকাকড়ি উপরোক্ত ওয়ারেছগণকে পৌছাইয়া দিতে হইবে সততা ও সদ্ভাবের সহিত। আয়াতে বর্ণিত "ভ্রাতা" "ক্ষমা" ও "এহছান" প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইতেছে কেবল প্রথম বারের অপরাধের জন্য।

অপরাধী যদি দ্বিতীয় বার এই অপরাধে ধৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই তখন আর উঠিতে পারিবে না।

১৩৭। **টীকা ঃ অছিয়ত**—তাহার মৃত্যুর পরে নিশ্চিতভাবে প্রতিপালিত হইবে—এইরূপ কোনো নির্দেশের নাম "অছিয়ত"। এই আয়াতে পিতামাতা ও অন্য নিকট আত্মীয়দের জন্য মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাওয়ার হুকুম দেওয়া হইতেছে, এবং নিজের বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ অছিয়ত করিয়া যাওয়াকে মোত্তাকী মোসলমানদিগের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়াও তাকীদ করা হইতেছে। সুতরাং ইহা যে একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যবস্থা, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না।

ইহা হইতেছে মোছলেম কওমের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক অবস্থার সাময়িক বিধান। তখন পর্যন্ত আরব সমাজে মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যেসব বিধি-ব্যবস্হা প্রচলিত ছিল, এই আয়াতে প্রথমতঃ তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সেই অন্ধকার যুগে যে ব্যবস্হা প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে মৃত ব্যক্তির পুত্র-সন্তানগণ এবং পুত্রের অবিদ্যমানে তাহার যুদ্ধক্ষম আত্মীয়গণ মাত্রই উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী ছিল। পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি আর কেহই তখন উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না।

আয়াতে এই অবিচারের প্রতিবাদে পিতামাতা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়-দের জন্য মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করার হুকুম দেওয়া হইতেছে, যেন ন্যায্য ওয়ারেছরা পূর্বের ন্যায় তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু ওয়ারেছ-দিগের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার পরিপূরক হিসাবে, কিছুদিন পরে, সূরা নেছার ১১ ও ১২ আয়াতে, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, সূরা নেছার আয়াতটি এই আয়াতের সমর্থক ও পরিপূরক ব্যবস্হা মাত্র, তাহার বিরোধী বা বিপরীত কোনও নূতন ব্যবস্হা নহে। সুতরাং আয়াতটা মন্‌ছুখ হওয়া না হওয়ার কোনও প্রশ্নই এক্ষেত্রে উঠিতে পারে না। এখন, সূরা নেছার আয়াতে যে সব আত্মীয়ের প্রাপ্য স্বীকৃত ও অংশ নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অছিয়ত করার আর কোনও সঙ্গতি বা দরকার থাকিতেছে না। পক্ষান্তরে মাহরূম ও মাহজুব ওয়ারেছদের জন্য অথবা কোনো সৎকাজে দান করার জন্য, অছিয়ত করার দরকার এখনও আছে, এবং চিরকাল থাকিবে। সূরা নেছার আয়াতগুলিতেও তাই ওয়ারেছদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্যাংশ নির্ধারণের পর, সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দেওয়া হইতেছে—মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি

হইতে, তাহার "অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পরে।"

১৩৮। **টীকাঃ অছিয়তের অদল-বদল**—১৮১ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তির অছিয়তের কোনো কথার রদবদল করা অন্যায় ও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অপরাধ। ১৮১ আয়াতে বলা হইতেছে যে, অছিয়তকারী কোনও কারণে কোনও ওয়ারেছের প্রতি পক্ষপাত বা অন্যায় করিয়াছে জানিয়া, কেহ যদি সে সম্বন্ধে একটা আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দেয় বা নিষ্পত্তির জন্য সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে তাহাতে যদি কিছু রদবদল করিতে বাধ্য হয়, তাহাতে তাহার উপর কোনও দোষ বর্তিবে না।

---

২৩ রুকু

১৮৩। হে মোমেনগণ! 'ছিয়াম'কে তোমাদের উপর ফরয করা হইল—যেরূপে (তাহা) ফরয করা হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (উম্মত)-দিগের উপর—যেন তোমরা সংযমশীল হইয়া থাকিতে পার,—(১৩৯)

১৮৩ يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ۙ

১৮৪। —গণিত কতিপয় দিবস ; তবে তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা ছফরে থাকে, সে অবস্থায় তাহাকে অন্য কোনো সময় গণনা করিয়া (কাযার রোযাগুলি) শোধ করিতে হইবে; (১৪০) আর যাহারা রোযা রাখিতে সমর্থ হয় বিশেষ কষ্টের সহিত, তাহাদিগকে (এক একটা রোযার পরিবর্তে) এক একজন মিছ্‌কীনকে অন্নদান করিতে

১৮৪ اياما معدودت ط فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ط وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ط فمن تطوع

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ
تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝

হইবে ; তবে কেহ যদি ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু ব্যয় করিতে চায়, তাহা তো তাহার পক্ষে আরও উত্তম ; বস্তুতঃ রোযা রাখিলে তোমাদেরই মঙ্গল—যদি তোমরা অবগত থাক ! (১৪১)

١٨٥ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ
فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ
كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ
اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ
لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

১৮৫। তাহা হইতেছে রমযান মাস, যে মাসের (সাধনা) সম্বন্ধে কোর্‌-আন নাজেল করা হইয়াছে—জনগণের পথপ্রদর্শকরূপে, ও হেদায়তের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণরূপে এবং (হক্‌ ও না-হকের মধ্যে) প্রভেদকারী হিসাবে ;—(১৪২) অতএব তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি এই মাসে স্বগৃহে অবস্থান করে, তাহাকে অবশ্যই রোযা রাখিতে হইবে ; পক্ষান্তরে যে পীড়িত হয় অথবা ছফরে থাকে, তাহাকে অন্য সময় হিসাব করিয়া (ভাঙ্গা রোযাগুলি) শোধ দিতে হইবে; আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন তোমাদের (সাধনাকে) সহজ করিয়া দিতে, কিন্তু কঠিন করিয়া দিতে ইচ্ছুক তিনি কখনই নহেন—যেমতে তোমরা রোযার দিনগুলি পুরা করিতে পার, আর যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশমতে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে পার এবং যেন

و لعلكم تشكرون ○

তোমরা (তাঁহার) শোকরগোজারী করিতে থাক।

١٨٦ و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب ط اجيب دعوة الداع اذا دعان لا فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ○

১৮৬। আর (হে রাছুল!) আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (বলিয়া দিও) আমি তো নিকটেই আছি; কোনও আহ্বানকারী আমাকে ডাক দিলে, অমনি তাহার ডাকে সাড়া দেই। অতএব তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিতে থাকুক, আর আমার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করুক—সেমতে তাহারা (তত্ত্ব) জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। (১৪৩)

١٨٧ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ط هن لباس لكم و انتم لباس لهن ط علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم ج فالئن باشروهن و ابتغوا ما

১৮৭। রোযার রাত্রে স্ত্রী-সংশ্রব তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে; তাহারা হইতেছে তোমাদের পক্ষে লেবাছ্স্বরূপ আর তোমরা হইতেছ তাহাদের পক্ষে লেবাছ্-স্বরূপ; (১৪৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা নিজেদের (বৈধ অধিকার) সম্বন্ধে ত্রুটী করিতেছ, সেমতে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং তোমাদের (ভার) লাঘব করিয়া দিলেন, অতঃপর তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হও এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা অবধারিত করিয়াছেন,

তাহা প্রাপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা কর—এবং পানাহার করিতে থাক—যাবৎ রাত্রের কাল রেখা হইতে উষার শুভ্র রেখা ফাটিয়া বাহির না হয়, তৎপর রোযাকে পুরা করিও রাত পর্যন্ত। এবং মাছজিদে এ'তেকাফ করিয়া থাকিবে যখন, সে অবস্থায় স্ত্রীদের সহিত সংশ্রব করিও না; (১৪৫) বস্তুতঃ এগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমারেখা, অতএব তোমরা তাহার নিকটেও যাইও না; এইরূপে আল্লাহ্ নিজের আয়াত-গুলিকে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন, যেন তাহারা সংযম-শীল হইয়া থাকিতে পারে।

كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَ
اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ
اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج
وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ لا فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৮৮। আর(হে মোমেনগণ!), তোমরা যেন নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মালগুলি অন্যায়ভাবে ভোগ করিও না, এবং জনগণের মালের এক অংশ পাপভাবে ভোগ করার জন্য তৎসংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমাগুলি— (নিজেদের

١٨٨ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى
الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ

অন্যায় সম্বন্ধে) জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও—'হাকিম'দিগের কাছে উপস্থিত করিও না। (১৪৬)	أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ع

তাফ্ছীর

১৩৯। **টীকা : ছিয়াম ও তাহার সাধনা**---ছিয়াম শব্দের অর্থ—ছওম পালন করা। ছওম শব্দের অর্থ নিবৃত্ত থাকা, আত্মসংবরণ করা। ইছলামের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময় পানাহার ও স্ত্রী-সংশ্রব হইতে নিবৃত্ত থাকা ইহার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু কোর্‌আন ও হাদীছের নির্দেশ অনুসারে, ছিয়াম পালনের আরও কতকগুলি অঙ্গ বা অংশ আছে। সেগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে পালন করিয়া যাইতে হইবে। অন্যথায় ছিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হইয়া যাইবে। এই রুকুর আয়াতগুলির তাফ্ছীরে পাঠকগণকে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব।

রোযার হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াতের শেষ অংশে বলা হইতেছে—তোমাদের উপর রোযার হুকুম দেওয়া হইল, যেন উহা পালন করিয়া তোমরা সংযমশীল হইতে—বা হইয়া থাকিতে পার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষকে প্রবৃত্তির সংযমে অভ্যস্ত করার জন্যই ছিয়াম সাধনার প্রবর্তন করা হইয়াছে। মানুষের ''নাফ্ছ'' বা প্রবৃত্তিগুলিও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দান। আধ্যাত্মিক সাধনার নামে এগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলাও যেমন মহাপাপ, প্রবৃত্তিগুলির দাসত্ব স্বীকার করিয়া নেওয়াও সেইরূপ কাবীরা গোনাহ্। রিপুগুলি থাকিবে মানুষের জ্ঞান-বিবেকের বশীভূত, তাহার জ্ঞান-বিবেক রিপুগুলির বশীভূত হইয়া পড়িবে না, ছিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য যে ইহাই, আয়াতের শেষভাগে তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৪০। **টীকা : বর্জিত-বিধি**—রুকু'র প্রথম আয়াতে ছিয়াম পালনের দৃঢ় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে মোছলেম সমাজকে সমগ্রভাবে। ছিয়ামের উদ্দেশ্যের কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ১৮৪ আয়াতের প্রথম অংশে দুই শ্রেণীর লোককে এই আদেশের আমল হইতে রেহাই দিয়া বলা হইতেছে যে, যাহারা পীড়িত হয় বা প্রবাসে থাকে, তাহারা এই সময় রোযা ভাঙ্গিবে। কিন্তু অন্য কোন সময় তাহাদিগকে সেই ভাঙ্গা রোযাগুলি হিসাব করিয়া শোধ দিতে হইবে।

শেষাংশে বলা হইতেছে যে, (বার্ধক্যের জন্য বা অন্য কোনো কারণে) যেসব নর-নারীর অবস্থা এইরূপ হইয়া পড়ে যে, রোযা রাখিতে তাহাদিগকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহাদিগকে রোযা রাখিতে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেকটি রোযার জন্য একজন করিয়া মিছ্‌কীনের খোরাক তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। এক মিছ্‌কীনের খোরাক অর্থ—একজন মিছ্‌কীনের একদিনের খোরাক। অবস্থায় কুলাইলে একাধিক মিছ্‌কীনের খোরাক দেওয়াও উত্তম। ইহাতে রোযার ফিদিয়া আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই রহমতের জন্য আল্লাহ্‌র শোকরিয়াও আদায় করা হয়। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে এমন কতকগুলি দুস্থ নর-নারী থাকে, যাহারা রোযার সময়ও পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায় না। অথচ রোযা রাখিতে তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রোযার ফিদিয়া দেওয়ার জন্য সর্বাগ্রে এই শ্রেণীর মিছ্‌কীন রোযাদারের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

এই আয়াতে يطيقونه শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি—"যাহারা রোজা রাখিতে সমর্থ হয় বিশেষ কষ্টের সহিত" বলিয়া। আমার মতে ইহাই সঙ্গত অনুবাদ। কারণ বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া মানুষ যে কাজ করিতে সমর্থ হয়, আরবী সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহার অনুসারে তাহার, কেবল তাহারই সম্বন্ধে এই শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইমাম রাজী এই মতের সমর্থনে বলিতেছেন :

( ) اما الطاقة فهو اسم لمن كان قادرا على الشيء مع الشدة والمشقة — فقوله و على الذين يطيقونه' اى وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة -

(٢) الحجة الثانية فى تقرير هذا القول انه لا يقال فى العرف للقادر القوى انه يطيق هذا الفعل' لان هذا اللفظ لا يستعمل الا فى حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة - كبير ج ٢' ص ١٧٨—١٧٧ -

ইমাম রাগেবও তাঁহার অভিধানে আলোচ্য শব্দের এই অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাফ্‌ছীরের রাবিগণের অধিকাংশই ইহার অর্থ করিয়াছেন—"যাহারা রোযা রাখিতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখে, তাহারা রোযার বদলে ফিদিয়া (মিছ্‌কীনের খানা) প্রদান করিবে।" এই অসঙ্গত অনুবাদের ফলে, এ জামানার একদল প্রগতিশীল পণ্ডিত ব্যবস্থা দিতেছেন যে, কোনও ওজর আপত্তি না থাকিলেও ফিদিয়া দিয়া রোযা ভাঙ্গা যাইতে পারে। অন্যদিকে, এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, উপরোক্ত

রাবী ও তাফ্ছীরকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, ১৮৪ আয়াত নাজেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫ আয়াত দ্বারা মানছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে! কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আল্লাহ্র কালাম। একটা আয়াত নাজেল করার পর মুহূর্তে তাহাকে মানছুখ করিয়া দেওয়ার খামখেয়ালী, তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে না। বস্তুতঃ কোর্আন মাজীদে মানছুখ আয়াত একটিও নাই।

১৪১। টীকা ঃ রমযান মাস—১৮৪ আয়াতের প্রথমে বলা হইয়াছে—রোযা রাখিতে হইবে গণিত কতিপয় দিবস। এই আয়াতে তাহারই ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হইতেছে, গণিত কতিপয় দিবসের অর্থ হইতেছে রমযান মাসের দিনগুলি। شهر رمضان الذى انزل فيه القران আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে করা হয়—রমযান মাসে, যাহাতে কোর্আন নাজেল করা হইয়াছে। আমি "যাহাতে" স্থলে "যে সম্বন্ধে" বলিয়াছি। আমার পক্ষের যুক্তি-প্রমাণগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(১) আয়াতে فيه শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ, তাহাতে ও তাহার সম্বন্ধে, দুই প্রকারই হইতে পারে। বিষয়ে ও সম্বন্ধে অর্থে "ফী" বর্ণ কোর্আন মাজীদের বহু আয়াতে, রাছুলুল্লাহ্র বিভিন্ন হাদীছে এবং আরবী সাহিত্যে, বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে, এই ব্যবহারের কয়েকটা নজীর নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(ক) এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর فادارئتم فيها তোমরা তাহার "সম্বন্ধে" বিসংবাদ করিতেছিলে (বাকারা)।

(খ) الذى هم فيه مختلفون যাহা "সম্বন্ধে" তাহারা মতভেদ করিতেছে (নাবা)।

(গ) لا تستفت فيهم منهم ابدا তাহাদের "সম্বন্ধে" ইহাদের কাহারও মত জিজ্ঞাসা করিও না (কাহাফ)।

(ঘ) يستفتونك فى النساء নারীদিগের "সম্বন্ধে" তোমার নিকট ব্যবস্থা জানিতে চাহিতেছে (নেছা)।

(ঙ) الذين يجادلون فى آيات الله, যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনগুলি "সম্বন্ধে" কলহ করিতেছে (মোমেন)

(চ) হাদীছে আছে—

دخلت امراة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها

একটা বিড়ালের "কারণে" জনৈক স্ত্রীলোক দোজখে দাখিল হয়—সে তাহাকে বাঁধিয়া রাখে, অথচ খাইতে দেয় নাই। হাদীছের শেষভাগে আছে—

হযরতের মুখে ঐকথা শুনিয়া, ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন—الناا فى البهائم اجر। পশুদিগের "সম্বন্ধে"ও কি আমাদের কর্মফল আছে? হযরত উত্তরে বলেন— فى كل كبد رطبة اجر প্রত্যেক জীবন্ত হৃৎপিণ্ড "সম্বন্ধে" কর্মফল আছে।

(ছ) হাদীছের সাহিত্যে আরও দেখা যায়— رجم ماعز فى الزنا
فى كل اربعين شاة شاة - هذه الاية نزلت فى ابى بكر - هذه الاية
نزلت فى الخمر -

ইহার কোনটিতে "ফী"-বর্ণ তে বা মধ্যে অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মিছ্‌বাহুল মুনীর, কামূছ, মাজ্‌মাউল-বেহার, প্রভৃতি অভিধান এবং কাবীর ২—১৮২, ৪৩৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

এই সকল নজীর হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, "ফী"-বর্ণের অর্থ যেমন স্থান বিশেষে বা মধ্যে হইতে পারে, সেইরূপ বিষয়ে, সম্বন্ধে ও কারণে প্রভৃতিও হইতে পারে। আমি শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ রমযান মাসে সমস্ত কোর্‌আন নিশ্চয় নাজেল হয় নাই। কোনো কোনো অংশ, অন্যান্য মাসের ন্যায় রমযান মাসেও নাজেল হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থায়, "রমযান মাসে কোর্‌আন নাজেল করা হইয়াছে"—বলার কোনও সার্থকতা থাকে না।

এই সমস্যার সমাধানে বলা হইয়াছে যে, হযরতের উপর কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল সর্বপ্রথমে রমযান মাসে। এই হিসাবে বলা হইয়াছে—রমযান মাসে নাজেল হইয়াছিল। কিন্তু আমি এই যুক্তিকেও সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কারণ, এই দাবীর সমর্থনে তাঁহারা কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। পক্ষান্তরে বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদীছের কেতাবে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন ছাহাবিগণের বর্ণিত রেওয়ায়তগুলিতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হযরত রাছুলে কারীম ৪০ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া ৪১ বৎসরে পদার্পণ করার পরেই, তাঁহার উপর কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল। হযরতের জন্ম হইয়াছিল রাবীউল-আউয়াল মাসে, সুতরাং ঐ মাসের ৯(বা ১২) দিন পরেই তাঁহার ৪১ বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইল রাবীউল-আউয়াল মাসেই প্রথমে কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। হাদীছের এবারতগুলি এইরূপ:

انزل عليه و هو ابن اربعين

على راس اربعين سنة

بعث رسول الله صلعم لاربعين سنة

বোখারীর বিখ্যাত টীকাকার হাফেজ ইবন-হাজ্র অন্যত্র প্রতিকূল অভিমতের আভাস দেওয়া সত্ত্বেও এখানে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন :

وهذا انما يتم على القول بانه بعث فى الشهر الذى ولد فيه

"হাদীছগুলির বর্ণনা সার্থক হইতে পারে কেবল সেই অবস্থায়, যখন স্বীকার করা হইবে যে, হযরত যে মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মাসেই নবুয়ত লাভ করিয়াছিলেন" (ফাৎহুলবারী ৩৬৬)। এই জন্যই অধিকাংশ ইমাম ও মোহাদ্দেছগণ এই মতকে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাকেই বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণের সাধারণ অভিমত বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। (জাদুল-মাআদ ১—১৮, হালবী ১—২২৪)।

১৪২। **টীকা: ইছলামে কৃচ্ছ্রসাধনার স্থান নাই**—ইছলামের এবাদত বান্দেগীগুলি সমস্তই সহজসাধ্য, তাহাতে কৃচ্ছ্রসাধনার কোনও স্থান নাই। রোযার হুকুম-আহ্‌কামগুলি হইতেও আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ জানিতে পারিতেছি। যাহাদের রোযা রাখিতে হয় বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া—তাহাদের জন্য রোযা মাফ করিয়া দেওয়া হইল, প্রবাসী ও পীড়িতদের জন্য অন্য সুবিধাজনক সময়ে রোযা রাখার ব্যবস্থা করা হইল, একমাত্র এই উদ্দেশ্যে। ইহা ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। মাসের বিশেষ সময়ের জন্য তাহাদের নামায একেবারে মা'ফ, গর্ভবতী ও প্রসূতি (সন্তানকে দুধ খাওয়াইবার মুদ্দতে) নারীরাও, বিশেষ অসুবিধার সময়, রোযা ভাঙ্গিতে পারে। এই রোযা সম্বন্ধে পরে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, বার্ধক্য-গ্রস্ত লোকদিগের ন্যায়, তাহাদিগকে ফিদিয়া দিতে হইবে। ইমাম আবু-হানিফার মতে রোযার দ্বারা রোযার কাযা শোধ দিতে হইবে। সুতরাং ফিদিয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে না। কারণ এক রোযার পরিবর্তে কাযা ও ফিদিয়া উভয় ব্যবস্থাই বলবৎ করা যাইতে পারে না (কাবীর)। আমার মতে সারকথা এই যে, গর্ভধারণ ও সন্তানকে দুগ্ধ প্রদানের ব্যপদেশে যখন রোযা রাখা স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর বা তাহার ও তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিজনক বিবেচিত হইবে, সেই সময় বাদে, যখনই সুযোগ সুবিধা ঘটিবে, তখনই তাহাকে রোযা কাযা করিতে হইবে। আর যদি ইহার সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে (অবস্থায় কুলাইলে) তাহাকে ফিদিয়া দিতে হইবে।

আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রীলোকের কথা উল্লিখিত না থাকিলেও, "যাহারা রোযা রাখিতে সমর্থ হইবে বিশেষ কষ্টের সহিত"—আয়াত হইতে এই অনুমতি

পাওয়া যাইতেছে, এবং হযরত রাছুলে কারীম স্বয়ং বিষয়টা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

১৪৩। **টীকাঃ আল্লাহ্‌, বান্দাহ্‌র নিকটে**—রুকুর প্রথম আয়াতে ছিয়াম পালনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরের আয়াতের উপসংহারে বলা হইতেছে—রোযার জন্য নির্ধারিত এক মাস ধরিয়া তোমরা যদি এই সাধনাকে যথাযথভাবে অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের মনে ও মস্তিষ্কে এমন এক স্বর্গীয় শক্তির সঞ্চার হইয়া যাইবে, যাহাতে সত্যকারভাবে আল্লাহ্‌র তাক্‌বীর করা এবং একমাত্র তাঁহারই হুজুরে শোকর গোজার হইয়া থাকা, তোমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া যাইবে। ইহা হইতেছে তাক্‌ওয়া বা পরহেজগারীর একদিক এবং সর্বপ্রধান দিক।

তাক্‌বীর অর্থে "আল্লাহু-আকবার" বলা, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু এই আল্লাহু-আকবার শব্দের এবং সেই শব্দ উচ্চারণ করার অর্থ কি? কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া সেই তাৎপর্যকে মনে-প্রাণে ধারণ না করিয়া এবং তাহার সফল সাধনার কোনো অটল সঙ্কল্প গ্রহণ না করিয়া, শুধু "না'রায়ে তাক্‌বীরের" নামে উৎকট চীৎকার দ্বারাই কি আমাদের তাক্‌বীর সাধনা শেষ হইয়া যাইবে? সোজা কথায় বলি—আল্লাহ্‌ সবচাইতে বড়, সকলের চাইতে বড়, আমার আমিত্বের অভিমানের চাইতে বড়, আমার অস্তিত্বের সব উপাদানের চাইতে বড়, আমার লোভ ও ভয়ের সব আজাজীলের চাইতে বড়। সেই অসীমের অনন্ত "বড়ত্বের" কোরবানগাহে, দুনিয়ার আর সব অসত্য-অপ্রকৃত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র 'বড়'কে একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া দেওয়াই তাক্‌বীরের প্রকৃত সাধনা, বরং একমাত্র সাধনা এইরূপে, গণ্ডেপিণ্ডে পান-ভোজন করিয়া, শেষ ঢেকুরের সঙ্গে সঙ্গে "শোকর আলহামদু লিল্লাহ্‌" বলিয়া স্বস্তিলাভের নামও শোকর গোজারী নহে। কোর্‌আন বলিতেছে বান্দাহ্‌র সব শোকর সব কৃতজ্ঞতা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হইতেছেন আল্লাহ্‌। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সেইসব শোকর গোজারীর কারণ ঘটিয়াছে যাহা—তাহার প্রত্যেকটি একমাত্র সেই মহিমাময় আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ দান। সুতরাং যখন কোনো ভয়, কোনো লোভে বা প্রবৃত্তির আর কোনো মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, মানুষ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধকে সেই ভয়ের জন্য সেই লাভের লোভের খাতিরে, বা সেই মায়ার প্ররোচনায় সংবিৎহারা হইয়া অমান্য করিয়া দেয়,—স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই হতভাগ্য মানুষের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ সবচাইতে বড় নন। বরং প্রকৃত পক্ষে, সে নিজের স্বার্থ ও সংস্কারকেই আল্লাহ্‌ অপেক্ষা

বৃহত্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বড় কাহাকে মানিতে হইবে, শোকর গোজারী কাহার আদায় করিতে হইবে, দীর্ঘ ত্রিশ দিনের ছিয়াম সাধনার নিভৃত মুহূর্তে জ্ঞানের সাহায্যে তাহার চিন্তা করিতে হইবে, অন্তরে তাহার অনুভূতি জাগাইতে হইবে। তাহা হইলেই জানিতে পারিবে, মুছলমানের আল্লাহ্‌র জন্য আর কোন ডেপুটি খোদার দরকার হয় না, তাঁর কাছে আবেদন পৌঁছাইতে কোনো উকীল-মোক্তারের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হয় না – তিনি বান্দাহ্‌র নিকটেই আছেন, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময়। সুতরাং তিনি শুনিবেন-ই।

১৪৪। **টীকা ঃ স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ**—রোযার আদেশ নাজেল হওয়ার পর, ছাহাবাগণের অনেকে মনে করিতেন যে, ইফতারের পর হইতে না ঘুমান পর্যন্ত, পানাহার বা স্ত্রী-সংসর্গ বৈধ থাকে। তাহার পর তাহা হারাম বা অবৈধ হইয়া যায়। কেহ কেহ দিনের ন্যায় রাত্রেও স্ত্রী-সংস্রবকে অবৈধ-মনে করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ পৌত্তলিক ও ইহুদীদিগের আচার-ব্যবহার হইতে তাঁহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর একটা ধারণার সঞ্চার হইয়া গিয়াছিল।

এই আয়াতে তাঁহাদের অমূলক ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্ নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের সঞ্চার করিয়াছেন, এক মহান উদ্দেশ্যে। সুতরাং আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত, দিবাভাগের ন্যায়, রাত্রিকালেও সেই সংস্রব বর্জন করিয়া থাকা তোমাদের পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

লেবাছ অর্থে—যাহা পরিধান করা হয়, পোশাক, আচ্ছাদন; যাহা দ্বারা লজ্জা নিবারণ করা হয়; যাহার সাহায্যে মানুষ শীত ও রৌদ্রের প্রকোপ হইতে নিজের দেহকে রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, লেবাছ্-পোশাকের দ্বারা দেহের শোভা ও সৌন্দর্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যায়। এইসব হিসাবে, উভয় স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের লেবাছ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মোটের উপর, এই আয়াতে রোযাদারদিগকে রমযান মাসের রাত্রে স্ত্রী-সংস্রব করাকে বৈধ করা হইয়াছে। প্রাসঙ্গিকভাবে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শুধু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই এই সংস্রবের উদ্দেশ্য নহে। কুদ্‌রতের কারখানাকে বহাল রাখা ও মোহাম্মদের উম্মতীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। রোযার সংস্রবে এই বিষয়টার উল্লেখ করিয়া স্বামীদিগকে এ-সম্বন্ধে সংযত থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। স্বামীদিগের আত্মসংবরণের অভাবই অনেক সময়ে স্ত্রীদিগের অনেক ক্লেশ ও বিড়ম্বনার কারণ

হইয়া দাড়ায় এবং পরিণামে তাহাই দাম্পত্য-জীবনের সুখশান্তির পক্ষে বিঘ্নকর হইয়া থাকে।

•

১৪৫। **টীকাঃ ছিয়াম পালনের সময়**—রাত্রের শেষ যাম সমাপ্ত হইয়া যায় এবং রাত্রের অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রভাতের শুভ্র রোশনি বাহির হইয়া আসে যখন—তখন হইতে পানাহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়া যায় এবং রাত্রের প্রথম সূচনা (বা সূর্যাস্ত) পর্যন্ত, এই নিষেধ বলবৎ থাকে।

হযরত রাছুলে কারীমের হাদীছ অনুসারে, সূর্যাস্তের পর, অতিরিক্ত সতর্কতার বাহানায় ইফ্‌তার করিতে বিলম্ব করা অন্যায়। পক্ষান্তরে যথাসম্ভব বিলম্বে ছেহরী খাওয়ার নির্দেশও হাদীছে দেওয়া হইয়াছে।

১৪৬। **টীকাঃ পরের মাল গ্রাস করা**—পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকার এবং পুণ্যকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই তাক্‌ওয়া বা পরহেজগারী। আমরা এই রুকুর আয়াতগুলি হইতে স্পষ্টভাবে জানিতে পারিয়াছি যে, এই নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করাই হইতেছে রোযার সকল আদেশ-নিষেধের প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে, মোছলেম কওমের সামাজিক জীবনকে প্রেম, ভ্রাতৃভাব ও পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতির স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা হইতেছে, ছিয়াম সাধনার দ্বিতীয় লক্ষ্য। সামাজিক জীবনের সকল কল্যাণে মোহিত করিয়া তোলার জন্য প্রথমে দরকার হয় প্রত্যেকের পারিবারিক জীবনকে শান্তি ও সততায় পূর্ণ করিয়া তোলার। কারণ সমাজ হইতেছে বহু পরিবারের সমষ্টিগত নাম। উপরের আয়াতে এই কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের সমাজ-জীবনের সর্বত্র যে কলহ-বিবাদ ও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের শয়তানী অভিনয় ব্যাপকভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার মূল কারণ হইতেছে দুর্বল পক্ষের উপর প্রবল পক্ষের জুলুম-জবরদস্তি। ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পত্তি নিয়াই প্রধানতঃ এই অভিশাপের সূচনা হইয়া থাকে। প্রবল দল দুর্বলদিগের জমিজমা অন্যায়ভাবে গ্রাস করিতে চাহেন, সে-জন্য মোকদ্দমা-মামলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পল্লী-জীবনের সঙ্গে যাঁহাদের কিছু সম্বন্ধ আছে, এসব ব্যাপার তাঁহাদের অজানা থাকার কথা নয়। পক্ষান্তরে দুর্বল পক্ষ গ্রাম্য 'টাউট' প্রভৃতির দুষ্ট প্ররোচনায় হউক, আর মামলা-বায়ুগ্রস্ত হওয়ার জন্য হউক, অন্য পক্ষকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টারও ত্রুটি করেন না। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বা হালাল-হারাম বলিয়া কোনো কথাই কাহারও স্মরণে আসে না। অথচ রোযার হুকুম দেওয়া হইয়াছে

এই আত্মঘাতী সর্বনাশা প্রবৃত্তিকে সমাজ জীবন হইতে নিঃশেষে বিলুপ্ত করার জন্য ॥

---

২৪ রুকু

১৮৯। (হে রাছুল!) লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে নূতন চাঁদ-গুলি সম্বন্ধে; বল: এগুলি হইতেছে জনগণের মঙ্গলের জন্য কয়েকটা সময়ের নির্ধারণ —বিশেষ করিয়া হজের জন্য; (১৪৭) বস্তুতঃ তোমাদের (প্রচলিত প্রথা অনুসারে হজের সময়) পশ্চাৎ দিক দিয়া গৃহে প্রবেশ করাতে কোনই পুণ্য নাই, কিন্তু পুণ্যবান হইল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র (আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে) সংযত হইয়া চলিয়া থাকে, আর (দেখ), তোমাদের স্বগৃহে উপনীত হওয়া উচিত তাহার দ্বারগুলি দিয়া,—এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সংযত হইয়া চলিবে, যেমতে তোমরা সাফল্যলাভ করিতে পারিবে।

١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ
هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَ
الْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ
الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

১৯০। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাহারা, তোমরাও তাহা-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে, কিন্তু (ন্যায়ের) সীমা লঙ্ঘন করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে পছন্দ করেন না।

١٩٠ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

১৯১। (এ অবস্থায়) যেখানে পাইবে তাহাদিগকে—কতল্ করিয়া ফেলিবে—আর যেস্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে সে স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে, বস্তুতঃ ফেৎনা-ফাছাদ হইতেছে কতল্ অপেক্ষাও গুরুতর (ব্যাপার), আর মাছ্‌জিদুল-হারামের সন্নি-কটে তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না—যাবৎ না তাহারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়; তবে তাহারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়, সে অবস্থায় তোমরাও তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে; কাফেরদিগের প্রতিফল এইরূপই (হওয়া উচিত)।

١٩١ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقٰتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৯২। তবে তাহারা যদি নিবৃত্ত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাপরায়ণ, কৃপা-নিধান।

١٩٢ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৯৩। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবৎ না ফেৎনা-ফাছাদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায় এবং যে পর্যন্ত না দীন হইয়া যায় কেবল আল্লাহ্‌র জন্য

١٩٣ وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط

তবে তাহারা যদি বিরত হয়, সে অবস্থায় (তোমাদের স্মরণ রখিতে হইবে যে,) জালেমরা ব্যতীত আর কাহারও বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করা যাইতে পারে না।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯৪। নিষিদ্ধ মাস তো উভয় দলের পক্ষে নিষিদ্ধ আর তাহার সম্ভ্রম তো সকলের পক্ষে সমান-ভাবে রক্ষণীয়; অতএব কেহ যদি (ঐ নিষিদ্ধ মাসে) তোমা-দের উপর আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমরাও তাহাদের উপর প্রতি-আক্রমণ করিবে তাহার অনুরূপভাবে, আর আল্লাহ্‌র (ন্যায় বিচার) সম্বন্ধে সদা সতর্ক হইয়া চলিবে এবং জানিয়া রাখিবে যে, সংযমশীলদিগের সঙ্গে আছেন আল্লাহ্।

١٩٤ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

১৯৫। এবং তোমরা অর্থ ব্যয় করিতে থাকিবে আল্লাহ্‌র রাহে, আর (তাহার ব্যতিক্রম করিয়া) নিজেরা নিজদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিও না, আর সব কাজ আঞ্জাম দিতে থাক সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, নিশ্চয় (এই শ্রেণীর) সঙ্গত-কর্মা লোক-দিগকেই আল্লাহ্ পছন্দ করিয়া থাকেন। (১৪৮)

١٩٥ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج وَاَحْسِنُوْا صلے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৯৬। আর তোমরা হজ ও ওমরাকে পুরা করিবে — আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিন্তু যদি (তাহা হইতে) নিবারিত করা হয় তোমাদিগকে, সে অবস্থায় যাহা সহজলভ্য হয় (উট, গরু প্রভৃতি) কোরবানী করিয়া (এহরাম শেষ করিয়া ফেলিবে), কিন্তু কোরবানীর পশুগুলি যথাস্থানে পোঁছার পূর্বে নিজেদের মাথা মুড়াইবে না ; তবে তোমাদের কেহ যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে অথবা তাহার মাথায় যদি কোনো আপদ থাকে (এবং সেজন্য সময়ের পূর্বে মাথা মুড়াইতে বাধ্য হয়) তাহা হইলে এজন্য তাহাকে ফিদিয়া দিতে হইবে—রোযা রাখিয়া হউক, ছদকা-খয়রাত করিয়া হউক, আর কোরবানী দিয়াই হউক— কিন্তু অতঃপর তোমরা নিরাপদ হইবে যখন, সেঅবস্থায়, ওমরাকে হজের সঙ্গে মিলাইয়া সুবিধালাভ করিয়াছে যে ব্যক্তি, তাহাকে দিতে হইবে সহজলভ্য যে কোনও একটা কোরবানী, কিন্তু তাহার সংস্থান করিতে পারিবে না যে ব্যক্তি—তাহাকে রোযা

১৯৭ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا
تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ
بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ وقفة
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي

الحج وسبعة اذا رجعتم ۖ تلك عشرة كاملة ۗ ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ۚ واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ۝

রাখিতে হইবে হজের মওছুমে তিন দিন, আর সাত দিন ফিরিয়া আসার পর, এই হইল পুরা দশ দিন ; যাহার পরিজনবর্গ মাছজিদুল-হারামের সন্নিকটে উপস্থিত নাই, তাহার জন্য এ ব্যবস্থা ; আর তোমরা (সকল অবস্থায়) আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংযত হইয়া চলিও আর নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখিও যে, আল্লাহ্ হইতেছেন দণ্ডদানে সুদৃঢ় ।

তাফ্ছীর

১৪৭। টীকা ঃ আহেল্লা বা নূতন চাঁদ—আহেল্লা হেলাল শব্দের বহুবচন। মাসের প্রথম দুই দিনের চাঁদকে হেলাল বলা হয়। ইহার ধাতুগত অর্থ—"ঘোষণা করা।" নূতন চাঁদ উঠিলে, বিশেষতঃ নিষিদ্ধ মাসগুলির চাঁদ দেখা গেলে, সেকালে আরবরা "চাঁদ উঠিয়াছে, চাঁদ উঠিয়াছে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিত, এবং পরস্পরকে মোবারকবাদ জানাইত। এইজন্য উহার নাম হইয়াছে হেলাল। রজব্, জিলকা'দ, জিল্হাজ্জ ও মহর্রম—এই ৪ মাসকে আরব সমাজ নিষিদ্ধ মাস, বা নিরাপত্তার মাস বলিয়া সাধারণভাবে বিশ্বাস করিত। সেজন্য এই মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকিত।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকা'দ মাসে, অন্য মুছলমানদিগকে সঙ্গে নিয়া হযরত রাছুলে কারীম ওমরা করার জন্য মক্কা যাত্রা করেন। তীর্থযাত্রার জন্য আবশ্যক কোরবানীর উট প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিল। কাহারও সন্দেহ না হয়, এজন্য মুছলমানরা যাত্রা করিলেন একরূপ নিরস্ত্রভাবে। কিন্তু কোরেশরা মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁহাদের পথরোধ করিল। ইহা নিয়া অনেক আলাপ-আলোচনা হইল, কিন্তু কোরেশরা কিছুতে নিবৃত্ত হইল না। বরং তাহারা মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। মুছলমানরা তখন ফাঁপরে পড়িলেন। একদিকে নিষিদ্ধ মাস, যুদ্ধ করার উপায় নাই। অন্যদিকে

কোরেশের হাতে সকলের নিহত হওয়ার আশঙ্কা। আলোচ্য আয়াত নাজেল হয় এই সময়। অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, আত্মরক্ষার জন্য নিষিদ্ধ মাসে বা নিষিদ্ধ স্থানে যুদ্ধ করা অসঙ্গত নহে, বরং অবশ্য কর্তব্য, আয়াতে মুছলমান-দিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আরব-দিগের একটা চিরাচরিত কুসংস্কারের প্রতিবাদ করা হইতেছে। তাহাদের নিয়ম ছিল, এহরাম বাঁধার পর গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে, সম্মুখদ্বারের পরিবর্তে তাহারা প্রবেশ করিত পশ্চাৎদিক দিয়া, এবং ইহাকে তাহারা একটা পুণ্য কাজ বলিয়া মনে করিত। আয়াতে এই কুপ্রথার প্রতিবাদ করা হইতেছে। কারণ এই শ্রেণীর কুসংস্কারগুলির দ্বারা মানব সাধারণ প্রকৃত পুণ্যকাজ হইতে বিমুখ হইয়া, প্রচলিত কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসগুলিকেই ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

১৯৩ আয়াতে বলা হইতেছে: যাবৎ না "ফেৎনা" সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায় এবং যাবৎ না দীন হইয়া যায় সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র জন্য—তাবৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইবে। ফেৎনা শব্দের মূল অর্থ অগ্নি-পরীক্ষা। ইছলামের প্রাথমিক যুগে মুছলমানদিগকে বিপদ-আপদের কিরূপ অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী ইবন-আব্বাছের একটি রেওয়ায়তে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন:

فعلنا على عهد رسول الله صلعم و كان الاسلام قليلا و كان الرجل
يفتن فى دينه ، اما قتلوه واما عذبوه ـ حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة ـ

মর্মানুবাদ—হযরতের সময় যখন মুছলমানের সংখ্যা ছিল কম, তখন তাহাদিগকে এই ফেৎনার সম্মুখীন হইতে হয়। তখন শুধু ধর্মের জন্য, মুছলমানের উপর অত্যাচার করা হইত—কাফেররা হয় তাহাকে কতল্ করিয়া ফেলিয়াছে অথবা তাহার উপর উৎপীড়ন চালাইয়াছে। তাহার পর মুছলমানের সংখ্যা বেশী হইয়া গেলে, এই ফেৎনা রহিত হইয়া যায় (বোখারী)। ফলতঃ আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে—যাবৎ না এই শ্রেণীর ফেৎনা রহিত হইয়া যায় এবং যাবৎ না মুছলমানরা একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ অনুসারে, সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে নিজেদের ধর্মপালন করিতে সমর্থ হয়, বিরোধী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে তাবৎ মুছলমানদিগকে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইবে।

১৪৮। **টীকা: জেহাদে অর্থ ব্যয়**—এই আয়াতের সরল ও সঙ্গত অর্থ এই যে, তোমরা জেহাদের প্রস্তুতির জন্য যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতে থাকিও, এবং তাহার ব্যতিক্রম করিয়া আপনাদিগকে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া

দিও না। অর্থাৎ মুছলমান সমাজ সর্বদা, সর্বত্র ও সকল অবস্থায় জেহাদের ভাবনা ভাবিবে ও তাহার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে থাকিবে। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, একদল তথাকথিত ধর্মনায়ক এই আয়াতের বরাত দিয়া মুছলমানদিগকে জেহাদ হইতে নিবৃত্ত রাখারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কারণ, "নিজের জানকে হালাকাতির মধ্যে ফেলিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।" বিভিন্ন সময় শুনিয়াছি এবং ছিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কোনো কোনো "দীনী কিতাবে" দেখিয়াছি : জেহাদের জন্য কতকগুলি শর্ত আছে। সে সব শর্ত পুরা না হইলে জেহাদ ফরয হয় না। অথচ সত্য কথা এই যে, জেহাদ চিরন্তন ফরয এবং তাহার শর্তগুলা পুরা করাও যুগপৎভাবে ফরয। নামায ফরয এবং তাহার অন্যতম শর্ত হইতেছে অযু করা। কেহ যদি যথাসময়ে অযু না করিয়া বসিয়া থাকে, আর কোনো লোক তাহার নামায না পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যদি বলে : নামাযের শর্ত হইতেছে অযু করা। আমার এ শর্ত পুরা হয় নাই। কাজেই বিনা অযুতে নামায পড়িয়া গোনাহ্গার হওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না, তাহা হইলে তাহাকে কি উত্তর দেওয়া হইবে?

---

২৫ রুকু

১৯৭। আর হজের ক্রিয়াকর্মগুলি (সমাধা করিতে) হয় সুবিদিত মাসগুলিতে, সেমতে যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে, হজের কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জানা উচিত যে, হজের সময়ে স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি নাই, কোনো অনাচারে লিপ্ত হইতে নাই, কোনো প্রকার ঝগড়া-লড়াই করিতে নাই; (১৪৯) পক্ষান্তরে যে কোনও সৎকর্ম করিবে তোমরা, আল্লাহ্ সে সমস্তই অবগত থাকিবেন; আর হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ! তোমরা পথের সম্বল সঞ্চয়

197 اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

করিয়া নিবে, নিশ্চয় তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী হইতেছে উৎকৃষ্ট সম্বল, এবং (হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ), তোমরা সমীহ করিয়া চলিবে একমাত্র আমারই। (১৫০)

التقوى ز واتقون
يا ولى الالباب ط

১৯৮। তোমরা এই সময় (ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-দান লাভের চেষ্টা করিলে, তোমাদের উপর কোনো অপ-রাধ বর্তিবে না ;(১৫১) তাহার পর আরাফাত হইতে ফিরিয়া আসার সময় মাশ্‌'আরুল্-হারামের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, যেরূপে তিনি তোমাদিগকে সত্য পথ দেখাইয়া দিয়াছেন— যদিও ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট হইয়া। (১৫২)

١٩٨ ليس عليكم جناح ان
تبتغوا فضلا من ربكم ط
فاذا افضتم من عرفات
فاذكروا الله عند المشعر
الحرام ص واذكروه كما
هدىكم ج وان كنتم من
قبله لمن الضالين O

১৯৯। এবং অন্য সকলে যে স্থান হইতে ফিরিয়া আসে, (কোনও প্রকার ইতর বিশেষ না করিয়া) তোমরাও সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিবে, আর আল্লাহ্‌র হুজুরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ হই-তেছেন ক্ষমাপরায়ণ, কৃপা-নিধান। (১৫৩)

١٩٩ ثم افيضوا من حيث افاض
الناس واستغفروا الله ط
ان الله غفور رحيم O

২০০। সেমতে হজের অনুষ্ঠানগুলি সমাধা করিয়া ফেলিবে যখন, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে —যে প্রকারে (ঐ সময়) নিজেদের বাপ-দাদার কথা স্মরণ করিয়া থাক, বরং তাহা অপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে ;—(১৫৪) বস্তুতঃ মানব সমাজে এহেন লোকও আছে, যাহারা বলিয়া থাকে : হে আমাদের প্রতি-পালক-প্রভু, দুনিয়াতেই আমাদিগকে দিয়া দেও। বস্তুতঃ আখেরাতে তাহাদের প্রাপ্য অংশ কিছুই থাকিবে না।

২০০ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

২০১। পক্ষান্তরে তাহাদের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যাহারা (প্রার্থনা করিয়া) বলে, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যাণ প্রদান কর, আর আখেরাতেও কল্যাণ প্রদান করিও। আর দোযখের আজাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিও।

২০১ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

২০২। এই যে লোকগুলি, ইহাদের অর্জিত কর্মের মহান পুণ্যফল ইহারা প্রাপ্ত হইবে ; আর আল্লাহ্ হইতেছেন হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে ত্বরিৎ। (১৫৫)

২০২ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

২০৩। আর তোমরা আল্লাহ্‌র জেকের করিতে থাকিবে (তাশ্‌রীকের) গণিত দিনগুলিতে, তবে কেহ যদি দুই দিনের মধ্যে (মক্কায়) ফিরিবার জন্য তাড়াতাড়ি করে, তাহাতে তাহার কোনও গোনাহ্ হইবে না ; পক্ষান্তরে কেহ যদি দুই দিন বিলম্ব করে, তাহাতেও তাহার কোনো গোনাহ্ হইবে না—যে ব্যক্তি সংযত হইয়া চলে, তাহার জন্য (এ ব্যবস্থা) ; অধিকন্তু (হজের পরেও) তোমরা সংযত হইয়া চলিতে থাকিবে, আর জানিবে যে, তোমাদের সকলকে সমবেত করা হইবে তাঁহার সন্নিধানে। (১৫৬)

২০৩ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ج وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لا لِمَنِ اتَّقٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২০৪। আর, জনগণের মধ্যে এরূপ লোকও আছে—যাহার পার্থিব জীবন সংক্রান্ত কথাগুলি তোমাকে বিস্মিত করিয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষীও করিতে থাকে, অথচ সে হইতেছে (সত্যের) অতি বড় দুশমন। (১৫৭)

২০৪ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ لا وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

২০৫। অবস্থা এই যে, যখনই এই (শ্রেণীর) লোক শাসনক্ষমতার অধিকারী হইয়া যায়, অমনি চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেয় দেশে ফেৎনা-ফাছাদ উপস্থিত করিতে

২০৫ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ

الحرث و النسل ط والله لا يحب الفساد ○

এবং কৃষিক্ষেত্র ও পশুগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে; কিন্তু ফেৎনা-ফাছাদকে আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করেন না।

٢٠٦ و اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ط ولبئس المهاد ○

২০৬। আর যখন তাহাকে বলা হয়ঃ "আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল," তখন প্রাধান্যের অভিমান তাহাকে (অধিকতর) পাপাচারে লিপ্ত করিয়া দেয়, জাহান্নামই হইতেছে তাহার যোগ্য (প্রতিফল); বস্তুতঃ তাহা হইতেছে অতি নিকৃষ্ট আশ্রম। (১৫৮)

٢٠٧ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ط والله رءوف بالعباد ○

২০৭। অবশ্য জনগণের মধ্যে এমন মানুষও আছে, নিজ প্রাণের বিনিময়েও যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রেজামন্দী হাছেল করিতে প্রস্তুত; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন বান্দাদিগের প্রতি স্নেহপরায়ণ। (১৫৯)

٢٠٨ يايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ص ولا تتبعوا خطوت الشيطن ط انه لكم عدو مبين ○

২০৮। হে মোমেনগণ! তোমরা ইছ্‌লামে দাখিল হইয়া যাও সকলে সমবেত ও সম্পূর্ণভাবে—আর (সাবধান), শয়তানের পদচিহ্নগুলির অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে হইতেছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্‌মন। (১৬০)

٢٠٩ فان زللتم من بعد ما

২০৯। কিন্তু সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণগুলি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়া

যাওয়ার পরেও তোমরা যদি পদ-স্খলিতহইয়া পড়, তাহা হইলে জানিয়া রাখিবে যে, আল্লাহ্ হইতেছেন প্রবল-পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

جاءتكم البينت فاعلموا ان الله عزيز حكيم ٥

২১০। তাহারা কি কেবল এই অপেক্ষা করে যে, আল্লাহ্ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইবেন শুভ্র মেঘপুঞ্জের ছত্রতলে ফেরেশতা-দিগকে সঙ্গে নিয়া, আর এই-রূপে সমস্ত ব্যাপারের সমাধা হইয়া যাইবে। (১৬১) অবশ্য, সমস্ত ব্যাপারই ফিরিয়া যায় আল্লাহ্‌র পানে।

٢١٠ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملئكة وقضي الامر ط والى الله ترجع الامور ع ٥

তাফ্‌ছীর

১৪৯। **টীকা: হজের মওছম**—সুদীর্ঘকাল হইতে আরব দেশের অধিবাসীরা কা'বার হজ সমাধা করিয়া আসিতেছিল। ইহাই ছিল তাহাদের সাংবাৎসরিক সম্মেলন, সমগ্র আরব জাতির প্রধান পর্ব বা ধর্মানুষ্ঠান। ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য-চর্চা, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ফলে হজের মওছম সম্বন্ধে তাহারা সকলে সাধারণভাবে বিদিত ছিল।

শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়া, জিলহাজ মাসের দশম দিন পর্যন্ত, এই মওছম বহাল থাকে। আয়াতের প্রথমভাগে এই সময়ের কয়েকটা নিষিদ্ধ কাজ সম্বন্ধে হজযাত্রীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে:

(১) رفث বা স্ত্রী-সহবাস। কোর্‌আন মাজীদে যৌন-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি বর্ণনা করা হয় আভাস-ইঙ্গিতে, অত্যন্ত সতর্ক ভাষায়। এখানে রাফাছ শব্দও এইভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেসব ব্যাপারের প্রকাশ্য উল্লেখ বা অনুষ্ঠান করা সুরুচি বা সাধারণ ভদ্রতার বিপরীত, সেই শ্রেণীর সকল অশ্লীলতার কাজ ও কথার প্রতি ইহার ব্যবহার হইতে পারে। এই হিসাবে কেহ কেহ এখানে উহার অর্থ করিয়াছেন, ''অশ্লীল কথা'' বলিয়া। কিন্তু এই সূরায় ৮৭ আয়াতে স্ত্রী-

সহবাস বলিয়া ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি এখানেও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, অশ্লীল কথা ব্যবহার করা হজ ব্যতীত অন্য সময়েও নিষিদ্ধ। (আল্-মানার, কাবীর ১—১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(২) فسوق ফোছুক। ইহার মূল অর্থ—নিয়ম ও নীতি ভঙ্গ করা, বিপর্যয় বা উচ্ছৃংখলার প্রশ্রয় দেওয়া। এই হিসাবে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অমান্য করিয়া চলাকেও ধর্মীয় পরিভাষায় "ফেছ্ক" হয়।

(৩) جدال জেদাল। সকল প্রকারের ঝগড়া-লড়াই, হঠতর্ক, সত্য উদ্ধারের পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও অপদস্থ করার জন্য বিতর্ক-বিতণ্ডা, ইত্যাদি সম্বন্ধে এই শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

নামায, রোযা, হজ, যাকাত ও জেহাদ হইতেছে ইছলামের সর্বপ্রধান এবাদত্। এই এবাদত্গুলি সম্বন্ধে একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ইহার প্রত্যেকটির মধ্যে নিহিত আছে বান্দার ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও জাতিগত লক্ষ্য—আত্মশুদ্ধি ও মোছলেম জাতির কল্যাণ কামনা। হজ সম্বন্ধে এই তিনটি নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইতেছে আমাদের সংযম শিক্ষার উদ্দেশ্যে। ইহার অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির প্রধানতম শিক্ষা হইতেছে, মোছলেম জাহানের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠা।

১৫০। টীকা ঃ পাথেয় সঞ্চয়—নিষিদ্ধ বিষয়গুলি সম্বন্ধে বর্ণনা করার পর বলা হইতেছে যে, তোমরা যেসব সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতেছ বা ভবিষ্যতে করিবে, আল্লাহ্ তাহা সম্যকভাবে অবগত থাকেন। অর্থাৎ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তিনি তাহার পুণ্যফল তোমাদিগকে প্রদান করিবেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে—হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ; তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করিয়া নিও, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাক্ওয়া (পরহেজগারী) হইতেছে উত্তম পাথেয় (পথের সম্বল)।

অন্যান্য বহু স্থানের ন্যায়, এখানেও সম্বল বা পাথেয় শব্দের তাৎপর্য নিয়া অনর্থক মতভেদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আয়াতে প্রথম অংশে হজযাত্রীদিগকে বলা হইতেছে—তোমরা এই ছফরে বাহির হওয়ার সময় পথের সম্বল খাদ্য, রাহ-খরচ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া নিও, যেন বিদেশে বিপদে পড়িতে না হয়। সূরা এমরানের ৯ আয়াত হইতে স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, ছফরের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করার সুযোগ যাহার নাই, তাহার উপর হজ ফরয হয় না।

পাথেয় বা পথের সম্বল সঞ্চয় করিয়া নেওয়ার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে, সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিকভাবে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, পার্থিব জীবনের এই সব যাত্রার

ন্যায় তোমাদিগকে আর এক যাত্রার জন্য এই জীবনে সম্বল সঞ্চয় করিয়া নিতে হইবে। সে হইতেছে আখেরাতের বা পরকালের ছফর। সে যাত্রার সম্বল হইতেছে তাকওয়া বা পরহেজগারী।

শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে আমাদিগকে সর্বদা খেয়াল রাখিতে হয় সুপথ্য গ্রহণ করার ও কুপথ্য বর্জন করিয়া চলার, যুগপৎভাবে। এইরূপে ধর্মীয় জীবনকে সুষ্ঠু রাখিতে খেয়াল রাখিতে হইবে, আল্লাহ্ ও রাছুলের নির্ধারিত কর্তব্যগুলি পালন করার ও তাঁহাদের নিষিদ্ধ বিষয়গুলিকে সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করিয়া চলার। ইছলামের পরিভাষায় ইহারই নাম তাকওয়া, এবং ইহারই অনুবাদ করা হয় সংযম বা পরহেজগারী বলিয়া। এই প্রকার ব্যবহারের নজীর কোর্‌আনের অন্যত্র মওজুদ আছে। সূরা আ'রাফের ২৬ আয়াতে মানুষের লেবাছ-পোশাকের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, و لباس التقوى ذلك خير বস্তুতঃ তাকওয়ার যে লেবাছ, তাহাই হইতেছে উত্তম।

১৫১। **টীকা ঃ আল্লাহ্‌র "ফজল"**—ফজল শব্দ মুছলমান সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত আছে। আল্লাহ্‌র ফজলে ভাল আছি, আল্লাহ্‌র ফজলে এবার ফসল খুব ভাল হইয়াছে—এই শ্রেণীর কথা আমরা সচরাচরই বলিয়া থাকি। ফজল-শব্দের অর্থ—ইনআম বা অনুগ্রহদান। মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বা অন্য প্রকারে সঙ্গতভাবে যে অর্থ উপার্জন করে, কোর্‌আন মাজীদের বহুস্থানে তাহাকে ফজল বলা হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, হজের মওছুমে বৈধভাবে অর্থ উপার্জন করাতে কোনও গোনাহ্ হয় না।

১৫২। **টীকা ঃ মাশ্‌আরুল-হারাম**—"মক্কা ও আরাফাতের মধ্যে মিনা ও মোজদালেফা নামক দুইটি স্থান আছে। আরাফাত হইতে ফিরিবার সময় প্রথমে মোজদালেফায় অবস্থান করিতে হয়। এই মোজদালেফার একটা পাহাড়ের নাম মাশ্‌আরুল-হারাম। 'মাশআরুল-হারামের নিকট' বলিতে সমগ্র মোজদা-লেফাকে বুঝাইতেছে।"

১৫৩। **টীকা ঃ অসাম্যের মূলোচ্ছেদ**—হজ সম্মেলনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জনগণের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রাক্-ইছলামী যুগের কোরেশ সমাজ, অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায়, এক্ষেত্রেও হযরত ইবরাহীমের প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে বর্জন করিয়া, তাহার স্থলে অসাম্য ও কৌলিন্যের শয়তানী শিক্ষাকেই নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। হজের জন্য সকলকে জিলহাজ মাসের ৯ই তারিখে আরাফাত ময়দানে

সমবেত হইতে হইবে, ইহাই ছিল চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু কোরেশের পণ্ডিত-পুরোহিতরা মনে করিলেন যে, তাঁহারা হইতেছেন কা'বার খাদেম ও রক্ষক, সুতরাং অন্যান্য গোত্রের লোকদিগের তুলনায় তাঁহাদের মর্যাদা হইতেছে অনেক বেশী। তাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা আরাফাতে না গিয়া মোজদালেফায় অবস্থান করিবেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবেন।

কতদিন হইতে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক প্রমাণ আমি জানিতে পারি নাই। তবে বহু বিশ্বাস্য হাদীছ হইতে নিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে যে, ইহার প্রতিবাদ ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল সর্বপ্রথমে তরুণ মোস্তফার কণ্ঠে। নবুয়তলাভের পূর্বে মোস্তফা শুধু মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি কোরেশদিগকে ত্যাগ করিয়া, জনসাধারণের সঙ্গে মোজদালেফায় ফিরিয়া আসিলেন। মনে হয়, বিশ্বমানবের ইহ-পরকালের সুন্দরতম আদর্শ মোহাম্মদ মোস্তফা, যেন মাতৃগর্ভ হইতে নবুয়তের মহিমামণ্ডিত হইয়া দুনিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। (হাদীছগুলির জন্য তাফ্ছীর 'দুর্রে মানছুর' দেখুন)।

মোস্তফার প্রতিষ্ঠিত আদর্শের সমর্থন করিয়া এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, হজযাত্রীদিগকে অন্য সব লোকের সঙ্গে মিশিয়া যথানিয়মে সেখানে অবস্থান করিতে এবং তাহাদের সঙ্গে মিনা ও মোজদালেফায় ফিরিয়া আসিতে হইবে।

১৫৪। **টীকা ঃ আর একটা কুপ্রথা**—হজ শেষ হওয়ার পর আরবরা বাজারে বা মেলায় সমবেত হইত। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের কবি ও কারিকা-কারগণ নিজেদের পূর্ব-পুরুষগণের গৌরবগাথা কীর্তন করিতেন, নিজেদের কবি প্রতিভার পরিচয় দিতেন এবং অনেক সময় অন্য গোত্রের সম্মান-সম্ভ্রমের উপর আক্রমণ চালাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার ফলে নূতন করিয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি হইয়া যাইত।

আয়াতে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানগুলি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় নাই। উহার মন্দ দিকগুলি বর্জন করার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, মুছলমানের সব অনুষ্ঠান হইবে "আল্লাহ্-কেন্দ্রিক।" তাহা হইলে কৌলিন্যের অহঙ্কার, জ্ঞানের অভিমান, গোত্রগত বিদ্বেষ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি, আপনা আপনি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হজের প্রত্যেক পর্যায়ে এই শিক্ষার প্রভাব বিদ্যমান।

১৫৫। **টীকা ঃ মানুষের শ্রেণী বিভাগ**—২০০ আয়াতের শেষ অর্ধ হইতে ২০২ আয়াত পর্যন্ত, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি ভেদে মানুষকে দুই শ্রেণীতে

বিভক্ত করিয়া দেখান হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক কেবল পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের জন্য লালায়িত। এই জীবনই যে, মানব জন্মের শেষ কথা নহে, তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাহারা ইহকালে ও পরকালে, উভয় জীবনে কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ্‌র হুজুরে প্রার্থনা করিয়া থাকে। পরবর্তী জীবনের কল্যাণ যে, এই জীবনের কর্মাকর্মের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে। ২০২ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, নিজেদের ঈমান ও আমলের পুণ্যফলগুলি তাহারা প্রাপ্ত হইবে তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে।

১৫৬। **টীকা: আইয়ামে তাশরীক্**—জিল্‌হাজ মাসের ১০ই, ১১ই ও ১২ইকে আইয়ামে তাশরীক্ বলা হয়। এই সময় আল্লাহ্‌র তাকবীর করা—আল্লাহু-আকবার উচ্চারণ করার—বিশেষভাবে তাকীদ করা হইতেছে। কোরবানী ও কঙ্কর মারার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর বলা হয়।

১৫৭। **টীকা: মোনাফেক্-মুছলমান**—"পার্থিব জীবন সম্বন্ধে"—যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে, দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে, জাতির মঙ্গল-সাধনের নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে, ইত্যাদি। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাহারা নানা ছন্দে-বন্দে কথার জাল বিস্তার করিয়া জনসাধারণকে সম্মোহিত ও প্রতারিত করিতে থাকে। আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়া নিজের আন্তরিকতা প্রতিপন্ন করিতে চায়। অথচ এই শ্রেণীর লোকগুলি হইতেছে জনসাধারণের পরম শত্রু। পরবর্তী আয়াত্ দুইটিতে ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

১৫৮। **টীকা: মোনাফেকদের বাস্তব স্বরূপ**—কিন্তু নিরীহ জনসাধারণ যখন ইহাদের কথার ছলনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া এই মোনাফেকগুলিকে ক্ষমতার আসনে বসাইয়া দেয়, তখন নিজেদের সমস্ত ওয়াজ-বক্তৃতা ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া, তাহারা সেই জনসাধারণের সর্বনাশ করিতে আরম্ভ করে;—এমন সব কুকর্ম আরম্ভ করিয়া দেয়, যাহার ফলে দেশবাসী—বিশেষতঃ কৃষক সমাজ—উৎপন্ন খাদ্যশস্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, জমির মালিককে তাহার জমি হইতে এবং সেই জমির উৎপন্ন ফসল হইতে বেদখল হইতে হয়, এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অস্থির হইয়া কৃষক ও গৃহস্থ সমাজ তাহাদের গরু-বাছুর বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়া পড়ে—অথবা ঐ শাসক গোষ্ঠীর উপেক্ষা বা অত্যাচারের ফলে অনাহারে অর্ধাহারে রোগগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায়।

তখন কেহ যদি বলে—দেশ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে। দেশের বহু লোক

অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। আল্লাহ্‌র ভয় করুন, এইসব অনাচার বন্ধ করিয়া দিন। শক্তি মদমত্ত কর্তৃপুরুষগণের মেজাজের গর্মি তখন ১১০ ডিগ্রীতে উঠিয়া যায়। সম্মানের অভিমানে সংবিৎহারা হইয়া, তাহারা দ্বিগুণ প্রচণ্ডতার সহিত অনাচারগুলি চালাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই ক্ষুদে-ফেরআওনদের ফেরাওনী দম্ভ-দর্প, অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিবে না। কারণ, এই শ্রেণীর জুলুম ও অনাচারকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

এই আয়াত কয়টিতেও বর্তমান ইতিহাসের সার কথাগুলি বান্দাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন আল্লাহ্‌র বান্দারা এই শ্রেণীর "মোনাফেক-মুছলমান"দিগের নীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সদা সতর্ক হইয়া থাকে।

১৫৯। **টীকা: প্রতিকারের উপায়**—ছদ্মবেশী মুছলমান বা মোনাফেক-দিগের অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তাই ইহাদের দ্বারা প্রবর্তিত অনাচার-অবিচারের প্রতিকারের উপায়ও এই প্রসঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২০৫ আয়াতে বলা হইয়াছে—ফেৎনা-ফাছাদকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, সকল মুছলমান এই শ্রেণীভুক্ত নহে। আল্লাহ্ না পছন্দ করেন যে কাজগুলিকে, তাহার অবসান ঘটাইয়া, আল্লাহ্‌র রেজামন্দী বা সন্তোষলাভ করা যাইবে যেসব কাজের দ্বারা, তাহার প্রবর্তন করার জন্য সক্রিয়ভাবে কর্মসমরে অবতীর্ণ হইতে পারিবে, এমন সাধক বা মোজাহেদ, মুছলমান সমাজে চিরদিন মওজুদ থাকার দরকার—আল্লাহ্‌র রেজামন্দী হাছেল করার জন্য তাহারা নিজেদের প্রাণকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাই ইছলামের বায়আত্ বা আল্লাহ্‌র হাতে আত্মবিক্রয়।" (তাওবা, ১১১ আয়াত)।

আয়াতের উপসংহারে বলা হইতেছে—"আল্লাহ্ হইতেছেন বান্দাদিগের প্রতি স্নেহপরায়ণ।" অতএব আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশ পায় যেসব কাজে, সেগুলিকে অবলম্বন করাই হইতেছে আল্লাহ্‌র রেজামন্দী হাছেল করার অন্যতম প্রধান উপায়।

মোছলেম-রূপী মোনাফেক্‌দিগের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে যাহারা, "আয়াতে এই মোজাহেদদিগের কথাই বলা হইতেছে" (এবন-কাছীর)।

১৬০। **টীকা: গুরুত্বপূর্ণ আদেশ**—আয়াতে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া আদেশ দেওয়া হইতেছে: তোমরা ইছলামে দাখেল হইয়া যাও, كافة—

শব্দের হিসাবে ইহার অর্থ হইতে পারে সমবেতভাবে বা সম্পূর্ণভাবে। বিশিষ্ট তাফ্‌ছীরকারগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম ও কেহ কেহ দ্বিতীয় তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে কতকগুলি কষ্ট-কল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় (কাবীর)। প্রথম অর্থের জন্য তাহার দরকার হয় না। অথচ দ্বিতীয় অর্থটাও অভিধানসিদ্ধ। এইজন্য আমি অনুবাদে উভয় অর্থের উল্লেখ করিয়া দিয়াছি।

এই অর্থ দুইটি পরস্পর বিরোধী নহে। প্রথম অর্থের সারমর্ম এই যে, মছলমান কওম ইছলাম ধর্মে প্রবেশ করিবে সকলে সমবেতভাবে, দলে দলে বিভক্ত হইবে না। দ্বিতীয় অর্থের তাৎপর্য এই যে, ইছলামের যেসব আদেশ-নির্দেশ ও বিধি-ব্যবস্থা আছে, মুছলমান সমাজ তাহার প্রত্যেকটিকে আল্লাহ্‌র ফরমান ও রাছুলের আদর্শ হিসাবে সমান মর্যাদা দিবে, কতকগুলিকে গ্রহণ করিয়া আর কতকগুলিকে—অন্য মজ্‌হাবের দলিল বলিয়া—বর্জন করিবে না। বলা বাহুল্য, এই নীতির উপর আমল করিতে স্বীকৃত হইলে, মোছলেম সমাজের ধর্মগত বিভেদ-বিচ্ছেদ ও তজ্জনিত হিংসা-বিদ্বেষ একদিনেই নস্যাৎ হইয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ "ছুন্নৎ জামাত"* বলিয়া পরিচিত দলগুলির সর্বনাশী আত্মকলহের অবসান আপনা-আপনি হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোছলেম জাহানের অন্ততঃ শতকরা ৮০ ভাগ হইতেছে ইহারাই। সুখের বিষয়, বিশ্ব-মোছলেমের চিন্তা জগতে এই সত্যের অনুভূতি ক্রমশই ক্রম বর্ধমান দৃঢ়তার সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে।

১৬১। **টীকাঃ কর্মবিমুখের ধর্মসাধনা**—মোছলেম জাতির কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে উপরের কতকগুলি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য অনেক আয়াতে আরও অনেক আদেশ-নির্দেশের উল্লেখ আছে। সে সমস্তের সমবেত নির্দেশের সারমর্ম হইতেছে—ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে আমল, ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম। এ সাধনার প্রথম সম্বল হইতেছে আত্মত্যাগ, প্রাণপণ সংগ্রাম এবং সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠা। কোর্‌আনের এইসব শিক্ষা

---

* ছুন্নত অর্থে রাছুলুল্লাহ্‌র তওর-তারীকা, নীতি-পদ্ধতি, এবং শিক্ষা ও আদর্শকে বুঝায়। ইহার বিপরীত কাজ করার নাম বেদ্‌আত্‌। রাছুলের কথায় বা কাজে যেসব বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, সেইগুলি হইতেছে বেদ্‌আত্‌ বা নূতন আবিষ্কার—যদি তাহা ধর্মের হিসাবে পালন করা হয়। ফলতঃ ছুন্নীর বিপরীত কথা হইতেছে, বেদ্‌আতী। কোন্‌টা ছুন্নত আর কোন্‌টা পরবর্তী যুগের আবিষ্কৃত বেদ্‌আত, কোরআন-হাদীছের কষ্টিপাথরে সহজে তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অবগত হওয়ার পরও যদি মুছলমান সমাজ সে অনুসারে কাজ না করিয়া, বানি-ইছ্রাইলের ন্যায়, শুধু আকাশ কুসুম কল্পনা দ্বারা নিজেদের সব কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া বসে, আর আশা করিতে থাকে যে, স্বয়ং সদাপ্রভু ফেরেশ্তাদিগের এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়া "শ্বেত জলদ পুঞ্জের মধ্য দিয়া" নামিয়া আসিবেন, এবং নিমেষের মধ্যে তাঁহাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত লক্ষ্য ও আদর্শ এবং যাবতীয় আশা-আকাঙক্ষা সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে ? তাহা কি সফল হইতে পারিবে ?

না, ইহা কদাচ সম্ভব হইবে না । এই শ্রেণীর কর্মবর্জিত ধর্মসাধনার স্থান ইছ্লামে নাই ।

উপসংহারে বলা হইতেছে—সমস্ত ব্যাপারই ফিরিয়া যায় আল্লাহ্‌র পানে। অর্থাৎ—মানুষের কর্মসাধনার মূল শক্তিকেন্দ্র হইতেছেন আল্লাহ্ । তাঁহার দেওয়া সেই শক্তির সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করিল কে কি পরিমাণে, তাহার বিচার করিবেন আল্লাহ্‌ই ।

---

২৬ রুকু

২১১। (হে রাছুল।) তুমি বানি-ইছ্রাইলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ : কত সুস্পষ্ট নিদর্শনই না আমরা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে প্রাপ্ত হওয়ার পর যে ব্যক্তি তাহাকে বদলাইয়া ফেলে, সে অবস্থায় (তাহার জানা উচিত যে,) আল্লাহ্ হইতেছেন দণ্ডদানে সুদৃঢ় । (১৬২)

٢١١ سَلْ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ o

২১২। কাফের হইয়াছে যাহারা, দুনিয়ার জেন্দেগী সুশোভিত হইয়া আছে তাহাদের দৃষ্টিতে, সেমতে তাহারা

٢١٢ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ

مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا م
وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

মোমেনগণের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া থাকে, অথচ কিয়ামতের দিন পরহেজগার লোকেরা হইবে (মর্যাদায়) তাহাদের ঊর্ধ্বে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রেজেক দান করেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً
وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ
النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ
اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط فَهَدَى اللّٰهُ

২১৩। সমস্ত মানুষ ছিল (আদিতে) একই উম্মতভুক্ত; সেই অবস্থার পর আল্লাহ্ নবীদিগকে প্রেরণ করিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে এবং সেই নবিগণের মারফতে (নিজের) কেতাবও নাজেল করিলেন বারহাকভাবে,—এই উদ্দেশ্যে যে, তাহা জনগণের মধ্যে, তাহাদের বিরোধীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে ফায়ছালা করিয়া দিবে; (১৬৩) অবস্থা এই যে, কেতাব দেওয়া হইয়াছিল যাহাদিগকে, তাহারা সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটাইয়াছিল, বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার পরে, কেবল পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের ফলে; কিন্তু ঈমানদার লোকদিগকে আল্লাহ্ তাহাদের বিরোধনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে সত্যপথ

الذين امنوا باذنه ط والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ٥

দেখাইয়া দিলেন, নিজের অনুজ্ঞা-ক্রমে ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সত্য ও সরল পথের পানে হেদায়ত করিয়া থাকেন। (১৬৪)

২১৪ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ط مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ط الا ان نصر الله قريب ٥

২১৪। (হে মোমেনগণ!) তোমরা কি ধারণা করিয়া নিয়াছ যে, (বিনা-আজমায়েশে) জান্নাতে দাখিল হইয়া যাইবে। অথচ তোমাদের পূর্বে যেসব (মোছলেম) সমাজ গুজরিয়া গিয়াছে, তাহাদের (পরীক্ষার) অনুরূপ কোনো আজমায়েশ এখনও তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই ;— তাহাদের উপর বর্তিয়া যায় আপদ-বিপদ ও রণ-বিভীষিকা, এবং তাহারা প্রকম্পিত হয় এমন (প্রচণ্ড) ভাবে যে,(স্বয়ং)আল্লাহ্র রাছুল ও তাহার সহযোগী মোমেনগণ বলিয়া উঠে—কখন আসিবে আল্লাহ্র সাহায্য ? জানিয়া রাখ—আল্লাহ্র সাহায্য তো (তোমাদের) নিকটবর্তী। (১৬৫)

২১৫ يسئلونك ماذا ينفقون ط قل ما انفقتم من خير

২১৫। (হে রাছুল!) লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে—তাহারা "ব্যয়" (দান) করিবে কি প্রকারে ? তুমি বলিয়া দাওঃ "যে কোনও

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ
خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

মাল তোমরা ব্যয় কর না কেন, তাহা প্রাপ্য হইবে পিতা-মাতার, নিকটবর্তী আত্মীয়গণের, এতীম-গণের, কাঙ্গালগণের, (দুস্থ) পথিকগণের—বস্তুতঃ যে কোনও ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর না কেন, (স্মরণ রাখিও) যে, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্যক বিদিত। (১৬৬)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰى
اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا
شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○ ع

১৬। হে (মোমেনগণ।) যুদ্ধকে তোমাদের উপর ফরয (অপরি-হার্য ধর্মীয় কর্তব্যরূপে) অব-ধারিত করা হইয়াছে, অথচ তাহা হইতেছে তোমাদের পক্ষে অপ্রীতি-কর—খুব সম্ভব, তোমরা এমন একটা বিষয়কে অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করিতেছ, যাহা তোমা-দের পক্ষে বস্তুতঃই কল্যাণজনক পক্ষান্তরে ইহাও খুব সম্ভব যে, এমন একটা বিষয়কে তোমরা প্রীতিকর বলিয়া মনে করিবে বস্তুতঃ যাহা তোমাদের পক্ষে হইতেছে অনিষ্টকর; বস্তুতঃ প্রকৃত অবস্থা এই যে, (তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল) আল্লাহ্-ই অবগত আছেন, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না। (১৬৭)

তাফ্ছীর

১৬২। **টীকাঃ ইছরাইলীদের অধঃপতনের নিদান**—বানি-ইছ্রাইল সমাজের নিকট আল্লাহ্র আয়াত ও নিদর্শনগুলি সমাগত হইয়াছিল, আল্লাহ্র নবিগণের ও কেতাবগুলির মারফতে। বস্তুতঃ নবুয়ত ও কেতাবই ছিল, তাহাদের সমস্ত পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির একমাত্র উৎস কেন্দ্র। এই নিদর্শনগুলিকে বানি-ইছ্রাইল অতি নিষ্ঠুরভাবে অমান্য করিয়াছিল। কেতাবের পরিবর্তন ও নবীদিগের হত্যাসাধন করিতে তাহারা কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের অধঃপতনের প্রথম কারণ ছিল ইহাই।

এই প্রসঙ্গে কুদরতের একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম সম্বন্ধে আরও বলা হইতেছে ঃ আল্লাহ্র নিয়ামতকে বিকৃত করিয়া ফেলিবে যে বা যাহারা, কঠোর দণ্ডের ভাগী হইতে হইবে তাহাদিগকে। এই সূরার ৩২ রুকূ হইতে জানা যাইতেছে যে, সংখ্যায় বহু সহস্র এবং নবুয়তের ওয়ারেছ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা একটা ধিকৃত অভিশপ্ত দাস জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, প্রধানতঃ জেহাদের কর্তব্য পালনে বিমুখ হওয়ার ফলে। কোর্‌আনের বাহক মোছলেম জাতিকে আল্লাহ্র এই অলঙ্ঘ্য ও শাশ্বত নিয়মের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে—অর্থাৎ নবুয়তের শিক্ষা ও জেহাদের সাধনা হইতে স্খলিত হইলে মুছলমানদের পরিণামও ইহাই ঘটিবে। এই মূঢ়তার মূল কারণ হইতেছে পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের মোহ। পরবর্তী আয়াতেও ইহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৬৩। **টীকাঃ আদিযুগের মানব সমাজ**—দূর অতীতের কোনো এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় যুগে, স্বষ্টি কর্তার মহান উদ্দেশ্য যখন আদম বা মানবরূপে ধরার পৃষ্ঠে সর্বপ্রথমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সূচনা করিতেছিল, আয়াতে সেই আদিযুগের অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে। মানুষের সমাজে তখন জাতিবিচার ছিল না, বর্ণবিভেদ ছিল না, রাজ্য-প্রতিষ্ঠার বিভীষিকা ছিল না,—সকলেই তখন ছিল এক 'উম্মত'ভুক্ত। কিন্তু সে ছিল অজ্ঞতার যুগ।

কালক্রমে সাধারণ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এই প্রাথমিক সভ্যতার উন্মেষ তাহাদের মধ্যে আরম্ভ হইয়া যায়। কিন্তু মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য, কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও উপলব্ধি হইতে তখনও তাহারা বঞ্চিত ছিল। সত্যনিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বিচার বুদ্ধির অভাবে, জঙ্গলের আইনই ছিল, তাহার সমাজ জীবনের প্রধান অবলম্বন। কাজেই আত্মকলহ ও সংঘাত-সংঘর্ষেরও ইয়ত্তা ছিল না।

সেই সময় হইতে, মানুষের চক্ষুদানের জন্য, আল্লাহ্ নিজের নবী-রাছুলদিগকে দুনিয়ায় অভ্যুত্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের মারফতে নিজের কালামগুলিকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জনগণের মধ্যে যে-সব বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতেছিল, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাহার চরম ফায়ছালা করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

১৬৪। **টীকা: বিপরীত ফল**—আল্লাহ্‌র কেতাব আসিয়াছিল, মানুষের সব বিবাদ ও বিসংবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য। কিন্তু একদল অবিবেচক লোক সেই কেতাব সম্বন্ধে মতবিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিল, অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের ফলে। মানবীয় ইতিহাসের এই স্তরে জাতি বিচার ও কৌলিন্যবাদ, প্রতীক ও জড়পূজা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও নরপূজা প্রভৃতি সর্বনাশী মহাপাতকগুলির প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে।

কিন্তু যাহারা ছিল ঈমানদার, মুক্ত বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে যাহারা আল্লাহ্‌র কেতাবকে জানিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা সত্য-পথের পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

অতীতের এই চিত্র-বৈচিত্রের পরিচয় দিয়া কোর্‌আন আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে—সাবধান! তোমরা যেন তাহাদের মত হইও না, হিংসা-বিদ্বেষের মানসিকতা নিয়া সত্যকে অমান্য করিও না। কিন্তু এখনও কি আমরা সতর্ক হইতে পারিয়াছি, সতর্ক হইতে চেষ্টা করিয়াছি? তাহা হইলে একই আল্লাহ্‌র প্রেরিত ইছলাম পন্থী, একই কোর্‌আনের বাহক ও একই নবীর উম্মতের মধ্যে আজও এত দলাদলি কিসের জন্য?

আল্লাহ্ তাঁহার পাক কালামের তোফায়েলে আমাদিগকে সুমতি দান করুন।

১৬৫। **টীকা: মোমেনের আজ্‌মায়েশ**—আল্লাহ্‌র বার্‌হাক দীনকে মনে-প্রাণে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে যে ব্যক্তি এবং সেই সত্যকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে যে মোমেন—সংসার জীবনে সকল প্রকার বিপদ-আপদের জন্য তাহাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ইহাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন নিয়ম। হযরত রাছুলে কারীম বলিয়াছেন—"তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত গুজরিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, মাথায় করাত বসাইয়া যাহাদিগকে চিরিয়া ফেলা হইয়াছে, লোহার চিরুণী দিয়া যাহাদের শরীরের সমস্ত মাংস তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের দীনকে বর্জন করে নাই (এবন-কাছীর)।

কোর্‌আন নাজীদের আরও কতিপয় আয়াতে এইরূপ ক্ষেত্রে ফেৎনা বা

এব্তেলা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অগত্যা উহার অর্থ করা হয় পরীক্ষা বা আজমায়েশ বলিয়া। এইসব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত বলিয়া দিয়াছেন—"আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন, অথচ তোমাদের সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞাত নহেন।" আসল কথা এই যে, তোমরা যেমন সোনাকে আগুনে দিয়া ঝালাই করিয়া নেও, সেইরূপে আল্লাহ্তাআলা তোমাদিগকে বিপদ-আপদে ফেলিয়া ঝালাই করিয়া নিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর অগ্নি-পরীক্ষায় তোমাদের ঈমানের খাদগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তোমরা খাঁটী সোনায় বা খাঁটী মোমেনে পরিণত হইয়া যাও (হাকেম-মর্মানুবাদ)।

কোর্আনের শিক্ষা ও হযরত রাছুলে কারীমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ইছলামের প্রথম যুগে, বহু মোমেন নরনারী ঈমানের এই পরীক্ষায় বিশেষ গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের এইসব অনুপম কীর্তি-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু বাংলার অভিমানী মুছলমান আমরা, নিজেদের এই উত্তরাধিকারের কোনো খবরই আমাদের নাই।

১৬৬। **টীকাঃ সদ্ব্যয়ের উপযুক্ত পাত্র**—এখানে সাধারণ সদ্ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। ফরয সদ্ব্যয় বা যাকাতের বিষয় সূরা তাওবার ৬০ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতে বর্ণিত তরতীবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এই সদ্ব্যয়গুলি, পরিভাষার হিসাবে, "ফরয"-পর্যায়ভুক্ত না হইলেও অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক মুছলমান এই কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিলে, সমাজ হইতে দারিদ্র্যের অভিশাপ বহু পরিমাণে দূর হইয়া যায়।

১৬৭। **টীকাঃ জেহাদের নির্দেশ**—কোর্আন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে জেহাদের তাকীদ করা হইয়াছে। হযরত রাছুলে কারীম নিজে ইহার উপর যথাযথভাবে আমল করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহার ছাহাবা ও খলিফাগণ চরম দৃঢ়তার সহিত এই আদেশ পালন করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনার সাফল্য দুনিয়ার ইতিহাসে সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।

কিন্তু তাঁহাদের পর খেলাফত্ যখন বাদশাহীতে পরিণত হইয়া গেল, ইছ্লামী রাষ্ট্রের শাসনভার যখন বিলাসী আমীর-ওমরাদের হস্তগত হইয়া গেল এবং তাক্ওয়ানাশীন পীর ও রাজ প্রাসাদের বৃত্তিভোগী ও কৃপাভিখারী আলেমগণ যখন ধর্মের একচেটিয়া অধিনায়ক হইয়া বসিলেন—তখন হইতে, জেহাদের "বিড়ম্বনা" হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, "হীলা" আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। প্রথম দল বলিলেন—ময়দানের যে লড়াই, তাহা হইতেছে ক্ষুদ্র জেহাদ, আসল জেহাদ ও বৃহত্তম জেহাদ হইতেছে হুজ্রার জেহাদ, নাফ্ছে

আম্মারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—জেহাদ শব্দের ধাতুগত অর্থ—সাধনা, কোশেশ বা চেষ্টা করা। অন্যদিকে দরবারী আলেমরা গ্রীক ন্যায়-দর্শনের অনুসরণে, জেহাদের কোর্‌আন-হাদীছ প্রবর্তিত শর্তগুলিকে ক্রমশঃ দুঃসাধ্যভাবে কঠিন ও জটিল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু এই আয়াতে জেহাদের স্থলে "কেতাল" শব্দ ব্যবহার করিয়া, এই শ্রেণীর কাপুরুষতার দর্শনকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারই ব্যাখ্যায় সূরা এমরানে قاتلوا و قتلوا পদ ব্যবহৃত হইয়াছে (১৯৪ আয়াত)।*

অবশ্য জেহাদের জন্য কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতি আছে এবং বলা বাহুল্য যে, থাকাও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রথমতঃ সেই শর্তগুলি কোর্‌আন-হাদীছের অনুযায়ী হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ সেই শর্তগুলি পূরণ করাও যে ফরয, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

আরবরা যুদ্ধ-বিগ্রহে আদৌ অনভ্যস্ত ছিল না। বরং প্রাক্‌-ইছলামী যুগে তাহাই আরব গোত্রগুলির প্রধান ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবু আয়াতে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—"অথচ জেহাদ হইতেছে তোমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর।"

হযরতের ছাহাবাগণ জেহাদ করিতে কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের একদল মনে করিতেছিলেন, বর্তমানে আমাদের প্রস্তুতির সময়। বহু মুছলমান এখনও মক্কায় আটক হইয়া রহিয়াছেন। মদীনায় সমাগত মোহাজেরদের পুনর্বাসন এখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়া এবং জনসংখ্যার হিসাবে এখনও আমরা দুর্বল। পক্ষান্তরে কোরেশে সমাজ, অন্যান্য পৌত্তলিক আরবগোত্রগুলির সমবায়ে এবং হেজাজের ইহুদী ও খ্রীষ্টান গোত্রগুলির সহায়তায়, ক্রমশঃই অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া রোমান সাম্রাজ্য কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও সর্বক্ষণ লাগিয়া আছে। এ অবস্থায় এখনই যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, এই মুষ্টিমেয় মোছলেম-সঙ্ঘ হয়ত সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। হয়ত তাহার ফলে ইছলামের প্রচার ও প্রসার প্রতিহত হইয়া পড়িবে।

এই সন্দেহ ও দুশ্চিন্তার নিরাকরণ করিয়া কোর্‌আন বলিয়া দিতেছে—তোমাদের এই সব দৈন্য-দুর্বলতার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইতেছে জেহাদ।

---

* এই প্রসঙ্গে ছোট জেহাদ جهاد اصغر ও বড় জেহাদ جهاد اكبر বলিয়া যে হাদীছটির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা 'ছহীহ্‌' নহে (মাজ্‌মাউল-বেহার, খাতেমা ৫১৮ পৃষ্ঠা।)

তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল তোমরা অনেক সময় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পার না। কিন্তু আল্লাহ্ সে সমস্ত অবগত আছেন এবং তিনিই তোমাদিগকে জেহাদের হুকুম দিতেছেন। সুতরাং তোমাদের দ্বিধাবোধ করার কোনো কারণই থাকিতে পারে না।

নামায, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি এবাদতের বিষয় বর্ণনা করার পর, এই আয়াত হইতে মোছ্‌লেম জাতিকে তাহাদের পার্থিব জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

---

২৭ রুকু

২১৭। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে ; বলিয়া দাও : "তাহাতে যুদ্ধ করা একটা বৃহৎ ব্যাপার ; কিন্তু আল্লাহ্‌র (প্রদর্শিত) পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখা ও তাঁহাকে অমান্য করা, এবং মাছ্‌জিদুল্-হারাম হইতে জনগণকে বিরত রাখা আর তাহার প্রতিবেশের অধিবাসীদিগকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া (নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার তুলনায়) আল্লাহ্‌র হুজুরে অধিকতর অপরাধ, এইরূপে কতল্ অপেক্ষা ফেৎনা-ফাছাদ কঠিনতর অপরাধ; (১৬৮)এবং (হে মোছ্‌লেম সমাজ!) তোমাদিগের স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত না

২১৭ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ

করা পর্যন্ত কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে —যদি তাহাদের সাধ্যে কুলায়; (১৬৯)বস্তুতঃতোমাদের মধ্যকার কেহ যদি নিজের দীন হইতে মোরতাদ হইয়া যায় আর সেই কাফের অবস্থাতেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, সে অবস্থায় তাহাদের আমলগুলি পণ্ড হইয়া যাইবে —উভয় দুনিয়ায় ও আখে-রাতে, বস্তুতঃ তাহারা হইতেছে জাহান্নামের অধিবাসী সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী।

إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة ج واولئك اصحب النار ج هم فيها خلدون ٥

২১৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিবে এবং(ঈমান আনার পর) হিজরত করিবে, আর (হিজরতের পর) আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করিবে — আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশা করিতে পারিবে তাহারাই; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমা-পরায়ণ, কৃপানিধান। (১৭০)

٢١٨ إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله لا اولئك يرجون رحمت الله ط والله غفور رحيم ٥

—

২১৯। মাদক দ্রব্য (ব্যবহার) ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে; বলিয়া

٢١٩ يسئلونك عن الخمر

وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ
كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز
وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط
وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا
يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ

দাও : এই ব্যাপার দুইটিতে নিহিত আছে কাবীরা গোনাহ্ (মহাপাপ), এবং কোনো কোনো লোকের কিছু কিছু উপকার, কিন্তু ঐগুলির উপকার অপেক্ষা অনিষ্টের পরিমাণ অনেক অধিক ; (১৭১) তাহারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করিতেছে, ব্যয় করিবে কি পরিমাণ ? বলিয়া দাও : "যে পরিমাণ সহজসাধ্য হয়" ; আল্লাহ্ এইরূপে নিজের আয়াতগুলি, তোমাদের মঙ্গলের জন্য, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকালের (জীবন) সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতে থাক। (১৭২)

٢٢٠ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط
وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط
قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَاِنْ
تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

২২০। তাহারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করিতেছে, এতীমদিগের সম্বন্ধে ; বল : "তাহাদের জন্য কল্যাণের চেষ্টা করাই হইতেছে উত্তম (কাজ) ; আর যদি তাহাদিগের সহিত একত্র থাকিতে চাও, (অনায়াসে থাকিতে পার), কারণ তাহারা হইতেছে (ধর্মের হিসাবে) তোমাদের ভাই ; অবস্থা এই যে, কে সুধার করিতে চায়, আর কে বিগড়াইতে চায়,

المصلح ط ولو شاء الله لاعنتكم ط ان الله عزيز حكيم ○

আল্লাহ্ তাহা অবগত থাকেন ; আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদের জন্য কষ্টকর ব্যবস্থাও প্রদান করিতে পারিতেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (১৭৩)

٢٢١ ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ط ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ط ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ط اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ج

২২১। আর (সাবধান।), ঈমান না আনা পর্যন্ত কোনো মোশরেক নারীকে বিবাহ করিও না ; নিশ্চয় জানিও, একজন মোমেন দাসীও (স্বাধীন) মোশরেক নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট— যদিও সে তোমাদের দৃষ্টিতে চমৎকার বলিয়া বোধ হয় ; এইরূপে ঈমান না আনা পর্যন্ত মোশরেক পুরুষের সহিত (নিজেদের কোনও নারীর) বিবাহ দিও না —তোমাদের দৃষ্টিতে সে চমৎকার বোধ হইলেও ; নিশ্চয় জানিও, এক জন গোলাম-মুছলমান (স্বাধীন) মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম— মোশরেক নর-নারীরা তো তোমাদিগকে ডাকিয়া থাকে জাহান্নামের দিকে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ডাকিতেছেন জান্নাতের পানে ও মাগফেরাতের পানে—নিজ অনুজ্ঞাক্রমে ; এবং নিজের আয়াত-

গুলিকে আল্লাহ্ (সরলভাবে) বর্ণনা করিয়া দিতেছেন, যেন সকলে তাহার উপদেশ গ্রহণ করে। (১৭৪)	وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

তাফ্ছীর

১৬৮। **টীকা: নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ**—দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউছ্-ছানী মাসের শেষার্ধে হযরত রাছুলে কারীম, কয়েকজন ছাহাবীর একটি ক্ষুদ্র দলকে মদীনার বাহিরে প্রেরণ করেন কোরেশদিগের গতিবিধি সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়ার জন্য। এই দলের ছরদারকে একখানা পত্র দিয়া হযরত তাকীদ করিয়া দেন— তোমরা "নাখলা" নামক স্থানে পৌছার পর এই পত্র খুলিয়া পড়িবে ও সেই অনুসারে কাজ করিবে। পত্রে বিশেষভাবে লেখা ছিল—যুদ্ধ করিবে না, আর কোন সঙ্গীকে তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে না। বলা বাহুল্য, সেই অনুসারে কাজ হইয়াছিল। এই দলটি যখন পত্রের উপদেশ অনুসারে অগ্রসর হইতেছেন—তখন দেখা গেল, ছা'দ-এব্ন-আব্বাছ্ ও ওৎবা-এবন-গোজওয়ান নামক দুইজন ছাহাবী তাঁহাদের উট খুঁজিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও ফিরিয়া আসেন নাই। এই বিলম্বের জন্য তাঁহারা চারিদিকে ঐ দুইজন সঙ্গীর খোঁজ করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল, তিনজন উষ্ট্রারোহী কোরেশ তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল, সঙ্গী দুইজন কোরেশদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। সে অবস্থায় কোরেশদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহারা তীর নিক্ষেপ করেন এবং কোরেশদের একজন তাহাতে নিহত হয় আর বাকী দুইজনকে বন্দী করা হয়।

ইহা ছিল জমাদিউছ্-ছানী মাসের বৈকালের ঘটনা। রজবের চাঁদ সেই দিন সন্ধ্যার সময় দেখা যাওয়ার কথা। তাহার পর রজব (নিষিদ্ধ মাস) আরম্ভ হয়। অর্থাৎ নিয়ম অনুসারে নিষিদ্ধ মাস তখনও আরম্ভ হয় নাই। ছাআদ ও ওৎবা যে কোরেশদিগের দ্বারা বন্দী হইয়াছেন, মদীনাবাসীদেরও সেই ধারণা ছিল। তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, ঐ দুইজনের মদীনায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত কোরেশ বন্দী দুইজনকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। (এবন-কাছীর)।

কোরেশরা এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকিলে এই আয়াতটি নাজেল হইয়াছিল। আয়াতে বলা হইতেছে যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা নিশ্চয় বড়

অন্যায়। কিন্তু যে কা'বার সম্ভ্রমের এবং যাহার হজযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য চারটা মাসকে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছিল, তোমরা কোরেশ দলপতিগণ তো, মুছলমানদিগের বেলায় নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যেক সুযোগে তাহার অবমাননা করিয়া আসিতেছ। তোমরা সেখানে নরহত্যা করিয়াছ, তোমরা হরম হইতে মুছলমানদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছ, সেখানে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছ, দেশময় একটা জঘন্য অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ!!

১৬৯। **টীকাঃ কাফেরদিগের সংকল্প**—মুছলমানের সহিত কাফেরের এবং তাওহীদের সহিত শেরেকের কখনই সন্ধি হইতে পারে না। মুছলমান যত-দিন মুছলমান থাকিবে, কাফের সমাজ ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে থাকিবে এবং (সাধ্যে কুলাইলে) ছলে বলে কৌশলে যে কোনও প্রকারে হউক, মুছলমানকে মোরতাদ করার চেষ্টা করিবে। মুছলমান থাকার পর যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে বর্জন করিয়া যায়, তাহাকে মোরতাদ বলা হয়। সুতরাং প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মুছলমানকে সদাসর্বদা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাই হযরত নিজের উম্মতকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন :

الجهاد ماضٍ الى يوم القيامة

"কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কাফেরের বিরুদ্ধে মুছলমানের জেহাদ জারী থাকিবে।" কোর্‌আনে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে—নিষিদ্ধ মাসের বাদবিসংবাদ ত্যাগ করিয়া জেহাদের জন্য প্রস্তুত হও। বস্তুতঃ উপরের বর্ণিত ঘটনার মাত্র দুই মাস পরে বদরের ঐতিহাসিক প্রান্তরে মুছলমানের ঈমানের পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

আয়াতে বলা হইয়াছে। ان استطاعوا। যদি তাহাদের সাধ্যে কুলায়। অর্থাৎ, জাতি হিসাবে মুছলমানকে স্বধর্ম হইতে বিচ্যুৎ করা কস্মিনকালেও কাফের-দিগের পক্ষে সম্ভব হইবে না। (পরবর্তী আয়াত দেখুন)।

১৭০। **টীকাঃ ঈমান, হিজরত ও জেহাদ**—মোছলেম উম্মতের জাতীয় জীবনের প্রাণ-বস্তু হইতেছে ঈমান। সংক্ষেপে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ও তাঁহার তাওহীদে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র কেতাবের ও তাঁহার রাছুলের সত্যতায় অচল-অটল বিশ্বাসের নামই ঈমান। গোলামীর জীবনে এই ঈমানের সুষ্ঠু বিকাশ ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই পরাধীনতার বিলোপ ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাই হইতেছে জাতি হিসাবে মুছলমানের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য দরকার

স্ত্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকারের আলোচনা প্রসঙ্গে, এখানে বিষয়টার অবতারণা করা হইয়াছে। (২২৬ আয়াত দেখুন)।

১৮০। **টীকা ঃ ঈলা-তালাক**—প্রাক্-ইছ্লামী যুগের আরব সমাজে নারী জাতি সম্বন্ধে যেসব অবিচার ও অনাচার প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যকার একটা হইতেছে এই ঈলা-তালাক। সেকালে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে স্বামী অনেক সময় হলফ করিয়া বলিত—"আমি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিব না।" এই হলফের দোহাই দিয়া স্বামী স্ত্রীর অন্য সমস্ত তত্ত্বাবধানও পরিত্যাগ করিত। কিন্তু তালাকও দিত না। ফলে স্ত্রী অন্য বিবাহও করিতে পারিত না। স্ত্রীকে নির্যাতিত করাই হইত এই শ্রেণীর স্বামীদিগের উদ্দেশ্য।

বিবাহ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্বন্ধ—নিতান্ত অনিবার্য কারণ ব্যতীত—বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না, ইহাই হইতেছে ইছ্লামের নীতি। এই জন্য চরম পরিস্থিতিতেও তাহাদের পুনর্মিলনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ২২৬-২৭ আয়াতে বলা হইতেছে যে, স্ত্রীকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঝুলাইয়া রাখা চলিতে পারিবে না। ৪ মাসের মধ্যে তাহাকে স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলিত হইতে হইবে, অন্যথায় তাহাদের বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনি (Automatically) বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইতেছে—স্বামী যদি মন পরিবর্তন করে (এবং স্ত্রীতে উপগত হয়) তাহা হইলে "আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাপরায়ণ ও কৃপানিধান।" তাঁহার আইনে তাহাদের পুনর্মিলন অবৈধ বলিয়া নির্ধারিত হইবে না। কিন্তু এজন্য চার মাসের মধ্যে মন পরিবর্তন করিতে হইবে। কারণ নারীও তো পুরুষের ন্যায় আল্লাহ্র সৃষ্টি, তাহাদিগকে স্বামীদের অন্যায় আচরণ হইতে রক্ষা করাও তাঁহার কর্তব্য।

স্বামী যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও স্ত্রীকে তালাক না দেয়, সে অবস্থায় স্ত্রীর মুক্তিলাভের উপায় কি হইবে—এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিভিন্ন ইমাম ইহার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবু-হানীফা বলিতেছেন—চার মাস যখন মেয়াদ নির্ধারিত হইয়া আছে, তখন চার মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি তালাক বলবৎ হইয়া যাইবে, সে জন্য কাজীর বা আমীরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। আয়াতের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মতামত দিতে হইলে, এক্ষেত্রে ইমাম আবু-হানী-ফার অভিমতকে অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য "ফেকা" হাদীছ ও তাফ্ছীরের কেতাবগুলি দ্রষ্টব্য।

১৮১। **টীকা ঃ তালাকের ইদ্দত**—এই আয়াতের নির্দেশগুলির সারমর্ম

এই যে —যে স্ত্রীদিগকে তালাক দেওয়া হয়, তালাকের পর তিন ঋতু (মাসিক) পর্যন্ত তাহারা আত্মসংবরণ করিয়া থাকিবে। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবে না, সুতরাং স্ত্রী অন্য বিবাহ করিতে পারিবে না। আয়াতে "কোরূ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার মূল অর্থ—সময়, এক মুদ্দত হইতে অন্য মুদ্দতে প্রবেশ করার কাল। কোনো দুইটি বিষয়ের একত্রে اجتماع বা সঞ্চিত হওয়ার অর্থেও উহার ব্যবহার হয়। এই হিসাবে উভয় হায়েজের অবস্থা ও সাধারণ (পাকীর) অবস্থা সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে (রাগেব)।

আয়াতের তাফ্‌ছীরে "কোরূ" শব্দের কি তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা লইয়া ঘোর মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কুফা-স্কুলের ইমাম ও আলেমগণের মতে, "উহা হইতে হায়েজের সময়কে বুঝাইতেছে।" তাফ্‌ছীরের উচ্চস্তরের কেতাবগুলির মতে, ওমর, আলী, এবন-মাছউদ, আবু-মুছা আশ্‌আরী ও ইমাম আবু-হানীফা প্রমুখ ছাহাবী ও ইমামগণ এই মতের সমর্থক। পক্ষান্তরে হেজাজ স্কুলের আলেমগণের মতে "কোরূ-শব্দ হইতে এখানে পাকীর সময়কে বুঝাইতেছে।" ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্‌-এবন-ওমর, জায়েদ-এবন-ছাবেত, আবদুর রহমান-এবন-আবু-বাকর, والفقهاء السبعة বা বিখ্যাত ফকীহ-সপ্তক প্রমুখ ছাহাবী, ইমাম ও আলেমগণ এই মতের সমর্থক (কাবীর, এবন-কাছীর, ফাৎহুল্‌ কাদীর প্রভৃতি)।

এই প্রসঙ্গে উভয়পক্ষ হইতে যে সব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই খুব সমীচীন। উভয়পক্ষের দলিল-প্রমাণ ও স্বীকৃত বিষয়-গুলিকে অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐগুলির মধ্যে বস্তুতঃ কোনও বিরোধ নাই। ঋতুকালের শেষ মুহূর্ত ও শুচি-কালের প্রথম মুহূর্তের এবং এইভাবে শুচিকালের শেষমুহূর্ত ও ঋতুকালের প্রথম মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবিক বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। বিতর্কের ফলাফলের দিক দিয়া আলোচনা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, ইমাম শাফেয়ী প্রভৃতির মতানুসারে ব্যবস্থা করা হইলে ইদ্দতের সময় কয়েকদিন কমিয়া যাইবে এবং ইমাম আবু-হানীফা প্রভৃতির মত অবলম্বন করিলে কয়েকটা দিন বাড়িয়া যাইবে। "এহ্‌তিয়াতের" নীতি হিসাবে ইহাই নিরাপদ বলিয়া মনে হয়।

আয়াতে আরও দুইটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ইদ্দতের বর্ণনা করার পরই বলা হইতেছে—এই সময়ে আল্লাহ্‌ যদি তাহার গর্ভাশয়ে কিছু সঞ্চার করিয়া থাকেন, তাহা গোপন করা স্ত্রীর পক্ষে মহা অপরাধ হইবে।

বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যতই অনৈক্যের সৃষ্টি হউক না কেন, সন্তানের পিতামাতা হওয়ার পর প্রায়ই তাহাদের পূর্বভাবের পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। সন্তানের হিতচিন্তাই হয় তখন তাহাদের প্রধান ও সমবেত লক্ষ্য। সুতরাং স্বামী তাহার তালাকী স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনার কথা জানিতে পারিলে, তাহার মন পরিবর্তন অধিক সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায়। কারণ তালাকী স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যৎ তখন তাহার পক্ষে একটা গুরুতর সমস্যা হইয়া ওঠে। অন্যদিকে, গর্ভিণী জীবনের বহু ক্লেশ ও কর্মভোগ সত্ত্বেও মাতৃত্বের ভাবী গৌরব ও আনন্দের কল্পনায় "মা" তখন অন্য সব বিষয় ভুলিয়া যায়। তালাক সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধেও তাহার আশঙ্কার কূল থাকে না। সুতরাং সে'ও তখন স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হওয়ার আশায়, মন-পরিবর্তন করার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবে। কাজেই সে অবস্থায় তালাকের অভিশাপ হইতে এতগুলি মানব জীবনকে মুক্ত করিয়া নেওয়ার সম্ভাবনা ঘটিবে।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইতেছে যে, স্ত্রীর যেরূপ দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্বামীর উপর, স্বামীরও সেইরূপ দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্ত্রীর উপর। উভয়ই নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া চলিলে, সংসারেই স্বর্গের সুখ-শান্তি নামিয়া আসে। নারীর তুলনায় পুরুষের দর্জা এক ডিগ্রী বেশী, অর্থাৎ পুরুষের কর্তব্য নারীদের তুলনায় অধিক। সূরা নেছার ৩৪ আয়াতে পুরুষকে নারীর قوام বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বলা হইয়াছে। মেছ্‌ল শব্দের অর্থ— Similar, equal নহে।

---

২৯ রুকু

২২৯। এই তালাক হইতেছে দুইবার; তাহার পর (বিবিকে) হয় যথা-নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা সদাচারের সহিত বিদায় দিতে হইবে; (১৮২) আর তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ, তাহার মধ্যে কোনও কিছুই ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল হইবে না—

٢١ الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْ

তবে তাহাদের উভয়ের যদি আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহ্র বিধি-ব্যবস্থাগুলি রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না ;—(১৮৩) সেমতে (হে মোছ্লেম সমাজ !) তোমাদেরও যদি আশঙ্কা হয় যে, তাহারা বাস্তবিকই আল্লাহ্র বিধি-ব্যবস্থাগুলি কায়েম রাখিতে সমর্থ হইবে না, সে অবস্থায় স্ত্রী যদি (নিজের স্ত্রীধন হইতে স্বামীকে) কিছু দিয়া মুক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাতে তাহাদের কাহারও প্রতি কোনও অপরাধ বর্তিবে না ; এগুলি হইতেছে আল্লাহ্র(অবধারিত) সীমারেখা, অতএব সেগুলিকে অতিক্রম করিও না ; বস্তুত: আল্লাহ্র সীমারেখাগুলি অতিক্রম করে যাহারা, জালেম তো তাহারাই।

هن شيئا الا ان يخافا
الا يقيما حدود الله ط
فان خفتم الا يقيما حدود
الله لا فلا جناح عليهما
فيما افتدت به ط تلك
حدود الله فلا تعتدوها ج
ومن يتعد حدود الله
فاولئك هم الظلمون ○

২৩০। কিন্তু স্বামী যদি সেই তালাকী স্ত্রীকে (গ্রহণ না করিয়া চরম) তালাক দিয়া ফেলে, তাহা হইলে (ঐ স্ত্রী) তাহার পক্ষে অত:পর আর হালাল হইবে না—যাবৎ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে ;—তাহার পর এই স্বামীও যদি (ঘটনাক্রমে) ঐ স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অবস্থায় এই স্ত্রীও তাহার পূর্ব-স্বামীর পুন-

٢٣٠ فان طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا
غيره ط فان طلقها فلا
جناح عليهما ان يتراجعا

ان ظنا ان يقيما حدود
الله ط وتلك حدود الله
يبينها لقوم يعلمون ٥

মিলনে তাহাদের প্রতি কোনও অপরাধ বর্তিবে না—আল্লাহ্‌র বিধি-ব্যবস্থাগুলি (অতঃপর) পালন করিয়া চলিবে, এ বিশ্বাস যদি তাহাদের থাকে ; বস্তুতঃ এগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র (অবধারিত) সীমারেখা (চরম-বিধি-ব্যবস্থা), জ্ঞানবান সমাজের (অনুধাবনের) জন্য সেগুলিকে তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন। (১৮৪)

٢٣١ واذا طلقتم النساء
فبلغن اجلهن فامسكو
هن بمعروف اوسرحو
هن بمعروف ص ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ج
ومن يفعل ذلك فقد
ظلم نفسه ط ولا تتخذوا
ايت الله هزوا ز واذكروا
نعمت الله عليكم وما

২৩১। আর স্ত্রীদিগকে তোমরা তালাক দেও যখন, সে মতে তাহারা তাহাদের ইদ্দতের সীমা প্রদেশে উপনীত হইয়া যায়, সে অবস্থায় তোমরা হয় তাহাদিগকে নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে (স্ত্রীরূপে) রক্ষা করিবে, অথবা নিয়ম সঙ্গত-ভাবে বিদায় দিবে,—কিন্তু ক্ষতিজনকভাবে, (তাহাদের উপর) অত্যাচার করার মতলবে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, বস্তুতঃ এই কাজ করে যে ব্যক্তি, সে তো জুলুম করিল নিজেরই উপর ; আর (সাবধান!) আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে খেলা-তামাশা মনে করিও না, এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যেসব নিয়ামত আছে, স্মরণ করিও সেগুলিকে, আর কেতাবের

ও প্রজ্ঞার (হিকমতের) যেসব হিতকথা নাজেল করিয়া তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, সেইগুলিকেও (স্মরণ রাখিও) ; আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংযত হইয়া চলিও এবং জানিয়া রাখিও যে, আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।

أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

তাফ্ছীর

১৮২। টীকা ঃ তালাক দুইবার—ঋতুস্নানের পর, পুনরায় ঋতু আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে ''তোহর'' বলা হয়, আমরা পাকীর সময় বলিয়া ইহার উল্লেখ করিয়াছি। স্ত্রীকে তালাক দিতে হইবে এই তোহরের সময়। ঋতুকালে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া হযরত রাছুলে কারীম নির্দেশ দিয়াছেন। ''এই তালাক'' বলিতে কোর্‌আনের অনুমোদিত ও উপরে বর্ণিত তালাককে বুঝাইতেছে। ইহার ব্যতিক্রম করিয়া অন্য কোনও প্রকারে স্ত্রীকে বর্জন করিতে চাহিলে তাহা তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না।

আয়াতে বলা হইতেছে যে, এই তালাক দিতে হইবে দুই তোহরে দুইবার। তাহার পর এই তোহর শেষ হইয়া পুনরায় ঋতুকাল আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, স্বামীর অধিকার থাকিবে বিবাহ বন্ধন বজায় রাখিয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করার। স্বামী যদি এই অধিকারের সুযোগ গ্রহণ না করে, আর ইদ্দত শেষ হইয়া যায়, সে অবস্থায় স্বামীর আর স্ত্রীর উপর কোনও দাবী-দাওয়া থাকিবে না।

পূর্বে আরব দেশে বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে বহু প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাহার ফলে স্ত্রীলোকদের জীবন নানা অবিচারে-অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া আসিতেছিল। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিত, তাহাকে নির্যাতিত করার উদ্দেশ্যে। তখন তালাকের কোনও মুদ্দত নির্ধারিত ছিল না। ফলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া আবার তালাক দিত। জনৈক আনছার নারী সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী এই প্রকার দুর্ব্যবহার আরম্ভ করিলে, স্ত্রীলোকটি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিজের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেন। তাহার পর এই আয়াতটি নাজেল হয়। (এবন-কাছীর)।

امر كانت لهم فيه اناة। উক্তি হইতেই স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত ওমরের এই এজ্‌তেহাদের সদুদ্দেশ্য বর্তমানে একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, ঐ কুপ্রথা এখন একমাত্র শাস্ত্রীয় বিধানে স্থান করিয়া লইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই আজ তালাকী স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনকে অভিশাপে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—যে সদুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত ওমরের এজ্‌তেহাদক্রমে, কোর্‌আন-হাদীছের স্পষ্ট আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করাও সঙ্গত বলিয়া মনে করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে কোর্‌আন-হাদীছের শিক্ষাকে পুনরায় সমাজে বলবৎ করিয়া লওয়া কি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?" এই আলোচনার উপসংহারে একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে ন্যায়-নিষ্ঠ পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এক মজলিছে তিন তালাক দেওয়া হইলে তাহা তিন তালাক বলিয়া গণ্য হইবে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর যে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না। কিন্তু হযরত ওমর শেষ বয়স পর্যন্ত এই মতের উপর কায়েম ছিলেন, না, পরবর্তীকালে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন? এরূপ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, ইহা ছিল হযরত ওমরের এজ্‌তেহাদী ফাতওয়া। যে উদ্দেশ্যে তিনি এই ফাতওয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা সফল হইতে পারে নাই। হযরত ওমরের মত আল্লাহ্‌র একজন হাক্কানী বান্দাহ্, এই ব্যর্থতার অবস্থা দেখিয়াও যে নিজের মতের উপর "হট" করিয়া বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার মহান জীবনের অন্যান্য নজীর দেখিয়া তাহা আদৌ বিশ্বাস করা যায় না।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ আবুবক্‌র ইছমায়িলীর সঙ্কলিত "মুছনাদে ওমর" নামক হাদীছ গ্রন্থে এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইতেছে। তিনি ছনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিতেছেন: হযরত ওমর-এবন-খাত্তাব বলিয়াছেন, তিনটি বিষয়ের জন্য আমি যেরূপ অনুতপ্ত হইয়াছি, অন্য কোনও বিষয়ে আমাকে সেরূপ অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। (ইহার প্রথমটা হইতেছে)—

ان لا اكون حرمت الطلاق الخ -

"আমি প্রচলিত তালাককে কেন হারাম করিয়া দেই নাই।" ফলে দেখা যাইতেছে যে, কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ফলে, হযরত ওমর নিজের মত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। হাফেজ এবন-কাইয়ুমের মত বিজ্ঞ বিচক্ষণ মোহাদ্দেছ তাঁহার اغاثة اللهفان নামক পুস্তকে (১—৩৩৬ পৃষ্ঠা) এই হাদীছটি প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিতেছেন, ইহাও লক্ষ্য করার বিষয়। আলোচ্য প্রসঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণের

সময় এই হাদীছ সম্বন্ধেও সম্যক নজর রাখা দরকার।

অ্যাংলো-মোছলেম আইন—এ দেশে প্রচলিত "মোহাম্মদী আইন" (বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া) কোর্‌আন-হাদীছের শিক্ষার অতি শোচনীয়ভাবে অপচয় করিয়া দিয়াছে। আমার মনে হয়, আমাদের সামাজিক জীবনের একটা বড় গলদের মূল কারণ এইখানে লুকাইয়া আছে। সংক্ষেপে এই অনাচারের একটা উদাহরণ দিতেছি। এ দেশে প্রচলিত Mohamadan Law বা ইছলামী আইনের কল্যাণে সাধারণতঃ সকলেই বিশ্বাস করেন যে, মুছলমানের বিবাহ একটা Civil Contract ব্যতীত Sacrament কিছুই নহে, অর্থাৎ উহার সহিত ধর্মগতভাব ও সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই। অথচ হযরত রাছুলে কারীম বিবাহকে নিজের ও অন্যান্য নবীগণের ছুন্নত বা আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য হাদীছে বিবাহকে "ঈমানের অর্দ্ধেক" বলিয়া উল্লেখ করার পর হযরত বলিতেছেন:

من تزوج فقد استكمل نصف الايمان -

—"যে বিবাহ করিল, সে নিজের অর্ধেক ঈমানকে পূর্ণ করিয়া লইল।" যে হানাফী ফেকাকে অবলম্বন করিয়া এদেশে "মোহাম্মদী আইন" রচিত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট বিধান অনুসারে বিবাহ 'এবাদত' বলিয়া গণ্য (ফৎহুল্‌বারী)। দোর্রে মোখ্‌তার হানাফী ফেকার অন্যতম বিশ্বস্ত গ্রন্থ, তাহাতে বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষপে উদ্ধৃত করিতেছি—

ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم الى الان ثم تستمر فى الجنة الا النكاح والايمان -

বিবাহ ও ঈমান ব্যতীত শরীয়তে এমন অন্য কোন এবাদত নাই, যাহা আরম্ভ হইয়াছে আদমের সময় হইতে এবং পরজীবনে বেহেশ্‌ত পর্যন্ত যাহা আমাদের সহিত শাশ্বত হইয়া থাকিবে।

ويكون سنة مؤكدة فى الاصح' فيأثم بتركه و يثاب ان نكح ولدا وتحصينا -

অধিক সঙ্গত মত এই যে, বিবাহ করা ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিলে গোনাহ্‌গার হইতে হইবে, এবং সন্তানলাভের ও সচ্চরিত্র থাকার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিলে মানুষ ছওয়াব বা পণ্যের ভাগী হইবে।

ورجح فى النهو وجو به' للمو اظبة عليه والانكار على من رغب عنه -

'নহরে-ফায়েক' নামক গ্রন্থকারের মতে বিবাহকে ওয়াজেব বলিয়া নির্ধারণ

করাই সঙ্গত, কারণ হযরতের উহা চিরাচরিত আদর্শ। পক্ষান্তরে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হয় যে ব্যক্তি, হযরত তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠক দেখিতেছেন---ইছ্‌লামের পয়গম্বর যাহাকে ঈমানের অর্ধেক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পরও শরীয়তের যে বন্ধন বেহেশ্‌তের অনন্ত জীবনেও শাশ্বত হইয়া থাকিবে, হানাফী-ফেকার ইমামগণ যাহাকে ওয়াজেব—অন্ততঃ ছুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই তথাকথিত "মোহাম্মদীয় আইন" রচয়িতারা তাহাকে একদম ধর্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য একটা Civil Contract মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন-- সেই হানাফী আইনেরই দোহাই দিয়া !!

১৮৩। টীকাঃ মোহর ইত্যাদি ফেরত লওয়া নিষিদ্ধ—স্বামীরা স্ত্রীদিগকে "যাহা" দিয়াছে—বলিতে স্বামীর দেওয়া মোহরকে বুঝাইতেছে। মোহর ব্যতীত স্বামী স্ত্রীকে গহনা কাপড় প্রভৃতি আর যাহা কিছু সম্পূর্ণভাবে দান করিয়াছে এবং সেগুলিতে স্ত্রীর মালেকীস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনেকের মতে তাহাও ইহার অন্তর্গত (কাবীর, এবন কাছীর প্রভৃতি)।

স্ত্রী বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যগ্র অথচ স্বামী তালাক দিতে অসম্মত, এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীর দেওয়া মোহর তাহাকে ফিরাইয়া দেয় ও স্বামী তাহা নিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তাহা হইলে এই দানও গ্রহণে কোনো পক্ষ অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না। শরীয়তের পরিভাষায় এই নিয়মকে 'খোলা' বলা হয়।

বিবাহের সময় মোহর সম্পূর্ণরূপে শোধ করিয়া দেওয়াই হইতেছে ইছ্‌লামের ব্যবস্থা ও মোছলেম জাতির স্বর্ণ যুগের ব্যবহার। বর্তমান যুগে আমাদের দেশে মোহরের নামই হইয়া দাঁড়াইয়াছে "দায়েন মোহর।" হীলা শারয়ী (মোআ-জাল্লাহ্) বা ন্যায়ের ফাঁকি হিসাবে ৫/১০ টাকা নগদ দেওয়া হয় মাত্র। তাহার পর মরতেদম পর্যন্ত মোহর মাফ করাইয়া নেওয়ার চেষ্টা চলিতে থাকে। এক কথায় নারীর বৈবাহিক জীবনকে আল্লাহ্‌র দেওয়া সমস্ত স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখাই যেন আমাদের সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয়াতের শেষ অংশের প্রতি পাঠকগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করি-তেছি। উপরে বৈবাহিক জীবনের কতগুলি জরুরী বিধিব্যবস্থার বর্ণনা করার পর বলা হইতেছে—এগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা। ইহার ব্যতিক্রম করিবে যাহারা, তাহারা হইতেছে জালেম। (সূরা নেছা ৩৪, ৩৫ আয়াত দেখুন)।

১৮৪। টীকা ঃ তালাকের পরবর্তী অবস্থা—'বায়েন' বা চরম তালাক সম্পন্ন হওয়ার পর, সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করা স্বামীর পক্ষে বৈধ হইবে না, এমন কি পুনরায় বিবাহ করিয়াও নহে। ইহাই আল্লাহ্‌র চরম বিধান। তবে সেই স্ত্রী যদি অন্য বিবাহ করে এবং ঘটনাক্রমে এই দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাহাকে চরম তালাক দিয়া ফেলে, কেবল সেই অবস্থায় এই স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ হওয়া প্রথম স্বামীর পক্ষে বৈধ হইতে পারিবে। কিন্তু তালাকের পূর্বে ঐ স্ত্রীর সহিত দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস প্রমাণিত হওয়া চাই। আয়াতে বর্ণিত "নেকাহ"-শব্দের মূল অর্থ ইহাই। হযরত রাছুলে কারীমের বহু হাদীছেও ইহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতেছে সাধারণ অবস্থার স্বাভাবিক ব্যবস্থা। খোলা করিয়া বা তালাক দিয়া যে স্ত্রীর সহিত স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল, তাহার পর সেই স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিল এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে 'সহবাস' করিতে লাগিল, নিতান্ত দাইউছ ব্যতীত অন্য কোনও স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবে না। দুঃখের বিষয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাকে "হীলা" রূপে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করা হয় না। সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ কোনও লোক স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া বসিল। অথচ অল্প পরে নিজের কাজের জন্য সে অনুতপ্ত হইল। কিন্তু প্রচলিত ফতওয়ার ফলে সে নিরূপায়। তখন অন্য পুরুষের সহিত একটা গোপন ব্যবস্থা করিয়া তাহার সহিত স্ত্রীর বিবাহ দিল, সহবাসের সম্ভাবনা প্রমাণ করার জন্য, স্ত্রীকে তাহার সঙ্গে কিছু সময় রাখিয়া ফিরাইয়া আনিল। দ্বিতীয় স্বামী চুক্তি অনুসারে স্ত্রীকে তালাক দিল এবং এই আয়াতের দোহাই দিয়া প্রথম স্বামী সেই স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিল—এই শ্রেণীর কুৎসিত ঘটনার সহিত এই আয়াতের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই কদাচার সম্বন্ধেই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে—"আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে তোমরা খেলা-তামাশা বানাইয়া নিও না।" দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, কোর্‌আনের প্রবর্তিত ইদ্দতের ব্যবস্থাকে অমান্য করিয়া এক মজলিছে তিন তালাক দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং তাহাকে তিন তালাক বলিয়া গণ্য করার ফলেই, সমাজে এই কদাচারের প্রচলন হইয়াছে। অথচ এই কদাচারে লিপ্ত ব্যক্তিগণ হযরত রাছুলের ও তাঁহার মহামান্য ছাহাবিগণের ভাষায় মাল্‌উন বলিয়া ধিকৃত হইয়াছে, জেনার অপরাধে দণ্ডার্হ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলেমগণের অনেকেই দলিল-প্রমাণের দিক দিয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হাফেজ এবন কাইয়ুমের "জাদুল-মাআদ" সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কেতাব বলিয়া আমার বিশ্বাস।

৩০ রুকু

২৩২। এবং তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দেও, আর ইদ্দতের শেষ সময় আসন্ন হইয়া আসে, সে অবস্থায় ঐ স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না—যদি উভয় তাহারা নিজেরা রাজী হইয়া থাকে, যথাবিহিতরূপে ; (১৮৫) তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকাল সম্বন্ধে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সংশিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাকে ; বস্তুতঃ তোমাদের জন্য ইহাই হইতেছে বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা ; আর (তোমাদের কল্যাণ) আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন, কিন্তু তোমরা জানিতেছ না। (১৮৬)

২৩২ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُو
هُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ط ذَٰلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ط
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ٥

২৩৩। আর জননীরা নিজেদের সন্তানদিগকে দুধ খাওয়াইবে পুরা দুই বৎসর পর্যন্ত—দুধ খাওয়াইবার সময় পুরা করিতে চায় যে ব্যক্তি, তাহার জন্য (এই ব্যবস্থা) ; আর নিয়ম-সঙ্গতভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও পোশাক যোগান হইবে সন্তানের জনকদিগের কর্তব্য ;

২৩৩ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

(১৮৭) সাধ্যের অতিরিক্ত ভার কাহারও উপর অর্পণ করা যাইতে পারে না—(অতএব) কোনও জননীকে যেন তাহার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয় এবং কোনও জনককেও যেন তাহার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়, অধিকন্তু (জনকের মৃত্যু ঘটিলে) ওয়া-রেছের জন্য ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা—অবশ্য, উভয় জনক ও জননী যদি নিজেদের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (নির্ধারিত সময়ের পূর্বে) দুধ ছাড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাতে তাহাদের কাহারও কোনও গোনাহ্ হইবে না ; এবং তোমরা যদি নিজেদের সন্তান-গুলির জন্য (জননী ব্যতীত) অন্য কাহারও দুধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে চাও, তাহাতে তোমাদের কোনও অপরাধ হইবে না—যদি তোমরা (সন্তানের গর্ভ-ধারিণীকে) যাহা দিতে চাহিয়া-ছিলে, নিয়ম সঙ্গতভাবে তাহা সমর্পণ করিয়া থাক ; আর তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সদা সতর্ক হইয়া চলিবে এবং জানিয়া রাখিবে যে, তোমরা যে সব কাজ করিতেছ—আল্লাহ্ হইতেছেন সে সমস্ত

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ج لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَّهُ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط
وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْ
ضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ
اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا

تعملون بصير ০

সম্বন্ধে সম্যক পর্যবেক্ষক।

২৩৪ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ج فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ط والله بما تعملون خبير ০

২৩৪। এবং তোমাদের মধ্যকার যাহারা মরিয়া যায় স্ত্রীদিগকে রাখিয়া, সেই (বিধবা) স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন আত্মসংবরণ করিয়া থাকিবে, সেমতে তাহাদের (এই) অবধারিত ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে বিধি সম্মতভাবে যে ব্যবস্থা করে, তাহাতে তাহাদের উপর কোনও অপরাধ বর্তিবে না ; বস্তুতঃ তোমাদের কৃতকর্মগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ হইতেছেন সম্যক ওয়াকেফহাল। (১৮৮)

২৩৫ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم ط علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا

২৩৫। আর (উপরোক্ত) স্ত্রীলোককে 'পায়গাম' দেওয়া সম্বন্ধে তোমরা আভাসে কিছু প্রকাশ করিলে, অথবা মনে মনে কোনো ভাব পোষণ করিলে, তোমাদের কোনো অপরাধ হইবে না ; আল্লাহ্ জানিতেছেন যে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, কিন্তু তাহাদের সহিত গুপ্তভাবে

تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ط ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب اجله ط واعلموا ان الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروه ج واعلموا ان الله غفور حليم ع

কোনো ওয়াদা-একরার করিও না—তবে সৎভাবে কথা বলিতে পার ; এবং ইদ্দতকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত (তাহাদের সহিত) বিবাহের সঙ্কল্প করিও না; আর জানিয়া রাখিও যে, তোমাদের মনের ভাবও আল্লাহ্ অবগত আছেন, অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সমীহ করিয়া চলিবে, আরও জানিয়া রাখিবে যে, আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমা-পরায়ণ, ধৈর্যশীল। (১৮৯)

তাফ্ছীর

১৮৫। **টীকা : তালাকের পর পুনর্বিবাহ**—স্বামী স্ত্রীকে যথাবিধি তালাক দিল এবং ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে গ্রহণও করিল না, ফলে ইদ্দতকালও সম্পূর্ণভাবে শেষ হইয়া গেল—এ অবস্থায় ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা কোনও প্রকারে স্বামীর পক্ষে বৈধ হইবে না, স্ত্রী সম্মত থাকিলেও নহে। ২৩০ আয়াতে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত হইতে বাহ্যতঃ মনে হইতে পারে যে, ইদ্দত সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরও, স্বামী-স্ত্রী উভয় সম্মত হইলে, আবার বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। এক মজহাবের আলেমগণ এই আয়াত অনুসারে তাহাদের পুনর্বিবাহের বৈধতা ঘোষণা করিতেছেন এই আয়াতের উপর ও ইহার শানে-নজুল সংক্রান্ত কয়েকটা রেওয়ায়তের উপর নির্ভর করিয়া, এবং ২৩০ আয়াতের চরম নির্দেশকে উপেক্ষা করিয়া। অন্য মজহাবের আলেমরা কেবল নির্ভর করিতেছেন ২৩০ আয়াতের উপর—এই আয়াতটিকে ও

উপরোক্ত রেওয়ায়তগুলিকে উপেক্ষা করিয়া। এজন্য তাঁহারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ازواجهن শব্দের অর্থ করিয়াছেন "তাহাদের মনোনীত ভাবী স্বামী" বলিয়া।

এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আয়াত দুইটির মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। অধিকন্তু এ সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীছ-গুলির সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা হইতে এই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

আয়াতের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে فبلغن اجلهن পদের তাৎপর্য। আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি—"ইদ্দতের শেষ সময় আসন্ন হইয়া আসে" বলিয়া। কারণ, ২৩০ আয়াত অনুসারে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তালাক-দাতা স্বামীর ও তালাকী স্ত্রীর পুনর্মিলনের আর সম্ভাবনাই থাকে না। এই কারণে পূর্ববর্তী স্বনামখ্যাত আলেমগণও ২৩১ আয়াতে বর্ণিত ঠিক এই فبلغن اجلهن পদের এইরূপ অনুবাদই করিয়াছেন। শাহ্ অলিউল্লাহ্ ছাহেব আয়াতের হাশিয়ায় বলিতেছেন—يعنى نزديك رسيدند بانقضاء عدت অর্থাৎ ইদ্দত পুরা হওয়ার শেষ সীমার নিকটবর্তী হইল।" মওলানা থানভী ছাহেব অনুবাদ করিতেছেন—پهر وه عورتيں اپنى عدت گزرنے كے قريب پهونچ جائيں তিরমিজী ও ইমাম মালেকের উল্লিখিত ওরওয়া-এবনে জোবের ছাহাবীর এতদ-সংক্রান্ত বর্ণনায় বলা হইতেছে حتى اذا شارفت انقضاء عدتها "এইভাবে স্ত্রীর ইদ্দতের শেষ সময় যখন নিকটবর্তী হইয়া আসে।" সুতরাং এখানেও ঐ প্রকার অনুবাদ দিয়া কোনও অন্যায় করি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ফলতঃ, ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার পরেও যে, স্বামী-স্ত্রী নূতন বিবাহ করিয়া আবার পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, আয়াত হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে না। আয়াতে ইদ্দতের শেষ সীমার কথাই বলা হইতেছে। এই বিশেষ অবস্থায় তাহাদিগকে পুনর্মিলনের অনুমতি দেওয়া হইতেছে, স্ত্রীর সম্মতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া। "স্ত্রী যদি নিজের স্বামীকে বিবাহ করে"—কথার তাৎ-পর্য ইহাই। যথেষ্ট সময় থাকিতে স্বামী মন পরিবর্তন করিলে সে নিজের ইচ্ছা-ক্রমে স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারিত। তখন স্ত্রীর সম্মতি বা বিবাহের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারিত না। এই অনুবাদের ফলে "তাহাদের স্বামী"কে "তাহাদের মনো-নীত ভাবী স্বামী" বলিয়া কষ্টকল্পনা করারও কোনো দরকার থাকিতেছে না।

১৮৬। **টীকাঃ দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা**—আয়াতের শেষ অংশের প্রতি পাঠকগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া

থাকিবেন যে, তালাক সম্বন্ধে এক একটা আদেশ-নির্দেশ প্রদানের পর, প্রত্যেক স্থানেই এই মর্মের উপদেশ বা সতর্কবাণীর উল্লেখ করা হইয়াছে। মোছ্‌লেম নর-নারীর দাম্পত্য জীবন যে, আল্লাহ্‌র হুজুরে কত পবিত্র ও কত মহান, উপসংহার ভাগের এই সব আয়াত দ্বারা তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাই হইতেছে তালাক সংক্রান্ত সমস্ত আইন-কানুনের ethic বা নৈতিক বুনিয়াদ।

ইহা ব্যতীত তালাক সংক্রান্ত আদেশ-নিষেধগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, যাহাতে মুছলমান সমাজে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা যথাসম্ভব কম সংঘটিত হয়, আয়াতগুলিতে নীতির হিসাবে তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ওয়াজের মাহফিলে ও সমাজ-সংস্কার সংক্রান্ত সভা-সমিতিতে জোর প্রচারণা চালাইবার দরকার আছে।

১৮৭। **টীকা: সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা**—আয়াতে জননী বা প্রসূতি বলিতে কোন্ শ্রেণীর প্রসূতিকে বুঝাইতেছে, তাহাতে মতভেদ আছে। এক মতে প্রসূতি বলিতে কেবল তালাকী প্রসূতিকে বুঝাইতেছে, সধবা প্রসূতিগণ এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অন্যরা তালাকী ও সধবা, সকল শ্রেণীর উপর এই আয়াতটি সাধারণভাবে বলবৎ হইবে বলিয়া মনে করেন।

আমি প্রথম মতকেই যুক্তি-প্রমাণ সম্মত বলিয়া মনে করি। স্বামী যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী, তাহা ইছলামের সাধারণ ব্যবস্থা। এখানে স্বতন্ত্র-ভাবে ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে বিশেষ অবস্থার জন্য। চরম তালাক ঘটিয়া যাও-য়ার পর তালাকী নারী তাহার তালাকদাতা স্বামীর স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রী হিসাবে খোরপোশ পাওয়ারও অধিকারী হয় না। তাই এখানে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তালাকী স্ত্রী যদি সম্মত হয়, এবং সন্তানের পিতা যদি তাহার উপর সন্তানের স্তন্য দানের ভার অর্পণ করিতে চায়, সে অবস্থায় প্রসূতিকে নিয়ম সম্মতভাবে খোরপোশ দিতে সন্তানের পিতা বাধ্য থাকিবে।

আয়াতে বর্ণিত পুরা দুই বৎসর অর্থে—দুই বৎসর পর্যন্ত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়ার পর, তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা অসদ্‌ভাবের সৃষ্টি হইয়া যায়। তাহার পর তালাকের সময় যদি তাহাদের কোনো শিশু সন্তান থাকে অথবা পরে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার লালন-পালন সম্বন্ধে কোনো বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না হইতে পারে, তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করাই আয়াতের বিশেষ উদ্দেশ্য। তালাকের পর স্ত্রীর স্বাধীনতা যাহাতে কোনক্রমে খর্ব না

হইতে পারে এবং স্বামীকেও অকারণে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে না হয়, এই বিধানে তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ঘটনাক্রমে স্তন্যপায়ী শিশুর পিতার যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতার কর্তব্যভার অর্পিত হইবে "তাহার" ওয়ারেছের উপর। এখানে কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই তাহার শব্দের অর্থ হইবে উপরোক্ত পিতার। অন্যরা বলিয়াছেন 'তাহার ওয়ারেছ' বলিতে এ শিশুর সম্ভাব্য ওয়ারেছগণকে বুঝাইতেছে। আমার মতে, শিশু সন্তানের স্বার্থরক্ষার জন্য যে ওয়ারেছের স্বাভাবিক আগ্রহ ও দরদ থাকার সম্ভাবনা অধিক, এক্ষেত্রে ওয়ারেছ বলিয়া গণ্য হইবে সেই ব্যক্তি। বস্তুতঃ সন্তানের ওয়ারেছ ও সন্তানের পিতার ওয়ারেছদের মধ্যে বিশেষ কোনও পাথক্যও নাই।

চরম তালাক হইয়া যাওয়ার ও ইদ্দত শেষ হওয়ার পর, স্ত্রী হয় তো অন্য বিবাহ করিতে পারে, হয় তো দুই বৎসরের মধ্যে তাহার আবার গর্ভ সঞ্চার হইয়া যাইতে পারে। এই প্রকার আরও অনেক অসুবিধা ঘটিয়া যাইতে পারে। এ অবস্থায় সন্তানের স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পিতা-মাতা যদি দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দুধ ছাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করে, অনায়াসে তাহা করিতে পারে। পক্ষান্তরে সন্তানের পিতা যদি প্রসূতির পরিবর্তে অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ খাওয়াইবার ইচ্ছা করে, তাহাও সে করিতে পারিবে। কিন্তু সন্তানকে দুগ্ধদানের জন্য প্রসূতিকে যে অজুরা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিয়া দেওয়া স্বামীর কর্তব্য হইবে। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে তখনই যে তাহা শোধ করিতে হইবে, আয়াতের উদ্দেশ্য ইহা নহে। নচেৎ সময় বিশেষে ইহা দ্বারা শিশুর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে।

মা সন্তানকে কতদিন পর্যন্ত দুধ খাওয়াইতে পারিবে, কতদিন পরে দুধ খাওয়ান নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে, এরূপ কোনও শেষ সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া আদৌ আয়াতের উদ্দেশ্য নহে। আমি যতদূর জানি, কোর্‌আনের বা বিশ্বাস্য হাদীছের কোনও আদেশে এইরূপ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। প্রসবের পর হইতে কত দিনের মধ্যে, অন্য কাহারও সন্তানকে দুধ খাওয়াইলে, সে দুধ-সম্বন্ধে প্রসূতির পুত্র তথা মোহর্‌রম বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ইহার ফলে দুধ-ভাই, দুধ-মা ও দুধ-বাপ এবং দুধ সম্পর্কিত অন্যান্য নর-নারী তাহার মোহর্‌রম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে, এ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ছাহাবিগণের ও আলেমদিগের অধিকাংশের মতে দুধ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে দুই বৎসরের মধ্যে দুধ খাওয়াইলে। ছহীহ্ হাদীছের দ্বারা এই মতের সমর্থন হইতেছে (এবন-

কাছীর)। সূরা নেছার ২৩ আয়াতে, সূরা আহকাফের ১৫ আয়াতে ও সূরা লোক-মানের ১৪ আয়াতে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৮৮। **টীকা ঃ বিধবার ইদ্দত**—স্বামী মরিয়া যাওয়ার পর, তাহার বেওয়া বিবিকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিতে হয়। "তাহারা আত্ম-সংবরণ করিয়া থাকিবে," অর্থাৎ বিবাহ করিবে না,—করিলে তাহা স্বতসিদ্ধ-ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে। বিভিন্ন ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে—ইদ্দতের সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সাজসজ্জা করা, সুরমা লাগান, সুগন্ধি ব্যবহার করা বিধবাদের পক্ষে নিষিদ্ধ (বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি)। ইহার পর সে নিজের সম্বন্ধে খোদ-মোখতার। বিবাহ করিতে চাহিলে স্বচ্ছন্দে করিতে পারিবে।

আকবর বাদশাহের আমল হইতে মোছলেম ভারতে একটা অন্ধকার যুগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া যায়। একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় ছোলতানদিগের কেহ কেহ এই শোচনীয়তার যুগকে শোচনীয়তর করিয়া দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই সব অভিশাপের ফলে মোছলেম সমাজে চতুর্বর্ণ সৃষ্টির পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হইয়া যায়। ইহারই কুফলে মুছলমান সমাজের "শরীফ" লোকেরা বিধবা বিবাহকে চরম ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকেন। এই সময় পরম ভক্তিভাজন মোজাদ্দেদে-আল্‌ফে-ছানীর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন সাধুপুরুষ, বিশেষত: মোজাহেদে আজম সৈয়দ আহমাদ শাহীদ এবং তাঁহার শিক্ষায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ আলেম সমাজ, এই শ্রেণীর সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও দেশব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহাদের সাধনা ও সংগ্রামের ফলে মুছলমান সমাজ এদেশে ঘৃণিত পঞ্চম জাতিতে পরিণত হওয়ার অভিশাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর মুছলমান আজ এই মহামহিম ব্যক্তিগণকে, ইংরেজের কল্পিত ও প্রচারিত, ওহাবী নামে আখ্যাত বা অখ্যাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

১৮৯। **টীকা ঃ সংযত ব্যবহারের উপদেশ**—ইদ্দতকালে কোনও নর-নারীর বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই প্রকার বিবাহ যে হারাম, সে সম্বন্ধে ইমাম ও আলেমগণ সকলে একমত (ফাৎহুল্-বায়ান)। হযরত ওমর ও হযরত আলী ইহার সমর্থন করিয়া-ছেন, এবং তাঁহাদের সময় এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিলে তাঁহারা এইরূপ বিবাহকে বাতেল করিয়া দেন। ইঁহাদের মতে শুধু বিবাহ বাতেল করাই যথেষ্ট হইবে না, বরং সেই অসংযত ও অনাচারী পুরুষ আর কখনও বিবাহ করিতে

পারিবে না। ইমাম আবু-হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখও উপরোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন।

সমাজে যাহাতে এইরূপ অনাচার ঘটিতে না পারে, সে জন্য ২৩৪ আয়াতে স্ত্রীলোকদিগকে আত্মসংবরণ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পর এই আয়াতে পুরুষদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে, যেন তাহারা ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে নারীদিগকে বিবাহের পয়গাম না দেয়, বা তাহাদিগকে কোনও প্রতিশ্রুতি প্রদান না করে। এমন কি, এইরূপ বিবাহ সম্বন্ধে যেন মনে মনেও কোনও সঙ্কল্প করিয়া না বসে।

দুঃখের বিষয় ইদ্দতের সময়কার বাধানিষেধ সম্বন্ধে নিম্নস্তরের মুছলমান-দিগের মধ্যে জ্ঞানের ও সতর্কতার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। ইহার প্রতিকার করার ভার অর্পিত হইয়া আছে আমাদের আলেম, ওয়ায়েজ ও সংবাদপত্র পরি-চালকগণের উপর। সমাজ সংস্কার যে একটা বড় কাজ, তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি।

---

৩১ রুকু

২৩৬। তোমরা যদি (বিবাহের পর) স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়া দেও তাহাদিগকে "স্পর্শ" করার পূর্বে, অথবা তাহাদের জন্য কোনো মোহর অবধারিত করার পূর্বে—তাহাতে তোমাদের উপর কোনও দায়িত্ব বর্তায় না,—এ অবস্থায় উহাদের জন্য তোমরা কিছু সংস্থান করিয়া দিবে—সচ্ছল অবস্থার লোককে দিতে হইবে নিজের সঙ্গতি অনুসারে, এবং অসচ্ছল অবস্থার লোককে দিতে হইবে নিজের সঙ্গতি অনুসারে—নিয়ম সঙ্গত-ভাবে, ইহা হইতেছে সদাচারী লোকদিগের উপর অবধারিত কর্তব্য।

٢٣٦ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ صلے وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○

২৩৭। পক্ষান্তরে, তোমরা যদি স্ত্রী-দিগকে তালাক দেও তাহা-দিগকে স্পর্শ করার পূর্বে---অথচ তাহাদের জন্য একটা মোহর সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছ, সে অবস্থায় দেয় হইবে মোহরের অর্ধেক পরিমাণ, তবে স্ত্রীরা যদি মাফ করিয়া দেয়, অথবা বিবাহ বন্ধন যাহার এখ্‌তিয়ারে আছে—সে যদি (তাহার প্রাপ্য অর্ধেক) ছাড়িয়া দেয় ; বস্তুতঃ মাফ করিয়া দেওয়াই হইতেছে পরহেজগারীর দিক দিয়া অধিক সঙ্গত ; এবং তোমরা (কোনো পক্ষ) যেন, পরস্পরের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিও না ; নিশ্চয় জানিও তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক পর্যবেক্ষক। (১৯০)

٢٣٧ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ط وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥

২৩৮। (হে মোমেনগণ!) তোমরা সকল (অক্তের) নামাযের—বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামাযের—হেফাজাত করিতে থাকিবে, আর আল্লাহ্‌র হুজুরে খাড়া হইবে সুবিনীত-সুসংযতভাবে।

٢٣٨ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ ق وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٥

২৩৯। কিন্তু যদি কোনো বিপদের আশঙ্কা ঘটিয়া যায় তোমাদের,

٢٣٩ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ

رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

তাহা হইলে (নামায আদা করিবে) হাঁটিতে হাঁটিতে অথবা ছওয়ারীতে চলিতে চলিতে, ইহার পর যখন নিরাপদ হইয়া যাও তোমরা, তখন আল্লাহ্‌র জেকের করিবে—যেরূপে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, পূর্বে যাহা ছিল তোমাদের অবিদিত। (১৯১)

٢٤٠ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً
لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللّٰهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২৪০। এবং, তোমাদিগের মধ্যে যাহারা মরিয়া যায় স্ত্রীদিগকে রাখিয়া, তাহাদের স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ অছিয়ত করা হইতেছে যে, স্ত্রী এক বৎসর পর্যন্ত খোরপোশ পাইতে থাকিবে আর এই সময়ের মধ্যে তাহাকে (বাড়ী হইতে) বাহির করিয়া দেওয়া চলিবে না,—(১৯২)কিন্তু তাহারা যদি নিজেরা বাহির হইয়া যায়, সে অবস্থায় তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সে সম্বন্ধে তোমাদের দায়িত্ব কিছুই থাকিবে না; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

٢٤١ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى

২৪১। তালাকী স্ত্রীদিগের জন্যও বিহিতভাবে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত; পরহেজ-

الْمُتَّقِيْنَ ۝

গার লোকদিগের জন্য ইহা হইতেছে অবশ্য কর্তব্য।(১৯৩)

٢٤٢ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ ع

২৪২। এইরূপে তোমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ নিজের আয়াত-গুলিকে বিশদভাবে বয়ান করিয়া দিতেছেন, যেন তোমরা বুঝিয়া নিতে পার। (১৯৪)

তাফ্‌ছীর

১৯০। টীকাঃ কয়েকটা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বিশেষ বিশেষ লাচারীর অবস্থায়। কিন্তু ইহা দ্বারা সমাজ জীবনে নানা দিক দিয়া যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সঞ্চার হইয়া যায়, সেগুলির যথাসম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থাও কোর্‌আন মাজীদে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরের আয়াত দুটিও সেইসব ব্যবস্থার অন্তর্গত।

তালাকী স্ত্রী সম্বন্ধে চার প্রকার পরিস্থিতির সম্ভাবনা আছে :

(১) বিবাহের সময় যাহার মোহর নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার সঙ্গে সহবাসও হইয়াছে। এরূপ স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহরের অধিকারিণী, তাহা বা তাহার কোনও অংশ গ্রহণ করার বা পরিশোধ না করার অধিকার স্বামীর থাকিবে না। তিন তোহর বা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। (এই সূরার ২২০ আয়াত দেখুন)।

(২) যাহার মোহর নির্ধারিত হয় নাই ও যাহার সহিত স্বামীর সহবাসও ঘটে নাই, সেই শ্রেণীর স্ত্রীদিগকে তালাক দিলে স্বামীর উপর মোহর সম্বন্ধে কোনো আইনগত দায়িত্ব বর্তায় না বটে, কিন্তু ইহাদের জন্য "নিজের অবস্থা অনুসারে ও বিহিতভাবে" কোনো একটা সংস্থান করিয়া দেওয়া স্বামীর কর্তব্য হইবে। ২৩৬ আয়াতে ইহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীর তালাকী স্ত্রীদিগকে ইদ্দত পালন করিতে হয় না (আহজাব, ৪৯ আয়াত)।

(৩) মোহর নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু সহবাস ঘটে নাই। ২৩৭ আয়াতের ব্যবস্থা মতে ইহারা নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পাওয়ার অধিকারিণী হইবে।

(৪) মোহর নির্ধারিত হয় নাই, অথচ সহবাস ঘটিয়া গিয়াছে—এইরূপ পরি-

স্থিতিতে পুরা মোহর শোধ করিয়া দিতে হইবে। (নেছা, ২৪ আয়াত) ২৩৭ আয়াতের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, তালাকী স্ত্রী ইচ্ছা করিলে তাহার প্রাপ্য অর্ধেক মোহর ছাড়িয়া দিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে স্বামীও স্ত্রীকে, অর্ধেকের স্থলে,পুরা মোহর দিয়া দিতে পারে,—বরং ইহাই হইবে সুসঙ্গত ও সুসংযত কাজ। এইরূপ তালাকের ফলে স্ত্রীর মনে দারুণ আঘাত লাগার কথা। ইহা ব্যতীত, তালাকের ঘটনার দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারবর্গের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যায়। তাহারই কিছুটা প্রতিকারের জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন। ইহার সারমর্ম এই যে, স্ত্রী যদি আত্মসম্মান জ্ঞানের ফলে ঐরূপ হঠকারী স্বামীর প্রদত্ত মোহরের অর্ধাংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, বা মাফ করিয়া দেয়; এবং পক্ষান্তরে স্বামী যদি নিজের অন্যায় কাজের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পুরা মোহরটাই স্ত্রীকে দিয়া দেয়, তাহাতে কোনো অন্যায় তো হইবেই না, বরং এখানে তাহাকে পরহেজগারীর কাজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯১। **টীকা ঃ নামাযের হেফাজত**,—বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত ব্যাপার-গুলি উপস্থিত হইলে পক্ষরা সাধারণভাবে তাহা নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তালাকের ঘটনা উপলক্ষে তো তাহাদের মধ্যে উত্তেজনার অবধি থাকে না। ইহা ছাড়া পাড়ার পাঁচজনের তো আহার-নিদ্রা উঠিয়া যায়। ইন্ধন যোগাইবার কাজেও অনেকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন।

তালাক সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পূর্বে তাই নামায প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, দুইটি বিশেষ কারণে। প্রথমতঃ বলা হইতেছে যে, তোমরা এই সব ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নামাযের বিহিত অঙ্গগুলি সম্বন্ধে উপেক্ষা করিও না। কারণ নামায হইতেছে আমলের দিক দিয়া মুছলমানের প্রধান কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ, পরস্পরের মধ্যে হাজার দ্বন্দ্ব-কোলাহল ও উত্তেজনা চলিতে থাকুক না কেন, মুছলমান যখন অজু করিয়া, শুদ্ধবুদ্ধ দেহ-মন নিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয় এবং আল্লায় আত্মসমর্পণকারী বান্দাহ্ হিসাবে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাতারে খাড়া হইয়া যায়, তখন আপনা আপনি মনে সৎ ও সাত্তিকভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। মুছলমান যখন আত্তা-হিয়াতের দোওয়ায় পার্শ্ববর্তী সমস্ত মুছলমানের জন্য আল্লাহ্‌র হুজুরে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রার্থনা করে,উপসংহারে যখন জামাআতের সকল মুছলমানের জন্য ছালাম (শান্তি) ও আল্লাহ্‌র রহমতকে উপহার উপস্থিত করে, তখন তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আয়াতে সব নামাযের—বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের—হেফাজত

করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বহু ছহীহ্ হাদীছের নির্দেশ ও অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণ অনুসারে, মধ্যবর্তী নামায বলিতে আছরের নামাযকেই বুঝাইতেছে। (কাবীর, এবনে-কাছীর প্রভৃতি)।

আয়াতের শেষে বিপদকালীন নামাযের কথা বলা হইতেছে। সাধারণ অবস্থার জন্য আয়াতের প্রথম ভাগে নামাযে খাড়া হইতে বলা হইয়াছে—"সুবিনীত ও সুসংযতভাবে।" কিন্তু বিপদের আশঙ্কা ঘটিলে ছওয়ারীতে চড়িয়া বা হাঁটিয়া যাইতে যাইতে নামায পড়া চলিবে। জেহাদের ময়দানে নামাযের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সূরা নেছার ১০২ আয়াতে স্বতন্ত্র নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯২। টীকা : বিধবা স্ত্রীর খোরপোশ—এই আয়াতের মর্ম গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রথমে "অছিয়ত" শব্দের ধাতুগত ও ব্যবহারিক অর্থের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক। ইমাম রাগেব বলিতেছেন—

الوصية التقدم الى الغير بما يعمل به مقترنا بالوعظ -

"অন্যকে তাহার কর্তব্য জানাইয়া দেওয়া—সৎ উপদেশ সহকারে।" সাধারণত: মনে করা হয় যে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মানুষ নিজের বিষয়-সম্পত্তি বা অন্য কোনও আবশ্যকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ প্রদান করে, তাহাকেই কেবল অছিয়ত বলা হয়। কিন্তু এ ধারণা সঙ্গত নহে। আল-আছ্র সূরায় সৎকর্মশীল মোমেনদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

"এবং তাহারা পরস্পরকে অছিয়ত করিয়া থাকে সত্যের অনুসরণ করিতে, আরও অছিয়ত করিয়া থাকে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে।" এখানে অছিয়ত অর্থে নছীহত, কাহাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করা।

আল্লাহ্ মানুষকে "অছিয়ত" করিতেছেন—এই মর্মের বহু আয়াত কোর্-আন মাজীদে মওজুদ আছে। যেমন—

يوصيكم الله فى اولادكم (নেছা), وصينا الذين اوتوا الكتاب (ঐ) و وصينا الانسان بوالديه ,(আনআম), اذ وصيكم الله به ,(ঐ) وصية من الله (আন্কাবুৎ, আহকাফ, লোকমান) প্রভৃতি। এই সব আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ ইবরাহীমকে অছিয়ত করিতেছেন; আল্লাহ্ মানুষকে অছিয়ত করিলেন; ইত্যাদি। সূরা নেছার ১১ ও ১২ আয়াতে মীরাছ বা উত্তরাধিকারের ভাগ-বণ্টন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার আরম্ভ করা

হইয়াছে يوصيكم الله বলিয়া এবং শেষ করা হইয়াছে وصية من الله বলিয়া। এই হিসাবে আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এই আয়াতেও অছিয়ত কর্তা হইতেছেন আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ মুছলমানদিগকে তাহাদের সমাজের বিধবা নারীদিগের সম্বন্ধে এই নির্দেশ দিতেছেন। "যে ব্যক্তি সন্তান-সন্ততি রাখিয়া মরিয়া যায়, তাহাকে নিজের বিধবা স্ত্রী সম্বন্ধে অছিয়ত করিতে হইবে"— এইরূপ অনুবাদ করিলে মনে হইতে পারে যে, যেন মানুষকে মরিয়া যাওয়ার পর অছিয়ত করিতে বলা হইতেছে। আমার গৃহীত তাৎপর্যে এই প্রকার সংশয় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ থাকিতেছে না।

পূর্বে আরবরা অনেক সময় জীবিতকালে অছিয়ত করিয়া যাইত যে, তাহার মৃত্যুর পর, তাহার বিধবা স্ত্রী এক বৎসর পর্যন্ত খোরপোশ পাইবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সে স্বামীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বা অন্য বিবাহ করিতে পারিবে না। আয়াতে সেই অত্যাচারমূলক প্রথার সংশোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইতে এক বৎসর পর্যন্ত বিধবা স্ত্রী খোরপোশ পাইবে। ঐ সময় পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করার অধিকার তাহার থাকিবে বটে, কিন্তু থাকিতে বাধ্য হইবে না। ইচ্ছা করিলে সে ইদ্দতের চার মাস দশ দিন পরে চলিয়া যাইতে এবং নিজের জন্য স্বাধীনভাবে যে কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবে। "সে অবস্থায় বাকী সাত মাস বিশ দিনের খোরপোশ সে পাইবে না" (মোজাহেদ, বোখারী)।

তাফ্ছীরকারগণের অধিকাংশই এই আয়াতকে মন্ছুখ বা রহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন:

(১) এই আয়াতে বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক বৎসর ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ইহার পূর্বে, ২৩৪ আয়াতে, ইদ্দতের মুদ্দত চার মাস দশ দিন নির্ধারিত করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ ২৩৪ আয়াত দ্বারা এই আয়াত (২৪০) আয়াত মন্ছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে।

(২) এই আয়াতে স্ত্রীকে এক বৎসর খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। অথচ সূরা নেছার ১২ আয়াতে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে তাহাদের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সূরা নেছার ঐ আয়াত দ্বারা এই আয়াতে বর্ণিত খোরপোশ দেওয়ার অংশটা মন্ছুখ হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রকার দাবী করার অনুকূলে কোনও যুক্তি নাই। কারণ, এই আয়াতের সহিত ইদ্দতের কোনই সম্বন্ধ নাই। এখানে শুধু এই কথা বলা হইয়াছে যে, স্ত্রী পুরা এক বৎসর স্বামীর গৃহে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু

ইচ্ছা করিলে ইদ্দতের পর যে কোনও সময় ইচ্ছা, সে চলিয়া যাইতে বা অন্য বিবাহ করিতে পারিবে। তাহার পর স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখার অধিকার কাহারও থাকিবে না। ইহা ব্যতীত, ২৩৪ আয়াত দ্বারা ২৪০ আয়াত মনছুখ হইতেছে, এ কেমন কথা।

একটু ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ২৩৪ আয়াতের সহিত এই আয়াতের কোনও বিরোধ নাই। সেখানে বলা হইয়াছে শুধু ইদ্দতকালের কথা আর এই আয়াতে متاع বা খোরপোশের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। চার মাস দশ দিনে ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। তাহার পর বিধবার জন্য আরও ৭ মাস ২০ দিনের খোরপোশের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতেছে। এখানে তাফ্‌ছীর কাবীর হইতে ইমাম রাজী ও আবু মোছলেম এস্‌পেহানীর যুক্তি-প্রমাণের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল মাত্র।

১৯৩। টীকাঃ তালাকী স্ত্রীর খোরপোশ—২৩৩ আয়াতেও এই ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৪। টীকাঃ ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা—আইন-কানুন ও সামাজিক ব্যবস্থার বর্ণনা এই সূরার মত এখানে শেষ হইতেছে। রুকূর শেষ আয়াতে বলা হইতেছে—এইরূপে আল্লাহ্‌ তোমাদের কল্যাণের জন্য নিজের আয়াত-গুলিকে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দেন—এবং ভবিষ্যতেও দিবেন—যেন তোমরা বুঝিয়া নিতে পার। আমি এখানে আইনজ্ঞ পাঠকবর্গকে এইসব আয়াতের বর্ণিত বিধি-ব্যবস্থাগুলির বর্ণনা কৌশল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইতেছি। শুনিতে পাই, কোর্‌আন-হাদীছে বর্ণিত বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে codify করা না-কি অসম্ভব। ইহা কি সঙ্গত কথা?

---

৩২ রুকু

২৪৩। (হে রাছুল!) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই সেই সব লোকের (অবস্থার) প্রতি, যাহারা নিজে-দের আবাস ভূমি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল—মওত হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, অথচ তাহারা ছিল সংখ্যায় বহু

২৪৩ الم تر الى الذين خرجوا
من ديارهم وهم الوف
حذر الموت ص فقال

لهم الله موتوا قف ثم احياهم ط ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ○

সহস্র ? সেমতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—মরণ হউক তোমাদের ! তৎপর তিনি তাহাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সকল মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, অথচ অধিকাংশ মানুষই শোকরগোজারী করে না। (১৯৫)

২৪৪ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ○

২৪৪। এবং তোমরা (হে মোমেনগণ।) আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করিতে থাকিও, আর জানিয়া রাখিও যে, আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা (১৯৬)

২৪৫ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة ط والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ○

২৪৫। কে আছে এমন ব্যক্তি, আল্লাহ্‌কে যে কর্জ প্রদান করিবে বিহিতভাবে, ফলে ঐ ঋণকে (আল্লাহ্) তাহার জন্য বহুগুণে বর্ধিত করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ (তোমাদের আর্থিক অবস্থাকে) সচ্ছল বা অসচ্ছল করিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্-ই, আর তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে তাঁহারই পানে।

২৪৬ الم تر الى الملا من بني

২৪৬। তুমি কি দেখ নাই, মূছার পর বানি-ইছরাইল (জাতির) প্রধান -

দিগের অবস্থা কি ঘটিয়াছিল? সেই সময়ের কথা, যখন তাহারা নিজেদের নবীকে বলিয়াছিল : "আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ কায়েম করিয়া দিন—আমরা আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করি"; নবী বলিল—যদি জেহাদকে তোমাদের উপর ফরয করিয়া দেওয়া হয়, সে অবস্থায় নাফরমানী করিয়া জেহাদ হইতে ত বিরত থাকিবে না? তাহারা বলিল : জেহাদ না করার কি কারণ আমাদের থাকিতে পারে? অথচ আমরা নিজেদের আবাস হইতে বহিস্কৃত হইয়াছি এবং নিজেদের পুত্রগণ হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু যখন জেহাদের হুকুম দেওয়া হইল তাহাদিগকে, তখন অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত, আর সকলে ফিরিয়া দাঁড়াইল; বস্তুতঃ জালেমদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ্ সুবিদিত আছেন। (১৯৭)

إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى م
إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ
لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا ط قَالُوا وَمَا
لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ
دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا ط فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ٥

২৪৭। তাহাদের নবী (তখন) তাহাদিগকে বলিয়াছিল : দেখ, আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের বাদশাহ্‌রূপে অবধারিত করিয়াছেন, তাহারা বলিল : আমাদের উপর আধিপত্য করার কি অধিকার তালুতের আছে? বস্তুতঃ রাজত্ব করার প্রধান হক্‌দার তো আমরাই, অধিকন্তু ধন-দৌলতের দিক দিয়াও তো তাহাকে সমৃদ্ধ করা হয় নাই। (১৯৮) নবী বলিল : নিশ্চয়, আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের অধিনায়কের পদের জন্য বাছিয়া নিয়াছেন এবং জ্ঞানবলে ও দৈহিক সামর্থ্যে তাহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ নিজের রাজত্ব যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন বিপুল শক্তির অধিকারী, সকল জ্ঞানে সুসম্পন্ন। (১৯৯)

٢٤٧ وقال لهم نبيهم ان الله
قد بعث لكم طالوت
ملكا ط قالوا انى يكون
له الملك علينا ونحن
احق بالملك منه ولم
يؤت سعة من المال ط
قال ان الله اصطفه
عليكم وزاده بسطة فى
العلم والجسم ط والله
يؤتى ملكه من يشاء ط
والله واسع عليم o

২৪৮। তাহাদের নবী তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিল : তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, সেই তাবুত তোমাদের কাছে

٢٤٨ وقال لهم نبيهم ان اية
ملكه ان ياتيكم التابوت

পৌঁছিয়া যাইবে—যাহাতে থাকিবে তোমাদের প্রবোধ ও স্বস্তিলাভের উপকরণ, এবং মূছার স্বজনবর্গের ও হারুণের স্বজনবর্গের (এলেমের) নষ্টাবশেষগুলি, ফেরেশতারা যাহা বহন করিয়া থাকে; নিশ্চয় এই ব্যাপারে নিহিত আছে তোমাদের জন্য একটা বিশেষ নিদর্শন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২০০)

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَآلُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ
الْمَلَٰٓئِكَةُ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ع

তাফ্‌ছীর

১৯৫। **টীকা: এক জাতির উদাহরণ**—এখানে কোন্ জাতির কথা বলা হইতেছে, আয়াতে স্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, সেই জাতির বিবরণ আরব সমাজের অবিদিত ছিল না। ইহার পরে জেহাদ সংক্রান্ত আদেশ ও তাহার একটা ঐতিহাসিক নজীর উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা যে বানি-ইছরাইল জাতির বর্ণনা, আয়াতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সংখ্যায় বহু সহস্র থাকা সত্ত্বেও প্রাণভয়ে মিছর হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল তাহারাই। সুতরাং ২৪৩ আয়াতে বানি-ইছরাইল জাতির ও তাহাদের এই পলায়নের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। তাফ্‌ছীরের বিভিন্ন কেতাবে এ সম্বন্ধে যেসব গল্প-গুজবের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অমূলক ও অযৌক্তিক, সুতরাং সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য।

"সে মতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদের মরণ হউক"—৪০ বৎসর তীহ্ ময়দানে বিভ্রান্ত ভ্রমণের পর এই বানি-ইছরাইল জাতির বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেরা সকলেই সেই মরুপ্রান্তরে মরিয়া যায় (মায়দা, ৪ রুকু), এবং তাহার পরবর্তী পুরুষের লোকেরা নবীর হুকুম অনুসারে জেহাদ করিয়া কাফেরদিগের উপর জয়যুক্ত হয়। একটু পরেই (২৪৬ আয়াত হইতে রুকুর শেষ পর্যন্ত)

তাহাদের পরীক্ষা ও কৃতকার্যতার বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর মরণ ও পুনর্জীবনের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। জীবন ও মরণ শব্দের এই অর্থ আরবী ভাষায় সুপরিচিত। কোর্‌আন মাজীদেও এই প্রকার ব্যবহারের যথেষ্ট নজীর মওজুদ আছে। যথাযথ স্থানে পাঠকগণ ইহার প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

১৯৬। **টীকা ঃ জেহাদে জীবন**—বানি-ইছ্‌রাইল সমাজের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের এই নিদর্শন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মোছলেম জাতিকে জেহাদের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে এবং সেজন্য মুক্ত-হস্তে অর্থ ব্যয় করিতে উৎসাহিত করা হইতেছে। জেহাদে অর্থ ব্যয় করিয়া মুছলমান উপকৃত হইবে নিজে, ইহকালে ও পরকালে। আবার যে অর্থ ব্যয় করা হইবে, তাহাও আল্লাহ্‌র। কিন্তু তবু আল্লাহ্‌ তাহা চাহিতেছেন, কর্জ হিসাবে। আল্লাহ্‌র হুজুরে জেহাদের মরতবা যে কত বেশী, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। "এই কর্জের মূলধনের বহুগুণ অধিক আল্লাহ্‌ আমাদিগকে দান করিবেন"—ইহাও স্মরণ রাখা উচিত। মোছলেম জাতির স্বুবর্ণ যুগের ইতিহাস ইহার বাস্তব প্রমাণ।

১৯৭। **টীকা ঃ প্রধানদিগের দুর্বলতা**—আয়াতে ইহুদী জাতি না বলিয়া ইহুদী জাতির প্রধান বা নেতাদিগের কথা বলা হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া তাহারা একজন রাজা নিয়োগের প্রার্থনা করিয়াছিল, তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া জাতি ও ধর্মের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। পরাধীন জীবনের দুর্দশার বিষয় তাহারা তখন অনুভব করিতে-ছিল। তাই জেহাদ করিয়া এই দাসত্বের অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। নবী তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কথা বলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন নিজেদের পরাধীন জীবনের দুর্দশার উল্লেখ করিয়া তাহারা দৃঢ়তার সহিত নিজেদের দাবীর পুনরুল্লেখ করে। কিন্তু তাহাদিগকে যখন জেহাদের হুকুম দেওয়া হইল, অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইল। আয়াতের উপসংহারে এই নেতাদিগকে জালেম বলা হইয়াছে। মোছলেম উম্মত যাহাতে এই শ্রেণীর নেতাদিগের সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকে, সেইজন্য এখানে এই নজীরের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৮। **টীকা ঃ বিদ্রোহের সূচনা**—ইহুদী প্রধানগণ এমন একজন ملكا বা অধিনায়ক নিয়োগের প্রার্থনা জানাইয়াছিল, যাহার পরিচালনাধীনে শত্রু শক্তির বিরুদ্ধে তাহারা সফলতার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু তাহাদের নবী যখন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে, তালুতকে তাহাদের অধিনায়করূপে মনোনীত করিলেন, অমনি তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিল—কতকগুলি অন্যায় কারণ দেখাইয়া।

জাতীয় জীবনের সবচাইতে বড় দুর্লক্ষণ ইহাই। ব্যক্তিগত মান-অভিমান, হীনস্বার্থবোধ ও জঘন্য হিংসা-বিদ্বেষই এই শোচনীয় পরিস্থিতির প্রধান কারণ। বানি-ইছ্‌রাইল প্রধানগণের অধিকাংশই এইসব হীনপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া তালুতের নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

১৯৯। **টীকাঃ নবীর প্রতিবাদ**—নবী তখন ইহুদীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তালুতকে নায়ক মনোনীত করা হইয়াছে তাহার জ্ঞানের বিশালতার ও তাহার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের বিপুলতার জন্য। বর্তমান অবস্থায় তাহার মত একজন পরিচালকই তোমাদের জন্য আবশ্যক।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এলেমের সহিত শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করাও খুব দরকার। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ চিরকালই উদাসীন। তাঁহারা চান, লেখাপড়া শিখাইয়া ছেলেগুলিকে হয় অফিসের কেরানী করিতে, না হয়, হুজরার পীর বানাইতে। আরবীওয়ালারা এ ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশী অমনোযোগী। বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা ছাত্রদিগের মন ও মস্তিষ্ককে এমনভাবে গড়িয়া তোলেন, যাহাতে তাহাদের কৈশোর ও যৌবনের সমস্ত জীবন-চাঞ্চল্য, শরীরচর্চার সমস্ত উদ্যম, গাজী ও মোজাহেদ হওয়ার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়। মধ্যে, জেহাদ আন্দোলনের ফলে, আলেম সমাজের মধ্যে যে চেতনার উদ্রেক হইয়াছিল, পরিতাপের বিষয় গত ৭৫ বৎসর হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া চলিয়াছে।

২০০। **টীকাঃ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী**—আল্লাহ্‌র নবী তখন বানি-ইছ্‌রাইল জাতির নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন—তালুতের রাজ্যশাসনের সঙ্গতি ও সাফল্যের একটা নিদর্শন এই যে, তোমরা নিজেদের সেই "তাবুতকে" ফিরিয়া পাইবে—যাহাতে থাকিবে মূছার ও হারুণের বিদ্যা ও জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ।

তাবুত শব্দের অর্থ সিন্দুক, পাত্র বা কোনও পদার্থ ধারণের ও রক্ষা করণের আধার। নবিগণের এলেম হইতেছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত অহি—তাহা মাৎলু হউক বা গায়ের মাৎলু হউক। আল্লাহ্‌র কেতাবে স্থান দেওয়া হয় যে অহিগুলিকে এবং সদাসর্বদা আবৃত্তি করা হয় যেগুলির, তাহাই হইতেছে, অহি-মাৎলু। পক্ষান্তরে যেগুলি নাজেল হয় রাছুলের মানসক্ষেত্রে, অথচ কেতাবে যেগুলিকে

স্থান দেওয়া হয় নাই, তাহা হইতেছে অহি-গায়ের মাৎলু। প্রথমটাকে বলা হয় কেতাব, আর দ্বিতীয় অহিকে বলা হয় হাদীছ। এই উভয় প্রকারের অহি নাজেল হয় নবিগণের قلب বা অন্তরে, আল্লাহ্‌র হুকুমে। সূরা বাকারার ৯৭ আয়াতে ও সূরা শো'আরার ১৯৩-৯৪ আয়াতে ইহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ তাবুত অর্থে হৃদয় ধরা হউক, আর আধার বলিয়া গ্রহণ করা হউক, তাহাতে তাৎপর্যের কোনই তারতম্য হইতেছে না। "আম্বীয়াগণের" হৃদয় হইতেছে আল্লাহ্‌র অহির আধার বা সিন্দুক। ফেরেশতাগণ চিরকালই অহি বহন করিয়া থাকেন, এবং তাহা চিরকালই সঞ্চিত ও সুরক্ষিত হইয়া থাকে প্রথমতঃ নবিগণের অন্তরে।

খ্রীষ্টান ও ইহুদীদিগের পৌরাণিক পুঁথিগুলিতে এই ঘটনা সম্বন্ধে এমন সব উদ্ভট, উৎকট ও পরস্পরবিরোধী কেচ্ছা-কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে, কোর্‌আনের তাফ্‌ছীরে তাহার উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি। দুঃখের বিষয়, আমাদের এক শ্রেণীর রাবীলোক, নিরক্ষর বেদুইন ইহুদীদের নিকট হইতে তাহার বহু প্রকারে বিকৃত বিবরণ অবগত হইয়া এবং তাহার উপর নিজেরা আরও কিছু রং ফলাইয়া সমসাময়িক মুছলমানদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাফ্‌ছীর লেখকগণ চোখ বুজিয়া সেগুলিকে নিজেদের কেতাবে স্থান দিয়াছেন।

---

৩৩ রুকু

২৪৯। অতঃপর তালুত যখন ফওজ-গুলি সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইল, সে (তাহাদিগকে) বলিল: "দেখ, একটি নদীর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদিগের আজমায়েশ করিবেন, তখন যে ব্যক্তি তাহা হইতে পান করিবে,সে আমার দলভুক্ত নহে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পানি না খায়, সে-ই হইবে আমার দলভুক্ত, তবে কেহ যদি

২৪৯ فلما فصل طالوت بالجنود لا قال ان الله مبتليكم بنهر ج فمن شرب منه فليس مني ج ومن لم يطعمه فانه مني الا

مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ج
فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْهُمْ ط فَلَمَّا جَاوَزَهٗ
هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ لا
قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ط
قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ
مُّلٰقُوا اللّٰهِ لا كَمْ مِّنْ فِئَةٍ
قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً
بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ
الصّٰبِرِيْنَ ۝

হাতে করিয়া এক কোষ তুলিয়া নেয়,"—কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সকলেই নদী হইতে পান করিল ; (২০১) তারপর তালুত যখন তাহার সঙ্গী মোমেনদিগকে লইয়া নদী পার হইয়া গেল, তখন (তাহাদের একদল) বলিল : "জালুতের ও তাহার লোক-লশকরের মোকাবেলা করার শক্তি আজ আর আমাদের নাই ; (২০২) (অন্যদল), যাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদিগকে (একদিন) আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে হাজির হইতে হইবে, তাহারা বলিল : "কত ক্ষুদ্র দলই না কত বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হইয়াছে—আল্লাহ্‌র হুকুমে।" বস্তুতঃ ধৈর্যশীল বান্দাদের সহায় হইতেছেন আল্লাহ্‌। (২০৩)

٢٥٠ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ
وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ

২৫০। এবং ইহারা জালুতের ও তাহার লোক-লশকরের সম্মুখীন হইল যখন, তখন (মোনাজাত করিয়া) বলিতে লাগিল : হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ার-দেগার। ধৈর্য ধারণের বিপুল

عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ط

শক্তি আমাদিগের প্রতি নামাইয়া দাও, আর আমাদের কদম-গুলিকে তুমি অটল করিয়া রাখ, এবং কাফের জাতির উপর আমাদিগকে বিজয়ী করিয়া দাও। (২০৪)

২৫১ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ قف وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لا لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ o

২৫১। তৎপর ইহারা (কাফের-দিগকে) আল্লাহ্‌র হুকুমে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল, আর জালুত-কে নিহত করিল দাউদ, এবং আল্লাহ্ তাহাকে প্রদান করিলেন রাজ্য ও সৎজ্ঞান, এবং নিজের মর্জী অনুসারে অন্যান্য বিষয়ও তাহাকে শিক্ষা দিলেন ; (২০৫) বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি মানব সমাজের একদলের দ্বারা অন্য দলকে প্রতি-নিবৃত্ত না করিতেন, তাহা হইলে জমিন বিপর্যস্ত হইয়া যাইত ; কিন্তু আল্লাহ্ হইতেছেন সকল জাহানের প্রতি মহা-মেহেরবান। (২০৬)

২৫২ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ o

২৫২। এগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র (প্রেরিত) আয়াত, তোমার প্রতি তাহার আবৃত্তি করি-তেছি বারহাকভাবে ; বস্তুতঃ (হে মোহাম্মদ) তুমি হইতেছ রাছুলগণের অন্যতম। (২০৭)

২৫৩। এই যে রাছুল-সমাজ, ইহাদের কেহ কেহকে অন্য কাহারো কাহারো উপর ফজিলত দিয়াছি —তাহাদের মধ্যে কাহারও সহিত আল্লাহ্ কালাম করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যকার কাহারও দর্জা বহুগুণে উন্নত করিয়াছেন। (২০৮) এবং মরিয়মের পুত্র ঈছাকে দিয়াছিলাম বহু স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, আর তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম 'রূহুল্-কুদুছের' দ্বারা; আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে, নবিগণের পরবর্তী লোকেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইত না—কিন্তু তাহারা হইয়া গেল বিভিন্ন মতাবলম্বী, ফলে কেহ কায়েম রহিল ঈমানের উপর আর কেহ হইয়া গেল কাফের; বস্তুতঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না, কিন্তু অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ যাহা

২৫৩ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض م منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت ط واتينا عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح القدس ط ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينت ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ط ولو شاء الله ما اقتتلوا قف ولكن الله يفعل

ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। (২০৯)

مَا يُرِيْدُ ع

তাফ্ছীর

২০১। টীকাঃ মোজাহেদের পরীক্ষা—কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, বানি-ইছ্রাইলদিগের এক বিপুল জনসঙ্ঘ তালুতের পতাকা তলে সমবেত হইল, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জেহাদ করার উদ্দেশ্যে। সেনাপতি তালুত যথাসময়ে তাহাদিগকে নিয়া যাত্রা করিলেন।

এই মোজাহেদ বাহিনীকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল বিভিন্ন মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া। এই সময় তালুত সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সম্মুখে একটা নদী আসিতেছে। সাবধান, কেহ সে নদীর পানি খাইও না। যে এই আদেশ অমান্য করিবে, আমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। তাফ্ছীরের লেখক ও রাবিগণ ইহাকে একটা পরীক্ষা বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। কে দারুণ পিপাসার সময় ছরদারের আদেশ মান্য করিয়া ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারে, তাঁহাদের মতে, ইহার পরীক্ষা করাই ছিল তালুতের উদ্দেশ্য। ইহাতে যে ধৈর্যধারণ ও ছরদারের তাবেদারী করার একটা গুরুতর পরীক্ষা ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহা কি কেবল পরীক্ষার জন্য কল্পিত হইয়া ছিল, না, এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রচারের অন্য কোনও সঙ্গত কারণ ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ আমার হস্তগত হয় নাই। তবে সমস্ত পারিবেশিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করার অব্যবহিত পরে, প্রচুর পরিমাণে পানি খাইতে দেওয়া বিজ্ঞ সেনানায়ক সঙ্গত মনে করেন নাই, সৈনিকগণের দৈহিক নিরাপত্তার তাকিদে—। কারণ, এরূপ অবস্থায় একটু অসাবধান হইলে প্রায় সর্দি-গর্মির আক্রমণ ঘটিয়া থাকে। (২২১ টীকা দেখুন)।

২০২। টীকাঃ ছরদারকে অমান্য করার কুফল—যাহারা তালুতের নিষেধ অমান্য করিয়া পিপাসা মিটাইয়া পানি খাইয়াছিল, নদী পার হওয়ার পর তাহারা বলিতে লাগিলঃ—"দুশমনের মোকাবেলা করার শক্তি আজ আর আমাদের নাই।" খুব সম্ভব ঐ অবস্থায় অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার ফলে তাহাদের শরীর স্বাভাবিকভাবে অতিমাত্রায় অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছিল। "আজ" আর আমাদের নাই—পদ হইতেও ইহার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

২০৩। **টীকাঃ বিশ্বাসের সুফল**—যাহারা আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল, এবং আমীরের নির্দেশ অনুসারে এক-বুক পিপাসা নিয়া এক-গলা পানি পার হইয়াছিল, নিজেদের সংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া যাইতে দেখিয়াও তাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। মোছলেম-উচিত বীরদর্পে তাহারা ঘোষণা করিল: সংখ্যায় কম হইলেই যে পরাজিত হইতে হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই। তাওহীদের বল ও আদর্শের প্রেরণা নিয়া জীবন জেহাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে যেসব মোজাহেদ তাহাদের অনেকেই যে, প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে আল্লাহ্‌র হুকুমে পরাজিত করিয়া দিয়াছে, তাহার প্রমাণ তো ইতিহাসে যথেষ্ট আছে। * সুতরাং পরাজিত হওয়ার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাওয়ার কোনও কারণই আমাদের নাই। আর সবচাইতে বড় কথা এই যে, জাতির মুক্তির জন্য, ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহ্‌র বাণীর জয়জয়কারের জন্য জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় যেসব ঈমানদার ও ধৈর্যশীল মুছলমান, স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলাই তো তাহাদের সহায়। তাঁহার মর্জিতে রাজী থাকা ও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করাই তো তাওহীদের প্রধানতম শিক্ষা। সুতরাং আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।

২০৪। **টীকাঃ ময়দানের মোনাজাত**—বিরাট শক্তিশালী রাজা জালুত, তাহার সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়া ময়দানের অপরপ্রান্তে উপস্থিত। নিজেদের সংখ্যাশক্তি, শস্ত্রবল ও মুছলমানদের দৈন্য তাহাদিগকে আশু বিজয়ের আশায় উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের আস্ফালনের অবধি নাই। অন্যদিকে মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হইয়াছে অল্পসংখ্যক মুছলমান। সেই ঘোরতর অগ্নি-পরীক্ষার প্রাক্কালে, তাহারা শক্তি চাহিতেছে আল্লাহ্‌র কাছে, ধৈর্য চাহিতেছে আল্লাহ্‌র কাছে এবং বিজয় চাহিতেছে আল্লাহ্‌র কাছে। ইহা ময়-দানের মোনাজাত—খোৎবার গুরুগম্ভীর বিজয় কামনায় অথবা তাওয়াক্কোলের মিথ্যা তাৎপর্যে আত্মহারা মুছলমানের মোনাজাতে, আর ময়দানের এই মোনা-জাতে,—ধর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের নিবেদিতচিত উৎসর্গিত-প্রাণ মোজাহেদের এই মোনাজাতে, আছমান-জমিনের তফাত। এই মোনাজাত যে অবিলম্বে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল আশ্চর্যভাবে, পরবর্তী আয়াতে সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

---

* ২নং পরিশিষ্ট দেখুন।

২০৫। **টীকাঃ দাউদের অসাধ্য সাধন**—কোর্আন মাজীদের ১৬টি আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে হযরত দাউদের উল্লেখ আছে। তিনি জালুতকে কতল করিয়াছিলেন, একাধারে নবুয়ত ও বাদশাহাতের অধিকারী ছিলেন, জব্বুরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মোটামুটিভাবে ইহাই ঐ আয়াতগুলির মর্ম। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ও জালুতকে কতল করার বিবরণ সম্বন্ধে রাছুলুল্লাহ্‌র কোনও হাদীছে কিছু বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানিতে পারি নাই। হাফেজ এবন-কাছীরও এ-সম্বন্ধে কোনো হাদীছের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আয়াতের তাফ্‌ছীরে ইহার অধিক বলা আমি সঙ্গত মনে করি না।

২০৬। **টীকাঃ যুদ্ধ অপরিহার্য**—মাজলুম মানুষকে জালেমের জুলুম হইতে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের দরকার হইয়া থাকে। আমালেকরা ইছ্‌রাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। মনুষ্যত্বের সকল স্বত্ব ও অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দাস-জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। যুদ্ধ না করিলে তাহারা নিজেদের দেশ, ধর্ম এবং জাতিগত সম্ভ্রমকে উদ্ধার করিতে পারিত না। তাই মানুষের অন্তরে আত্মরক্ষার প্রেরণা ও আত্মসম্ভ্রমের অনুভূতির সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্‌র বড় নিয়ামত, তাঁহার রহমতের পরম দান। অব্যবহার বা অপব্যবহারের দ্বারা এই প্রাণ-শক্তিকে পঙ্গু বা বিকৃত করিয়া ফেলিবে যে জাতি, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সূরা হজের ৪০ আয়াতে বিষয়টি আরও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২০৭। **টীকাঃ রাছুলগণের অন্যতম**—কোর্আনের বহুস্থানে হযরত রাছুলে কারীমকে এইরূপে নবী ও রাছুলগণের অন্যতম বা একজন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। করুণাময় আল্লাহ্‌র মঙ্গলবিধানে, দুনিয়ার দিকে দিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সত্যধর্মের প্রচার হইয়াছে। ইছ্‌লাম সেগুলিকে স্বীকার করে। তাহার বাহক ও প্রচারকগণও মুছলমানের ঈমানের দিক দিয়া আল্লাহ্‌র সত্য নবী। কিন্তু মানব সমাজের তৎকালীন অবস্থার হিসাবে তখনও বিশ্বধর্মের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নাই। তাই তখনকার নবিগণ সকলে ছিলেন আঞ্চলিক, সাময়িক বা সাম্প্রদায়িক। অধিকন্তু এই সমস্ত নবী-রাছুলের যুগ শেষ হওয়ার পর, স্থানীয় পণ্ডিত-পুরোহিতের দল তাঁহাদের ধর্মকে নানা দিক দিয়া ক্রমশঃ এমনভাবে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন যে, অন্য কোনও জাতি বা অন্য কোনও দেশের পক্ষে তাহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা ছাড়া দুনিয়ার আর সকলে দস্যু, ম্লেচ্ছ, যবন ও পিচাশ। এবং তাঁহাদের নবী

ব্যতীত দুনিয়ার আর সমস্ত নবী-রাছুল ও সাধুসজ্জন চোর, দস্যু ও ভণ্ড হিসাবে চিরদিনের মত অস্পৃশ্য। দুনিয়ায় ইহার সক্রিয় প্রতিবাদ করিয়াছে আল্লাহ্র কেতাব কোর্আন মাজীদ আসিয়া। এই আয়াতেও সেই একই নীতির অভিব্যক্তি করা হইতেছে। পুনঃ পুনঃ এই ভাবের প্রচার করার বিশেষ কারণও আছে। বস্তুতঃ ইছলামের সব শিক্ষার ও সব সাধনার মর্মবাণী বা রূহানী পায়গাম হইতেছে—বিশ্বমানবের সমবায়ে একটি সার্বজনীন ও সর্বভৌমিক ভ্রাতৃসমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই, মোছলেম সমাজের শত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, এবং প্রতি-পক্ষীয়দের যুগ-যুগান্তর ব্যাপী প্রবল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, আজ দুনিয়ার অন্ততঃ ৫০ কোটি মানুষ এই ভ্রাতৃসমাজের পতাকাতলে সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

২০৮। টীকা ঃ পূর্ব আয়াতের সমর্থন—২৫২ আয়াতের শেষে হযরত মোহাম্মদকে রাছুলগণের অন্যতম বলা হইয়াছে। এখানেও সেই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, তাহাদের এক-এক জনের এক-একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্যের হিসাবে অন্যদের তুলনায় তাঁহার ফজিলত বা মর্যাদা অধিক। যেমন, একজন রাছুল আসিয়াছেন একটা বিশেষ অঞ্চলের জন্য। কেহ আসিয়াছেন কোনো পূর্ববর্তী নবীর শরীয়তকে পরবর্তী যুগের উম্মতগণের বিকার ও বেদ্আত হইতে মুক্ত করার জন্য। কেহ কেহ আসিয়াছেন বিশেষ যুগের বা বিশেষ গোত্রের জন্য। পক্ষান্তরে কেহ আসিয়াছেন নূতন কেতাব নিয়া যুগোপযোগী নূতন শরীয়ত কায়েম করিতে। কেহ আসিয়াছেন প্রধানতঃ জেহাদ করিয়া মজলুমদিগকে জালেম রাজা-বাদশাহ্ বিশেষের দাসত্ব হইতে মুক্তিদান উদ্দেশ্যে। এই হিসাবে তাঁহাদের কাহারো কাহারো এক-একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবী ও রাছুল হিসাবে তাঁহাদের সকলেই সমান স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী। অবশ্য, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে কাহারো অপেক্ষা কাহারো মর্যাদা বা গুরুত্ব যে অধিক ছিল, বাস্তব ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

আয়াতে এই পারস্পরিক ফজিলতের তিনটি নজীর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম হযরত মূছার, দ্বিতীয় হযরত ঈছার, তৃতীয় এমন একজনের—যাঁহার নাম ধরিয়া পরিচয় দেওয়ার দরকার নাই। মূছার সহিত আল্লাহ্ কালাম করিয়াছিলেন, ঈছা বহু স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছিলেন। হযরত মূছা বানি-ইছ্রাইল জাতিটাকে মিসররাজের দীর্ঘদিনের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, হযরত ঈছা তাহাদিগকে জ্ঞান ও প্রেমের শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। অতীতের মহাজন-

বর্গের এই শ্রেণীর মহিমার কথা মোছলেম সমাজ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকে।

কিন্তু তাহাদের পর যিনি আসিয়াছেন—তিনি সারা জাহানের নবী, সকল গোত্র-গোষ্ঠীর নবী, যুগযুগান্তরের নবী—রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্বাচিত রাহমাতুললিল্-আলামীন। নাম না করিয়া তাঁহারই সম্বন্ধে বলা হইতেছে—তাহাদের মধ্যকার জনৈক রাছুলকে মর্যাদায় উন্নত করা হইয়াছে বহু বহু পরিমাণে।

রূহুল-কুদুছ শব্দের তাৎপর্যের জন্য ৬৪ টীকা দেখুন। খ্রীষ্টানদিগের কল্পিত Holy Ghost বা পবিত্র প্রেতাত্মার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

আয়াতে বলা হইয়াছে—"এবং মরিয়ম-তনয় ঈছাকে আমরা প্রদান করিয়াছিলাম البينات অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ-পুঞ্জ। বাইয়্যেনাত শব্দের ইহাই মূল অর্থ। কোর্‌আন মাজীদেও এই অর্থে ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যথা—(১) انى على بينة من ربى (আন্‌আম); (২) افمن كان على بينة من ربه (হূদ); (৩) ان كنت على بينة من ربى (হূদ); (৪) من هلك على بينة (আন্‌ফাল)। "বাইয়্যেনা" অন্য নবিগণকেও দেওয়া হইয়াছে—كانت تاتيهم رسلهم بالبينات (মোমেন), বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কেতাবে বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণকে কোর্‌আনে 'বাইয়্যেনা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—ام آتينهم كتابا فهم على بينة منه, 'আমরা কি তাহাদিগকে কোনো কেতাব প্রদান করিয়াছি, যাহার দলিল-প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত হইয়া) আছে তাহারা (মালায়েকা)।

২০৯। টীকা: আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য—রাছুলদিগের এন্‌তেকালের পর, বিভিন্ন রাছুলের নামকরণে গঠিত উম্মতগুলির মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। আবার একই নবীর উম্মতের মধ্যেও আপোষে সংঘর্ষ ও হানাহানি কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, উম্মতের একদল লোক আল্লাহ্‌র আদেশ ও রাছুলের তরিকার উপর কায়েম থাকে, আর অন্য একদল নানা প্রকার শেরেক বেদ্‌আতে লিপ্ত হইয়া কাফের হইয়া যায়—ইছলামের সব শিক্ষাকে বাক্যতঃ ও কার্যতঃ অমান্য করিয়া দেয়।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানের মধ্যে সংঘটিত ভয়াবহ ঘটনাগুলি ইউরোপের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লিখিত হইয়া আছে। ইহাদের বিভিন্ন মজ্‌হাবের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবী চলিয়া আসিয়াছে, শুধু Inquisition-

এর দুই-একটা ঘটনার ইতিহাস পড়িলে তাহার পৈশাচিক বর্বরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। খ্রীষ্টান জগৎ দুনিয়ার পৃষ্ঠ হইতে ইছলাম ধর্ম ও মুছলমানের রাজনৈতিক শক্তিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য, গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া ছলে-বলে-কৌশলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা যীশুকে খোদা বলিয়া গ্রহণ করিয়া ও তাওরাত ও ইঞ্জিলের আদেশ-নিষেধগুলিকে অমান্য করিয়া কাফের হইয়াছে। তাই ইছলামের ও মুছলমানের প্রতি তাহাদের এই প্রকৃতিগত হিংসা-বিদ্বেষ। দুঃখের বিষয়, মুছলমান সমাজের নিজেদের ইতিহাসও এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত নহে। তাতারীদের সর্বনাশী অভিযান, বাগদাদের পতন, মোছলেম জগতের জাতীয় জীবনের অবসান,—এ সমস্তের মূলে ছিল কয়েকজন মুষ্টিমেয় ছুন্নী-বিদ্বেষীর ষড়যন্ত্র। বাগদাদের ইতিহাস পাঠ করিলে হানাফী ও শাফেয়ীদের শোচনীয় আত্মকলহের অনেক নমুনাও দেখিতে পাওয়া যাইবে। "খারেজী" —"রাফেজী," কোন্দলের ব্যাপারও কম দুঃখজনক নহে। আমাদের দেশের "কল্পিত অহাবী ও কল্পিত ছুন্নী'দের সংঘর্ষে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হইতেছে ইছলামের সাহিত্য ভাণ্ডারগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে ভস্মীভূত করিয়া। ইহার কারণও অভিন্ন।

আল্লাহ্ জবরদস্তি কাহাকেও নেককার বা বদ্‌কার করিয়া দেন না। তাঁহার নিয়ম রাজ্যের সমস্ত কাজ চলিতেছে ন্যায় বিচারের উপর। মানুষকে আল্লাহ্ বিচারের শক্তি দিয়াছেন। তাহার পর আসিয়াছে আল্লাহ্‌র কেতাব ও রাছুলের হাদীছ। তবু মানুষ যদি বিপথগামী হয়, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। অন্যপক্ষ যদি সততার সহিত কাজ করিয়া যায়, তাহাদের নিয়তে যদি কোনও ত্রুটি না থাকে, তাহা হইলে এই সাধু কর্মের পুণ্যফলে সত্যের জয় হইবে, নিশ্চয়।

---

৩৪ রুকু

২৫৪। হে মোমেনগণ। আমরা তোমাদিগকে রেজেকরূপে যাহা দান করিয়াছি, তাহা হইতে কিছু কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করিতে থাক, সেইদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে—যেদিন

٢٥٤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن

না থাকিবে কোনও খরিদ-বিক্রয়, না থাকিবে কোনও সৌহৃদ্য, আর না চলিবে কোনও ছুই-ছোপারেশ; বস্তুতঃ অমান্য-কারী (কাফের) যাহারা, জালেম তো তাহারাই। (২১০)

قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৫৫। আল্লাহ্!—কেহ নাই, কিছু নাই, পূজার যোগ্য প্রভু তিনি ব্যতীত, সদা-সজীব তিনি, স্বয়ং স্বত্ব ও বিশ্বসত্তার ধারক তিনি, তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—নিদ্রাও (তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না); সকল আছমানে ও সকল জমিনে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তের একমাত্র মালেক তিনি; তাঁহার অনুমতি ব্যতীত, তাঁহার হুজুরে ছোপারেশ করিতে পারে কে আছে এমন (শক্তি-মান) ব্যক্তি! তাহাদের অগ্র-পশ্চাৎ সমস্তই তিনি বিদিত থাকেন; বস্তুতঃ তাঁহার জ্ঞানের অতি সামান্য অংশও মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না—তবে যেটুকু তিনি ইচ্ছা করেন; তাঁহার জ্ঞান সমগ্র আকাশ-মণ্ডলকে ও সমগ্র ভূমণ্ডলকে ব্যাপন করিয়া আছে; অথচ তদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্তও হন না, বস্তুতঃ তিনি

٢٥٥ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا

يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

হইতেছেন (কুদ্‌রতে) পরাক্রান্ত, (রহমতে) মহামহীম। (২১১)

٢٥٦ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ
قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২৫৬। দীন সম্বন্ধে কোনো প্রকার জবরদস্তি (করিতে) নাই, নিশ্চয় জ্ঞান ও অজ্ঞতা পরস্পর হইতে স্পষ্টরূপে পৃথক হইয়া গিয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি সমস্ত 'তাগুতকে' অমান্য করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনিল আল্লাহ্‌র উপর, নিশ্চয় সে তো এমন একটা অবলম্বনকে আঁকড়াইয়া ধরিল—যাহা কখনও ছিন্ন বা ভগ্ন হওয়ার নহে; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হইতেছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (২১২)

٢٥٧ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لا
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ

২৫৭। আল্লাহ্‌ই হইতেছেন মোমেনদিগের অলি-অভিভাবক—তিনিই তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন অন্ধকারপুঞ্জ হইতে আলোকের পানে, পক্ষান্তরে (আল্লাহ্‌কে) অমান্য করিল যাহারা—তাহাদের আওলীয়া হইতেছে তাগুত, সে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনে

আলোক হইতে অন্ধকার-পুঞ্জের দিকে ; ইহারাই হই-তেছে জাহান্নামের অধিবাসী —সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী।

الطَّاغُوتُ لَا يُخْرِجُونَهُمْ
مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ط
أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ع

তাফ্‌ছীর

২১০। **টীকা ঃ সদ্ব্যয় করার তাকীদ**—"রেজ্‌ক" শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে ৩ টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। "সেই দিন" অর্থে কিয়ামতের দিন বা হিসাব-নিকাশের সময়। মানুষ দুনিয়ায় আসিয়াছে একা এবং দুনিয়া হইতে তাহাকে যাইতেও হইবে একা। সঙ্গে থাকিবে কেবল তাহার আমল বা কর্মের ফল। "মানুষ মরার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিয়ামত আরম্ভ হইয়া যায়"—এবং মৃত্যু যে কোনও মুহূর্তে উপস্থিত হইতে পারে। কাজেই মানুষকে ইহা ভাবিয়া সর্বদা সৎকর্মে ব্রতী থাকিতে হইবে।

ব্যয় বলিতে সকল প্রকারের সদ্ব্যয়কে বুঝাইতেছে, ফরয ছাদকাগুলিও ইহার অন্তর্গত। প্রাসঙ্গিকতার হিসাবে এখানে জেহাদের জন্য ছাদকা করাকেই বুঝাইতেছে, ইহা অনেকের মত। শাফা'আত সম্বন্ধে পরবর্তী আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

২১১। **টীকা ঃ আয়াতুল্‌-কুরছী**—এই আয়াতের শেষভাগে কুরছী শব্দের উল্লেখ আছে, সেজন্য ইহাকে আয়াতুল-কুরছী বলা হয়। এই আয়াতের বিশেষ ফজিলত রাছুলুল্লাহ্‌র বহু ছহীহ্‌ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র জাত ও ছেফাৎ বা সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, আয়াতে তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিজের অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আয়াতের বর্ণিত কয়েকটা শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি:

(১) আল্লাহ্—এছমে জাত। নিশ্চিত সত্তা, যাবতীয় পূর্ণগুণের অধিকারী, সকল ত্রুটী হইতে মুক্ত, অক্ষয় অব্যয় সত্তা যাঁহার।

(২) একমাত্র পূজনীয় প্রভু তিনি, তিনি ব্যতীত কোনও বিষয় বস্তু বা ব্যক্তি, এবাদতের যোগ্য প্রভু নহে এবং এবাদত করিতে হইবে একমাত্র তাঁহারই।

(৩) الحی القیوم—তিনি সদা-সজীব, তিনি স্বয়ং সত্ত্ব ও সৃষ্টির সকল সত্তার কারক ও ধারক একমাত্র তিনি। অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন তিনি।' তিনি ব্যতীত আর সবকিছুই তাঁহারই মোহতাজ ও মুখাপেক্ষী। (القائم بنفسه المقيم لغيره রাগেব)।

(৪) তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রার অতীত। সুতরাং তাঁর কুদরতের কারখানা সদা-সর্বদা যথানিয়মে চলমান।

(৫) আছমান-জমিনে যাহা কিছু আছে, সমস্তের একমাত্র মালেক তিনি। সুতরাং ৩,৩৩,৩৩ শত বা তেত্রিশ কোটি 'ডেপুটি খোদা' রাখার দরকার তাঁর কখনও হয় না।

(৬) দেবতাদের তপস্যা ও তোষামোদে, মুনি-ঋষিদের অনুরোধ-উপরোধে অথবা কাহারো শাপগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে, কোনো কাজ করা না-করার দুর্বলতা, সেই প্রবল পরাক্রান্ত সত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

(৭) তাঁহার জ্ঞানের সামান্য অংশও মানুষের আয়ত্তে আসিতে পারে না। যেটুকু তাহারা পায়, তাহাও আল্লাহ্‌রই দান। ফানুস উড়ানোর খেয়াল মানুষের চিরদিন ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রাজ্যের অনন্ত রহস্যের এক কণা মাত্রও তাহারা আজও আয়ত্ত করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। সুতরাং বিশ্বরহস্য চিরকালই মানুষের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

(৮) তাঁহার জ্ঞান সমস্ত জগৎকে ব্যাপন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের বিদিত বা অনুমিত এই "বিশ্ব চরাচর" ছাড়াও আরও অনেক জগৎ আছে, যাহার কল্পনাও মানুষ করিতে পারে না। এই অনন্ত অসীম আলম বা জগৎ-গুলির স্রষ্টা ও রক্ষকও তিনি। কিন্তু কোনও প্রকারের আলস্য, তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ৬ দিন সৃষ্টিকার্য চালাইবার পর সপ্তম দিনে তাঁহাকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বা নিদ্রা যাইতে হয় না। (সৃষ্টিকর্তার উৎকট নিদ্রালুতার কথা আমাদের দেশের বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে)।

পূর্বে বলিয়াছি, আয়াতে "কুরছী" শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার দুই প্রকার

অর্থ হয়—আসন বা জ্ঞান। (রাগেব)। এবন-আব্বাছ্ এখানে জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন (বোখারী)। এবন-জারীর এই মতকে অধিক সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (তাফ্ছীর)। যাঁহারা আসন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও শব্দটাকে تمثيل مجرد বা নিছক উপমা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে لا كرسى فى الحقيقة و لا قاعد "প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে কোনও আসনও নাই, আর তাহার উপর উপবেশনকারীও কেহ নাই।" আমি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাগুত, طغى ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার মূল অর্থ পাপাচারের চরম সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়া। তাগুত শব্দের ব্যবহারিক অর্থ—

الطاغوت عبارة عن كل متعبد و كل معبود من دون الله - (راغب)

و هو كل ما تكون عبادته و الايمان به سببا للطغيان و الخروج عن الحق ' من مخلوق يعبد و رئيس يقلد و هوى يتبع - (المنار)

"প্রত্যেক সীমা লঙ্ঘনকারী ও প্রত্যেক ঝুটা মা'বুদ যাহার এবাদত্ এবং যাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে ও সত্যকে বর্জন করিয়া বসে—তা সে সৃষ্টির এমন কিছু হউক, যাহার বন্দেগী করা হয়, অথবা কোনও প্রধান ব্যক্তি হউক, যাহার অন্ধ অনুকরণ করা হইয়া থাকে, অথবা এমন কোনও প্রবৃত্তি হউক, যাহার তাবেদারী করা হয়।"

দুঃখের বিষয়, আমাদের এক শ্রেণীর তাফ্ছীরকার কোনও আয়াতের উপর মনছুখ বা রহিত হওয়ার হুকুম লাগাইতে একটু অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখানেও তাঁহারা আলোচ্য আয়াতটিকে, জেহাদের আয়াত দ্বারা মনছুখ হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সন্ধান নিলে জানা যাইবে যে, জেহাদের প্রথম আয়াত নাজেল হয় ১২ই ছফর ২য় হিজরীতে। আর আলোচ্য আয়াত নাজেল হইয়াছে বানি-নজিরের দেশ ত্যাগের সময়, ৩য় হিজরীর রমযান মাসের মধ্যভাগে। অর্থাৎ মনছুখ হওয়ার থিউরী মানিয়া নিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, মনছুখ আয়াত নাজেল হইয়াছে নাছেখ আয়াতের কমবেশী দেড় বৎসর পরে। আবু দাউদ ও নাছায়ী প্রভৃতি হাদীছের কেতাবে এই আয়াত নাজেল হওয়ার উপলক্ষ বা শানে-নযুল সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যেসব রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের মতের সম্পূর্ণ সমর্থন হইয়া যাইতেছে।

২১২। **টীকাঃ ধর্ম সম্বন্ধে জবরদস্তি**—এই আয়াতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি

সুসঙ্গত নীতির প্রচার করা হইতেছে। দুনিয়ার আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব নিজেদের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে নির্ভর করিতে হইবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্ত বুদ্ধি-বিবেকের উপর। যুক্তি-প্রমাণ দিয়া নিজেদের ধর্মের প্রচার কর, ভদ্রভাবে অন্যদের দোষত্রুটি দেখাইয়া দাও, জনসাধারণকে বুঝাইয়া নিজেদের মতে আনার চেষ্টা কর, তাহাতে কোনও দোষ হইবে না। কিন্তু অন্যের কণ্ঠরোধ করিয়া, তাহাদিগকে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দিয়া এবং রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া অন্য কাহারও বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক-স্বাধীনতা খর্ব করা হইলে, উৎপীড়িত সমাজগুলির আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করার সকল প্রকার অধিকার থাকিবে। আরবের প্রবাদ অনুসারে এসব ক্ষেত্রে শেষ যুক্তি হইবে তরবারি।

---

৩৫ রুকু

২৫৮। (হে মোহাম্মাদ!) তুমি কি সেই ব্যক্তির (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যে ইবরাহীমের সহিত হুজ্জত করিয়াছিল তাহার পরওয়ারদেগার সম্বন্ধে —আল্লাহ্ তাহাকে বাদশাহাত দিয়াছেন বলিয়া—সেই সময়, ইবরাহীম যখন (প্রত্যুত্তরে) বলিয়াছিল : "যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটাইয়া দেন, তিনিই আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার, সে ব্যক্তি বলিল : আমিই তো জীবন-দান করি ও প্রাণ সংহার করি ; ইবরাহীম বলিল : বেশ কথা, আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্বদিক হইতে আনয়ন করেন; তুমি তাহাকে

٢٥٨ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ
فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ م اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ
رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ لا
قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ط
قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ
الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ

الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ
كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ج

পশ্চিমদিক হইতে আনিয়া দেখাও। সেমতে ঐ অমান্যকারী ব্যক্তি হতভম্ব হইয়া পড়িল; বস্তুতঃ জালেমদিগকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন না। (২১৩)

২৫৯ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ
وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى
عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى
يُحْىِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ
مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط
قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ

২৫৯। অথবা সেই ব্যক্তির বৃত্তান্তের প্রতি(তুমি কি লক্ষ্য কর নাই), যে ব্যক্তি কোনও এক নগরে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেই নগরটি ছিল জনশূন্য, তাহার এমারতগুলি ছিল ভিত্তির উপর পতিত; সে বলিল: মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আবার ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন, কিরূপে। তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে "মারিয়া রাখিলেন" একশত বৎসর, তাহার পর তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন; বলিলেন—কত সময় অবস্থান করিলে? বলিল—একদিন অথবা একদিনের কিছু কম। বলিলেন—না, বরং অবস্থান করিয়াছ একশত বৎসর—সেমতে নিজের খাদ্যের প্রতি ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা বিকৃত হয় নাই,

আরও লক্ষ্য কর নিজের গর্দভ-টার প্রতি—অবস্থা এই যে, এইরূপে তোমাকে আমরা নিদর্শন-স্বরূপ করিয়া দিব জন-গণের জন্য—তুমি আরও লক্ষ্য কর অস্থিগুলির প্রতি—কিরূপে আমরা সেগুলিকে সঞ্চালিত করিয়া মাংসে আচ্ছাদিত করি-তেছি ; বিষয়টা যখন তাহার নিকটে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, তখন সে বলিল : আমি অবগত আছি যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় সকল বিষয়ে সর্ব-শক্তিমান। (২১৪)

وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج
وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ
وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا
لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا
قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ o

২৬০। আরও স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, ইবরাহীম যখন বলিয়া-ছিল : হে আমার প্রভু, হে আমার পরওয়ারদেগার। মোর-দাকে তুমি জেন্দা করিবে কি প্রকারে, আমাকে তাহা দেখাইয়া দাও। বলিলেন : তবে কি তুমি ইহাতে বিশ্বাস কর নাই ? ইবরাহীম (উত্তরে) বলিল, হাঁ (বিশ্বাস করি), তবে আমার অন্তঃকরণ স্বস্তিলাভ করুক—এইজন্য (এ প্রার্থনা) ; আল্লাহ্

২৬০ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ
اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ
الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَلَمْ
تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ
لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ط قَالَ

فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ع

বলিলেন : তাহা হইলে তুমি চারটা পাখী গ্রহণ কর এবং সেগুলিকে নিজের প্রতি অনু-রক্ত করিয়া (পোষ মানাইয়া) লও, তাহার পর সেগুলির প্রত্যেকটাকে এক একটা পর্ব-তের উপর রাখিয়া দাও, তাহার পর ডাক দাও সেগুলিকে দেখিবে তাহারা 'ছুটিয়া' আসিতেছে তোমার কাছে। আর নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখিও যে, আল্লাহ্ হইতেছেন পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (২১৫)

তাফ্ছীর

২১৩। টীকা: নমরূদের হুজ্জত—নমরূদ ছিল হযরত ইবরাহীমের সমসাময়িক রাজা। একটা রাজত্বের অধিকারলাভ করিয়াছিল বলিয়া সে অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। রাজাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জ্ঞান করাই ছিল সে কালের সমস্ত পৌত্তলিক জাতির সাধারণ বিশ্বাস। হযরত ইবরাহীম ছিলেন দুনিয়ায় তাওহীদ ধর্মের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তাই নমরূদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তাঁহার বাদবিতণ্ডা ও সংঘাত-সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যায়। ইহারই একটা সংক্ষিপ্ত উদাহরণ এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাজকীয় অধিকারলাভ করার জন্য অহঙ্কারী ও বিদ্রোহী না হইয়া বিনয়-অবনতভাবে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই নমরূদের উচিত ছিল। রাজ-নৈতিক শক্তি লাভ করার জন্য অহঙ্কারী ও অনাচারী না হইয়া মানুষের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর ও রাজত্বের সমস্ত অবদান-উপকরণের প্রভু ও মালেক হইতেছেন আল্লাহ্। সুতরাং সেই মালেকের দেওয়া রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা তাঁহারই সৃষ্টির উপর অনাচার-অত্যাচার চালাইলে তাঁহার লা'নৎ ভাগী হইতে হয়। পূর্ব আয়াতে আলোক ও অন্ধকারের উপমা দেওয়া হইয়াছে। তাহারই প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে যথাক্রমে ইবরাহীম ও নমরূদের উল্লেখ করা হইতেছে।

২১৪। টীকাঃ ইতিহাসের প্রমাণ—পূর্ব আয়াতে স্বৈরাচারী নমরূদ রাজার মোকাবেলায় হযরত ইবরাহীম যেসব ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, একটি ঐতিহাসিক নজীর দিয়া এখানে তাহার সমর্থন করা হইতেছে। আয়াতের প্রথমে كالذى শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার কাফ-বর্ণ হইতে এই তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে সূচিত হইতেছে। তাফ্‌ছীরকার ও বৈয়াকরণগণের অধিকাংশের মতও ইহাই। কাজেই আয়াতের সঠিক মর্ম গ্রহণের জন্য আমাদিগকে হযরত ইবরাহীমের অথবা তাঁহার বংশধরগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের সন্ধান লইতে হইবে। কিন্তু ইহার পূর্বে আয়াতে বর্ণিত শব্দ ও সমাসগুলির স্পষ্ট অর্থ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতগুলি সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিচার-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নিম্নে তাহার চেষ্টা করা হইতেছে—

(১) الذى বা সেই ব্যক্তি—বলিয়া কোন্ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, সে সম্বন্ধে তাফ্‌ছীরকারগণের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ দেখা যাইতেছে। একদল আয়াতের বর্ণনা হইতে কতকগুলি যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, সে ব্যক্তি ছিলেন একজন নবী। অন্যদল ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, সে ব্যক্তি ছিল আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে অবিশ্বাসী, একজন কাট্টা কাফের। তাহার অবিশ্বাস দূর করার জন্য এই সব মো'জেজা দেখান হইয়াছিল। আয়াতের কয়েকটা বর্ণনা হইতে তাঁহা-রাও নিজেদের মতবাদের সমর্থন করিয়া থাকেন। প্রথম মতের সমর্থকগণের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন, সেই নবীর নাম ছিল ওজের (Ezra, ইষ্রা)। কেহ বলিয়াছেন আরমিয়া (যিরমিয়ো), এবং দুই-একজন হেজকীল (Ezikel, যিহিস্কেল) ভাববাদীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমি মোটের উপর প্রথম মতবা-দের সমর্থন করি। তবে ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আমার মতভেদ আছে।

(২) 'কার্‌ইয়া' শব্দের অর্থ মানুষের আবাসস্থল, গ্রাম বা নগর এবং জনপদের অধিবাসী মানব সমাজ—উভয়ই হইতে পারে। এই তাৎপর্য ভেদে 'কার্‌ইয়া' শব্দ ও তাহার সর্বনামগুলি কখনও স্ত্রীবাচক এবং কখনও পুংবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোর্‌আন মাজীদের বহুস্থানে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি সন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, অধিকাংশ স্থলেই উহা জনপদের অধিবাসী অথবা ''القوم انفسهم'' বা সেই অঞ্চলের বাশেন্দা কওমকেই বুঝান হইয়াছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য রাগেব ৪১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) আয়াতের فاماته الله مائة عام ثم بعثه অংশটির তাৎপর্য কি হইতে পারে। ইহার শাব্দিক অনুবাদ হইতেছে: আল্লাহ্ তাহাকে মারিলেন

একশত বৎসর, তাহার পর তাহাকে অভ্যুত্থিত করিলেন। মৃত্যু বা মওত এক মুহূর্তের ব্যাপার। একশত বৎসর ধরিয়া কোনও জীবকে মারার কোনও সঙ্গত অর্থ হইতে পারে না। সে জন্য সকলেই ইহার অর্থ করিয়াছেন—একশত বৎসর তাহাকে মৃতের অবস্থায় রাখিলেন। আমার মতে আয়াতে কোনও একটা জাতির কথা বলা হইতেছে, একশত বৎসর ধরিয়া যাহারা রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল স্পন্দন ও প্রাণশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর তাফ্ছীরকারগণের বর্ণিত তিনজন নবী বা সাধু ব্যক্তির অবিরাম চেষ্টার ফলে আবার তাহারা নবজীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তাহারা জীবন্ত জাতি হিসাবে দুনিয়ায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এখানে بعث শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই শব্দের মূল অর্থ—প্রেরণ করা, কোনও বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা, নিদ্রা হইতে জাগ্রত করা। অভিধানকারগণের সমবেত মত ইহাই। (জাওহারী, কামুছ, ছোরাহ্, রাগেব প্রমুখ) ইহার একটি ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে ইমাম রাগেব বলিতেছেন—

و قوله عز و جل ' والموت يبعثهم الله ' اى يخرجهم و يسيرهم الى القيامة -

"মৃতদিগকে আল্লাহ্ بعث করিবেন" আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে বাহির করিবেন ও কিয়ামতের (ময়দানের) পানে পরিচালিত করিবেন"। সুতরাং এইসব আভিধানিক প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, পুনর্জীবিত করা بعث শব্দের মূল অর্থ নহে, খুব সম্ভব ব্যবহারিক অর্থও নহে। এ অবস্থায় উদ্ধৃত আয়াতটিকে একত্রভাবে ও সবদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আয়াতে মওত ও হায়াত অর্থে দৈহিক মৃত্যু বা পুনর্জীবন নহে। অন্ততঃপক্ষে কোনও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তকে অসঙ্গত বলিয়া নির্ধারিত করিতে পারিবেন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বস্তুতঃ হায়াত ও মওত শব্দ, কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়াতে এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সূরা আনফালের ২৪ ও ৪২ আয়াতে এবং অন্যান্য বহু আয়াতে পাঠকগণ ইহার প্রমাণ পাইবেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ইমাম রাগেবের মোফরাদাত, "হায়াত" ও "মওত" শব্দ দ্রষ্টব্য।

এখন ঘটনার ঐতিহাসিক দিক সম্বন্ধে বিচার করিতে চেষ্টা পাইব। আয়াত হইতে "একশত বৎসর" পর্যন্ত একটা জাতির জীবনহীনভাবে অবস্থান করার বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারিতেছি। সকলে স্বীকার করিতেছেন যে, বখ্‌ত নছর কর্তৃক বায়তুল-মোকাদ্দাছ আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গই এই আয়াতে আলোচনা

করা হইয়াছে। তাফ্ছীরকারগণ কয়েকজন নবীর নামও করিয়াছেন। এই প্রমাণ ও স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে ঐতিহাসিক সত্য অবগত হওয়ার জন্য ধীরভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আয়াতের তাফ্ছীর সম্বন্ধে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কিছু কমবেশী ২৫ শত বৎসর পূর্বকার ব্যাপার। ইহুদীদিগের বাইবেলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, আমাদের রাবিগণ তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। রক্ষণশীল দলের তাফ্ছীর লেখকগণ বিনা বিচারে সেইগুলির উল্লেখ করিয়া নিজেদের কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। অথচ সেইসব পুস্তকে আলোচ্য ঘটনাগুলির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যেসব বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিকে তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিতেছেন।

আয়াতের প্রধান বিতর্কের বিষয় হইতেছে "একজন" মানুষের একশত বৎসর মরিয়া থাকার পর, আবার জীবন্ত হইয়া উঠা। বাইবেলে এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, ইজিকেল প্রমুখ নবিগণ "কাশ্ফের" হিসাবে, ঘটনার বহুদিন পূর্বে, এবং বানি-ইছ্রাইল জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলি প্রচার করিয়াছিলেন। কোর্আনে যে শতাব্দী-ব্যাপী মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে ইছ্রাইলদের স্বাধীন জাতীয় জীবনের অবসানকে বুঝাইতেছে, তাহাও বাইবেলের বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। কয়েকজন রক্ষণশীল আধুনিক লেখক, কোর্আনের বর্ণনার সমর্থনে, হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন: বখ্ত নছর বাদশার আক্রমণ ও বায়তুল-মোকাদ্দাছের ধ্বংস এবং ইহুদী জাতির দাসত্ব ও দুর্ভাগ্যের সময় হইতে পারস্যরাজ cyrus বা কোরছ কর্তৃক তাহাদের মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা প্রচারের এবং তদনুসারে সেখানে তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত, ঠিক একশত বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পরমুহূর্তে বলিতেছেন—একশত বৎসর মরিয়াছিলেন একজন পরিব্রাজক নবী। (আল্-ফোরকান, খওয়াজা মোহাম্মদ আবদুল হাই ফারূকী, আলীগড় জামেয়া মিল্লিয়ার অধ্যাপক)। হাফেজ এবনে-কাছীর প্রমুখ কয়েকজন তাফ্ছীরকার এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আর সকলে ইহুদীদের প্রচারিত কিংবদন্তিগুলি কোর্আনের অবশ্যমান্য তাফ্ছীর হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

বাইবেলের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

হেজকীল বা যিহিস্কেল নবী বলিতেছেন: "আমি জাতিগণের মধ্যে হইতে

তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, দেশসমূহ হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব ও তোমাদেরই দেশে তোমাদিগকে উপস্থিত করিব (২৪) আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব (২৬) আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা বাস করিবে (২৭) সেইদিন নগর সকলকে বসতিবিশিষ্ট করিব এবং উৎসন্ন স্থান সকল নির্মিত হইবে (৩৩)-ইত্যাদি। ৩৬ অধ্যায়ে এই শ্রেণীর বর্ণনার পর, ৩৭ অধ্যায়ের প্রথমভাগে বলা হইতেছে: "সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত হইল এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মায় আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে রাখিলেন; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল। পরে তিনি চারিদিকে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন করাইলেন; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে **বিস্তর অস্থি ছিল**; এবং দেখ, সে সকল অতিশয় শুষ্ক। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য সন্তান, এই সকল অস্থি জীবিত হইবে? আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাববাণী বল, **তাহাদিগকে বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল**, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে। **আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব·· মাংস উৎপন্ন করিব, চর্মের দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব,** ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে···আমিই সদাপ্রভু। তখন আমি যেমন আজ্ঞা পাইলাম, তদনুসারে ভাববাণী করিলাম, আর আমার ভাববাণী বলিবার সময়ে শব্দ হইল, আর দেখ ভূমিকম্প হইল, এবং সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন আপন অস্থির সহিত সংযুক্ত হইল। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, তাহাদের উপরে শিরা হইল ও মাংস উৎপন্ন হইল, এবং চর্ম তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা ছিল না·······আমি ভাববাণী করিলাম তাহাতে আত্মা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহারা জীবিত হইল, ও আপন আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল, সে অতিশয় মহতী বাহিনী (হেজকিল বা যিহিস্কেল ৩৬ অধ্যায়)।

হযরত হেজকীলের যে মাকাশেফার কথা উপরে উদ্ধৃত হইল, আমার মতে, আলোচ্য আয়াতে তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা যে বাস্তব ঘটনা নহে, বাইবেলেও তাহার প্রমাণ আছে। ঐ পুস্তকে উদ্ধৃত বিবরণটি উল্লেখ করার পরেই বলা হইতেছে—'পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য

সন্তান, **এই সকল অস্থি সমস্ত ইছ্রাইল-কুল**, দেখ তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থি সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের আশ্বাস নষ্ট হইয়াছে, আমরা একেবারে উচ্ছিন্ন হইলাম।" সদাপ্রভু যে ইহাদিগের কবর মুক্ত করিবেন এবং আবার ইছ্রাইলের দেশে যাইয়া ইহারা বসতি স্থাপন করিবে, সে আশ্বাসও হেজকীল নবীর মারফত তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। কোর্‌আনেও আলোচ্য আয়াতে প্রথমে كالذى শব্দে যে ك বর্ণ আছে, উহা মেছাল, উদাহরণ বা রূপক উপমা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরের বিবরণটি যে হেজকীল নবীর স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের ব্যাপার—বাস্তব ঘটনা নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য ك ব্যবহার করা হইয়াছে, কেহ কেহ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, পাঠকগণ বাইবেলের বিবরণের সহিত কোর্‌আনের আয়াতটি মিলাইয়া পড়িলে নিঃসন্দেহভাবে দেখিতে পাইবেন যে, কোর্‌আনে হেজকীল নবীর এই মাকাশেফার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এবং জাতির হিসাবে মৃত বানি ইছ্রাইলদিগের নবজীবন লাভের প্রসঙ্গই এখানে উল্লেখিত হইয়াছে।

হেজকীল নবী যে, এ ক্ষেত্রে রূপকের ভাষায় কথা বলিয়াছেন, তাঁহার কেতাবের বিভিন্ন স্থানে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে উদ্ধৃত বর্ণনার অব্যবহিত পরেই বলা হইতেছে: "পরে তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্য সন্তান, এই সকল অস্থি সমস্ত ইছ্রাইল-কুল ; দেখ, তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থিসকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের আশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমরা একেবারে উচ্ছিন্ন হইলাম। এই জন্য তুমি....সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব,... আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে... ইত্যাদি। (ঐ, ৩৭—১১,১২)।

২১৫। টীকা: এলমুল একীন ও আয়নুল-একীন—হযরত ইবরাহীমের প্রসঙ্গে এখানে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। ইবরাহীম দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত বহু জাতির আদি পিতা, এবং পৃথিবীর দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত তিনটি প্রধান ধর্মের প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক। তাঁহার গৃহীত আদর্শের প্রধানতম সম্বল হইতেছে সত্যকার তাওহীদ, ভেজালহীন একেশ্বর-বাদ ও অলঙ্ঘনীয় কর্মফলবাদ। সেই কর্মফল লাভের বা ভোগের অবধারিত কাল হইতেছে আখেরাত বা পরজীবন। (হিন্দু দর্শনের জন্মান্তরবাদের সহিত যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই)।

তাই ইবরাহীম নিজের পরওয়ারদেগারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—প্রভু হে! তুমি মোরদাকে আবার জিন্দা করিয়া তুলিবে কি প্রকারে, তাহা আমাকে 'দেখাইয়া' দাও—বুঝাইয়া দাও। প্রভুর হুজুর হইতে প্রশ্ন আসিল—এই কুদ্‌রত যে আমার আছে, তুমি কি তাহা বিশ্বাস কর না? আল্লাহ্‌র খলিল উত্তর করিলেন—বিশ্বাস নিশ্চয় করি। তবে অন্তরের স্বস্তি ও পূর্ণ শান্তি-লাভের জন্য এ নিবেদন।

আল্লাহ্‌র বাণী আসিল : বেশ কথা। তুমি চারিটা পাখী সংগ্রহ কর, তাহার পর সেগুলিকে আদর যত্নের দ্বারা নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লও। উত্তমরূপে পোষমানার পর এক একটা পাখীকে এক একটা পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও। তাহার পর এক স্থানে দাঁড়াইয়া সেগুলিকে ডাক দাও, দেখিবে সেগুলি অবিলম্বে ছুটিয়া আসিবে তোমার কাছে।

বনের পাখী যদি দু'দিনের আদর যত্নে নির্ভয়ে ও সানন্দে তোমার কাছে ছুটিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে আমারই সৃষ্ট, আমারই দ্বারা লালিত-পালিত এবং আমার প্রেমে অভিষিক্ত মানুষ—মানুষ কি আমার ডাক শুনিবে না, আমার কাছে ছুটিয়া আসিবে না?

আয়াতে آرنى ও صرهن শব্দ আছে। ارنى (আরেনী) রা'য়ুন ধাতু হইতে উৎপন্ন। স্থানভেদে উহার অর্থ হয়—চোখের দ্বারা দর্শন করা, মনের দ্বারা উপলব্ধি করা, অবগত হওয়া। ব্যাকরণের সূত্র হিসাবে ইমাম রাগেব বলিতেছেন :

ورآى اذا عدى الى مفعولين اقتضى معنى العلم -

অর্থাৎ "রা'য়ুন ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াপদ যখন দ্বিকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার তাৎপর্য হইবে এলেম, অবগতি বা উপলব্ধি।" এখানে ইহার দুইটি কর্ম আছে, সুতরাং উহার এই অর্থ হওয়া অবধারিত। কোর্‌আন মাজীদে এই ব্যবহারের ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

ইহার পর বিপদ উপস্থিত হইতেছে صرهن শব্দ নিয়া। তাফ্‌ছীরের রেওয়া-য়ত অনুসারে উহার অর্থ করা হইতেছে—পাখী চারিটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাট। উর্দুওয়ালারা এই কাটার সঙ্গে "কুটার"ও যোগ করিয়া দিয়া বলিতেছেন—

ان کو اچھی طرح کوٹ کر قیمہ بنالو অর্থাৎ কাটিয়া ও উত্তমরূপে পিষিয়া উহার কীমা বানাইয়া লও। কিন্তু এই শব্দের আর একটি অর্থ আছে, "তাহাই অধিকতর মশ্‌হুর" এবং সাহিত্যিক হিসাবে তাহাই এখানে প্রযোজ্য। আমি এই املهن বা পোষ মানাইয়া নেওয়ার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্য অর্থ গ্রহণ করিলে আয়াতটা একেবারে অর্থহীন হইয়া যায়। সকলেই জানেন, ফেএল

বা ক্রিয়া পদের অর্থের তারতম্য ঘটিয়া থাকে যেমন তাহার "বাবের" তারতম্য অনুসারে, সেইরূপ তাহার ছেলার তারতম্য অনুসারেও তাহার অর্থের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আবু মোছলেম বলিতেছেন—

المشهور فى اللغة فى قوله فصرهن املهن ' و اما التقطيع و الذبح فليس فى الاية ما يدل عليه ' فكان ادراجه فى الاية الحاقا لزيادة فى الاية لم يدل الدليل عليها - (كبير)

"আভিধানিক হিসাবে ইহার মাশ্‌হূর অর্থ হইতেছে পোষ মানাইয়া লওয়া। কিন্তু কাটা বা জবাই করা অর্থ গ্রহণ করার কোনও প্রমাণ আয়াতে নাই। সুতরাং আয়াতে এই অর্থ যোগ করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইতে পারে না।" (কাবীর)।

পাখী চারিটাকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেল **নিজের প্রতি**—এ কথার কোনও মানে মতলবই হইতে পারে না। সুখের বিষয়, আমাদের দেশের বিজ্ঞ অনুবাদকগণের অনেকেই আবু মোছলেমের মত সমর্থন করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌রাহীম এই উদাহরণ শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, আয়াত হইতে পরোক্ষভাবে তাহা বুঝা যাইতেছে। তাফ্‌ছীরের রাবীরা এ সম্বন্ধে যেসব কাহিনীর আমদানী করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনা মাত্র (এবন-কাছীর)

---

৩৬ রুকু

২৬১। নিজেদের ধন-দৌলত আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করে যে সব লোক, তাহাদের (দানের) মেছাল হইতেছে: যেমন একটি শস্যবীজ, যাহা হইতে উৎপন্ন হইল সাতটা শীষ, তাহার প্রত্যেক শীষে আছে একশত দানা; এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা (এই পুণ্যফল) বহু-গুণে বর্ধিত করিয়া দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন দানে বিপুল, জ্ঞানে ব্যাপক। (২১৬)

২৬১ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬২। —সেই সমস্ত (দাতা) ; যাহারা আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের ধন-দৌলত ব্যয় করে, অথচ ব্যয়ের সঙ্গে (কাহারও প্রতি) অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং (কাহাকে) কষ্ট প্রদানও করে না—তাহাদের জন্য পুণ্যফল অবধারিত আছে তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে, কোনও ভয় নাই তাহাদের এবং দুঃখিতও হইবে না তাহারা।

২৬২ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّا لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৬৩। যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশদায়ক কিছু, সদালাপ ও ক্ষমা তাহা অপেক্ষা উত্তম ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন বেনিয়াজ, মহা ধৈর্যশীল।

২৬৩ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○

২৬৪। হে মোমেনগণ! এহছান জিতাইয়া অথবা ক্লেশ দিয়া নিজেদের দানগুলিকে পণ্ড করিয়া ফেলিও না—সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের অর্থ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ্‌র প্রতিও আখেরী দিনের প্রতি

২৬৪ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا

তাহার ঈমান নাই ; (২১৭) সেমতে তাহার মেছাল হইতেছে, যেমন একখানা পাথর (আর) তাহার উপরে আছে কিছু মাটি—তাহার উপরে হইল প্রবল বৃষ্টিপাত, ফলে তাহাকে (ধুইয়া) ছাফ করিয়া ছাড়িল ; নিজেদের শ্রমের সামান্য ফলও তাহারা লাভ করিতে পারিল না ; বস্তুত: অবিশ্বাসী সমাজকে আল্লাহ্ সুপথে পরিচালিত করেন না।

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ
وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط
لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৬৫। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত লোক নিজেদের অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ্র রেজামন্দী হাছেল করার আশায় ও আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে, তাহাদের উদাহরণ, যেমন উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি ফলের বাগান—তাহাতে নামিল প্রবল বৃষ্টিধারা, সেমতে তাহাতে উৎপন্ন হইল দ্বিগুণ খাদ্য সামগ্রী, আর প্রবল বৃষ্টির পরিবর্তে যদি অল্প বৃষ্টিও নামে

٢٦٥ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ
اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا
وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ ج فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا

وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(তাহাতেও সুফল হয়); বস্তুতঃ তোমাদের কৃতকার্যগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ হইতেছেন সম্যক দ্রষ্টা। (২১৮)

২৬৬ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২৬৬। আচ্ছা, তোমাদের কাহারও যদি খেজুর ও আঙ্গুর ফলের এমন একটা বাগান থাকে—যাহার নিম্নদেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নদ-নদীমালা, সকল প্রকার মেওয়াজাতের সংস্থান তাহাতে আছে, আর সে উপনীত হইয়া গিয়াছে বার্ধক্যে, এবং তাহার আছে কতকগুলি অক্ষম সন্তান-সন্ততি—এমনই অবস্থায় একটা অগ্নিবৎ 'লূহ্' সেই বাগানকে আক্রমণ করিয়া পুড়াইয়া ফেলিল—কানন স্বামী কি ইহা পছন্দ করিবে? এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গলের জন্য আয়াতগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিতেছেন, যেহেতু তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিবে। (২১৯)

তাফ্ছীর

২১৬। **টীকাঃ আল্লাহ্‌র রাহে সদ্ব্যয়**—৩২ রুকূর প্রথম হইতে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জেহাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন

প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ ও উপমা-উদাহরণের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, অবসন্ন বা মৃতপ্রায় জাতির দেহে প্রাণচাঞ্চল্য জাগাইতে হইলে, জেহাদের উপকরণ-অবদানগুলির আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

মুছ্‌লমানের জেহাদ বলিতে সমগ্র মোছ্‌লেম জাতির জেহাদ, শুধু কতকগুলি বেতনভুক সৈনিকের জেহাদ নহে। নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মুছ্‌লমানকে জেহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতির মন ও মস্তিষ্ককে ইহার জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

এদিক দিয়া প্রধান দরকার হইবে অর্থের। এই অর্থ ব্যয় করিয়া একদিকে সমাজের দুস্থ দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের অভাব মোচন করিতে হইবে—ইছ্‌লামের শিক্ষা ও আদর্শের মধ্যদিয়া তাহাদের মন ও মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যদিকে গাজীদিগের জন্য আবশ্যকীয় রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সমস্তই সংগ্রহ করিতে হইবে। আমি যতটুকু বুঝিতে পারি, এই উভয় প্রকার ব্যয়ই "আল্লাহ্‌র রাহে" বা জেহাদে ব্যয়।

এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া মুছ্‌লমান যদি কোর্‌আনের উপদেশমতে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে আর্থিক দিক দিয়াও তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। আয়াতের উপমায় তাহাও মুছ্‌লমানদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২১৭। টীকাঃ দানের নীতি—বিহিতদানের তিনটি নিষেধাত্মক নীতির কথা রুকুর প্রথম তিনটি আয়াতে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে—

(১) তুমি কিছু টাকা বা ধান দিয়া কাহাকে অসময়ে সাহায্য করিলে। তাহার পর কোনো কারণে তাহার উপর রাগ হইলে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলে —লোকটা কত বড় নেমক হারাম, অসময়ে তাহাকে আমি রক্ষা করিয়াছিলাম, অথচ আজ সে আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করিতেছে।

(২) আমি একটা ভাল কাজে একশত টাকা চাঁদা দিলাম, তুমি কিছুই দিলে না বা দিতে পারিলে না। ইহা নিয়া আমি সর্বত্র তোমার গ্লানি রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইহাতে তোমাকে যাতনা দেওয়া হইল।

(৩) লোকের কাছে আমার সুনাম সুযশ হইবে—এই মতলবে আমি কোনো কাজে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিলাম। এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে নিজের হীন স্বার্থসাধন—কর্তব্যবোধের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

উদ্দেশ্যের ও আদর্শের হিসাবে এই শ্রেণীর দানগুলি সম্পূর্ণভাবে পণ্ড হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে সকলকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে।

২১৮। **টীকা : দুইটি উদাহরণ**—বৃষ্টিধারা ফসল পত্তনের জন্য বিশেষ আবশ্যক ও উপকারী। কিন্তু তাহার একটা নিয়ম বা নীতি আছে। তাহাকে অগ্রাহ্য করিলে, তোমার বীজধান ও পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। নীতিরক্ষা করিয়া চাষ পত্তন কর, বাগ-বাগিচা লাগাও, তোমার শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের তুলনায় বহুগুণ অধিক ফল পাইবে। দুইটি উদাহরণে যথাক্রমে এই সত্যটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

২৬৫ আয়াতে দানের উদ্দেশ্য ও উপকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যাহারা দান করে (১)আল্লাহ্‌র রেজামন্দী (সন্তোষ) লাভের আশায় এবং (২)নিজদিগকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে।" সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের সব দানের বা অর্থ ব্যয়ের উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহ্‌র সন্তোষলাভ, আর দুনিয়ার বুকে জাতি হিসাবে নিজেদের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এইটুকু বুঝিয়া চলিতে পারিলে আমাদের দীন-দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান আপনা আপনি হইয়া যাইবে।

২১৯। **টীকা : তৃতীয় উপমা**—আল্লাহ্‌র সন্তোষলাভের কামনায় এবং মুছলমান হিসাবে দুনিয়ায় আপনাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত, অন্য অসাধু উদ্দেশ্যে যাহারা অর্থ ব্যয় করে তাহাদের দুই দলের ব্যর্থতা ও সফলতার দুইটি উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এখানে সকল প্রকার এবাদত বন্দেগী ও নেক কাজ সম্বন্ধে আর একটা উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। দান-খয়রাত সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া না চলিলে, তাহার পুণ্যফল ব্যর্থ হইয়া যায়, অসময়ে কোন কাজে আসে না—এই উদাহরণে তাহাই বুঝান হইতেছে।

---

৩৭ রুকু

২৬৭। হে মোমেনগণ। তোমরা যাহা কামাই-রোজগার করিয়াছ আর আমরা জমিন হইতে যাহা উৎপন্ন করিয়া দিয়াছি, তাহার মধ্যে যাহা "হালাল ও উৎকৃষ্ট," (সৎকাজে) ব্যয় করিও তাহা হইতে, এবং "হারাম ও নিকৃষ্ট" (বস্তু) ব্যয়

٢٦٧ يَـا يُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْا
اَنْفِقُـوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّـا اَخْرَجْنَـا
لَكُـمْ مِّـنَ الْاَرْضِ ص

করার মতলব করিও না— অথচ অবস্থা এই যে, তোমরা নিজেরা (অন্যের নিকট হইতে) তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না, চোখ বন্ধ না করিয়া; এবং বিশেষরূপে জানিয়া রাখিও যে, আল্লাহ্ হইতেছেন বেনিয়াজ, গুণগ্রাহী। (২২০)

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ط وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

২৬৮। শয়তানই তোমাদের অন্তরে অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তোমাদিগকে কুৎসিত কাজের নির্দেশ দিয়া থাকে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন তাঁহার মার্জনার ও অনুগ্রহের; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন প্রচুর দানকারী, সর্বজ্ঞ। (২২১)

٢٦٨ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلے ○

২৬৯। তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিচার-বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন; আর বিচার-বুদ্ধি দেওয়া হইল যে ব্যক্তিকে, বহু কল্যাণের অধিকারী করা হইল তাহাকে; বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেহ ইহার উপলব্ধি করিতে পারে না। (২২২)

٢٦٩ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ج وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

২৭০। আর তোমরা যে-কোনো প্রকার ব্যয় কর না কেন, অথবা যে কোনো নজর মান না কেন, আল্লাহ্ কিন্তু তাহা অবগত থাকেন, বস্তুতঃ কেহই নাই জালেমদিগের সাহায্যকারী।

٢٧٠ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٥

২৭১। যদি তোমরা ছাদকাগুলি প্রকাশ্যভাবে দান কর—সে তো ভাল কথা, আর যদি তাহা গোপনভাবে অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে প্রদান কর, তোমাদের পক্ষে তাহা হইবে অধিক উত্তম—এবং (ছাদকার পুণ্যফলে) তোমাদের পাপের ক্ষয়ও তিনি করিয়া দিবেন ; বস্তুতঃ তোমাদের আমলগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ হইতেছেন বিশেষরূপে ওয়াকেফহাল। (২২৩)

٢٧١ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ط وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥

২৭২। (হে রাছুল !) তাহাদিগকে হেদায়ত কবুল করানোর দায়িত্ব তোমার উপর (অর্পিত করা হয়) নাই—(পথ দেখাইয়া দেওয়াই তোমার কর্তব্য) পরন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন (২২৪) আর যে-কোনো অর্থ তোমরা ব্যয়

٢٧٢ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

কর না কেন, তাহা হইতেছে তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য, বস্তুতঃ তোমরা তো সদ্ব্যয় করিয়া থাক কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষলাভের জন্য, বস্তুতঃ যে কোনও অর্থ তোমরা (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় করিবে, তাহা তোমাদিগকে পোঁছাইয়া দেওয়া হইবে পুরাপুরিভাবে, আর অবিচার করা হইবে না তোমাদের প্রতি।

٢٧٣ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○ ع

২৭৩। (এই দান-খয়রাত) প্রাপ্য হইতেছে সেই সকল নিঃস্ব লোকের—যাহারা আবদ্ধ হইয়া আছে আল্লাহ্‌র রাহে, তাহারা (রুজী-রোজগারের জন্য) দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, (ভিক্ষা হইতে) নিবৃত্ত থাকার ফলে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করে, তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তাহারা মানুষের কাছে "জড়াইয়া ধরিয়া" ছওয়াল করে না ; এবং (হে মুছলমানগণ।) যে-কোনো অর্থ তোমরা ব্যয় কর না কেন, আল্লাহ্ হইতেছেন সে সম্বন্ধে সম্যক বিদিত। (২২৫)

তাফ্ছীর

২২০। **টীকাঃ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট**—জাতির কল্যাণের জন্য মুছলমানকে মুক্তহস্তে সমস্ত সৎকার্যে ব্যয় করিতে হইবে, বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন দিক দিয়া আমাদিগকে ইহা সম্যকভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই আয়াতে, 'তাইয়েব' ও 'খবীছ্' শব্দ ব্যবহার করিয়া মালের প্রকার ভেদকেও বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। যাহা হালাল ও উৎকৃষ্ট তাহাই হইতেছে তাইয়েব মাল। ইহার বিপরীত, যাহা নিকৃষ্ট ও হারাম, খবীছ্-মাল বলিতে তাহাকে বুঝায়।

২২১। **টীকাঃ শয়তানের নির্দেশ**—কোনও সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করার দরকার উপস্থিত হইলে, শয়তান তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে থাকে—"নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ কর। এমন করিয়া সব সময় 'অপব্যয়' করিতে থাকিলে তুমি নিজেই অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।" এই শয়তান হইতেছে, মানুষের نفس اماره বা অন্তরের হীনপ্রবৃত্তি। এই অর্থে, অপব্যয়কারীদিগকেও কোর্আনে اخوان الشياطين বা শয়তানের ভাই বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। (ইছরাইল, ২৭)।

প্রবৃত্তির নির্দেশ ইহাই। কিন্তু আল্লাহ্ আশ্বাস দিতেছেন, অনুগ্রহের। "আল্লাহ্ হইতেছেন واسع বা প্রচুর দানকারী"—পদে এই অনুগ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ সৎকাজে মুছলমান যাহা ব্যয় করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে ততোধিক প্রদান করিবেন।

২২২। **টীকাঃ হেকমত বা বিচার-বুদ্ধি**—হেকমত শব্দের মূল অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি। নবী উম্মতকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিয়া থাকেন, এই জন্য তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাকেও হেকমত বলা হয়।

সৎকাজে অর্থ ব্যয় করার প্রসঙ্গে এখানে "বিচার-বুদ্ধির" প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। এই বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, জাতি ও ধর্মের মঙ্গলের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহার সুফল বর্তিয়া যায় সমষ্টির—অর্থাৎ সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টির প্রতি। সমাজ-দর্শনের এই সার সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারিলে, কওম অশেষ কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিবে।

২২৩। **টীকাঃ ছাদকা আদায় করার পদ্ধতি**—ছাদকা বলিতে যাকাত, ফেতরা ও অন্যান্য সমস্ত দান-খয়রাতকে বুঝায়। আয়াতে প্রকাশ্য-ভাবে ছাদকা আদায় করা এবং গোপনভাবে তাহা নিজেরা দীন-দুঃখীদিগকে প্রদান করা,—উভয় প্রকারকে সঙ্গত বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে,

ছাদকা দুই প্রকারের এবং এই প্রকার ভেদে তাহার হুকুমেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ফরয নামায আদায় করিতে হয় প্রকাশ্যভাবে, মছজিদে জামাতের সঙ্গে। অথচ নফল নামায মছজিদের পরিবর্তে বাড়ীতে আদায় করার তাকীদ আসিয়াছে। এই প্রকারে ফরয (ওয়াজেব) ছাদকা প্রকাশ্যভাবে প্রদান করাই শ্রেয়ঃ। কারণ, প্রথমতঃ ইহাতে রেয়াকারীর সম্ভাবনা থাকে না, দ্বিতীয়তঃ, এই সব ছাদকা জমা হয় বায়তুল মালের তহবিলে। অভাবগ্রস্ত লোকেরা তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিজেদের অধিকার বলে। সুতরাং তাহা নিয়া কোনও গ্রহীতাকে তা'না দেওয়ার সুযোগ বা অধিকার কাহারও থাকে না। এই নীতি অনুসারে নফল দান-খয়রাতগুলিকে যত গোপনে করা যায়, ততই ভাল। হযরত রাছুলের বিভিন্ন হাদীছ হইতে ইহার তাকীদও প্রমাণিত হইতেছে।

২২৪। **টীকা: হেদায়েত কবুল করান**—হেদায়েত শব্দের অর্থ—পথ দেখাইয়া দেওয়া, পথে পরিচালিত করা বা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়া। ইছলামের সাধারণ নীতি এবং উপক্রম উপসংহার অনুসারে উহার বিশেষ তাৎপর্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। এখানে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি এই হিসাবে আয়াতের অনুবাদ করিয়াছি।

এই আয়াতে সম্বোধন করা হইয়াছে নবী হিসাবে হযরত মোহাম্মদকে, এবং তাঁহার উম্মতকে সমগ্রভাবে। আয়াতের পরবর্তী অংশে সাতটি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ বহুবচনাত্মকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই কারণে।

কয়েকজন ছাহাবীর বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, কাফের মোশ্‌রেক আত্মীয়-স্বজনকে কোনও প্রকার ছাদকা প্রদান করা যাইতে পারে কি-না, সে সম্বন্ধে হযরতের সময়ে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। "এই আয়াতটি নাজেল হয় সেই প্রসঙ্গে।" এই আয়াতটি বাস্তবিক উপরোক্ত প্রসঙ্গে নাজেল হইয়াছিল কি-না, সে সম্বন্ধে কোনও প্রকার স্বীকারোক্তি না করিয়া, আমি মোটামুটিভাবে মানিয়া নিতেছি যে, এক সময় স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন নিয়া ছাহাবিগণের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। আয়াতে সেই সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে কি, আয়াতটা সমগ্রভাবে বিচার করিয়া না দেখিলে তাহা জানা সম্ভব হইবে না। দানের স্বরূপ সম্বন্ধে আয়াতে বলা হইতেছে—

(১) فلأنفسكم তাহার উপকার বর্তাইবে মুছলমান সমাজের প্রতি,

(২) যে দান করা হইবে আল্লাহ্‌র রেজামন্দী হাছেল বা সন্তোষলাভ করার একমাত্র উদ্দেশ্যে।

আমার বিশ্বাস, এই আয়াত হইতে কাফের-মোশ্‌রেকদিগকে ওশর, যাকাত প্রভৃতি ফরয ওয়াজেব ছাদকা দেওয়ার অনুমতি সূচিত হওয়ার পরিবর্তে বরং তাহার নিষেধই প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। অন্যথায় আয়াতের উদ্দেশ্য দুইটি পূর্ণ হওয়ার আশা করা যায় না। ইমাম ও আলেমগণের প্রায় সকলের মতও ইহাই।

২২৫। **টীকাঃ প্রথম হকদার**—ছাদকা-খয়রাত পাওয়ার অধিকতর হকদার হইতেছে সেই সমস্ত নিঃস্ব লোক, যাহারা আল্লাহ্‌র রাহে আবদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদের পাঁচটা বিশেষণ দেওয়া হইতেছে—

(১) তাহারা আল্লাহ্‌র রাহে অর্থাৎ দীনের খেদমতে ও জাতির মঙ্গল সাধনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যেমন জেহাদে লিপ্ত গাজিগণ ও তাহাদের সেবা-শুশ্রূষাকারী লোকেরা অথবা আছহাবে ছোফ্‌ফার সর্বত্যাগী সাধকগণ।

(২) এমন সব লোক, কামাই-রোজগার করার জন্য যাহারা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না।

(৩) উদরজ্বালা নিবারণ বা পরিবার-পরিজনের জন্য ভিক্ষা করিতেও পারে না। যেমন সত্যকার দীনী মাদ্রাছার শিক্ষক ও ছাত্রগণ, প্রকৃত এছলাম প্রচারকগণ। ভিক্ষা করিতে পারে না বলিয়া অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

(৪) তাহারা লোকদিগকে ব্যবসাদার ফকীরদিগের মত জড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা চাহিতে পারে না।

(৫) জ্ঞানী লোকেরা চেহারা ও অন্যান্য বাহিরের আলামত দেখিয়া তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারেন।

---

৩৮ রুকু

২৭৪। নিজেদের ধন-দৌলতগুলি যাহারা ব্যয় করে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে এবং গোপনভাবে ও প্রকাশ্যরূপে—তাহাদের সকলের পুণ্যফল (অবধারিত) আছে তাহাদের প্রতিপালক-প্রভুর সন্নিধানে; বস্তুতঃ কোনও

٢٧ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم

عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

আশঙ্কার কারণ নাই তাহাদের আর দুঃখ-দুর্ভাবনাগ্রস্তও হইবে না তাহারা। (২২৬)

٢٧٥ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا
لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا
يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى
فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ
اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ

২৭৫। সুদ খাইয়া থাকে যাহারা, তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে সেই-সব মানুষের মত—শয়তান যাহাদিগকে সংবিৎহারা করিয়া দিয়াছে, স্পর্শের দ্বারা ; ইহার কারণ এই যে, তাহারা বলিয়া থাকে : খরিদ-বিক্রয়ের কাজও তো সুদের ব্যবসায়েরই মত। (২২৭) অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করিয়াছেন আর সুদকে করিয়া দিয়াছেন হারাম ; সে-মতে যে ব্যক্তির নিকট উপদেশ আসিয়া গিয়াছে তাহার প্রভুর হুজুর হইতে, ফলে সে নিবৃত্ত হইয়া গেল—অতীতে গৃহীত সুদ তাহারই রহিল ; আর তাহার মামলা রহিল আল্লাহ্‌র এখ্‌তিয়ারে ; (২২৮) কিন্তু অতঃপরও আবার (সুদের কাজ)

فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

আরম্ভ করিবে যাহারা, তাহারা হইতেছে জাহান্নামের অধিবাসী ; সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী।

۲۷۶ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

২৭৬। সুদকে আল্লাহ্ করিয়া দেন বে-বরকত এবং ছাদকা-যাকাত দেওয়া মালকে তিনি বর্ধিত করিয়া দেন ; বস্তুতঃ কোনও হঠকারী, মহাপাতকীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (২২৯)

۲۷۷ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৭। যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কর্মগুলি সমাধা করিয়া থাকে এবং নামাযকে কায়েম রাখে ও যাকাত প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদের কর্মফল (অবধারিত) আছে তাহাদের পরওয়ারদেগারের হুজুরে ; বস্তুতঃ কোনও আশঙ্কার কারণ নাই তাহাদের আর দুঃখ-দুর্ভাবনা-গ্রস্তও হইবে না তাহারা।

۲۷۸ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৭৮। হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল এবং বাকী-বকেয়া সুদ ছাড়িয়া দাও—যদি তোমরা (বাস্তবিক) মোমেন হইয়া থাক। (২৩০)

২৭৯। কিন্তু যদি (এই হুকুম অনুসারে কাজ) না কর, তাহা হইলে প্রস্তুত হও—আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাছুলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তবে তোমরা যদি তাওবা কর; তাহা হইলে মূলধন তোমাদের প্রাপ্য হইবে, তোমরা অত্যাচারী হইবে না—অত্যাচারিতও হইবে না।

٢٧٩ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

২৮০। আর দেনদার যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে (তাহার) অবস্থা সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিতে হইবে কিন্তু যদি মূলধনও খয়রাত করিয়া দাও, তাহা হইবে তোমাদের পক্ষে উত্তম কাজ, যদি তোমরা অবগত থাক। (২৩১)

٢٠٨ وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২৮১। আর তোমরা (হে মোমেনগণ।) সেই দিন সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিবে, যে দিন তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে — আল্লাহ্‌র পানে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্মফল দেওয়া হইবে পুরাপুরিভাবে, আর অবিচার করা হইবে না তাহাদের উপর।

٢٧١ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ قف ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ع ۝

তাফ্ছীর

২২৬। **টীকা : সুদ নিবারণের ভূমিকা**—পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ২৬১ আয়াত হইতে ছাদকা ও দান-খয়রাত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হইয়াছে। পূর্ববর্তী দুইটি রুকূতে এ সম্বন্ধে সকল দিকের সম্পূর্ণ আলোচনা করার পর, এই (২৭৪) আয়াতে সুদ সংক্রান্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইতেছে। এই বর্ণনা ধারার তাৎপর্য এই যে, সমাজকে সুদের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে হইলে জনসাধারণের অভাব ও দারিদ্র্যের প্রতিকার করিতে হইবে, তাহার পূর্বে।

আয়াতে বলা হইয়াছে—যাহারা নিজেদের ধন-দৌলতগুলি ব্যয় করে "রাত্রিকালে ও দিবাভাগে এবং গোপনভাবে ও প্রকাশ্যে"—ইহার অর্থ সকল সময়ে ও সকল প্রকারে ব্যয় করার কারণ উপস্থিত হইলে, বিনাবিলম্বে।

২২৭। **টীকা: সংবিৎহারা সুদখোর**—আয়াতের প্রথম অংশে, সুদ-খোরের উপমা দেওয়া হইতেছে মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের সহিত। প্রাক্-ইছলামী যুগের আরব সমাজ বিশ্বাস করিত যে, মানুষ বায়ু-রোগগ্রস্ত হয় ভূত-প্রেতের স্পর্শের ফলে। তাহার পর আরবী ভাষায় বায়ু রোগকে مس বা স্পর্শ রোগ বলিয়া অভিহিত করা হইতে থাকে। কিয়াম শব্দের অর্থ—দুই পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়ান, মজবুতভাবে অবস্থান করা, দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সুদখোরের জীবন সৎজ্ঞান ও সুনীতির মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, উপমা দ্বারা এই সত্যটা প্রকাশ করা হইতেছে (বায়জাভী, কাবীর প্রভৃতি)।

২২৮। **টীকা : সুদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য**—কোর্আনে "রেবা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। বাংলা অনুবাদ সুদ, কুসীদ। ইহার ধাতুগত অর্থ—কোনও বস্তুর বর্ধিত হওয়া। কোর্আনের বিভিন্ন স্থানে এই (বর্ধিত হওয়া) অর্থে উহার ব্যবহার হইয়াছে, (হজ ৫, রূম ৩৯)। এই রুকূতে ও ইহার পরবর্তী রুকূতে নগদ কর্জ ও ধারে খরিদ-বিক্রয়ের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ফলতঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মূলধনের অতিরিক্ত যে বৃদ্ধির লেন-দেন করা হয়, রেবা শব্দের তাৎপর্য নিশ্চিতভাবে তাহাই হইবে। সুতরাং কোর্আনে রেবা-শব্দের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইহা ব্যতীত, কোর্আন নাজেল হওয়ার সময় ও তাহার পূর্বে আরবী ভাষায় এই রেবা শব্দের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। তখন মহাজন খাতককে

একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা কর্জ দিত এবং প্রতি মাসে তাহার জন্য সুদ আদায় করিয়া নিত। কিন্তু খাতক নির্দিষ্ট সময় মূল টাকা শোধ করিতে না পারিলে, মহাজন তাহার মূলধন ও সুদের অনুপাত বাড়াইয়া নিত ও পরিশোধের মেয়াদ বাড়াইয়া দিত। ধারে কোনও পশু বা অন্য কোনও বস্তু খরিদ করিলেও বিক্রেতা খরিদ্দারের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিত, (জরীর প্রভৃতি)। আরব সমাজের সকলেই ইহাকে রেবা বলিয়া আখ্যাত করিত। সুতরাং নূতন করিয়া ইহার ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকারও হয় নাই—যেমন শূকর মাংসের ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার হয় নাই।

সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবের কুসীদজীবী মহাজন-দিগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে তাহার দারুণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। তখন তাহারা বলাবলি করিতে থাকে—"সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে আর সুদের কারবারে কোনও প্রভেদ নাই। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ করিতেছেন আর সুদকে হারাম করিয়া দিতেছেন"—ইহার অর্থ কি? উভয় যখন সমান, তখন উভয়ের জন্য সমান আদেশ হওয়া উচিত ছিল। পূর্বেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পরস্ব শোষণের হীন মনোবৃত্তির বশবর্তী হইয়া পড়ায়, এই শ্রেণীর লোকগুলি বিবেক-বুদ্ধি বর্জিত হইয়া গিয়াছে। তাই সুদী ব্যবসায়ের ও বৈধ কারবারের পার্থক্য তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না।

সুস্থ মন ও সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই দুই শ্রেণীর কারবারের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই, বরং নীতিগতভাবে ইহা পরস্পরের ঘোর পরিপন্থী। ব্যবসা-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা চায় নিজেদের পণ্য-দ্রব্যের অধিকতর কাটতি। এজন্য জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বর্ধিত হওয়াই তাহাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যতই সচ্ছল হইতে থাকিবে, তাহাদের আর্থিক অভাব যতই দূর হইয়া যাইবে, সুদখোর মহাজনের শাইলকী ব্যবসায়ে ততই বিপর্যয় উপস্থিত হইবে। সে চায় বন্যা আসুক, অনাবৃষ্টিতে দেশের ফসল নষ্ট হইয়া যাউক। একটা ভূমিকম্প, একটা মহামারী, একটা অগ্নিকাণ্ড অথবা এই শ্রেণীর কোনও একটা আপদ-বিপদের জন্য সে সর্বদা অপেক্ষা করিতে থাকে। সংক্ষেপে ব্যবসা বাণিজ্য হইতেছে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দের অভিলাষী, পক্ষান্তরে সুদখোর হইতেছে তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের জন্য লালায়িত। সুতরাং উভয়কে অভিন্ন বলিয়া মনে করার মত অজ্ঞতা আর কিছুই হইতে পারে না।

২২৯। টীকাঃ সুদ ও ছাদকা—"সুদকে আল্লাহ্ يمحق (মহক) করিয়া

দেন"—ইহার অর্থ হ্রাস করা, বরকত বর্জিত করা। ইমাম রাগেব আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় করিয়া দেওয়াও ইহার অর্থ হইতে পারে। ছাদকা বলিতে সকল প্রকার ফরয ও নফল যাকাত খয়রাতকে বুঝাইয়া থাকে।

সুদী কর্জি-কারবারের অবশ্যম্ভাবী কুফল হইতেছে ধনের কেন্দ্রীকরণ। বহু লোককে শোষণ করিয়া কয়েকজন মানুষ ইহাতে জাতীয় ধন-সম্পদের মালিক হইয়া বসে। ফলে তাহারা জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া পড়ে এবং অবশেষে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া এই শ্রেণীর ধনকুবেরদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলার চেষ্টা পাইতে থাকে। সুদের ব্যাপারে ইহুদী জাতি সব চাইতে বেশী কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। প্রধানতঃ ইহারই ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইউরোপে ইহুদী হত্যার নিষ্ঠুর ও ব্যাপক অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের বহুযুগের সঞ্চিত অগাধ ধনভাণ্ডার লুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশেও এই অনাচারের যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। দুইশত বৎসর ধরিয়া, "তেজারতী মহাজনীর" কল্যাণে মহাজনরা যে অগাধ ধন-সম্পদ ও বিপুল জমিদারীর মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন, সে সমস্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ওশর, যাকাত ও বিভিন্ন নফল দান-খয়রাতগুলির মূলনীতি ও চরম আদর্শ হইতেছে ইহার ঠিক বিপরীত—ধনের নিষ্কেন্দ্রীকরণ, ব্যক্তিগত উপার্জনের সাহায্যে জাতীয় ধনের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তুমি বৎসরে একলাখ বা এক কোটি টাকা উপার্জন কর, কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু এই মুনাফার শতকরা ২.৫০ টাকা হিসাবে তোমাকে দান করিতে হইবে বায়তুল-মাল তহবিলে, দুস্থ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য। ইহা ব্যতীত ওশরেরও ব্যবস্থা আছে।

এই ব্যবস্থার ফলে কর্জ ও কর্জদারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং সুদখোর মহাজন আপনা আপনিই ধ্বংস হইয়া যায়। বরকত ও বে-বরকতের অর্থ ইহাই।

২৩০। **টীকাঃ বকেয়া সুদ**—এই হুকুম নাজেল হওয়ার পূর্বে, মহাজনকে সুদ বাবদ যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরত পাওয়ার দাবী করা চলিবে না—২৭৫ আয়াতে ইহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হওয়ার পর, দেনাদারের কাছে মহাজনের সুদ বাবত যে টাকা বাকী থাকিবে, মহাজনকে তাহা পরিত্যাগ

করিতে হইবে। পরবর্তী (২৭৯) আয়াতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সুদখোর তাওবা করিলে সে কেবল মূলধন ফিরাইয়া পাওয়ার অধিকারী হইবে। মুছলমান "অত্যাচারী হইবে না ও অত্যাচারিত হইবে না"—ইহাই হইতেছে মুছলমানের জীবন সাধনার সকল পর্যায়ের মূলনীতি। ইহার বিপরীত, কেহ যদি মুছলমানের উপর অত্যাচার করিতে আসে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করাই হইবে জাতি হিসাবে সকল মুছলমানের কর্তব্য।

২৩১। **টীকাঃ প্রেম ও করুণার আদর্শ**—পূর্বে আইন-কানুনের কথা বলা হইয়াছে, এখানে দেওয়া হইতেছে প্রেমের, দয়ার ও ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা। মূলধন অচিরে বা এক সঙ্গে পরিশোধ করার সঙ্গতি যদি দেনাদারের না থাকে, তাহা হইলে অবকাশ দিতে হইবে তাহার অবস্থা সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি তোমরা মূলধনের দাবীও ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে ইছলামের আদর্শের দিক দিয়া, তাহাই হইবে তোমাদের পক্ষে উত্তম।

---

৩৯ রুকু

২৮২। হে মোমেনগণ! তোমরা যদি আপোষে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য; ধারের কোনও লেন-দেন করিতে চাও, তাহা হইলে তাহা লিখিয়া রাখিও; আর কোনও একজন লেখক যেন তোমাদের উভয়ের পক্ষ হইতে তাহা লিখিয়া দেয়, ন্যায্যভাবে; আর কোনও লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে—(বরং) আল্লাহ্ তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেইরূপে লিখিয়া দেওয়াই তাহার

২৮২ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ص وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج

উচিত; এবং দেনার জন্য দায়ী হইবে যে, সে-ই যেন দলিলের বক্তব্যগুলি বলিয়া দেয়, আর সে যেন নিজের পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলে—সেমতে (উভয় পক্ষের স্বীকৃত) বক্তব্যগুলির কোনও অংশ যেন কম করিয়া না দেয়;—(২৩২) কিন্তু দেনার জন্য দায়ী থাকিবে যে ব্যক্তি, সে যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা দলিলের মজমুন লিখাইয়া দিতে নিজে সমর্থ না হয়, সে অবস্থায় তাহার অলি (কারপরদাজ) লিখাইয়া দিবে ন্যায্যভাবে; আর তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষকে (ঐ দলিলের) সাক্ষী করিয়া রাখিবে, কিন্তু দুইজন পুরুষ যদি না হইয়া ওঠে, তাহা হইলে (সাক্ষী করিয়া নিবে) একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে, নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে—(নারী সাক্ষীদের) একজন ভুলিয়া গেলে অন্যে স্মরণ করাইয়া দিবে; আর সাক্ষী-

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ط
فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا
اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ط
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ
اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ط

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ط وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ط ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ط وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ ص وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ط
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ

দিগকে যখন ডাকা হইবে (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য), কোনও সাক্ষী যেন তাহাতে অস্বীকৃত না হয়; (২৩৩) আর ঋণ ছোট হউক বা বড় হউক, মেয়াদকালের জন্য তাহা তোমরা লিখিয়া রাখিবে; আল্লাহ্‌র হুজুরে ইহা হইতেছে অতি সঙ্গত (ব্যবস্থা), এবং সাক্ষ্যকে সুরক্ষিত করার সুদৃঢ় উপায়, অধিকন্তু ইহা দ্বারা তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক—তবে যদি এমন নগদা-নগদী কারবার হয়—যাহাতে তোমরা হাতে হাতে লেন-দেন করিয়া থাক, তবে সেগুলি না লিখিয়া রাখিলে তোমাদের প্রতি কোনও অপরাধ বর্তিবে না; এবং তোমরা যখন খরিদ-বিক্রয়ের কোনও কাজ কর, তখন (তাহার) সাক্ষী রাখিবে, আর (দেখিও) কোনও লেখককে ও কোনও সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়; কিন্তু যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তাহা হইবে তোমাদের পক্ষে

فسوق بكم ط واتقوا الله ط ويعلمكم الله ط والله بكل شىء عليم ০

অবিচার এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিও; আর (স্মরণ রাখিও যে) তোমাদিগকে (এই সব বিধি-ব্যবস্থা) জানাইয়া দিতেছেন আল্লাহ্; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।

২৮৩। وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة ط فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امانته وليتق الله ربه ط ولا تكتموا الشهادة ط ومن يكتمها فانه اثم قلبه ط والله بما تعملون عليم ০

২৮৩। এবং, তোমরা যদি ছফরে থাক আর কোনও লেখক না পাও, সে অবস্থায় দখলী বন্ধক (হইতেছে বিধেয়); অবশ্য কোনো পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে বিশ্বস্ত মনে করে (আর সেজন্য বন্ধক না নিতে সম্মত হয়) সে অবস্থায়, বিশ্বস্ত মনে করা হইয়াছে যাহাকে, সেই (দেনদার) ব্যক্তি যেন তাহার 'আমানত্' পরিশোধ করিয়া দেয় এবং তাহার প্রভু ও প্রতিপালক যে আল্লাহ্—তাঁহাকে যেন ভয় করিয়া চলে। (২৩৪) আর (হে মুছলমানগণ!) তোমরা কখনও সাক্ষ্য গোপন করিও না; বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে, নিশ্চয় তাহার অন্তর হইতেছে অপরাধী; বস্তুতঃ তোমাদের সমস্ত কাজ সম্বন্ধে আল্লাহ্ হইতেছেন সুবিদিত।

তাফ্‌ছীর

২৩২। **টীকা: কাজ-কারবারের বিধি-ব্যবস্থা**—মানব জীবনের মহান

কর্তব্যগুলির প্রত্যেকটিই মুছলমানের এবাদত। নিশীথ রাত্রের নিভৃত গৃহ-কোণের তাহাজ্জদ যেমন এবাদত, সহস্র কণ্ঠের কোলাহল মুখরিত জেহাদের মুক্ত ময়দানে বীরদর্পে উপস্থিত হওয়াও সেইরূপ এবাদত। উভয়ই তার কর্ম-ক্ষেত্র এবং উভয়ই তার ধর্মক্ষেত্র। জীবন সাধনায় পরাঙমুখ অলস, পরভোজী, এবং মোছলেম জীবনের অভিমান ও অনুভূতি বিবর্জিত সন্ন্যাসীর স্থান ইছলামে নাই। তাই কোর্‌আন আমাদিগকে যেমন নামায রোযার রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়াছে, দেশ শাসনের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা জানাইয়া দিয়াছে, সেইরূপে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কাজ-কারবারের বিধি-ব্যবস্থাগুলিও আমাদের সম্মুখে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

২৩৩। টীকাঃ **দুইজন নারী সাক্ষী**—আয়াতে বলা হইতেছে যে, যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী রাখিতে হইবে। এই পার্থক্যের কারণও আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ নারীজাতি শান্তিপ্রিয়। বাহিরের বৈষয়িক ব্যাপারের সহিত তাহাদের সংস্রব খুব কম থাকে। ফলে লেন-দেনের ব্যাপারের খুঁটিনাটি তাহাদের সকলের স্মরণ না থাকিতে পারে। এই জন্য একজনের স্থলে দুই-জন নারীকে সাক্ষী রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একজন ভুলিয়া গেলে অন্য নারীসাক্ষীটি তাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিবে, ইহাই উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত মামলা মোকদ্দমা ও কোর্ট-কাছারীর অপ্রীতিকর ও অশান্ত পরিবেশ হইতে নারী সমাজকে যত দূরে রাখা যায়, ততই মঙ্গল।

---

৪০ রুকু

২৮৪। আছমানে ও জমিনে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই হইতেছে আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত; বস্তুতঃ অবস্থা এই যে, তোমাদের মনে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর বা গোপন করিয়া রাখ, সে সব সম্বন্ধে আল্লাহ্ তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করিবেন; সেমতে

٢٨٤ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ط والله على كل شىء قدير ٥

যাহাকে ইচ্ছা মাফ করিয়া দিবেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা দণ্ড দান করিবেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৮৫ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ط كل امن بالله وملئكته وكتبه ورسله قف لانفرق بين احد من رسله قف وقالوا سمعنا واطعنا ق غفرانك ربنا واليك المصير ٥

২৮৫। রাছুলের প্রতি তাহার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে যাহা নাজেল করা হইয়াছে, তিনি তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করিয়াছে মোমেনগণ সকলেই ; সকলে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে আল্লাহ্‌তে, তাঁহার ফেরেশতাগণে, তাঁহার কেতাবগুলিতে আর তাহার রাছুলগণে—(তাহারা বলে) — "আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাছুলগণের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে কোনও তারতম্য করি না আমরা", তাহারা আরও বলে : "হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ারদেগার। আমরা শ্রবণ করিলাম (তোমার বাণী) ও মান্য করিলাম (তোমার আদেশ),—তোমার ক্ষমা ভিখারী আমরা হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার, আর আমাদের প্রত্যাবর্তন তো তোমারই পানে।"

২৮৬ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ط لها ما كسبت

২৮৬। আল্লাহ্ কাহারও উপর তাহার সাধ্যের অধিক কর্তব্য অর্পণ করেন না ; যে (সৎ-) কর্ম সে

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن
نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا
تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة
وَاغْفِرْ لَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة
أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ع

সঞ্চয় করিবে, তাহার পুণ্যফল (প্রাপ্য হইবে) তাহারই, পক্ষান্তরে যে (অসৎ-) কর্ম সে অর্জন করিবে—তাহার প্রতিফলও বর্তিবে তাহারই উপর; (মোমেন বান্দারা প্রার্থনা করিয়া আরও বলে): —"হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ারদেগার। যদি ভুলিয়া যাই বা ভুল করিয়া বসি, সেজন্য আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিও না;" "হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরু-ভার অর্পণ করিয়াছিলে, আমাদের উপর সেরূপ ভার অর্পণ করিও না।" "হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার, আমাদের সাধ্যাতীত কর্তব্যভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না।"—"আর ক্ষমা কর আমাদিগকে, ক্ষয় করিয়া দাও আমাদিগের পাপগুলিকে, কৃপা কর আমাদের উপর, তুমিই আমাদের অলি-অভিভাবক, অতএব কাফের কওমের উপর, তুমি আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া দাও।।"

সুরা আল-এমরান ৩

سورة آل عمران ٣

১ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে।

١ الٓمّٓ ۚ

১। আলেফ-লাম-মীম — (১)

٢ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۗ

২। আল্লাহ্! তিনি ব্যতীত আর কেহই নাই আর কিছুই নাই পূজার যোগ্য প্রভু—সদা সজীব তিনি, স্বয়ং-সত্ত (ও) বিশ্ব সত্তার ধারক তিনি। *

٣ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ

৩। তিনি তোমার প্রতি নাজেল করিয়াছেন এই কেতাবকে বার-হাকভাবে, (২) তাহার পূর্ববর্তী কেতাবগুলির তাছ্‌দীককারীরূপে, এবং ইতিপূর্বে নাজেল করিয়া-ছেন—মানবগণের পথ প্রদর্শক হিসাবে—তাওরাত ও ইনজীলকে, আরও নাজেল করিয়াছেন (সঙ্গে সঙ্গে) 'ফোরকান'কে ; (৩)

٤ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ

৪। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে অমান্য করে যাহারা—তাহাদের জন্য (অবধারিত) আছে কঠিন আজাব; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতে-

---

* বাকারা, ২৫৫ আয়াতের তাফ্‌ছীর দ্রষ্টব্য।

ছেন পরাক্রান্ত, প্রতিফল দানের মালেক। (৪)

عَذَابٌ شَدِيدٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৫। নিশ্চয় আল্লাহ্, জমিনের কোনও কিছুই তাঁহার কাছে গোপন থাকিতে পারে না এবং আছমানের কোন কিছুও (গোপন থাকিতে) পারে না।

۵ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

৬। সেই তো তিনি, তোমাদিগকে যিনি গর্ভাশয়ে নিজের ইচ্ছামত আকার দিয়া থাকেন; তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই আর কিছুই নাই পূজার যোগ্য প্রভু— পরাক্রান্ত তিনি, প্রজ্ঞাময় তিনি। (৫)

۶ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৭। সেই তো তিনি, তোমার প্রতি যিনি নাজেল করিয়াছেন এই কেতাব—যাহার কতক আয়াত হইতেছে মোহ্‌কাম, সেগুলি হইতেছে কেতাবের মূলাধার (স্বরূপ);—এবং আর কতকগুলি হইতেছে মোতাশাবেহ্; ফলে যাহাদের অন্তরে আছে অসরলতা, তাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে তাহার মধ্য হইতে মোতাশাবেহ্

۷ هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا

تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ م وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

আয়াতগুলির—বিপর্যয় ঘটাইবার মতলবে এবং (অসঙ্গত) তাৎপর্য বাহির করার উদ্দেশ্যে; অথচ তাহার তাভীল কেহই জানিতে পারে না—আল্লাহ্ ব্যতীত এবং জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিপুণ ব্যক্তিগণ ব্যতীত, তাহারা বলেঃ আমরা ঈমান আনিয়াছি কেতাবে; (মোহ্কাম ও মোতাশাবেহ্) সমস্তই সমাগত হইয়াছে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুর হইতে, বস্তুতঃ সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ব্যতীত আর কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ج إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৮। তাহারা (মোনাজাত করিয়া) বলেঃ হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরগুলিকে কুটিল হইতে দিও না, আর রহমত হউক আমাদের প্রতি তোমার সন্নিধান হইতে, নিশ্চয় তুমি হইতেছ বিপুল দানকারী। (৬)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ع

৯। হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! তুমি যে একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রে সমবেত করিবে, তাহাতে সন্দেহ করার কোনই হেতু নাই; নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনই নিজের ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

তাফ্‌ছীর

১। টীকা ঃ আলেফ-লাম-মীম—কোর্‌আনে মাজীদের ২৯টি সূরার প্রারম্ভে এই শ্রেণীর একটি বা একাধিক বর্ণের উল্লেখ আছে। এই সূরার ৬ আয়াতে কোর্‌আনের আয়াতগুলি সম্বন্ধে মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্‌ শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। তাফ্‌ছীরকারগণের একদল বলিয়াছেন যে, মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির অর্থ আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেহই অবগত হইতে পারে না। সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত حروف مقطعات বা "বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলিকে আয়াতরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাকেও তাঁহারা মোতাশাবেহ্‌ বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে বিশিষ্ট আলেম ও তাফ্‌ছীরকারগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, অন্যপক্ষ মোতাশাবেহ্‌ শব্দের তাৎপর্য গ্রহণে ভুল করিয়াছেন। একটা পূর্ণ-চ্ছেদের প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছে। ৬ আয়াতের তাফ্‌ছীরে এই সব বিষয় নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে শুধু "বিচ্ছিন্ন বর্ণ"গুলি সম্বন্ধে কয়েকটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

আরবী বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরের একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা আছে এবং সেই বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরের একত্র যোজনারও একটা স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, নূন ও ফে-বর্ণ একত্রে ব্যবহৃত হইবে যেসব শব্দে, তাহার সবগুলিতে মৌলিক অর্থ থাকিবে, বাহির হওয়া। যেমন نفد، نفق، نفث، نفر، نفخ، نفح، نفس ইত্যাদি। এইরূপে ফে ও লাম একত্রে ব্যবহৃত হইবে যেসব শব্দে, সে সমস্তের মূল তাৎপর্য হইবে شگافتن বা বিদীর্ণ করা। যেমন فلج فلح فلق ইত্যাদি। এই সব বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার আলোচনা করার পর, ভক্তিভাজন শাহ্‌ অলি-উল্লাহ্‌ ছাহেব এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলি হইতেছে প্রকৃতপক্ষে সূরার নাম বা শিরোনাম। যেমন পুস্তকের নাম বা প্রবন্ধের শিরোনাম হইতে, পুস্তকের বা প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলির আভাস পাওয়া যায়, সূরার শীর্ষ-ভাগে লিখিত হরফগুলি হইতেও সেইরূপে সূরায় বর্ণিত বিষয়-বস্তুগুলিরও একটা সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই গবেষণার জন্য আরবী ভাষায় গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন, শাহ্‌ ছাহেব ইহাও বলিয়া দিয়াছেন এবং পর-বর্তী আলেমদিগের জন্য সে গবেষণার কয়েকটা নমুনারও উল্লেখ করিয়াছেন। (দেখুন—আল্‌-ফাওজুল কাবীর, ৪৬, ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠা)।

এই প্রসঙ্গে শাহ্‌ ছাহেব উপরোক্ত বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলির মৌলিক তাৎপর্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই শ্রেণীর মূল্যবান সূত্রগুলি

ধরিয়া অগ্রসর হওয়ার কোনও চেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হইয়াছে বলিয়া আমি জানিতে পারি নাই।

২। **টীকাঃ বারহাকভাবে**—হক্-শব্দের আভিধানিক অর্থ—কোনও বিষয়ের সহিত অন্য কোনও বিষয়ের সম্পূর্ণ সমঞ্জস হইয়া যাওয়া। ব্যবহারিক তাৎপর্য চতুষ্টয়ের মধ্যে এখানে উহার অর্থ হইবে—

الفعل والقول الواقع بحسب ما يجب و بقدر ما يجب و فى الوقت الذى يجب - .... و يصح إن يراد به الحكم الذى هو بحسب مقتضى الحكمة - راغب

"হেকমত বা প্রজ্ঞার নির্দেশ অনুসারে যে বিষয়টা ঠিক যে প্রকারে, ঠিক যে পরিমাণে এবং ঠিক যে সময়ে সম্পন্ন করা হয়, হক বলিতে সেই কাজ বা সেই কথাকে বুঝাইয়া থাকে।" (রাগেব)।

এখানে হক শব্দের পূর্বে 'বে' থাকায় পূর্বে উহার অনুবাদ করিয়াছি "সত্য সহকারে' বলিয়া। বারহাকভাবে অপেক্ষাকৃত সঙ্গত অনুবাদ। বাংলার মুছলমান সমাজেও ইহার প্রচলন আছে। যেমন—"যাদু বারহাক, কিন্তু করনে-ওয়ালা কাফের"।

৩। **টীকাঃ ফোরকান**—ধাতু, ফরক। ফোরকান অর্থে ফরককারী। কোনও বস্তু বা বিষয় হইতে অন্য কোনও বস্তু বা বিষয়কে পৃথক করিয়া দেয় যাহা, তাহার নাম ফোরকান। এই হিসাবে, সূরা আনফালের ৪১ আয়াতে বদরযুদ্ধের দিনকে "ইয়াওমুল্-ফোরকান" বলা হইয়াছে। মানুষের সুষ্ঠু জ্ঞান ও অনাবিল বিচার-বুদ্ধি, সত্যকে মিথ্যা হইতে বাছাই করিয়া নিতে পারে বলিয়া عقل বা বিবেক-বুদ্ধিকে এই আয়াতে ফোরকান বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। এইরূপে, যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়া দেয় বলিয়া কোনও কোনও আয়াতে কোর্আনকেও ফোরকান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (বাকারা ৫৩, ১৮৫)। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ধারার হিসাবে যেখানে যে ভাবার্থ গ্রহণ করা সঙ্গত, সেখানে তাহাই গ্রহণ করা কর্তব্য। এই হিসাবে আলোচ্য আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্পষ্টতঃ দেখা যাইবে যে; এখানে ফোরকান শব্দ কোর্আন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ, আয়াতের প্রথমভাগে যে কেতাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই কোর্আন। বলা হইতেছে—আল্লাহ্ পূর্বে তাওরাত ও ইনজীল নাজেল করিয়াছিলেন, এবং হযরতের প্রতি এই কেতাব নাজেল করিয়াছেন, আরও নাজেল করিয়াছেন

ফোর্‌কানকে। "এই কেতাব" অর্থে নিশ্চয়ই কোর্‌আন। কারণ হযরতের উপর অন্য কেতাব নাজেল করা হয় নাই। এখন ফোর্‌কান অর্থেও যদি কোর্‌আনকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আয়াতের অনুবাদ দাঁড়াইবে: আল্লাহ্ কোর্‌আন নাজেল করিয়াছেন, তাওরাত, ইনজীল নাজেল করিয়াছেন, আরও নাজেল করিয়াছেন কোর্‌আনকে। এইরূপ অসঙ্গত তাৎপর্য গ্রহণ করা কোনও সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। এই কারণে ইমাম এবন-জরীর তাঁহার তাফ্‌ছীরে উপরোক্ত মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। "এবং আল্লাহ্ ফোরকান নাজেল্ করিলেন"—এই আয়াতাংশের তাফ্‌ছীরে ইমাম ছাহেব বলিতেছেন :

يعنى جل ثنائه بزلكٖ ' انزل الفصل بين الحق و الباطل ' فيما اختلف فيه الاحزاب و اهل الملل فى امر عيسى و غيره -

অর্থাৎ—ঈছা সম্বন্ধে আরবীয় জনসাধারণ ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা যে মতভেদ ঘটাইয়াছে, তাহা ফায়ছালা করার উপকরণ নাজেল করিয়াছেন (৩—১১১)। কোর্‌আনের অন্যত্র এই ফায়ছালা করার উপকরণকে 'মীজান' বা তারাজু বলা হইয়াছে (সূরা ১৭, হাদীদ ২৫)। প্রত্যেক কাজ ও কথার প্রকৃত মূল্য, Value ও বাস্তব স্বরূপ যাচাই করিয়া নেওয়া যাহা দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, তাহাকে বলা হয় মীজান। ইহা মানুষের সুষ্ঠু জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সূরা বাকারার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ইহুদী সমাজ এবং তাহাদের বিশ্বাস ও কার্যকলাপ। এই সূরার প্রধান আলোচ্য হইতেছে, খ্রীষ্টান-সমাজ ও তাহাদের বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি। ইছলাম তাওহীদের শিক্ষা প্রচার করিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের মূল ভিত্তি—যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ প্রভৃতির উপর কঠোর আঘাত হানিয়াছে। এই মতভেদের ফায়ছালা হইতে পারে একমাত্র নিরপেক্ষ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা। তাই বলা হইতেছে—আল্লাহ্ কেতাব নাজেল করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে নাজেল করিয়া দিয়াছেন জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি। ইমাম গাজালী ও মুফতী আবদুহু প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ আলেমগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন (আবদুহু-তাফ্‌ছীরুল কোর্‌আন, ৩—১৬০)।

৪। **টীকা : এন্‌তেকাম, প্রতিফল দান**—কোর্‌আনের তাফ্‌ছীর সম্বন্ধে মুছলমান সমাজ, বিশেষতঃ দীনী এলেমের বাহকগণের অনেকে, দীর্ঘকাল হইতে যে মারাত্মক উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার একটা লজ্জাজনক নজীর হইতেছে, এই আয়াতের এন্‌তেকাম শব্দ ও তাহার প্রচলিত তাৎপর্য।

এন্‌তেকাম শব্দের ধাতুগত অর্থ—ভর্ৎসনা করা, অসন্তুষ্ট হওয়া। ইহারই মাছদার এন্‌তেকাম। অর্থ, مكافات عمل কর্মফল প্রদান করা। প্রতিশোধ গ্রহণ করা বা বদলা নেওয়া ইহার অর্থ হইতে পারে না। বিচারকরা অপরাধীদিগকে তাহাদের অপরাধের তারতম্য অনুসারে দণ্ড দিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতিহিংসা গ্রহণ করার বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লেশমাত্রও থাকে না (কামূছ, ছেহাহ্-জাওহারী, রাগেব প্রমুখ)।

দুঃখের বিষয়, পরবর্তী যুগের ব্যবহারের ফলে, প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থই সাধারণভাবে গৃহীত হইয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী অনুবাদক ও তাফ্‌ছীরকারগণের অনেকেই বিনা বিচারে এই অর্থ চালাইয়া আসিয়াছেন। মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু এন্‌তেকাম শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করার পর বলিতেছেন :

و يستعمل اهل هذا العصر الانتقام بمعنى التشفى بالعقوبة و هو بهذا المعنى محال على الله تعالى-

মর্মার্থ—কিন্তু এই যুগের লোক প্রতিশোধ গ্রহণ করার অর্থে ঐ শব্দের ব্যবহার করিতেছেন, আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে অর্থের প্রয়োগ হইতেই পারে না (আল-মানার, ৩-১৬৬)।

৫। **টীকাঃ খ্রীষ্টানী মতবাদের আলোচনা**—আল্লাহ্ একক, তিনি ব্যতীত "আল্লাহ্" আর কেহই হইতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টানরা বলিতেছেন—আল্লাহ্ তিনটি, যীশু তাহার মধ্যে একজন। ইহা তাঁহাদের জ্ঞান বিকার মাত্র। কারণ একাধিক আল্লাহ্ স্বীকার করা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করারই নামান্তর।

আল্লাহ্ সদা-সজীব। তন্দ্রা, নিদ্রা বা মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের আকীদা অনুসারে ক্রুশে যিশুর মৃত্যু হয়। সুতরাং তিনি আল্লাহ্ হইতে পারেন না।

আল্লাহ্ কাইয়ুম, অর্থাৎ স্বয়ংসত্ত ও সমগ্র বিশ্বসত্তার একমাত্র রক্ষক ও ধারক। যীশু ইহুদীদের হাত হইতে নিজের প্রাণটাও রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং তিনি কোনো মতেই আল্লাহ্ হইতে পারেন না।

খ্রীষ্টান বন্ধুরা স্বীকার করিতেছেন যে, ইনজীল অহি বা আপ্ত বাক্য, সদা-প্রভু তাহা যীশুর প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র কেতাবে থাকে আদেশ নিষেধ ও উপদেশ। এই অহি বা আদেশ যিনি প্রদান করিয়াছেন, তিনি প্রভু, আর তাহার প্রাপক, বাহক ও প্রচারক হইতেছেন, সেই প্রভুর অনুগত ও আজ্ঞাবহ বান্দাহ্। যীশুকে ঈশ্বর বলিলে, বান্দাকে প্রভু বানাইয়া দেওয়া হয়। মানসিক

বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত আর কেহই এরূপ উদ্ভট কথা বলিতে পারে না। ৩ আয়াতে আরও বলা হইতেছে যে, অসৎ কর্মের প্রতিফল প্রত্যেক মানুষকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকরা প্রচার করিতেছেন যে, যীশুখ্রীষ্ট নিজের প্রাণ দিয়া দুনিয়ার সকল মানুষের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই আত্মবলিদানে বিশ্বাস করিলেই মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি হইয়া যাইবে। তাহাদিগকে পাপাচারের কোনও প্রতিফলই ভোগ করিতে হইবে না। ইহাকে পাপাচরণের O.G.L. ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কোনো সত্য ধর্মে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না।

৪ আয়াতে বলা হইতেছে যে, আছমান-জমিনের কোনও কথাই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন থাকিতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের বর্ণনাগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে, নিজের পারিপার্শ্বিক অনেক ব্যাপারই যীশুর অবিদিত ছিল।

যীশুর পিতা ছিলেন, একথা খ্রীষ্টানরা স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি যে, সাধারণ মানব সন্তানের ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জরায়ুজ জীব যে ঈশ্বর হইতে পারে না, ৫ আয়াতে তাহার আভাস দেওয়া হইতেছে। জরায়ুতে ভ্রূণের সঞ্চার সময় হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত যে সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়া তাহাকে দুনিয়ায় উপস্থিত হইতে হয়, তাহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভ্রূণকে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীনে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই নিয়মের নিয়ামক ও এই বিধানের বিধায়ক যিনি, তিনিই আল্লাহ্‌, এবং নিয়ন্ত্রিত জীবটি হইতেছে তাঁহার আজ্ঞাবহ বান্দাহ্‌।

৬। **টীকা ঃ মোহ্‌কাম, মোতাশাবেহ্‌ ও তাভীল**—এই তিনটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তাফ্‌ছীরকারগণের ও কারীদিগের মধ্যে বহু মতভেদ বর্তমান আছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাতা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলি আবার পরস্পর বিপরীত। সুতরাং ফারসী কবিতার ভাষায় বলিতে হইতেছে, از کثرت تعبیر ها خواب من پریشان شد তাবির এত অধিক করা হইয়াছে যে, তাহাতে আমার খওয়াবটাই বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, ইমাম এবন-জরীর, হাফেজ এবন কাছীর প্রমুখ কয়েকজন স্বনামধন্য তাফ্‌ছীরকার ধীর-স্থিরভাবে এবং যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বিষয়টির বিচার আলোচনা করিয়াছেন এবং সঙ্গত তাৎপর্যের সন্ধানও আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন।

মূল বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে মতভেদের মূল কারণ ও

প্রকৃত স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করিতেছি।

হযরত রাছুলে কারীমকে সম্বোধন করিয়া আয়াতে বলা হইতেছে :

(ক) আমরা তোমার প্রতি এই কেতাব, অর্থাৎ কোর্‌আন নাজেল করিয়াছি—

(খ) তাহার (কোর্‌আনের) কতক আয়াত হইতেছে 'মোহ্‌কাম' (এবং) সেইগুলি হইতেছে কোর্‌আনের (মাতা =) মূলাধার স্বরূপ—

(গ) এবং আর কতকগুলি হইতেছে মোতাশাবেহ্‌ (একাধিক অর্থ বাচক) ;

(ঘ) ফলে যাহাদের মনে আছে অসরলতা (অসৎ উদ্দেশ্য) তাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে তাহার মধ্য হইতে (কেবল) মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির —ফেৎনা (সংশয়) সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং আয়াতের অসঙ্গত অর্থ করার জন্য ;

(ঙ) অথচ তাহার (প্রকৃত) তাৎপর্য কেহই জানে না আল্লাহ্‌ ব্যতীত× এবং এলেমে (জ্ঞানে) সুনিপুণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ× (তাহারা) বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি কেতাবে....... ।

মতভেদ ঘটান হইতেছে শেষ অংশের × চিহ্নিত স্থান দুইটির 'অক্‌ফ' বা ছেদ চিহ্ন নিয়া। একদল বলিতেছেন, প্রথম চিহ্নিত স্থানে একটা বিষয় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অক্‌ফের আলামত বা ছেদ চিহ্ন বসিবে এইখানে। তাঁহাদের কথা মতে আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়াইবে—মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির অর্থ আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে।

অন্য দলের মতে ছেদ বসিবে দ্বিতীয়× চিহ্নিত স্থানে। তাঁহাদের মত অনুসারে, আয়াতের অর্থ হইবে—মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির মর্ম আল্লাহ্‌ ব্যতীত এবং জ্ঞানে 'সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিপুণ' ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহ অবগত হইতে পারে না। الراسخون فی العلم পদের অনুবাদ করিয়াছি, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিপুণ ব্যক্তিগণ বলিয়া। রোছুখ শব্দের অর্থ ইহাই। যাহারা নিজের বিবেক-বুদ্ধির ও ন্যায়-নিষ্ঠার সিদ্ধান্তে অটল থাকিতে পারে এবং কোনও অসৎ উদ্দেশ্য যাহাদিগকে সত্য হইতে বিচলিত করিতে না পারে, অধিকন্তু যাহারা বিপুল জ্ঞানের অধিকারী, তাহারাই কেবল এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। অসৎ উদ্দেশ্যে এবং মানুষের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিয়া দেওয়ার মতলবে আয়াতের তাভীল করিতে চায় যাহারা, তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না।

মতভেদ সম্বন্ধে বিচার : মূল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার সময়, আমাদিগকে প্রথমে মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্‌ শব্দ দুইটির এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাভীল শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

এই নির্ণয়ের জন্য সর্বাগ্রে আমাদিগকে সন্ধান করিতে হইবে কোর্আন মাজীদের ব্যবহারের। এই শব্দগুলি কোর্আনের অন্যান্য স্থানে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রমের সঙ্গতি অসঙ্গতি হইবে প্রথম আলোচ্য। তাহার পর যথাক্রমে আসিবে হাদীছের ও আরবী ভাষার ব্যবহারের প্রশ্ন। এই হিসাবে কোর্আনের কয়েকটা ব্যবহারের নজীর নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

(১) সূরা হূদের প্রথম আয়াতে বলা হইতেছে :

الر، كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير -

"এই যে কেতাব (কোর্আন), মোহ্কাম করা হইয়াছে ইহার আয়াত গুলিকে পুনরায় বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে সেগুলিকে, প্রজ্ঞাময় সর্ববেত্তা (আল্লাহ্‌র) তরফ হইতে।

(২) সূরা জোমারে বলা হইতেছে—

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني --

"আল্লাহ্-ই নাজেল করিলেন উৎকৃষ্টতর বাণী (অর্থাৎ) এই কেতাবকে, যাহা হইতেছে (মোতাশাবেহ্ বা পরস্পরে সদৃশ ও পুনঃ পুনঃ বর্ণিত (২৩)।

প্রথম আয়াতে বলা হইতেছে যে, কোর্আনের আয়াতগুলি সমস্তই হইতেছে মোহ্কাম এবং অন্যত্র সেই মোহ্কাম আয়তগুলির তাফ্ছীল এবং বিশদ বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতে সমগ্র কোর্আন মাজীদকেই মোতাশাবেহ্ বলা হইয়াছে। এই আয়াত দুইটি হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, মোহ্কাম ও মোতাশাবেহ্ বলিয়া কোর্আনের আয়াতগুলিকে দুইটি বিভিন্ন ও পরস্পর বিপরীত শ্রেণীতে বিভক্ত করা কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

(৩) সূরা হা-মীম-সিজদার প্রথম আয়াতে বলা হইতেছে—

حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا
لقوم يعلمون --

"করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নাজেল করা হইল এই কেতাব, যাহার আয়াতগুলি বর্ণিত হইয়াছে সুস্পষ্টভাবে, আরবী ভাষায় প্রকাশিত কোর্-আনরূপে, বিদ্বান সমাজের (উপকারের) জন্য"—এই আয়াত হইতে, এবং এই শ্রেণীর আরও বহু আয়াত হইতে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, কোর্আনের আয়াতগুলি, আরবী ভাষায়, সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং

তাহার কতকগুলি আয়াতকে সকল মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অবোধ্য বলিয়া নির্ধারিত করিলে, কোর্‌আনের এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা হইবে। অধিকন্তু আয়াত হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, যাঁহারা জ্ঞানী ও বিদ্বান, তাঁহারা কোর্‌আনের সমস্ত আয়াতের মর্ম অবগত হইতে পারেন। বিদ্বান বলিতে আরবী ভাষার আলেমদিগকে বুঝান হইতেছে এবং এজন্য আয়াতে বিশেষভাবে আরবী ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা এমরানের আলোচ্য আয়াতেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

হাদীছের আলোচনা ঃ—মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্ শব্দের অর্থ বা সংজ্ঞা সম্বন্ধে হযরত রাছুলে কারীমের প্রমুখাৎ কোনও বিবরণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। তবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণিত কতকগুলি হাদীছে এই শব্দ দু'টির অথবা উহার ধাতু হইতে উৎপন্ন অন্যান্য শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। তাহার কয়েকটা নজীর নিম্নে অতি সংক্ষেপে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :

(১) হযরত রাছুলে কারীম কোর্‌আনের বিশেষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন— وهو الذكر الحكيم —(তিরমিজী, দারমী)। ইহার ব্যাখ্যায় মোল্লা মোহাম্মদ তাহের বলিতেছেন—

اى القران حاكم لكم و عليكم ' او هو المحكم الذى لا اختلاف فيه و لا اضطراب -

অর্থাৎ কোর্‌আন হইতেছে তোমাদের জন্য ও তোমাদের উপর হাকেম বা হুকুমদাতা, অথবা কোর্‌আনের আয়াতগুলি হইতেছে মোহ্‌কাম—যাহাতে মতভেদ ঘটানোর বা শক-শোবাহ্ করার কোনও কারণ নাই।

(২) "কোর্‌আনের বিশেষণ সম্বন্ধে ঃ

آمنوا بمتشابهه و اعملوا بمحكمه المتشابه -

"তাহার মোতাশাবেহ্ (বিষয়) গুলির উপর ঈমান রাখিবে এবং তাহার মোহ্‌কামগুলির সাহায্যে উহার অর্থ নির্ণয় করিবে।

(৩) "فالمحكم الله عن ذلك" اى منعه - من احكمته اذ منعته

(৪) "حكم اليتيم كما تحكم ولدك" - اى امنعه من الفساد كما تمنع ولدك -

এই দুইটি নজীর হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হাদীছে حكم ধাতুগত শব্দ, منع বা প্রতিরোধ করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শাসনকর্তাকে হাকেম বলা হয়, কারণ তিনি জালেমের জুলুম প্রতিরুদ্ধ করিয়া দেন।

(৫) যাহার অন্তর ঈমানে সুদৃঢ়, তাহার সম্বন্ধে হাদীছে محكم فى نفسه বিশেষণ ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৬) "من تشبه بقوم فهو منهم" - روى من التفعيل (و) و الافتعال - اى من تشبه بالكفار و الفساق فى اللباس و غيره او بالصلحاء فهو منهم - مختصرا -

অর্থাৎ—বিধর্মী জাতির বা অনাচারী সমাজের লেবাছ-পোশাক ইত্যাদির অনুরূপ লেবাছ-পোশাক ইত্যাদি অবলম্বন করিবে যাহারা....তাহারা সেই জাতির ও সেই সমাজের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(এই পরিচ্ছেদের বিবরণগুলি মরহুম মোল্লা মোহাম্মদ তাহেরের মাজ্‌মাউল বেহার নামক হাদীছের বিখ্যাত অভিধান হইতে গৃহীত)।

আভিধানিক বিচার :—ইমাম রাগেব মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্‌ শব্দ দুইটির তাৎপর্য সম্বন্ধে যে জ্ঞানগর্ভ ও সুসঙ্গত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাকে অনুপম বলিলে, খুব সম্ভব অত্যুক্তি হইবে না। দুঃখের বিষয়, স্থানাভাববশতঃ তাঁহার সেই দীর্ঘ আলোচনার মর্ম পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিলাম না। ইমাম ছাহেব দীর্ঘ বিচার বিশ্লেষণের উপসংহারভাগে আভিধানিক হিসাবে যে তিনটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

(حكم) اصله منع منعا لا صلاح -

"হ-ক-ম মাছদারের মূল অর্থ হইতেছে—কোন কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কাহাকে কোনও বিষয় হইতে নিবারিত রাখা, কোনও অন্যায় হইতে সুরক্ষিত করা।" এই মূল সূত্রটি বর্ণনা করার ও কোরআন মাজীদ হইতে ইহার সমর্থনে বহু নজীর উদ্ধৃত করিয়া দেওয়ার পর, তিনি বলিতেছেন :

و قوله عز و جل "آيات محكمات هن ام الكتاب و أخر متشابهات-
فالمحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ و لا من حيث المعانى -

আলোচ্য আয়াতটির উল্লেখ করার পর ইমাম ছাহেব বলিতেছেন, যে আয়াতগুলিতে শব্দের ও অর্থের কোনো দিক দিয়া কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না, মোহ্‌কাম বলিতে সেই আয়াতগুলিকে বুঝায়।

(شبه) و المتشابه من القرآن ما اشكل تفسيره لمشابهته لغيره ' اما من حيث اللفظ او من حيث المعنى -

শব্দের হিসাবে হউক বা অর্থের হিসাবে হউক, অন্যের সহিত সাদৃশ্য

থাকার জন্য যে সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করা মুশ্‌কিল বোধ হয়, সেই বিষয়গুলি হইতেছে কোর্‌আনের মোতাশাবেহ্।

و حقيقة ذلك ان الايات عند اعتبار بعضها ببعض محكم على الاطلاق و متشابه على الاطلاق ' و محكم من وجه متشابه من وجه الخ -

"এবং ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, আয়াতগুলি পরস্পরের সংস্রবের হিসাবে তিন প্রকার : সম্পূর্ণ মোহ্‌কাম ও সম্পূর্ণ মোতাশাবেহ্, কোনও হিসাবে মোহ্‌কাম এবং কোনও হিসাবে মোতাশাবেহ্ ... ।"

মোটের উপর কথা এই যে, পরবর্তী লেখকরা মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্ বলিয়া কোর্‌আনের আয়াতগুলির যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং মোতাশাবেহ্ আয়াতগুলিকে মানুষের অবোধ্য বলিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, ইমাম রাগেব বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহার যথাবিধি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন।

এবন-জরীরের ব্যাখ্যা—ইমাম এবন-জরীর এই আয়াতের তাফ্‌ছীরে বলিতেছেন :

واما المحكمات فانهن اللواتى قد احكمن بالبيان والتفصيل (الخ (৩-১১৩ "যে আয়াতগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই মোহ্‌কাম।" اما قوله متشابهات فان معناه متشابهات فى التلاوة مختلفات فى المعنى - .

"যেগুলির তেলাওতে বা পঠনে কোনও পার্থক্য নাই, কিন্তু অর্থের দিক দিয়া পরস্পরে পার্থক্য আছে, মোতাশাবেহ্ বলিতে সেইগুলিকে বুঝায় (ঐ, ১১৪)।

এবন-কাছীরের তাফ্‌ছীর—হাফেজ এবন-কাছীর আলোচ্য আয়াতের তাফ্‌ছীরে বলিতেছেন :

يخبر تعالى ان فى القران ايات محكمات هن ام الكتاب اى بينات واضحات الدلالة' لا التباس فيها على احد - ومنه آيات اخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس او بعضهم' فمن ردما اشتبه الى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى' ومن عكس العكس-

"আল্লাহ্ তাআলা জানাইয়া দিতেছেন যে, কোর্‌আনের কতকগুলি আয়াত হইতেছে মোহ্‌কাম, সেগুলি হইতেছে কোর্‌আনের 'মা' (বা মূলাধার স্বরূপ)" —অর্থাৎ সেগুলি বর্ণিত হইয়াছে সুস্পষ্টভাবে এবং তাহার প্রতিপাদ্য গ্রহণ

করিতে কাহাকে কোনও সন্দেহে পড়িতে হয় না। "এবং তাহার অন্য আয়াত-গুলির প্রতিপাদ্য বুঝিতে বহু লোকের বা কতক লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সে অবস্থায় সন্দেহের বিষয়টাকে যে ব্যক্তি মোহ্‌কাম বা সুস্পষ্ট বর্ণনার সহিত খতাইয়া দেখে এবং মোহ্‌কাম আয়াতগুলির তুলাদণ্ডে তাহার সন্দেহের বিষয়গুলির বিচার-মীমাংসা করিয়া নেয়, তাহা হইলে সে হেদায়ত প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ইহার উল্‌টা করিবে যে ব্যক্তি, সে হইয়া যাইবে উল্‌টা-পথের যাত্রী।"

শাফেয়ী ও আহমদের সংজ্ঞা : ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন :

المحكم مالا يحتمل من التاويل الا وجها واحدا ' والمتشابه ما احتمل من التاويل وجو ها -

"একটি মাত্র তাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোনো তাৎপর্যের সম্ভাবনা থাকে না যাহাতে, তাহাই মোহ্‌কাম। পক্ষান্তরে একাধিক তাৎপর্য গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকিতে পারে যে শব্দে ও আয়াতে, সেগুলি হইতেছে—মোতাশাবেহ্‌। (আল্‌-মানার ৩—১৯০)

ইমাম আহমদ-এবন-হাম্বল বলিতেছেন :

المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج الى بيان' و المتشابه ما احتاج الى بيان -

"যে আয়াত বা শব্দগুলি স্বতঃসম্পূর্ণ ও অন্যনিরপেক্ষ, তাহার তাৎপর্য অন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নহে— সেইগুলি হইতেছে মোহ্‌কাম, পক্ষান্তরে যেগুলি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, মোতাশাবেহ্‌ বলিতে তাহাকে বুঝাইতেছে।

কোর্‌আনের, হাদীছের ও অভিধানের প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, পরবর্তী রাবী ও লেখকগণ মোতাশাবেহ্‌ শব্দের যে তাৎপর্য দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাঁহারা বলিতেছেন যে, মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির অর্থ আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেহই জানে না, জানিতে পারে না। তাঁহাদের মত গৃহীত হইলে, কোর্‌আনের অধিকাংশ আয়াত মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। ইহার আলোচনা পরে করা হইবে, এখানে আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, অন্য পক্ষের দলিল-প্রমাণ সম্বন্ধে। কোর্‌আন বলিতে সমগ্র কোর্‌আনকে বুঝাইতেছে। কোর্‌আন আসিয়াছে বিশ্বমানবের হেদায়তের জন্য, তাহার দীন-দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার সুসঙ্গত সমাধান করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পূর্ণতার চরম সীমায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বহুস্থানে কোর্‌আন স্বয়ং এই ঘোষণা প্রচার করিতেছে। এই স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত নীতির ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন যাঁহারা, ন্যায়তঃ প্রমাণের ভার অর্পিত

আছে তাঁহাদের উপর। এ হিসাবে কোনও দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করার দরকার আমাদের ছিল না।

দুঃখের বিষয়, কোর্আন, হাদীছ ও আরবী ভাষার কোনও প্রমাণই তাঁহারা উপস্থিত করেন নাই, অর্থাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন এবন-আব্বাছ ও এবন-মাছউদ নামক দুইজন ছাহাবীর ব্যক্তিগত অভিমতের উপর। প্রথমে এবন-আব্বাছের বা তাঁহার নামকরণে প্রচারিত মত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

রেওয়ায়তগুলির বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না তুলিয়া, আমরা স্বীকার করিয়া নিতেছি যে, "মোতাশাবেহ্ আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ অবগত হইতে পারে না"—এইরূপ অভিমত এবন-আব্বাছ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহার এই উক্তিকে, নিজেদের জ্ঞান-বিবেকের বিরুদ্ধে স্বীকার করিয়া নিতে আল্লাহ্ বা তাঁহার রাছুল কি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন?

কোর্আনের তাফ্ছীর ও তাফ্ছীরের রেওয়ায়তগুলি সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু খোঁজ-খবরও রাখেন, তাঁহারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, প্রায় প্রত্যেক আয়াতের তাফ্ছীরে এবন-আব্বাছের নামকরণে একাধিক রেওয়ায়ত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে সেগুলি পরস্পরের সহিত অসমঞ্জস, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আয়াতের তাফ্ছীর সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার উক্তিগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

(১) "মোতাশাবেহ্ আয়াতগুলির অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে না।"

(২) "নাছেখ আয়াতগুলি হইতেছে মোহ্কাম, এবং তাহার দ্বারা রহিত বা মনছুখ করা হইয়াছে যে আয়াতগুলি, তাহাই হইতেছে মোতাশাবেহ্।" সুতরাং রহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেই আয়াতগুলির হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নিষেধগুলি নিশ্চয় বলবৎ ছিল। অতএব তাহার অর্থও মুছলমান সমাজের অবোধ্য ছিল না। অন্যথায় সেগুলি অনুসারে আমল করা সম্ভব হইত না। ফলতঃ এখানে "মোতাশাবেহ্ অর্থ মনছুখ" বলায়, স্বীকার করিয়া নেওয়া হইতেছে যে, মোতাশাবেহ্ আয়াতের অর্থ সে সময় হযরতের ও মুসলমানদিগের সুবিদিত ছিল।

(৩) তাঁহার দেওয়া তাৎপর্য কোর্আনের ভাষার সঙ্গে খাপ খাইতেছে না দেখিয়া, এবন-আব্বাছ বলিতেছেন—الراسخون فى العلم يقولون। পদের

يقولون শব্দ الراسخون শব্দের পূর্বে বসিবে।" তাঁহার এই মতকে সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া নিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আয়াতের যে তরতীব আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নাজেল হইয়াছিল, তাহাতে ভুল ছিল। আমার বিশ্বাস, এবন-আব্বাছের মত একজন সম্মানাস্পদ ছাহাবী কখনও এরূপ উক্তি করেন নাই।

(৪) "এবন-আব্বাছ বলিতেছেন :

انا من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تاويله —

"যে সব জ্ঞানবান ব্যক্তি মোতাশাবেহ্‌ আয়াতের তাৎপর্য অবগত আছেন—আমি তাঁহাদের একজন।" সুতরাং তাঁহার এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির অর্থ বিজ্ঞ-ব্যক্তিরা অবগত হইতে পারেন।

এবন-মাছউদের উক্তি সম্বন্ধেও এই কথা। অধিকন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতকে বিনা বিচারে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, সূরা 'ফলক' ও সূরা 'নাছ' (কুল আউজো সূরা ২টি) কোরআনের অন্তর্গত নহে বলিয়াও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহা ব্যতীত, এবন-মাছউদও আয়াতের শব্দ ও তরতীবের পরিবর্তন করিয়া কোর্‌আনের لا يعلم تاويله الا الله পদের স্থানে ان تاويله الا عند الله পদ ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ হযরতের সময় হইতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মুছলমান সমবেত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছে যে, রাছুলের উপর যে কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল, এবং প্রথম ও তৃতীয় খলীফার সময় যাহা পুস্তকাকারে একত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাই আজ পর্যন্ত অবিকলভাবে প্রচলিত আছে। তাহার একটি বর্ণের বা শব্দের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয় নাই।

(উপরের সমস্ত রেওয়ায়ত এবন-জরীর, এবন কাছীর ও তাফ্‌ছীর আল-মানার হইতে গৃহীত হইয়াছে।)

ফলাফলের দিক দিয়া বিচার—আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির পরিচয় ও সংখ্যা নির্ণয় সম্বন্ধে। দুঃখের বিষয়, অন্যপক্ষ এ প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এক দলের মত অনুসারে, কোর্‌আন মাজীদের কেবল পাঁচ শত আয়াত মোহ্‌কাম, আর সমস্তই মোতাশাবেহ্‌—অর্থাৎ তাহার অর্থ মানুষের অবোধগম্য। কোর্‌আনের আয়াতগুলির মোট সংখ্যা (কুফীদের বর্ণনা অনুসারে) হইতেছে ৬২৩৭টি। সুতরাং এই মত অনুসারে ৫৭৩৭টি আয়াত মানুষের অবোধগম্য। আবার, এবন-আব্বাছের নামকরণে বর্ণিত একটি রেওয়ায়ত অনুসারে,

এমরানের দুইটি ও বানি ইছ্রাইলের একটি, একুনে এই তিনটি আয়াত বাদে অন্য সমস্ত আয়াত মোতাশাবেহ—এগুলির মানে-মতলব আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে। (কাবীর, জরীর প্রভৃতি)। অথচ এই এবন-আব্বাছ্ কোর্‌আন মাজীদের প্রায় প্রত্যেক আয়াতেরই অর্থ করিয়াছেন।

"তাভীল" শব্দের অর্থ :—আয়াতে বলা হইতেছে যে, মোতাশাবেহ্ আয়াতগুলির তাভিল আল্লাহ্ ব্যতীত ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই অবগত নহে। এই তাভীল শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধেও বিনা কারণে অনেক বাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

"তাভীল" উৎপন্ন হইয়াছে আওলুন ধাতু হইতে। মাওআল শব্দও ইহা হইতে উৎপন্ন। অর্থ—যাহার পানে প্রত্যাবর্তন করা হয়। বস্তুতঃ কোনো বিষয়কে তাহার চরম উদ্দেশ্যের পানে প্রত্যাবর্তিত করাই হইতেছে তাভীল (রাগেব)। হা দীছের একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আমপারার সূরা ফৎহে (=ইজা জাআ সূরায়) হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় তোমার কাছে পৌঁছাইয়া যাইবে যখন, فسبح بحمد ربك واستغفره তখন "তুমি আল্লাহ্‌র মহিমার জয় ঘোষণা করিবে ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে।" বিবি আয়েশা বলিতেছেন :

كان رسول الله صلعم يقول فى ركوعه و سجوده : سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلى—يتاول القران—بخارى : مسلم -

"হযরত রাছুলে কারীম তাঁহার রুকূতে ও সিজদায় উপরোক্ত দোওয়া পাঠ করিতেন—এইরূপে তিনি কোর্‌আনের তাভীল করিতেন, অর্থাৎ তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতেন।" এই হিসাবে আমরা সহজ ভাষায় ইহার অর্থ করিতে পারি—আমালী তাফ্‌ছীর বা বাস্তব তাৎপর্য বলিয়া। সূরা ইউছুফের ১০০ আয়াতে তাভীল শব্দ ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এইরূপে সাহিত্যের হিসাবে, কোন শব্দকে যখন তাহার মূল ধাতুর পানে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, তখন তাভীল শব্দের অর্থ হইবে—বায়ান ও তাফ্‌ছীর বা ব্যাখ্যা। (এবন-কাছীর)। যেমন আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে—মোতাশাবেহ্ আয়াতের তাভীল আল্লাহ্ ব্যতীত ও জ্ঞানবান লোকেরা ব্যতীত আর কেহ অবগত নহে। এখানে উহার অর্থ হইবে ব্যাখ্যা বা তাফ্‌ছীর।

ছেদ বা ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধে বিচার : আয়াতে ছেদ বা ওয়াক্‌ফ ব্যবহারের স্থান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, পূর্বে তাহা বিশদভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, বর্তমানে কোর্‌আন মাজীদে যে সকল ওয়াক্‌ফ বা ছেদ চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বহু পরবর্তী সময়ের আবিষ্কার। সুতরাং তাহাকে কোর্‌আনের অংশ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া কোনো ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে হাফীজ এবন-কাছীর ও ইমাম রাজী প্রমুখ তাফ্‌ছীরকারগণের বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, "মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলির অবগত আছেন এক-মাত্র আল্লাহ্‌ এবং জ্ঞানে সুনিপুণ ব্যক্তিগণ"-পদের পরেই ছেদ চিহ্ন বসিবে। হাফীজ এবন-কাছীর বলিতেছেন :

ومنهم من يقف على قوله و الراسخون فى العلم وتبعهم كثير من المفسرين واهل الوصول' وقالو الخطاب بما لا يفهم بعيد - وقد روى عن ابن عباس انه قال—انا من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تاويله - ابن كثير -

"আলেমদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ছেদ চিহ্ন বসাইতে হইবে 'এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ' পদের পরে" বহু তাফ্‌ছীরকার ও ওছুল শাস্ত্রবিদ্‌ এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মানুষ যাহা বুঝিতে পারিবে না, সেরূপ কথা তাহাদিগকে বলা খুব অসমীচীন। এবন-আব্বাছের উক্তি হইতেও এই মতের সমর্থন হইয়া যাইতেছে।

উপরোক্ত মত সম্বন্ধে ইমাম রাজী বলিতেছেন :

وهذا القول مروى عن عباس ومجاهد والربيع ابن انس واكثر المتكلمين

"মোজাহেদ, রাবী এবন-আব্বাছ, মোহাম্মদ-এবন-জাফর এবং 'কালাম' বা (Scholastic Theology) শাস্ত্রের অধিকাংশ পণ্ডিত, এমন কি এবন-আব্বাছ হইতেও, এইরূপ রেওয়ায়ত করা হইয়াছে (কাবীর ২—৬০২)।" সুতরাং তাফ্‌ছীরকার ও ধর্মদর্শনের বিজ্ঞ আলেমগণ, এমন কি স্বয়ং এবন-আব্বাছ যে এই মতের সমর্থন করিতেছেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে—"যাহাদের অন্তরে কুটিলতা, তাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে কোর্‌আনের আয়াতগুলির মধ্য হইতে মোতাশা-বেহ্‌গুলির—ফেৎনা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এবং তাহার তাভীল করার মতলবে।"

এক শ্রেণীর লেখক, এই আয়াত হইতে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, মোতাশাবেহ্ আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া অন্যায়।

কিন্তু ইহা অন্যায় সিদ্ধান্ত। যাহারা কুটিলমনা, এবং যাহারা মোহ্কাম আয়াতগুলিকে বাদ দিয়া কেবল মোতাশাবেহ্ আয়াতগুলিকে অবলম্বন করিয়া, মুছলমানের ধর্ম জীবনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উদ্রেক করিয়া দিতে চায়, আয়াতে মুছলমানদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। এই সতর্কতা অবলম্বনের দরকার পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। খ্রীষ্টান লেখকগণ দীর্ঘকাল হইতে এই অসাধু পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মোছলেম জাহানকে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পূর্বে ও পরে, এক শ্রেণীর "মোনাফেক-মুছলমান" এই অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া নানা ছন্দেবন্দে ইছলামের বিরুদ্ধে মুছলমানদিগকে বিদ্রোহী বা বীতশ্রদ্ধ করার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং এখনও পাইতেছেন। এই শ্রেণীর ছদ্মবেশী মুছলমানদিগের দুষ্ট প্ররোচনা হইতে কওমকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করার জন্য, প্রথম ও প্রধান দরকার হইতেছে, সর্বত্র ও সকল ভাষায় সুষ্ঠু ও সঙ্গতভাবে কোর্‌আনের অনুবাদ ও তাফ্ছীর প্রচার করার। আল্লাহ্‌র হাজার হাজার শোকর অনধিক একশত বৎসরের অল্প বিস্তর চেষ্টার ফলে, ইতিমধ্যেই দুনিয়ার হাওয়া ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কওমের খাদেমদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজের জনসাধারণকে সমগ্রভাবে সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ করিয়া না তুলিতে পারিলে, আগতপ্রায় তুফানের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এজন্য সর্বপ্রথমে তাহাদের মন ও মস্তিষ্ককে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিতে হইবে; অজ্ঞতার, অন্ধবিশ্বাসের, কুসংস্কারের অভিশাপ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইবে। এজন্য জ্ঞান সাধনার দরকার, এজন্য সৎসাহসের দরকার, বলিষ্ঠ ঈমানের দরকার। যাহাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা হইবে, এই সাধনায় প্রথম পরীক্ষা আসিবে তাহাদেরই মধ্যবর্তিতায়। কিন্তু দমিলে চলিবে না। বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক দিকে অন্ধ-বিশ্বাসগুলির প্রশ্রয় দিয়া, অন্যদিকে সত্যকার ইছলামের সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠার আশা করার ন্যায় আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছুই হইতে পারে না। সৎজ্ঞান ও অসৎ-জ্ঞানের পার্থক্য এখানে। তাই আয়াতের শেষভাগে বলিয়া দেওয়া হইতেছে—সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ব্যতীত আর কেহই সৎজ্ঞান ও সদুপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না।

২ রুকু

১০। নিশ্চয় (সত্য ধর্মকে) অমান্য করিল যাহারা, তাহাদের মাল ও তাহাদের আওলাদ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র (আজাব) হইতে কিছু-মাত্রও রক্ষা করিতে পারিবে না ; বস্তুত: তাহারা হইতেছে জাহান্নামের ইন্ধন—(৭)

١٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ط وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ لا

১১। তাহাদের অবস্থা হইতেছে, ফেরআওনের স্বজনবর্গের ও তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদিগের ন্যায় ; আমাদের আয়াতগুলিকে ঝুটলাইয়া দিয়াছিল তাহারা, সেমতে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়াছিলেন তাহাদের পাপাচারগুলির কারণে ; বস্তুত: আল্লাহ্‌ হইতেছেন দণ্ডদানে কঠিন। (৮)

١١ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ لا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ج فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ط وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ o

১২। (হে রাছুল।) তুমি অমান্যকারী লোকদিগকে বলিয়া দাও : সত্বরই পরাভূত করা হইবে তোমাদিগকে (এই দুনিয়ায়), এবং (পরকালে) তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে জাহান্নামে ; বস্তুতঃ তাহা হইতেছে অতি মন্দ অবস্থানস্থল। (৯)

١٢ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ o

১৩। যে দুইটি দল সম্প্রতি পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল (যুদ্ধের

١٣ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي

ময়দানে), তাহাদের ব্যাপারে একটা নজীর রহিয়াছে তোমাদের জন্য—একদল যুদ্ধ করিতেছিল আল্লাহ্‌র রাহে এবং অন্য দলটি ছিল কাফের, উহাদিগকে দেখিতে ছিল নিজেদের দ্বিগুণ—চাক্ষুষ দর্শনে ; আর অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজের মদদের দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন ; নিশ্চয় এই ব্যাপারে একটা বিশেষ শিক্ষা রহিয়াছে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের জন্য। (১৩)

فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَشَاءُ ط اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِاُولِي الْاَبْصَارِ ○

১৪। নিশ্চয় মানুষের কাছে শোভনীয় হইয়া আছে—স্ত্রীগণের, পুত্রগণের এবং স্তূপে স্তূপে সজ্জিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, এবং সুসজ্জিত অশ্বরাজির, আর পশুপালের ও শস্যক্ষেত্রের মায়া মহব্বত ; এগুলি হইতেছে পার্থিব জীবন-যাপনের উপকরণ, কিন্তু আল্লাহ্‌র

১৪। زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ

اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

কাছে রহিয়াছে পরিণামের মহাকল্যাণ। (১১)

١٥ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ج

১৫। বল : ইহা অপেক্ষাও উত্তম সম্পদের কথা তোমাদিগকে জানাইয়া দিতেছি ; —অন্যায় হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে যাহারা ;তাহাদের জন্য অবধারিত রহিয়াছে তাহাদের পরওয়ারদেগারের হুজুরে জান্নাতের কাননকলাপ, যাহার নিম্নদেশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নদ-নদীমালা, সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী, আরও (অবধারিত রহিয়াছে) পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ, বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে (সমাগত) রেজওয়ান ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন নিজ বান্দাগণের (অবস্থা) সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টিমান, —(১২)

١٦ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ج

১৬। (সেইসব বান্দাহ্), যাহারা বলিয়া থাকে : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। নিশ্চয় ঈমান আনিয়াছি আমরা, সে-মতে আমাদের গোনাহ্‌গুলি মা'ফ করিয়া দাও, এবং জাহান্নামের আজাব হইতে রক্ষা কর আমাদিগকে,—

١٧ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ

১৭। ধৈর্যপরায়ণ তাহারা, সত্যনিষ্ঠ

وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

তাহারা, সদা সুবিনীত তাহারা, সদ্ব্যয়ী তাহারা, আর প্রভাত-কালের ক্ষমা প্রার্থী তাহারা।(১৩)

১৮ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৮। আল্লাহ্ ঘোষণা করেন এবং ফেরেশতারা ও ন্যায়দর্শী বিদ্বান ব্যক্তিগণও ঘোষণা করিয়া থাকে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু বা পূজার্হ আর কেহ নাই;—কেহ ই নাই কিছুই নাই তিনি ব্যতীত মাবুদ হওয়ার যোগ্য, পরাক্রান্ত তিনি, প্রজ্ঞাময় তিনি।

১৯ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

১৯। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ্‌র হুজুরে (গৃহীত) 'দীন' ইছলাম ব্যতীত আর কিছুই নাই; অবস্থা এই যে, কেতাব দেওয়া হইয়াছিল যাহাদিগকে, তাহারা তো নিজে-দের মধ্যে মতভেদ ঘটাইয়াছিল —তাহাদের কাছে 'এলেম' সমাগত হওয়ার পর, আপোষে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। (১৪)

২০। তবু যদি তোমার সঙ্গে হুজ্জত করিতে আসে তাহারা, তাহা হইলে বলিয়া দিও: আমি তো নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি আল্লাহ্‌র হুজুরে এবং আমার তাবেদার মুছলমানগণও (তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে); এবং কেতাব প্রদত্ত হইয়াছিল যাহারা—তাহাদিগকে ও উম্মী-দিগকে জিজ্ঞাসা কর: তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ? সে-মতে তাহারাও যদি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, তবে সুপথ প্রাপ্ত হইল তাহারা, কিন্তু তাহারা যদি বিমুখী হইয়া যায়, সে অবস্থায় (আল্লাহ্‌র পায়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতীত আর কোনও দায়িত্ব নাই তোমার উপর; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হইতেছেন বান্দাদিগের সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টিমান।

٢٠ فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ع

তাফ্‌ছীর

৭। **টীকা: কোর্‌আনের সতর্কবাণী**—ইছলাম আল্লাহ্‌র প্রবর্তিত একমাত্র সত্য ধর্ম। অর্থবলে ও বাহুবলে তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না। এইরূপ অন্যায় চেষ্টায় লিপ্ত হইয়া আরবের পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টান সমাজ নিজদিগকে সর্বনাশগ্রস্ত না করুক, ইহাই এই সতর্ক-বাণীর উদ্দেশ্য। আয়াতে আরও জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহাদের এই চেষ্টা কিছুমাত্র সফলতাও লাভ করিতে পারিবে না। দুনিয়ার এই বিফলতা ছাড়াও পরকালের দণ্ড তো আছেই।

৮। **টীকা: ফেরআওনের জনগণের ন্যায়**—ফেরআওনের স্বজন-বর্গের এবং তাহার পূর্ববর্তী সত্য-বিরোধী সমাজগুলির পরিণাম কি হইয়াছিল,

ইহুদী ও খ্রীষ্টান সমাজের তাহা বিশেষভাবে জানা ছিল। মক্কার কোরেশও হযরত ইবরাহীমের বংশধর। নমরূদ ও শাদ্দাদের ইতিবৃত্ত তাহাদেরও জানা থাকার কথা। অতীতের এই সত্যগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ এই সতর্কবাণীর সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের প্রশ্রয় দিলে, তাহাদিগকেও অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে।

৯। **টীকা ঃ সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী**— আরবের ইহুদীরা ধূর্ত ও ধনশালী এবং লোকবলে ও ক্ষাত্রশক্তিতে প্রবল। খ্রীষ্টানদের সংখ্যা কম হইলেও, রোমান সাম্রাজ্যের সহায়তালাভের আশায়, তাহাদের দর্পদম্ভ চরমে পৌঁছিয়া যায়। ফলে এই সতর্কবাণীকে তাহারা পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। তাই অতঃপর স্পষ্টতর ভাষায় তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে—অনতিবিলম্বে তোমরা মুছলমানের হাতে পরাভূত হইয়া যাইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর মাত্র আট বৎসর সময়ের মধ্যে, সমগ্র আরব দেশের সমস্ত কাফেরী শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। আরবের সমস্ত পৌত্তলিক গোত্র ইছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়াছিল এবং মহিমান্বিত খলিফাগণের পতাকাতলে সমবেত হইয়া, বিশ্ব বিজয়ের অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কোর্‌আনের অন্যতম প্রধান মো'জেজা, এবং সত্য কথা বলিতে কি, সমগ্র কোর্‌আনই ইছলামের মো'জেজা।

১০। **টীকা ঃ একটা সাম্প্রতিক নজীর**—মক্কার কোরেশ ও মদীনার মুছলমান, এই দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে। বহু উদ্যোগ-আয়োজনের পর, কোরেশের এক হাজার যোদ্ধা সকল প্রকার রণসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া চড়াও হইয়া আসে, এবং মুছলমানের দলে ছিলেন মাত্র ৩১৩ জন মোজাহেদ—নিঃসম্বল ও কার্যতঃ নিরস্ত্র গাজী। কিন্তু তবুও এই মোকাবেলায় কোরেশদিগকে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। এই নজীরের উল্লেখ করিয়া কাফের সমাজগুলিকে বুঝান হইতেছে যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি বিফল হওয়ার কোনও কারণ নাই। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তোমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছ। তাই আয়াতের উপসংহারে বলা হইতেছে যে, এই ব্যাপারে চক্ষুষ্মান লোকদিগের জন্য বিশেষ শিখিবার ও বুঝিবার বিষয় আছে। এখানে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, বদরের যুদ্ধের পূর্বেও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া কোরেশদিগকে সাবধান-সতর্ক করা হইয়াছিল (সূরা কামার, শেষ রুকূ)। বদরের যুদ্ধ সম্বন্ধে আনফালের পাঁচ ও ছয় রুকূতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১১। টীকা ঃ পার্থিব জীবনের বাসনাবস্তু—পার্থিব জীবনের কতক-গুলি বাসনাবস্তুর উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে যে, এই বস্তুগুলি হইতেছে পার্থিব জীবন যাপনের উপকরণ। এগুলির মায়া-মহব্বত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু দুনিয়ার এই জীবন ছাড়া আখেরাতের একটা জীবনও আছে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখেরাতের জীবন শাশ্বত। দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্পদ, আনন্দ-উল্লাস পরকালের জীবনের তুলনায় অতি নগণ্য। পক্ষান্তরে পরকালের জীবনের দুঃখ-দুর্ভোগ, বেদনা ও সন্তাপ এই জীবনের তুলনায় অত্যন্ত গুরুতর। সুতরাং পার্থিব জীবনের বাসনাবস্তুগুলি যেন, পরবর্তী জীবন সাধনার উপাদান-উপকরণগুলিকে কোনো প্রকারে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে না পারে, সে সম্বন্ধে মোছলেম সাধককে সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। অন্যথায় "মনের বাসনাকে খোদা বানাইয়া লওয়া" হইবে (ফোরকান, ৪৩)।

এখানে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। পাঠক দেখিয়াছেন, ১১ ও ১২ আয়াতে, কাফেরদিগের পরাজিত হওয়ার এবং সেই প্রসঙ্গে বদর যুদ্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পরেই ১৩ আয়াতে কতকগুলি বাসনাবস্তু সম্বন্ধে মানুষের মায়া-মোহের কথা বলা হইতেছে। আমার মতে, যেহেতু জেহাদের সবচাইতে বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এই বাসনাবস্তুগুলি, সেইজন্য জেহাদ প্রসঙ্গের উপসংহারে সেগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা তাওবার ২৪ আয়াতে এই প্রকার বাসনাবস্তুর উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলা হইতেছে—"এই সব (বাসনাবস্তু) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ অপেক্ষা, তাঁহার রাছুল অপেক্ষা ও আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহা হইলে অপেক্ষা করিয়া থাক—আল্লাহ্‌র ফরমান না আসা পর্যন্ত ; বস্তুতঃ ফাছেক কওমকে আল্লাহ্ সুপথে পরিচালিত করেন না।" এই আয়াত হইতে উপরোক্ত অভিমতের সমর্থন হইয়া যাইতেছে। এই জেহাদকেই আয়াতে দুনিয়া ও আখেরাতের 'মহাকল্যাণ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২। টীকা ঃ রেজওয়ান—জান্নাতের ও তাহার নিয়ামতগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে সূরা বাকারার ২২ টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। অভিধান হিসাবে রেজওয়ান শব্দের অর্থ হইতেছে, رضا كثير বা বিপুল সন্তোষ। সূরা তাওবার ৭২ আয়াতে, জান্নাতের নিয়ামতগুলির বর্ণনা করার পর বলা হইতেছে ঃ

و رضوان من الله اكبر' ذلك هو الفوز العظيم -

"এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সমাগত যে রেজওয়ান, তাহাই হইতেছে সর্বপ্রধান

(নিয়ামত)। ইহাই হইতেছে মহান সফলতা।" হযরত রাছুলে কারীম বলিয়াছেন—মোমেন বান্দারা জান্নাতে যেসব নিয়ামত লাভ করিবেন, রেজওয়ান হইতেছে তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (বোখারী, মোছলেম, সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ)। মালেক তাহার বান্দাদিগকে মানুষরূপে পয়দা করিয়াছেন কতকগুলি কর্তব্য পালনের জন্য। বান্দাহ্ সেই কর্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে বলিয়া আল্লাহ্ তাহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিবেন, ইহা অপেক্ষা মানব জীবনের সফলতা আর কি হইতে পারে?

১৩। টীকা: **মোমেনের পাঁচটি লক্ষণ**—এই আয়াতে মোছলেম জীবনের পাঁচটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইতেছে:

(১) **ছাবেরীন**—ছাবের শব্দের বহুবচন। ছাবের অর্থ; যে ছবর করে। ইহার সাধারণ অর্থ—বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা ও হা-হুতাশ না করা। যুদ্ধে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা ও ভীরুতা প্রকাশ না করা, ইহাকে বলা হয় বীরত্ব; বিপরীত শব্দ কাপুরুষতা। (রাগেব)। মুফ্তী আবদুহ বলিতেছেন—যে সাধনাজাত মনোবৃত্তি দ্বারা মানুষ দুর্বহ বিষয়কে বহন করিতে সমর্থ হয়, সত্যের জন্য আগত বিপদ-আপদকে সন্তুষ্ট মনে বহন করা সম্ভব হয়, মনের সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেই মানসিক বৃত্তির উপর।

(২) **ছাদেকীন**—এক বচনে ছাদেক। মানুষের কথা যখন যুগপৎভাবে তাহার অন্তরের ও কথিত বিষয়ের বাস্তব অবস্থার সহিত সমঞ্জস হয়, তখন তাহাকে সত্য বলা হয়। মোনাফেকরা হযরতকে বলিয়াছিল—আপনি আল্লাহ্‌র রাছুল। হযরত যে আল্লাহ্‌র রাছুল, ইহা খুবই সত্য। কিন্তু যেহেতু তাহারা নিজেদের মনে ইহাতে বিশ্বাস করিত না, সেই জন্য এ ক্ষেত্রে মোনাফেকদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে, (সূরা মোনাফেকুন)। এইরূপে একজন পীরভক্ত মুছলমান প্রকাশ করিল যে, তাহার হিন্দুস্থানে অবস্থিত পীর কা'বা শরীফে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিয়া থাকেন। বক্তা ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত। কিন্তু যেহেতু ইহা বাস্তব অবস্থার বিপরীত, সেই জন্য তাহার কথা সত্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। "এই সূত্রটি অতীতের ন্যায়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য।" (রাগেব)। যে বিষয়কে বর্তমানে কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তাহা সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাহা হইতে বিরত না হওয়া—ইহা হইতেছে কাজ সম্বন্ধে সত্যতা। এক কথায়, সত্য ভাষী, সত্যকর্মী ও সম্পূর্ণভাবে সত্যাশ্রয়ী হয় যে ব্যক্তি, সেই হইতেছে ছাদেক্।

(৩) **কানেতীন**—কুনূত অর্থে বিনীত হওয়া ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা।

কোর্‌আনে উভয় অর্থে উহার ব্যবহার হইয়াছে।

(৪) মোস্তাগফেরীন—ধাতু গ-ফ-র। ইহার সাধারণ অর্থ হইতেছে—
الغفر اللباس ما يصونه عن الدنس' ومنه قيل اغفر ثوبك فى با
لوعاء واصبغ ثوبك فانه اغفر للوسخ - والغفران والمغفرة من الله هو
ان يصون العبد من ان يمسه العذاب -

অর্থাৎ, ''কোনো বস্তুকে এমনভাবে ঢাকিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহা ময়লা হইতে সুরক্ষিত হইয়া থাকে।'' ইহার সাহিত্যিক ব্যবহারের নজীর দেওয়ার পর রাগেব বলিয়াছেন ''এবং আল্লাহ্‌র মাগফেরাত অর্থ, তিনি যেন বান্দাকে আজাবের সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করেন।'' এইরূপ প্রার্থনাকারীদের কথা এখানে বলা হইতেছে। ময়লা-আবর্জনা বলিতে এখানে সকল প্রকারের অন্যায় কাজ ও পাপাচারকে বুঝাইতেছে।

১৪। টীকা ঃ ইছলাম—ইছলাম শব্দের ধাতুগত অর্থ—শান্তি, নিরাপত্তা (ছালামত), বশীভূত হওয়া, আত্মসমর্পণ। বস্তুতঃ এগুলি হইতেছে একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ভেদ। আল্লাহ্ নিজের কেতাবের মাধ্যমে ও নিজের নবী ও রাছুলগণের মারফতে যে সব ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন, সেগুলি সমস্তই ইছলাম পদবাচ্য। সেগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর, কোর্‌আনের মাধ্যমে ও মোহাম্মদ মোস্তফার মারফতে যে বিশ্বধর্মের প্রবর্তন হইয়াছে, এখন একমাত্র তাহারই নাম ইছলাম।

দীন অর্থে—কর্মফল বা ধর্মপদ্ধতি। ইছলাম হইতেছে সেই পদ্ধতির নাম। যেহেতু একমাত্র এই ধর্মপদ্ধতির দ্বারা দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং যেহেতু ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণের শিক্ষা বিশ্বমানবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, সেই জন্য এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হইয়াছে ইছলাম।

আয়াতে বলা হইতেছে যে, এই ইছলামই হইতেছে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একমাত্র সত্যধর্ম। বিভিন্ন ধর্মের সহিত ইছলামের তুলনা করিয়া দেখিলে এই দাবীর সত্যতা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। 'হিন্দু ধর্ম'—কথার বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নাই। মায়াবাদ ও চরম নাস্তিকতা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অদ্বৈতবাদ, জীব ও জড়জগতের প্রত্যেক বস্তুতে ঈশ্বরত্বের আরোপ, এবং ঘোর পৌত্তলিকতা ও জঘন্য তান্ত্রিক সাধনা পর্যন্ত সমস্তই হিন্দু ধর্ম। গৌতম বুদ্ধের নামকরণে দীর্ঘকাল হইতে যে সব শিক্ষা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহার সবচাইতে বড় কথা হইতেছে,

পরিনির্বাণবাদ। ইহার একদিকে আছে হিন্দু ধর্মের জন্মান্তরবাদ, অন্যদিকে আছে মানব জীবনের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণার অনুভূতি। সুতরাং এই অভিশাপ হইতে চিরদিনের তরে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষকে যত সত্বর সম্ভব Self-annihilation বা আত্মবিনাশের চেষ্টা করিতে হইবে, এবং ইহাই হইতেছে চরম ধর্ম সাধনা। এজন্য সংসারের সমস্ত কর্তব্য বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাসী হওয়াই মহত্তম আদর্শ। এই সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ হইতেছে অধিকন্তু। সুতরাং আল্লাহ্র দেওয়া মানব ধর্ম ও প্রাকৃতিক ধর্ম ইহা কখনই হইতে পারে না।

ইহুদীরা চিরদিনের "শক্তগ্রীব" জাতি। তাহাদের মূল ধর্মপুস্তক বহু পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ছহীফাগুলি তাহাদের পণ্ডিত-পুরোহিতগণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হইয়া আছে। হযরত ঈছা আসিয়াছিলেন সেই বিকারের সংস্কার করার জন্য। কিন্তু এই পুরোহিতের দল, বিদেশী রাজশক্তির সাহায্যে, (নিজেদের জ্ঞান বিশ্বাসমতে), তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং বস্তুতঃ 'মূছায়ী ধর্ম' বলিয়া কোন ধর্মের অস্তিত্ব নাই।

খ্রীষ্টান সমাজ হযরত ঈছার বা যীশুখ্রীষ্টের অনুসরণ করার দাবীদার। কিন্তু তাহাদের প্রবর্তিত ত্রিত্ববাদ ও পৌত্তলিকতা, যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাবা আদম কোন্ কালে দুইটা গমের রুটি খাইয়া অপরাধী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই পাপ, রক্তের মধ্য দিয়া সমস্ত মানব বা বানি আদমের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া চলিয়াছে। তাই সদাপ্রভু প্রেমবশতঃ নিজের ঔরসজাত পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে কোরবানী করিয়া, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিয়াছেন। অতএব মানুষ যত পাপ করুক না কেন, যীশুর কোরবানীতে বিশ্বাস করিলেই, তাহার নাজাত হইয়া যাইবে, অন্যথায় তাহার সমস্ত পুণ্যকর্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বিচারের দিক দিয়া এই কথা। কিন্তু বিচার পরিত্যাগ করিয়া হুজ্জত বা হঠতর্ক করিতে আসিবে যাহারা, মুছলমান তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নিষ্ঠার সহিত সত্যের প্রচার করিতে থাকিবে। ইছলাম দুনিয়ার বুকে নিজের স্থান নিজেই করিয়া নিবে। দুঃখের বিষয়, মুছলমান সমাজ সর্বাপেক্ষা অধিক অবহেলা করিতেছে এই প্রচার সম্বন্ধেই।

৩ রুকু

٢١ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ لا وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٥

২১। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে অমান্য করে যাহারা, এবং নবীদিগকে নাহক নিহত করে যাহারা, এবং ন্যায় বিচারের নির্দেশদাতাদিগকে হত্যা করে যাহারা, তাহাদিগকে তুমি (হে রাছুল!) পীড়াদায়ক আজাবের সংবাদ জানাইয়া দাও।

٢٢ أُولٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ ٥

২২। এই যে লোকগুলি, ইহাদের কর্মগুলি সমস্তই ব্যর্থ বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে। (উভয়) দুনিয়াতে ও আখেরাতে, বস্তুতঃ কেহই নাই তাহাদের সাহায্যকারী (১৫)

٢٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى

২৩। (হে রাছুল!) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই সেই লোকগুলির (আচরণের) প্রতি, কেতাবের একটা অংশ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে যাহারা—তাহাদিগকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ্‌র কেতাবের প্রতি, যেন সেই আল্লাহ্‌র কেতাব, তাহাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া

...য়, তৎপর তাহাদের মধ্যকার একটা দল ফিরিয়া দাঁড়ায়, এবং বস্তুতঃ তাহারা হইতেছে মোনুকের। (১৬)

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۝

২৪। ইহার কারণ এই যে, তাহারা বলিয়া থাকে: গণিত কয়েকটা দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, বস্তুতঃ তাহাদের চিরাচরিত মিথ্যা রচনাগুলিই তাহাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়া রাখিয়াছে।

٢٤ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

২৫। কিন্তু কিরূপ ঘটিবে সেদিনের —সেই সন্দেহাতীত দিনের অবস্থা, যেদিন আমরা সমবেত করিব তাহাদের সকলকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের অর্জিত কর্মের ফলাফল প্রাপ্ত হইবে পুরাপুরিভাবে, আর অত্যাচারিত হইবে না তাহারা ?

٢٥ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

২৬। বল: হে সকল সাম্রাজ্যের অধিকারী আল্লাহ্! যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর তুমি ও যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব কাড়িয়া লও তুমি, এবং যাহাকে ইচ্ছা

٢٦ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن

সম্মানিত কর তুমি ও যাহাকে ইচ্ছা অবমানিত কর তুমি; তোমারই হস্তগত হইয়া আছে সকল মঙ্গল; নিশ্চয় তুমি হইতেছ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ
تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ
الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

২৭। দিনের অবসানকালে রাত্রিকে উপস্থিত কর তুমি আর রাত্রের অবসানে দিনকে উপস্থিত করিয়া দেও তুমি, এবং মৃত (জাতি) হইতে জীবন্ত (জাতি)-কে আবির্ভূত কর তুমি আর জীবন্ত হইতে মৃতকে বহিষ্কৃত কর তুমি—এবং যাহাকে ইচ্ছা বে-হিসাব উপজীবিকা দান করিতে পার তুমি। (১৭)

٢٧ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ
وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز
وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

২৮। সাবধান! মোছলেম সমাজ যেন মুছলমানদিগকে ব্যতীত—কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। আর এই (অন্যায়) কাজ করিবে যে ব্যক্তি, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র

٢٨ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ
دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ

يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ٥

জিম্মাদারী কিছুমাত্রও রহিল না —তবে তাহাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, এবং তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন ; বস্তুতঃ তোমাদের শেষ আশ্রয়-স্থল হইতেছে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে। (১৮)

٢٩ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

২৯। বল : নিজেদের ভাবগুলি তোমরা গোপন কর বা প্রকাশ কর, (আল্লাহ্‌র পক্ষে উভয়ই সমান), সে সমস্তই তিনি অবগত থাকেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

٣٠ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا صلے ج

৩০। (ভাবিয়া দেখ) সেই দিনের কথা, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই মওজুদ পাইবে নিজের কৃত সৎকাজগুলিকে, আর নিজের

কৃত মন্দকাজগুলিকে; সে কামনা করিবে—হায়, তাহার ও তাহার কর্ম (ফল)-গুলির মধ্যে যদি দূর-দূরান্তরের ব্যবধান ঘটিয়া যাইত। (১৯) আর(দেখ,) আল্লাহ্ নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বান্দার প্রতি পরম স্নেহ-পরায়ণ।

وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۠

তাফ্‌ছীর

১৫। **টীকা ঃ ব্যর্থ-বিড়ম্বনা**—আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে অমান্য করে যাহারা এবং তাহাকে বিলুপ্ত করার আশায় তাঁহার কেতাবের বাহক নবীদিগকে ও তাহার প্রচারক আলেমদিগকে হত্যা করে যাহারা—বলিয়া প্রধানতঃ ইহুদী সমাজকে বুঝাইতেছে। পূর্ব হইতে প্রধানতঃ তাহাদের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে, অধিকন্তু ইতিহাসে ও তাহাদের স্বীকৃত ধর্মশাস্ত্রেও তাহাদের এই সব অনাচারের যথেষ্ট প্রমাণ মওজুদ আছে।

২০ আয়াতে তাহাদের এই অনাচারের কথা বর্ণনা করার পর ২১ আয়াতে বলা হইতেছে যে, তাহাদের এই কাজগুলি উভয় জগতে "হাবৃত" হইয়া গিয়াছে। হাবৃতুন—শব্দের মূল অর্থ—যে উদ্দেশ্যে যে কাজ করা হইল, তাহা তো পণ্ড হইয়া গেলই, অধিকন্তু সে জন্য উল্টা বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। মূলের এই ব্যবহারের উদাহরণ—যেমন একটা গরু একখানি সবুজ শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করিল। ইহাতে তাহার শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য কিছুমাত্র উন্নত হইল না, বরং গরুটা পেটের রোগে মরমর হইয়া পড়িল। (কামূছ, রাগেব, জওহারী প্রমুখ)। এই ভাবটা প্রকাশ করার জন্য আমি অনুবাদে 'ব্যর্থ-বিড়ম্বনা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

১৬। **টীকা ঃ ইহুদীদের আল্লাহ্‌র কেতাবকে অমান্য করা**—এই আয়াতের তাফ্‌ছীরে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। তাফ্‌ছীরকাররা রেওয়ায়ত করিতেছেন : ইহুদী সমাজের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে। এই অপরাধের শাস্তি সম্বন্ধে

ইহুদী সমাজে ঘোরতর বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া যায়। একদল বলিতে লাগিল, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অপরাধীদিগকে পাথরাইয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। অন্য দল বলিতে লাগিল, তাহা হইতে পারে না—মোসির ব্যবস্থায় এরূপ কোনও নির্দেশ নাই।

অবশেষে উভয় দল এই বিবাদ মীমাংসার জন্য হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইল। হযরত তাহাদিগকে বলিলেন: তোমরা যে পুস্তককে আল্লাহ্‌র কেতাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাক, তাহার ব্যবস্থা অনুসারে তোমাদের মীমাংসা করিয়া নেওয়া উচিত। সে মতে পণ্ডিতেরা তাওরাত আনিলেন এবং তাহার দণ্ডবিধিগুলি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। জেনাকারকে রজম্ করার অর্থাৎ পাথরাইয়া মারিয়া ফেলার আদেশ যে আয়াতগুলিতে ছিল, পাঠক তাহা বাদ দিয়া গেলেন। স্বনামখ্যাত ছাহাবী আবদুল্লাহ্ এবন-ছালাম (ভূতপূর্ব ইহুদী পণ্ডিত) দূরে বসিয়া ছিলেন। তিনি এই পুকুরচুরির ব্যাপারটা ধরাইয়া দিলেন। তখন ইহুদীদের একদল এই পরাজয়ের ফলে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ন হইল এবং তাওরাতের ব্যবস্থা মান্য করিতে অস্বীকার করিল। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (দোর্‌রে মনছুর, এবন-জরীর প্রভৃতি)।

ঘটনার প্রসঙ্গ বাদ দিলেও কোর্‌আনের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আয়াতে বর্ণিত "আল্লাহ্‌র কেতাব"—বলিতে ইহুদীদের স্বীকৃত আল্লাহ্‌র কেতাব অর্থাৎ তাওরাতকেই বুঝাইতেছে। ইমাম এবন জরীর যুক্তি-প্রমাণ দিয়া এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। ইমাম রাজী ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—ইহাই অধিকাংশ তাফ্‌ছীরকারের অভিমত।

কোনও ধর্মসমাজ পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে যাহা হয়, ইহুদী সমাজের পণ্ডিত-পুরোহিতদের অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। তাহারাও অসমসাহসিকতার সহিত প্রচার করিত—আমাদের কোনও দণ্ড নাই, থাকিলেও অতি সামান্য। ২৩ আয়াতে সেই অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৭। টীকা: **ইছলামের মৌলিক আকিদা**—এই আয়াতগুলি নাজেল হইয়াছিল হিজরতের পরে, ইছলামের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার সময়। সমগ্র আরবদেশ তখন মদীনার বিরুদ্ধে দলবদ্ধভাবে উত্থান করিয়াছে। মক্কায় অবস্থিত অবশিষ্ট মুসলমানদিগের অবস্থা তখন ক্রমশঃ শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে মুছলমানের অন্তরে আশার আলোক যোগাইয়াছিল—তাওহীদের যে অক্ষয় অব্যয় আকীদা, আয়াতে বর্ণিত প্রার্থনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র রাজ্যাধিপ হইতেছেন আল্লাহ্‌। কোন ব্যক্তি বা জাতিকে রাজ্য-রাজত্ব প্রদান করার অথবা কোনও ব্যক্তি বা জাতির হাত হইতে রাজত্ব কাড়িয়া নেওয়ার একমাত্র মালেক হইতেছেন তিনি। মানুষকে সম্মানিত বা অবমানিত করার সম্পূর্ণ শক্তি একমাত্র তাঁহারই অধিকারভুক্ত। কিন্তু মুছলমানের প্রভু-পরওয়ারদেগার স্বেচ্ছাচারী নহেন। তিনি যেমন ইচ্ছাময়, তেমনি ন্যায়বান ও মঙ্গলময়। রাজত্ব প্রদান বা প্রতিহরণ সমাধিত হয় তাঁহার এই ন্যায় বিচার অনুসারে। বিপন্ন মুছলমানের মর্মবেদনার একটা অস্পষ্ট আভাসও এই মোনাজাতের মধ্যবর্তিতায় মালেকের দরগায় নিবেদিত হইতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই মোনাজাত তিনি মুছলমান বান্দাকে নিশ্চয়ই শিখাইয়া দিতেছেন। ফলতঃ এই আকীদা বা বিশ্বাসের মধ্যেই একটা আশ্বাসের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—আলোক আসিতেছে, জীবন আসিতেছে।

এই আশারই স্পষ্টতর আভাস দেওয়া হইতেছে আয়াতের শেষ অংশে। মৃত হইতে জীবন্তকে বাহির করার উদাহরণ কুদরতের বিশাল কারখানার সর্বত্র ও সর্বক্ষণ বিদ্যমান। যেমন, বীজ হইতে বৃক্ষ শিশুর উদ্‌গম, বীর্য হইতে মানব শিশুর উদ্‌ভব এবং প্রাণহীন ডিম্ব হইতে জীবন্ত ও সক্রিয় পক্ষী শিশুর আবির্ভাব। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার হিসাবে এবং সৃষ্টির মহত্তম উদ্দেশ্যের দিক দিয়া, এখানে উহার অর্থ হইবে—প্রাণহীণ জাতির মধ্যে নূতন জীবন স্পন্দনের সঞ্চার। এই ব্যবহারের নজীর কোর্‌আনে অনেক আছে।

১৮। **টীকা ঃ কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ**—এই নিষেধাজ্ঞায় কোনো জড়তা নাই, জটিলতা নাই। আরও কয়েকটা আয়াতে এই শ্রেণীর নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছে (এবন-কাছীর দেখুন)। আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, যদি কোনও মুছলমান কাফেরদিগকে অলিভাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ সংস্রব থাকিবে না। 'মূলের হিসাবে অলি শব্দের অর্থ হইতেছে, কোনও কার্যভার প্রদত্ত ব্যক্তি।' ভাবার্থের হিসাবে বন্ধু, অভিভাবক, কারপরদাজ প্রভৃতিকেও অলি বলা হয়, যেমন নাবালকের অলি, মছজিদের মোতাঅল্লী। আয়াতের অর্থ এই যে, কোনও মুছলমান কোনও কাফেরকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, জাতি বা ধর্মসংক্রান্ত কোনও কার্যভার তাহার উপর ন্যস্ত করিবে না। কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়াতে এই মর্মের কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে।

এই নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পর আয়াতে বলা হইতেছে إلا أن تتقوا منهم تقاة।

এই আয়াতে استثناء منقطع ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ হইবে—কিন্তু তোমরা তাহাদের অনিষ্ট সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিবে। "তাহাদিগের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকিবে, মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় লইবে, কাফেরের সঙ্গে তাহার মতমতো কথা বলিবে"—গোমরাহ্ ফেরকা বিশেষের অনুসরণে, এরূপ কোনও বে-ঈমানীর প্রশ্রয় ইছলাম ধর্মের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে-না।

এখানে সবচাইতে বড় বিভ্রাট ঘটান হইয়াছে, তাক্ওয়া শব্দের অনুবাদে। ইহার অর্থ, কোনো অন্যায় অনিষ্ট হইতে নিজেকে রক্ষা করা। ভয় করার ভাব ইহাতে নাই। কাফেরদের ভয়ে বিহ্বল হইয়া তাহাদের সঙ্গে সহযোগ করা, অথবা তাহাদিগকে নিজেদের কার্যাধ্যক্ষ বা অলি অছিরূপে গ্রহণ করা, কিংবা সত্য গোপন করিয়া তাহাদের ধর্ম মতের সমর্থন করিয়া যাওয়ার অনুমতি কোর্আনে নাই, হাদীছে নাই এবং ইসলামের ইতিহাসেও এই বে-ঈমানীর কোনো নজীর নাই।

মোমেনের বিশেষণ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলিয়াছেন— لم يخش الا الله তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও ভয় করে না (তাওবা, ১৮)। এই সূরার ১৭৪ আয়াতে বলা হইতেছে— فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين "অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, এবং ভয় করিও একমাত্র আমাকে, যদি তোমরা সত্যকার মোমেন হইয়া থাক।" অর্থাৎ কাফেরদের ভয়ে কর্তব্যকে ত্যাগ করা মোমেনের কাজ নহে। এই আয়াতের উপসংহার ভাগ এবং পরবর্তী ২৮ ও ২৯ আয়াত পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, মনের কথা গোপন করার মহাপাপের বিরুদ্ধে এই রুকূর আয়াতগুলিতে মুছলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমর্থন করা হয় নাই।

---

৪ রুকূ

٣١ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩১। বল: তোমরা যদি আল্লাহ্কে মহব্বত করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার অনুসরণ করিয়া চল —আল্লাহ্ তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন এবং তোমাদের পাপগুলি মা'ফ করিয়া দিবেন; বস্তুত: আল্লাহ্ হইতেছেন পরম ক্ষমাশীল, কৃপানিধান। (১৯)

৩২। বল : তোমরা আজ্ঞাবহ হইবে আল্লাহ্‌র এবং আজ্ঞাবহ হইবে এই রাছুলের। তৎপর তাহারা যদি বিমুখী হইয়া যায়, সে অবস্থায় (তাহাদের জানা উচিত যে,) কাফেরদিগকে আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না। (২০)

৩২ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৩। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন আদমকে ও নূহকে এবং ইবরাহীমের পরিজনবর্গকে, এবং এমরানের পরিজনবর্গকে, সারা জাহানের উপর (নবুয়তের জন্য)—

৩৩ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ لا

৩৪। পরস্পর পরস্পরের আওলাদ ইহারা ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ হইতেছেন সর্বজ্ঞাতা। (২১)

৩৪ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ج

৩৫। (সেই সময়ের কথা), যখন এমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল : প্রভু হে। নিজের গর্ভস্থ সন্তানটিকে আমি উৎসর্গ করিয়াছি তোমার জন্য—সংসার মুক্তভাবে, সেমতে (এই নজরকে) তুমি আমার পক্ষ হইতে কবুল কর। নিশ্চয় তুমিই তো হইতেছ (সকলের প্রার্থনা) কবুলকারী, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (২২)

৩৫ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩৬। অতঃপর সে সন্তানটিকে প্রসব করিল যখন, তখন বলিল :

৩৬ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ

وَضَعَتْهَا أُنْثٰى ط وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى ج وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ○

প্রভু হে! আমি তো কন্যা প্রসব করিয়াছি ; অথচ সে যে কি প্রসব করিয়াছে আল্লাহ্ তো তাহা সকলের অপেক্ষা অধিক অবগত আছেন ; অথচ পুরুষ তো নারীর সমতুল্য নহে—এবং আমি তাহার নাম রাখিয়াছি মরিয়ম, আর তাহাকে ও তাহার সন্ততিবর্গকে সমর্পণ করিতেছি তোমার শরণে, অভিশপ্ত শয়তানের (প্রভাব) হইতে। (২৩)

٣٧ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا لا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ج كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ لا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ط قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا ط قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৭। সেমতে সেই 'নজর'কে তাহার পরওয়ারদেগার কবুল করিলেন উত্তমরূপে আর তাহার উৎকর্ষ সাধন করিলেন সুসঙ্গতভাবে, এবং তাহার অভিভাবক করিয়া দিলেন জাকারিয়াকে ; যখন জাকারিয়া মরিয়মের হুজরায় প্রবেশ করিতেন, সেখানে পাইতেন বিশেষ প্রকারের রেজ্‌ক, তখন জাকারিয়া বলেন—হে মরিয়ম! এ-সব তুমি প্রাপ্ত হও কোথা হইতে ? মরিয়ম (উত্তরে) বলেন—এ সমস্ত (প্রাপ্ত হই) আল্লাহ্‌র হুজুর হইতে ; নিশ্চয় তিনি যাহাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রেজ্‌ক দান করিয়া থাকেন।(২৪)

٣٨ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ج
قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ
لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ
سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ○

৩৮। সেই সময় জাকারিয়া তাহার প্রভুর হুজুরে দোওয়া করিয়া বলিল : প্রভু হে। আমাকে নিজ সন্নিধান হইতে সৎ-বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমিই তো হইতেছ দোওয়া কবুল করার একমাত্র মালেক। (২৫)

٣٩ فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ لا اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا
وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৩৯। ইহার পর, (একদা) জাকারিয়া মেহরাবে দাঁড়াইয়া 'নামায' পড়িতেছে—এমন সময় ফেরেশ্‌তারা তাহাকে ডাকিয়া বলিল : হে জাকারিয়া। আল্লাহ্ তোমাকে একটা পুত্রের খোশ-খবর দিতেছেন—যাহার নাম হইবে ইয়াহ্‌ইয়া —তিনি হইবেন আল্লাহ্‌র এক কলেমার তাছ্‌দিককারী, জনসমাজের একজন প্রধান, মহাসংযমী এবং সাধুসজ্জনদিগের মধ্যকার একজন নবী। (২৬)

٤٠ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ
وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ
عَاقِرٌ ط قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

৪০। জাকারিয়া বলিল : হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার সন্তান হইবে কেমন করিয়া! অবস্থা এই যে, আমি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি, আর আমার স্ত্রী হইতেছেন বন্ধ্যা; আল্লাহ্ বলিলেন —এই অবস্থাতেই, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

৪১। জাকারিয়া বলিল: হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার জন্য একটা নিদর্শন (অবধারিত) করিয়া দাও। আল্লাহ্ বলিলেন: তোমার (জন্য) এই নিদর্শন হইতেছে যে, তুমি তিন "দিবা-রাত্র" ইশারা ব্যতীত লোকজনের সহিত কথা বলিবে না, আর নিজ পরওয়ারদেগারকে স্মরণ করিবে বহুলভাবে এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাকিবে সকালে ও সন্ধ্যায়। (২৭)

٤١ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيٓ ءَايَةً ۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ع

তাফ্ছীর

১৯। টীকা: আল্লাহ্‌র মহব্বত—নাজরানের খ্রীষ্টান পাদ্রী-পুরোহিতদিগের সহিত হযরতের নানা বিষয়ের বিচার আলোচনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে খ্রীষ্টান সমাজের একটি ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

ইহুদী সমাজের ন্যায় তাহারাও বলিয়া থাকে—"আমরা হইতেছি আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁহার বন্ধু হাবীব (দোস্ত) (বাকারা, ১৬৫)। যে প্রেম করে, যাহার প্রেম করে, সাধারণতঃ তাহাকে যথাক্রমে হাবীব ও মাহবুব বলা হয়। কিন্তু আরবী অভিধান অনুসারে, অবস্থাভেদে প্রত্যেকেই হাবীব ও মাহবুব পদবাচ্য। ইহার একটা অতি সূক্ষ্ম ও অতি সুন্দর রহস্য আছে।

আয়াতে বলা হইতেছে, যদি তোমরা সত্যকারভাবে আল্লাহ্‌কে প্রেম করিয়া থাক, তাহা হইলে রাছুলের তাবেদারী কর, ফলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রেম করিবেন। এই শব্দগুলির মধ্যে দুইটি উপদেশ নিহিত আছে।

অন্তরের একটা গভীর উপলব্ধির নাম প্রেম। প্রেমাস্পদের সন্তোষ বা রেজওয়ান লাভ করাতেই ইহার পরম সিদ্ধি। মৌখিক হৈ-হল্লার বা দৈহিক নর্তন-কুর্দনের দ্বারা এই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। বরং এইসবের ফলে একটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ারই স্বষ্টি হইয়া যায়। এখানে আল্লাহ্‌র প্রেমের কথা বলা হইতেছে। সুতরাং তাহার সন্তোষ-সাধনার যে উপায় এবং তাঁহার অসন্তোষ

হইতে রক্ষা পাওয়ার যে নিয়ম-পদ্ধতি—প্রেমপ্রার্থী সাধককে সেইগুলি অবলম্বন করিতে হইবে।

হাফেজ এবন-কাছীর বলিতেছেন—

هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية فانه كاذب فى دعواه فى نفس الامر الخ -

"এই আয়াত ফায়ছালা করিয়া দিতেছে যে, যাহারা মুখে আল্লাহ্‌র প্রেমের দাবী করে অথচ মোহাম্মদী তারীকার উপর তাহার আমল না থাকে, সে মিথ্যাবাদী" —(তাফ্‌ছীর)। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধকে অমান্য করিয়া এবং মোহাম্মদের শিক্ষা ও তরীকাকে বর্জন করিয়া, প্রেম সাধনার যেসব পদ্ধতি, পতন-যুগের অজ্ঞ ও অসাধু লোকদিগের দ্বারা প্রচলিত করা হইয়াছে, তাহাকে একটা শয়তানী উপদ্রব ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

আয়াতটা খ্রীষ্টানদের প্রসঙ্গে বর্ণিত হইলেও, ওছুলের সাধারণ নিয়ম অনুসারে ইহার হুকুম আম এবং মোছলেম সমাজের প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ প্রধানতঃ মুছলমানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কোর্‌আনে এই শ্রেণীর প্রসঙ্গ-গুলির অবতারণা করা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌র প্রেম হইতেছে আজালী আবাদী, অর্থাৎ শাশ্বত ও চিরন্তন। মানুষ নিজের কুকর্মের দ্বারা তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া নেয় মাত্র। এই মানসিকতার পরিবর্তন করিয়া নিলে সে আল্লাহ্‌র প্রেমভাগী, অর্থাৎ তাঁহার আশীর্বাদভাজন হইতে পারিবে।

২০। **টীকা ঃ রাছুলের ফরমাঁবরদারী**—কোর্‌আন মাজীদে যেসব নীতির ও আদেশ-নিষেধের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলিলে আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী করা হইত এবং আনুষঙ্গিকভাবে রাছুলের ফরমাঁবরদারী করা হইত কিন্তু সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে "এবং রাছুলের ফরমাঁবরদারী কর"—পদ যোগ করার কোনও দরকার ছিল না। প্রকৃত অবস্থা এই যে, রাছুলে কারীম তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন—আল্লাহ্‌র প্রদত্ত অহি অনুসারে (নাজ্‌ম, ৩-৪)। রাছুলের এইসব আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনার নাম হাদীছ। এই হাদীছের এন্‌কার করা আর রাছুলের এন্‌কার করা ও কোরআনের এন্‌কার করা একই কথা।

২১। **টীকা ঃ নবুয়তের বাহক-গোষ্ঠী**—নবুয়তের গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য যেসব মহামানব আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন, ধর্মের হিসাবে তাঁহারা সকলেই একই গোত্রের অন্তর্গত। পক্ষান্তরে বাস্তব অবস্থার দিক দিয়া

বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, এ যাবৎ যেসব নবী ও রাছুলের সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই মূলতঃ একই গোত্র-গোষ্ঠী হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। গৌতম বুদ্ধের প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠিতে পারে না। কারণ, নবী ও রাছুল কেবল তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা অহি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহারই মধ্যবর্তিতায় মানব সাধারণকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তদের বিশ্বাস ও বর্ণনা অনুসারে যতটা জানা যাইতেছে তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন না। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাকে আল্লাহ্‌র নবী বা রাছুল বলিয়া গ্রহণ করা কখনই সঙ্গত হইবে না। অবশ্য তাঁহার Race বা গোত্র সম্বন্ধেও বলার কথা আছে।

৩২ আয়াতে বর্ণনা ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে নবুয়তের বাহকগণকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। হযরত নূহ পর্যন্ত প্রথম স্তর শেষ হইয়া যাইতেছে। মানব সমাজের শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া যাইতেছে দ্বিতীয় পর্যায়ের নবুয়ত। হযরত ইবরাহীম এই পর্যায়ের প্রধান পুরুষ। হযরত মূসার (ও তাঁহার অনুসারী নবিগণের) সঙ্গে সঙ্গে এই পর্যায়ের অবসান হইয়া যাইতেছে। বানি-ইসরাইল জাতিকে গোলামীর অভিশাপ হইতে মুক্ত করা এবং তাহাদের মধ্যে Law বা শরিয়তের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই স্তরের প্রধান সাধনা। এইখানে হযরত মূসার রাছুল জীবনের পূর্ণ সফলতা। সূরা বাকারায় তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পরে আসিতেছে ইবরাহীম-গোত্রের দ্বিতীয় শাখার নবুয়তের কর্মতৎপরতার বৃত্তান্ত—হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈছার নবী জীবনের ইতিহাস। আল-এমরান সূরার প্রধান আলোচ্য হইতেছে ইহাই। এখানে আসিয়া সাময়িক বা আঞ্চলিক নবুয়তের অবসান হইয়া যাইতেছে, এবং এখান হইতে সূচনা আরম্ভ হইয়া যাইতেছে, সমাগতপ্রায় ভাবী বিশ্বনবীর ও বিশ্বধর্মের সুস্পষ্ট ভূমিকা। হযরত ঈছার প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার পরেই আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাইব। ("এমরান"—সম্বন্ধে পরবর্তী টীকা দেখুন)

২২। টীকা ঃ এমরানের স্ত্রী—"এমরান" কে, এবং এমরামের "স্ত্রী" বলিয়া কি বুঝাইতেছে—ইহা নিয়া আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক তাফ্ছীরকারগণের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা সকলে

স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া নিয়াছেন যে, হযরত মূছার পিতার নাম ছিল এমরান। মাওলানা মোহাম্মাদ আলী ছাহেব তাঁহার উর্দু তাফ্‌ছীরে বলিয়াছেন :

یہ امر تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت موسی کے والد کا نام عمران تھا......بہت سے مفسرین نے یہ خیال کیاہے حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا - مگر اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں' گو اس کے خلاف بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں -

"ইহা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরত মূছার পিতার নাম ছিল এমরান.......তাফ্‌ছীরকারগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, বিবি মরিয়মের পিতার নামও এমরান ছিল। কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, যদিও ইহার বিরুদ্ধেও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই (১—২৯২)।

তাফ্‌ছীরকারগণের মতামতের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। এখানে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, মাওলানা ছাহেব তাঁহার দাবীর পোষকে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই ঐতিহাসিক প্রমাণের বিচার করা সম্ভবপর হইতেছে না। বাইবেলে মোসির পিতা-মাতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে বটে। কিন্তু, প্রথমতঃ বাইবেলের কোনো বর্ণনাকে 'ঐতিহাসিক প্রমাণ' বলিয়া উল্লেখ করিলে অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

এই প্রামাণ্যতা-অপ্রামাণ্যতার কথা বাদ দিলেও দেখা যাইবে যে, গণনা পুস্তকে মূছার জনকের নাম দেওয়া হইয়াছে 'অম্রম'—অম্রম ও এমরানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। গণনা পুস্তক, ১ অধ্যায়ের প্রথমে বলা হইতেছে—"আর লেবীয় কুলের এক পুরুষ গিয়া এক লেবীয় কন্যাকে বিবাহ করিলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন।" ইহার পর হযরত মূছার শৈশবকালে প্রাথমিক ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে মূছার পিতা-মাতার নাম উল্লেখ করা হইতেছে না।

ইহার পর মূছা বড় হইলেন, কিব্‌তীকে মারিয়া ফেলিলেন, প্রাণভয়ে মাদইয়ান দেশে গমন করিলেন, বিবাহ করিলেন ও দীর্ঘকাল শ্বশুর বাড়ী অবস্থান করিলেন, নবুয়ত লাভ করিলেন—কিন্তু কোনও স্থানে মূছার পিতা-মাতার পরিচয় দেওয়া হইতেছে না। ইহার পরও অনেক সময় কাটিয়া গেল। মূছা নবুয়ত লাভ করিলেন, ফেরআওনের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র বাণী পৌছাইয়া দিলেন, মিসরবাসীর উপর একের পর এক

করিয়া আছমানী গজব নাজেল হইতে লাগিল। এই সমস্তের পর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে : "আর অম্রম আপন পিসী যোকেবদকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য হারোনকে ও মোসিকে প্রসব করিলেন (৬—২০)।" এই উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হযরত মূছার পিতার নাম অম্রম, এমরান নহে। এই বর্ণনা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, মূছার পিতা বিবাহ করিয়াছিলেন নিজের ফুফুকে। অথচ আমরা যতটা জানি, ইহুদী সমাজে "maternal and paternal aunt" বা খালা ও ফুফুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ (Every Biblica, Marriage)। কিন্তু According to the Septuagint and the Juwish traditions, Jochebed was cousin, not aunt to Amram. অর্থাৎ ইহুদীদের ধর্মপুস্তক ও রেওয়াত-গুলির সিদ্ধান্ত অনুসারে, যোকেবদ ছিলেন অম্রমের জ্ঞাতি-ভগ্নী, ফুফু নহে। (Scott কৃত বাইবেলের টীকা)। সুতরাং বাইবেলের বর্ণনাকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিসাবে কোনো মতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

হযরত মূছার পিতার নাম এমরান, সুতরাং দুনিয়ায় কস্মিনকালে আর কাহারও নাম এমরান হইতে পারে না, এই দাবীটাও যুক্তির হিসাবে ও বাস্তব সত্যের হিসাবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অম্রম عمرم নাম বিশিষ্ট অন্য লোকের সন্ধান বাইবেলেও পাওয়া যাইতেছে (ইজ্‌র—১০,৩৪)। নবম শতাব্দীতেও ইহুদীদের মধ্যে এই নামের প্রচলন ছিল। এই সময় অম্রম নামের এক-জন বিশিষ্ট গোত্রপতি ও গ্রন্থকারের আবির্ভাবও তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল (Ency Bri, Amram)। এক জাকারিয়া নামের দশজন লোকের সন্ধান শুধু বাইবেলের বর্ণনায় পাওয়া যায় (Biblica)। এই নামের হযরত ঈছার সময় পর্যন্ত, ইহুদী সমাজে যে কিরূপ বহুল প্রচার ছিল, খ্রীষ্টানদের বাইবেল হইতেও তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ হযরত মূছার পিতার নাম অম্রম ছিল বলিয়া দুনিয়ার আর কাহারও ঐ নাম হইতে পারে না, এরূপ ধারণা করা অন্যায়।

আয়াতে বর্ণিত امرات عمران পদের অর্থ—এমরানের স্ত্রী। 'এমরান গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোক' বলিয়া উহার অনুবাদ করার কোনও সঙ্গতি নাই, এবং কোনও দরকারও নাই।

امراة (ইম্‌রাআত) শব্দের অর্থ, স্ত্রী বা স্ত্রীলোক। কিন্তু যখন সম্বন্ধ পদে, কোনো ব্যক্তির ইম্‌রাআত বলিয়া উহার উল্লেখ করা হইবে, তখন নিশ্চিতভাবে উহার অর্থ হইবে 'স্ত্রী'। কোরআন মাজীদে (কম বেশী)

২০টি স্থানে এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থানে উহার অর্থ করা হইয়াছে, স্ত্রী বলিয়া। যেমন—(١) امراة العزيز (٢) امراة لوط (٣) امراة نوح (٤) امراة فرعون (٥) امراته حمالة الحطب (٦) وامراتی عاقر (٧) والذی اشتراه من مصر لامراته এই সকল স্থানে অনুবাদ করা হইয়াছে, আজীজের স্ত্রী, লুতের স্ত্রী, নূহের স্ত্রী, ফেরআওনের স্ত্রী, আবু লাহাবের স্ত্রী বলিয়া। বলা বাহুল্য, এই পদগুলির "জনৈক স্ত্রীলোক" বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে না। কোর্‌আন মাজীদের এই চিরাচরিত ব্যবহার অনুসারে আমি এখানেও আনুবাদ করিয়াছি "এমরানের স্ত্রী" বলিয়া। সূরা তাহরীমের ১২ আয়াত এই অনুবাদের সম্পূর্ণ অনুকূল।

সূরা মরিয়মের ২৭ ও ২৮ আয়াতে বলা হইতেছে: বিবি মরিয়ম হযরত ঈছাকে আপন কওমের কাছে লইয়া গেলেন, তখন তাঁহার কওমের লোকেরা বিবি মরিয়মকে يا اخت هارون বা "হে হারুনের ভগ্নী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রী ও প্রচারকরা এই ব্যাপার নিয়া একেবারে তুলকালাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কোর্‌আনের বর্ণনায় একটা গুরুতর ঐতিহাসিক বিভ্রাট ধরা পড়িয়াছে—বিবি মরিয়মকে হারুনের ভগ্নী বলা হইয়াছে। এইরূপ প্রচারণার দ্বারা মুছলমানদের মনে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিলেই, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়া যায়। প্রচারনার এই অতীব আগ্রহের ফলে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না যে, আলোচ্য অংশটা, ইহুদীদিগের উক্তি হিসাবে উদ্ধৃত হইতেছে। মরিয়ম হযরত ঈছাকে সঙ্গে লইয়া নিজের আত্মীয়-স্বজনের নিকট উপস্থিত হইলে, সেই আত্মীয়রাই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ সম্বোধন করিয়াছিলেন। আমার মতে, এত কষ্ট স্বীকার না করিয়া পাদ্রী সাহেবেরা ঘোষণা করিয়া দিতে পারিতেন—যীশুখ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, কোর্‌আনে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। (দেখ, ৯—৩০)। "বস্তুতঃ মছীহ্ হইতেছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। ইহা কোর্‌আনেও আছে।" কিন্তু তাহার পূর্বে বলা হইয়াছে قالت النصارى অর্থাৎ নাছারারা বলিয়া থাকে যে, মছীহ্ হইতেছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। সূরা মরিয়মের ২৭—২৮ আয়াতেও এইভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, মরিয়মের কওমের লোকেরাই তাঁহাকে হারুনের ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

প্রকৃত কথা এই যে, হারুনের ভগ্নী বলিতে এখানে হারুন-গোত্রের কন্যা বুঝাইতেছে। পাদ্রী সাহেবরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। লুক

১—৫ পদে ইলীশাবেৎকে হারুনের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই ব্যবহারের উপর নির্ভর করিয়া। বাইবেলের আধুনিক অনুবাদকরা তাই হারুনের কন্যা না বলিয়া "হারুন বংশীয়া" বলিয়া অনুবাদ করিতেছেন। কোর্‌আনে, হাদীছে ও সাধারণ আরবী সাহিত্যে এই প্রকার ব্যবহারের ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। সম্ভব হইলে সূরা মরিয়মের তাফ্‌ছীরে তাহার উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করিব।

২৩। টীকা ঃ মরিয়মের জন্ম—মরিয়ম-জননী নজর মানিয়াছিলেন, নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে, সংসার হইতে মুক্ত করিয়া, আল্লাহ্‌র কাজে উৎসর্গ করিবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র মরজী, জন্মিল কন্যা সন্তান। নজর তিনি পুরা করিবেনই। কিন্তু কন্যা-সন্তানকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধর্মমন্দিরে রাখিবার বাধাবিঘ্ন অনেক, পুরোহিতদের শুচি-অশুচির ব্যবস্থা ইহার উপর অধিকন্তু।

এই সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে অধিক ভাবনা-চিন্তা না করিয়া তিনি আল্লাহ্‌র দরগাহে মোনাজাত করিয়া বলিলেন ঃ 'আমার কন্যা হইয়াছে' এবং পুরুষ তো কন্যার মত নহে। অর্থাৎ পুরুষ ত নারীর ন্যায় নানা রকম স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় বাধাবিঘ্নের অধীন নহে। আল্লাহ্‌ জানাইলেন—তুমি যে কন্যা-সন্তান প্রসব করিবে, তোমার পূর্ব হইতে আল্লাহ্‌ তাহা বিশেষভাবে অবগত আছেন। সুতরাং তোমার জানা উচিত যে, যিনি তোমাকে কন্যা সন্তান দিয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমস্ত সুব্যবস্থাও তিনি পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন।

উপসংহারে মরিয়ম-জননী প্রার্থনার ভাবে বলিতেছেন—মরিয়মকে ও তাহার সন্তান-সন্ততিকে আমি তোমার হেফাজতে সমর্পণ করিতেছি—শয়তান যেন তাহাদের উপর কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। পরবর্তী (৩৬) আয়াতের প্রথমভাগে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, মরিয়ম-জননীর এই নজর আল্লাহ্‌ কবুল করিয়াছিলেন এবং তাহার লালন-পালনের জন্য নিজের তরফ হইতে হযরত জাকারিয়াকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অভিভাবকরূপে।

মরিয়ম-জননীর এই প্রার্থনাকে উপলক্ষ করিয়া হাদীছ ও তাফ্‌ছীরের কেতাবে একটা রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। রেওয়ায়তটির সারমর্ম এই যে, আদম বংশে কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আসিয়া তাহার গায়ে খোঁচা মারে। ইহারই ফলে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। কিন্তু মরিয়ম-জননীর দোওয়ার বরকতে আল্লাহ্‌

মরিয়মকে ও তাঁহার আওলাদকে এই খোঁচা বা স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। শয়তান অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা মরিয়মের সম্মুখে একটা পর্দা লটকাইয়া দেন। নিরুপায় হইয়া শয়তান অবশেষে সেই পর্দার উপর একটা খোঁচা মারিয়া চলিয়া যায়। এই طعن বা খোঁচা মারার সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

هذ الطعن من الشيطان هو ابتد التسلط -

অর্থাৎ, শয়তানের এই যে খোঁচা, ইহাই হইতেছে মানুষের উপর শয়তানের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সূচনা (ফাৎহুল-বারী ৬—৩০০)। বোখারী-মোছলেমেও এই রেওয়ায়তটা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি এই রেওয়ায়তের বর্ণিত বিবরণটাকে হযরত রাছুলে কারীমের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। না হওয়ার কারণগুলি নিম্নে আরজ করিতেছি—

(১) আয়াতে দেখা যাইতেছে যে, মরিয়ম-জননী দোওয়া করিতেছেন কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার ও তাহার নামকরণ শেষ হইয়া যাওয়ার পর। আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি, আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি, দুইটাই মাজী্র ছিগা বা অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, মরিয়মের জন্ম, এমন কি তাঁহার নামকরণ পর্ব পর্যন্ত, সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে মরিয়ম-জননীর দোওয়া করার পূর্বে। সুতরাং দোয়ার বরকতে বিবি মরিয়ম শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এরূপ কথা বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব এই আয়াতের বাহক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার পক্ষে উপরোক্তরূপ অসঙ্গত উক্তি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

(২) এই রেওয়ায়ত হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক মানব শিশুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা। সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুরা কাঁদিয়া উঠে, ইহা সত্যকথা। কিন্তু অনেক সময় অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি তাহার কিছু পর পর্যন্তও কাঁদে না। ভ্রূণের ও প্রসূতীর স্বাস্থ্যের উপর ও ধাত্রীদের অভিজ্ঞতার উপর ইহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। এ অবস্থায় রেওয়ায়ত অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু শিশু স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। সুতরাং বিবি মরিয়ম বা হযরত ঈছার এ সম্বন্ধে কোনও বিশেষত্ব থাকিতেছে না।

(৩) "মরিয়ম ও যীশু ব্যতীত অন্য কোনও মানব শিশু"—তা তাঁহারা যত

বড় অলী-দরবেশ বা নবী-রাছুল হউন না কেন—শয়তানের খোঁচা, সুতরাং তাহার অধিকার, হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।"—ইহা ইছলামের একটা বুনিয়াদী অকীদার বিপরীত কথা। ইহাতে অন্য নবী-রাছুলগণের মর্যদা হানি করা হইতেছে।

(৪) এমরানের স্ত্রী প্রার্থনা করিয়াছিলেন "বিবি মরিয়ম ও তাঁহার ذرية বা সন্তান-সন্ততিদিগকে" শয়তানের প্রভাব হইতে রক্ষা করার জন্য। সুতরাং হযরত ঈছার সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে এই দোওয়ার বরকত হইতে বঞ্চিত করার কোনও কারণ নাই। এ অবস্থায় মাত্র মরিয়ম ও ঈছাকে মাছুম বানাইবার চেষ্টাটাই পণ্ড হইয়া যায়।

(৫) সবচাইতে গুরুতর কথা এই যে, এই রেওয়ায়তটা আবু-হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহার আর একটি রেওয়ায়তের উল্লেখও এখানে করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন: নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন যে—

"كل ابن آدم يلقى الله بذنب' يعذبه عليه انشاء او يرحمه' الا يحيى بن زكريا - ابن كثير ج٢ ٢٢٣

"জাকারিয়ার পুত্র ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত, প্রত্যেক আদম সন্তানকে আল্লাহ্র হুজুরে উপস্থিত হইতে হইবে গোনাহ্গার হিসাবে। সেই গোনাহের জন্য আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা আজাব করিবেন, আর যাহার উপর ইচ্ছা রহম করিবেন" (এবন-কাছীর ২—২২৩)। ফলে তাঁহার এই রেওয়ায়ত হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত নবী-রাছুল, এমন কি(মা'আজাল্লাহ্) হযরত রাছুলে কারীম পর্যন্ত সকলেই গোনাহ্গার।

আবু-হোরায়রা কর্তৃক এই শ্রেণীর আরও বহু রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে, যাহা যুক্তি বিরুদ্ধ, ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধ, অন্যান্য ছাহাবীদের বর্ণিত হাদীছের বিরুদ্ধ, এমন কি কোর্আনের স্পষ্ট বর্ণনার বিরুদ্ধ। এই জন্য খলীফা ওমর, আলী ও ওছমান এবং বিবি আয়েশা প্রমুখ হযরতের বিশিষ্ট ছাহাবিগণ তাঁহার রেওয়ায়তগুলিকে অবিশ্বাস করিতেন। কোর্আনের বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, في ستة ايام অর্থাৎ ছয় দিনে। কিন্তু আবু-হোরায়রা হযরতের প্রমুখাৎ সাতদিনের হিসাব বর্ণনা করিতেছেন। রেওয়ায়তটি ছহীহ্ মোছলেমে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও, ইমাম বোখারী ও তাঁহার ওস্তাদ আলী এব্নুল-মাদীনী ও অন্যান্য মোহাদ্দেছ, এই রেওয়ায়তের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইহাকে কা'ব-আহবারের উক্তি বলিয়া

নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, বস্তুতঃ পরবর্তী কোনও রাবী গোলমালে পড়িয়া উহাকে হযরতের উক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। (এবন-কাছীর, নূতন সংস্করণ, ১—১২৫)। এই কা'ব-আহবার হযরতের সময় ছিলেন, কিন্তু ইছলাম গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর ২য় খলীফার সময় তিনি মুছলমান হন। তাঁহার সহিত আবু-হোরায়রার দহরম মহরম ছিল, এবং তিনি কাবের কাছে আহলে কেতাবদিগের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। ইহা আবু-হোরায়রার নিজের স্বীকারোক্তি হইতেও জানা যাইতেছে (মালেক, আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিজী, নাছায়ী—মেশ্‌কাত, জুমআ)।

এই প্রসঙ্গে ইমাম ও মোহাদ্দেছগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আজ আমি ইমাম এবন-কোতায়বার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব। ইমাম ছাহেব, জনৈক সমালোচকের উত্তরে, ছাহাবী আবু-হোরায়রার পক্ষ হইতে কৈফিয়ত দিতে গিয়া বলিতেছেন:

اما طعنه على ابى هريرة بتكذيب عمر وعثمان وعلى وعائشة له، فان ابا هريرة صحب رسول الله صلعم نحوا من ثلاث سنين واكثر الرواية عنه- وعمر بعده نحوا من خمسين سنة وكانت وفاته سنة تسع وخمسين......وتوفت عائشة رض قبله بسنة - فلما اتى من الرواية عنه مالم يات بمثله من صحبه من مجلة اصحابه والسابقين الاولين اليه، اتهموه وانكروا عليه، وقالوا كيف سمعت هذا وحدك؟ ومن سمعه معك؟ وكانت عائشة رض اشدهم انكارا عليه، لتطاول الايام بها و به وكان عمر ايضا شديدا على من اكثر الرواية (الى قوله) وكان مع هذ القول: قال رسول الله صلعم كذا، وانما سمعه من الثقة عنده، فحكاه—(تاويل مختلف الحديث ص ٥٠-٤٩)

অর্থাৎ—ওমর, ওছমান, আলী ও বিবি আয়েশা যে আবু-হোরায়রার রেওয়ায়তকে মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, আবু-হোরায়রা হযরতের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, মোটামুটিভাবে তিন বৎসর, অথচ অধিকাংশ রেওয়ায়তই তাঁহা হইতে বর্ণিত। এতদ্ব্যতীত হযরতের এন্তেকালের পর আবু-হোরায়রা বাঁচিয়াছিলেন পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৯ বৎসর। ....বিবি আয়েশার মৃত্যু হয় তাঁহার এক বৎসর পূর্বে। তখন অবস্থা দাঁড়াইল যে, আবু-হোরায়রা হযরতের নাম করিয়া এমন বহু হাদীছ বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

তাঁহার (হযরতের) সুদীর্ঘ কালের সঙ্গী এবং প্রবীণ ও প্রাচীন ছাহাবিগণের মধ্যে আর কেহই তদ্রূপ হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। তখন ওমর প্রমুখ ছাহাবিগণ তাঁহার উপর দোষারোপ করেন ও তাঁহার রেওয়ায়তগুলিকে অস্বীকার করেন। এবং প্রশ্ন করেন—শুধু তুমি একাই এই হাদীছটি শুনিলে কি করিয়া? তোমার সঙ্গে আর কে উহা শ্রবণ করিয়াছে? বিবি আয়েশাও হযরতের পর দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতিবাদ হইয়াছিল অত্যন্ত কঠোর···· এইরূপে ওমরও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারীদিগের সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব পোষণ করিতেন····এতৎসত্ত্বেও আবু-হোরায়রা বলিতেন—"হযরত এই কথা বলিয়াছেন"—অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহা হযরতের উক্তি নহে। বরং তিনি যাহাকে বিশ্বস্ত মনে করিতেন, এমন কোনো লোকের মুখে শুনিয়া আবু-হোরায়রা (হযরতের নাম করিয়া) তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।" (তাবীল ৪৯, ৫০ পৃষ্ঠা)।

(উপসংহারে একটা বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। ইমাম এবন-কোতায়বা বলিতেছেন—আবু-হোরায়রা হযরতের সংস্রবে ছিলেন তিন বৎসর, তাঁহার পর জীবিত ছিলেন পঞ্চাশ বৎসর। আর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ৫৯ হিজরীতে। এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, আবু-হোরায়রা যখন প্রথমে হযরতের খেদ্‌মতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বয়স কত ছিল? ৩+৫০= ৫৩। ৫৯—৫৩=৬ বৎসর। পাঠকগণ বিষয়টা আলোচনা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব)।

২৪। **টীকা: বে-হিসাব রেজ্‌ক**—এই আয়াতের প্রথম ভাগে বলা হইতেছে—আল্লাহ্ মরিয়মকে লালন-পালন বা তাঁহার উৎকর্ষ সাধন করিলেন সুসঙ্গতভাবে। মূলে انبت শব্দ আছে। বীজ হইতে কোনও উদ্ভিদকে 'উদ্‌গত' করা এবং তাহাকে শাখা-প্রশাখায় ও ফুলে-ফলে সুশোভিত করাই ইহার ধাতুগত অর্থ। বিবি মরিয়মের দৈহিক পুষ্টির কথাই এখানে প্রধান বক্তব্য নহে। দেহের পুষ্টি তো সাধারণতঃ সকল শিশুরই হইয়া থাকে। আমাদের খেয়াল-বিলাসী রাবীরা বলিতেছেন—"সাধারণ শিশুরা এক বৎসরে যতটা বর্ধিত হয়, বিবি মরিয়ম এক মাসেই ততটা বাড়িয়া উঠিতেন।" কিন্তু তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিবি মরিয়ম দুই বৎসর বয়সে ২৪ বৎসরে একটি পূর্ণাঙ্গী স্ত্রীলোকে পরিণত হইয়া গিয়াছিলেন। হযরত ঈছার জীবনীকে বা কোর্‌আনের তাফ্‌ছীরকে, উপন্যাসে পরিণত করার ন্যায় অপরাধ আর কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে সকলের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। বস্তুতঃ বিবি মরিয়মকে বর্ধিত

করা হইয়াছিল সুশিক্ষায়, সৎজ্ঞানে ও চরিত্রের মহিমায়, একজন মহানবীর যোগ্য জননী হিসাবে।

রেজ্‌ক—শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। মানুষের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে কোনও নিয়ামত দেওয়া হয়, তাহার প্রত্যেকটি রেজ্‌ক পদবাচ্য। যেমন—খাদ্য, পানীয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি, ইত্যাদি। (রাগেব)। বিখ্যাত অভিধান লেখক ইমাম জাওহারী বলিতেছেন :

الرزق كل ما ينتفع به....وقد سمى المطر رزقا - وذلك فى قوله
وما انزل الله من السماء من رزق' فاحيابه الارض بعد موتها -

"যাহা কিছুর দ্বারা কোনও উপকার লাভ করা যায়, তাহার প্রত্যেকটিকে রেজ্‌ক বলা হয়....বৃষ্টিকেও কখনো কখনো রেজ্‌ক বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ বলিয়াছেন : "এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে রেজ্‌ক নাজেল করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা জীবনহীন জমিনকে আবার জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।" ইহার মধ্যে কোনো একটা অর্থ নির্বাচিত করিয়া নিতে হয়, প্রাসঙ্গিকতার হিসাবে।

বিবি মরিয়ম পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে, অন্যান্য মানব শিশুর ন্যায় স্বাভাবিকভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহাকেও জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। অর্থাৎ, তাঁহার জন্ম, শৈশব ও কৈশোর যুগপৎভাবে এক মুহূর্তে শেষ হইয়া যায় নাই। সুতরাং বয়সের পর্যায় অনুসারে তাঁহার লালন-পালনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

এইরূপে উপযুক্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর, তিনি ধর্মীয় আশ্রমে রক্ষিত হওয়ার পরেও তাঁহার জন্য খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা হওয়াও স্বাভাবিক। সুতরাং আয়াতে বর্ণিত রেজ্‌ক—অর্থে খাদ্য বা পানীয় যে আদৌ হইতে পারে না, এরূপ কথা বলিলে হঠতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু 'খাদ্য' হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করিলে, রাবীদের বর্ণিত উদ্ভট উপকথাগুলিকেও যে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া নিতে হইবে, তাহারও কোনও কারণ নাই। জাকারিয়া সপ্তদ্বার বিশিষ্ট কক্ষে মরিয়মকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাহির হওয়ার সময় তিনি সব দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাইতেন, এবং সেই অবস্থায় বেহেশ্‌ত হইতে মরিয়মের জন্য শীতকালে গ্রীষ্মকালের ও গ্রীষ্মকালে শীতকালের মেওয়া নামিয়া আসিত"—ইহা প্রমাণহীন কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে এই উপকথাগুলি ইহুদীদের একখানি ভিত্তিহীন পুরাণ হইতে গৃহীত। (আবদুল্লাহ্ ইউসুফ, ৩৬ আয়াতের টীকা ; Rodwell ৩৮৯ পৃষ্ঠা)।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমস্ত নিয়ামত, সমস্ত রহমত ও সমস্ত রেজ্‌ক নাজেল হইয়া থাকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এবং আল্লাহ্‌ যে-কোনও বান্দাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রেজ্‌ক দিয়া থাকেন—কেবল বিবি মরিয়ম সম্বন্ধে এই মর্মের আয়াত নাজেল হয় নাই।

২৫। টীকাঃ জাকারিয়ার মোনাজাত—হযরত জাকারিয়ার মোনাজাতের বিবরণ সূরা মরিয়মের প্রথম দিকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মোনাজাতটা এইরূপঃ "ইহা হইতেছে তোমার প্রভুর রহমতের বিবরণ, তাঁহার বান্দাহ্‌ জাকারিয়ার প্রতি, যখন সে নিভৃতে আপন প্রভুকে ডাকিয়া বলিয়াছিলঃ হে আমার প্রভু! আমার হাড়গুলি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আর বার্ধক্যের ফলে আমার মাথার চুলগুলি সম্পূর্ণভাবে সাদা হইয়া গিয়াছে, আর তোমার কাছে যাচঞা করিয়া, প্রভু হে! আমি কখনও বঞ্চিত হই নাই। অবস্থা এই যে, আমার পরে আমার জ্ঞাতি স্বজনগণের অবস্থা ভাবিয়া আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি। অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব আমাকে এমন একজন ওয়ারেছ বা স্থলাভিষিক্ত দান কর—যে আমার ও সমগ্র ইয়াকুব গোত্রের উত্তরাধিকারী হইতে পারে।"

এই আয়াতগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে, হযরত জাকারিয়া নিজের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন নাই। বরং তিনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বানি-ইছ্‌রাইল কওমের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। তাই নবুয়তের একজন যোগ্য ওয়ারেছ পাওয়ার জন্য তাঁহার এই মোনাজাত। সূরা মরিয়ম নাজেল হয় মক্কায়, আল-এমরানের বহু পূর্বে। এখানেও স্পষ্টভাবে "একটা পুত্র সন্তান" লাভের প্রার্থনা জানান হয় নাই।

রাবীদিগের বর্ণনার সার এই যে, বিবি মরিয়মের এবাদত-গাহে, শীতকালে গ্রীষ্মকালের এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালের মেওয়া দেখিয়া, হযরত জাকারিয়ার ভরসা হইল যে, অসময়ে মেওয়া উৎপন্ন করিয়া দিতে পারেন যে আল্লাহ্‌, তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিতে তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। অথচ জাকারিয়া ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁহার দোওয়া যে পূর্বে কখনও না-মঞ্জুর হয় নাই, তাঁহার মুখ হইতে আয়াতে ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৬। টীকাঃ পুত্রের খোশ-খবর—এই মোনাজাতের পর, এক সময় তিনি তাঁহার এবাদত-গাহে দাঁড়াইয়া, নিজেদের শরিয়তের বিধান অনুসারে নামায আদায় করিতেছেন, এমন সময় ফেরেশতা তাঁহাকে পুত্র লাভের সুসংবাদ জানাইয়া দিলেন। সূরা মরিয়মের ২ আয়াতে ইহাকেই "জাকারিয়ার প্রতি

আল্লাহ্‌র রহমত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সাফল্যের আনন্দে, কৃতজ্ঞতার অনুভবে এবং সেই মঙ্গল ভবিষ্যৎ লাভের ঔৎসুক্যে তখন হযরত জাকারিয়ার অন্তঃকরণে যে ভাবের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক, পরবর্তী আয়াতে তাহারই অভিব্যক্তি করা হইয়াছে। ফেরেশতারা খোশ-খবর দিতেছেন—তাঁহার দোওয়া কবুল হইয়াছে, তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী আসিতেছে। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহার নামও ঘোষণা করা হইল, ইহার পরেও তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ কথা বিশ্বাস করিতে অন্ততঃ আমি প্রস্তুত নহি। স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত ইবরাহীমও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের খোশ-খবর পাইয়া ঠিক হযরত জাকারিয়ার মত মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছিলেন। (হেজর, ৪ রুকূ)। চরম হতাশার সময়, পরম সাফল্যের খোশ-খবর শুনিলে, মানুষ সংবাদ দাতাকে নানা রকম প্রশ্ন করিতে থাকে, তাহার উত্তর পুনঃ পুনঃ শুনিতে চায়। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম (কলেমার অর্থ সম্বন্ধে ৪৪ আয়াতের টীকা দেখুন)।

২৭। **টীকাঃ জাকারিয়ার নিদর্শন**—জাকারিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন, তাঁহার জন্য একটা নিদর্শন স্থির করিয়া দিতে। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে ইমাম আবু মোছলেম বলিতেছেনঃ "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিবারাত্র মানুষের সঙ্গে কথা বলিবে না, অর্থাৎ কথা না বলিয়া এবং দুনিয়ার হাঙ্গামা হইতে দূরে সরিয়া আল্লাহ্‌র জেকের ও তছবীহে আত্মনিয়োগ করিবে। তোমার ও তোমার স্বজাতীয়গণের প্রতি আল্লাহ্‌র যে অমূল্য দান, তাহার জন্য শোকরগুজারী আদা করিতে থাকিবে। আমার পক্ষ হইতে তোমার উপর যখন এই হুকুম আসিবে, তখন বুঝিবে যে, সেই শুভ দিন উপস্থিত হইতে বেশী বিলম্ব নাই।"

আবু মোছলেমের এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইমাম রাজী বলিতেছেনঃ

"وهذا القول عندى حسن مقبول - وابو مسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف"

"আমার মতে ইহা সুন্দর ও যুক্তি সঙ্গত কথা। বস্তুতঃ তাফ্‌ছীর সম্বন্ধে আবু মোছলেমের কথাগুলি খুবই সুন্দর, কোর্‌আনের কঠিন ও সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে তিনি গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।" (কাবীর, ২—৬৬৮)। হযরত জাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলির সূরা মরিয়মের তাফছীরে আলোচনা করা হইয়াছে।

৫ রুকূ

৪২। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা), ফেরেশ্‌তারা যখন বলিয়াছিল : হে মরিয়ম! "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে পাক-ছাফ করিয়াছেন ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং (এক মহান উদ্দেশ্যে) তোমাকে নির্বাচন করিয়া নিয়াছেন সারা জাহানের স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে।" (২৮)

۴۲ وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ٥

৪৩। হে মরিয়ম! আপন প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুরে 'বিনীত ও অনুগত হইয়া চল, এবং ছেজদা করিতে থাক ও রুকূ করিতে থাক রুকূকারী লোকদিগের সঙ্গে মিলিয়া। (২৯)

۴۳ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٥

৪৪। —(হে রাছুল!) এগুলি হইতেছে অতীতের অজ্ঞাত সংবাদ —যাহা আমরা তোমাকে অহি দ্বারা জানাইয়া দিতেছি ; তাহাদের মধ্যকার কোন্ ব্যক্তি মরিয়মের অভিভাবক হইতে পারিবে—(এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য) যখন তাহারা নিজেদের জুয়ার তীরগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন তো তুমি তাহাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না, আর যখন তাহারা (এই ব্যাপার নিয়া)বাদানুবাদ করিতেছিল—তখনও তুমি তাহাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না। (৩০)

۴۴ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ٥

৪৫। যখন ফেরেশ্‌তারা বলিয়াছিল: হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে খোশ-খবর দিতেছেন নিজের একটি কলেমার (পায়গামের) দ্বারা, যাহার নাম আল্‌-মছীহ্‌ ঈছা এবন-মরিয়ম, সে হইবে উভয় দুনিয়ায় ও আখেরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য-প্রদত্ত লোকদিগের একজন,—(৩১)

٤٥ إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ق صلے اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ لا

৪৬। এবং সে লোকজনের সঙ্গে কথা বলিবে মাতৃক্রোড়ে ও পৌঢ় অবস্থায়, এবং (সে হইবে) সাধু-সজ্জনগণের মধ্যকার একজন।

٤٦ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ○

৪৭। মরিয়ম বলিল: হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমার সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ অবস্থা এই যে, কোনও মানুষই আমাকে (আজ পর্যন্ত) স্পর্শ করে নাই। আল্লাহ্‌ বলিলেন: (হইবে-) এইরূপেই, আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা পয়দা করিয়া থাকেন; কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিলে শুধু বলেন—"হউক"—অমনি হইয়া যায়। (৩৩)

٤٧ قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○

৪৮। আর (তোমার ঐ প্রতিশ্রুত পুত্রকে) আল্লাহ্—কেতাব ও জ্ঞানের কথা এবং তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিবেন—

٤٨ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج

৪৯। এবং আল্লাহ্ তাঁহাকে রাছুলরূপে প্রেরণ করিবেন বানিইছ্‌রাইল জাতির নিকট, সে-মতে সে বলিবে : আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের দেওয়া দলিল-প্রমাণ সঙ্গে নিয়া—আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়া তৈয়ার করিব পাখীর সদৃশ (একটি আকৃতি), যখন তাহাতে ফুৎকার করিব, তখন তাহা পাখী হইয়া যাইবে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে, (৩৪) এবং আমি অন্ধদিগকে ও কুষ্ঠরোগীদিগকে সুস্থ করিয়া দিব, এবং মোরদারদিগকে জেন্দা করিয়া তুলিব, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে — এবং তোমরা কি ভোগ করিবে আর নিজেদের গৃহে কি সঞ্চয় করিবে, সেই বৃত্তান্তটাও তোমাদিগকে জানাইয়া দিব; আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে—নিশ্চয় ইহাতে

٤٩ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۵ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ج وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ج وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ

তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর দেওয়া দলিল-প্রমাণ (নিহিত) আছে—যদি তোমরা (সত্যকার-ভাবে) ঈমানদার হও,—(৩৫)

فِى بُيُوتِكُمْ ط اِنَّ فِى
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ج

৫০। এবং তাওরাতের যে অংশ আমার সম্মুখে আছে, আমি হইতেছি তাহার তাছদীককারী, অধিকন্তু তোমাদিগের উপর যে বিষয়গুলি (তোমাদের নাফর-মানীর জন্য) হারাম করা হইয়া-ছিল, সেগুলিকে আমি তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দিব, বস্তুতঃ আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছি তোমাদের প্রভুর দেওয়া দলিল-প্রমাণ সঙ্গে নিয়া, অতএব তোমরা সমীহ করিয়া চলিবে আল্লাহ্‌কে, আর ফরমাঁবরদারী করিবে আমার।

٥٠ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ
مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ
بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوْنِ ○

৫১। নিশ্চয় জানিও, আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু হইতেছেন আল্লাহ্ —অতএব একমাত্র তাঁহারই এবাদত করিবে তোমরা ; ইহাই হইতেছে সরল ও সুদৃঢ় পথ। (৩৬)

٥١ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ ○

৫২। অতঃপর ঈছা যখন ইহুদীদের কাফেরী মনোভাবের বিষয়

٥٢ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ

الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ ج آمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ٥

অনুভব করিতে পারিল, তখন (স্বজাতিকে ডাকিয়া) বলিল: কে হইবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার মদদ্‌গার? হাওয়ারীরা তখন (ঈছার ডাকে সাড়া দিয়া) বলিয়া উঠিল—"এই যে, আমরা আছি আল্লাহ্‌র কাজের আনছার (মদদ্‌গার)। আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনিয়াছি, আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হইতেছি মোছলেম। (৩৭)

٥٣ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ٥

৫৩। "হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ারদেগার। যে কালাম তুমি নাজেল করিয়াছ, আমরা তাহাতে ঈমান আনিয়াছি এবং (তোমার প্রেরিত) রাছুলের তাবেদারী করিতেছি, অতএব আমাদিগকে লিখিয়া লও, সত্যের সমর্থকগণের সঙ্গে।"

٥٤ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ع

৫৪। বস্তুতঃ তাহারা এক তদ্‌বির আঁটিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন শ্রেষ্ঠতম তদ্‌বিরকারী। (৩৮)

তাফ্‌ছীর

২৮। **টীকা: ফেরেশতাগণ**—মালাক্-অর্থে ফেরেশতা, বহুবচনে মালায়েকা অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। এখানে বলা হইতেছে যে, খোশ-খবর দিয়াছিলেন ফেরেশতাগণ। কিন্তু সূরা মরিয়মে এই প্রসঙ্গে রূহ্ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'রূহ্ অর্থে হযরত জিব্‌রাঈল, সুতরাং একজন ফেরেশ্‌তা। সুতরাং আয়াত দুইটির বর্ণনা যে পরস্পর বিরোধী, তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে।

কাজেই এখানে অগত্যা ফেরেশ্‌তাগণ বলিতে 'একজন ফেরেশ্‌তা' গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম রাজী বলিতেছেন :

هذا و ان كان عدولا عن الظاهر انه يجب المصير اليه -

"যদিও ইহা কোর্‌আনের স্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত, তথাচ এই তাৎপর্য গ্রহণ করা ওয়াজেব্ হইয়া যাইতেছে (কাবীর ২—৬৬৯ এবং ৫—৭৭৯)।

আমার মতে, আয়াতের তাফ্‌ছীর সম্বন্ধে নিজদিগকে এরূপ বিপন্ন মনে করার কারণ তাফ্‌ছীরকারগণের আদৌ ছিল না। বস্তুতঃ রূহ্-শব্দের এক অর্থ জিব্‌রাঈল হইলেও তাহাই একমাত্র অর্থ নহে। আত্মা, অহি, প্রেরণা (Inspiration) ও কোর্‌আন প্রভৃতি অর্থেও ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। (সূরা মরিয়মের তাফ্‌ছীর দেখুন)।

২৯। **টীকা : মরিয়মের প্রতি উপদেশ**—বিবি মরিয়মকে নির্বাচিত করা হইয়াছিল যে উদ্দেশ্যে, তাহা অনতিবিলম্বে আত্মপ্রকাশ করিতে চলিয়াছে। তাই বিবি মরিয়মকে তখন উপদেশ দেওয়া হইতেছে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে। ভাবী সন্তানের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের জন্য ইহা অত্যন্ত আবশ্যক।

আয়াতে বিবি মরিয়মকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে আল্লাহ্‌র হুজুরে বিনীত ও অনুগত হইয়া থাকিতে এবং জামাআতের সঙ্গে 'নামায' আদায় করিতে। স্ত্রী-লোকদিগের জামাআতে শামিল হইয়া নামায পড়ার ব্যবস্থা ইছ্‌লামেও আছে। অবশ্য, অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মুছলমানদিগের মধ্যেও যাহাতে এই ব্যবস্থার অপব্যবহার হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও ইছ্‌লামে আছে।

৩০। **টীকা : শেষ নবুয়তের পূর্বাভাস**—এই আয়াতটি বর্ণিতহইয়াছে parenthetical, مستأنفه বা অনন্বিত হিসাবে। জাকারিয়া, মরিয়ম ও ঈছার বিবরণগুলি দূর অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু তৎকালীন ইহুদী সমাজের নানা অবিচার ও অনাচারের ফলে, ঐ ঘটনাগুলির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সমসাময়িক যাজক ও পণ্ডিত পুরোহিতগণের মধ্যবর্তিতায় তাহার যে ধ্বংসাবশেষ তাওরাত ইন্‌জীলের নামকরণে আখ্যাত হইতেছিল, প্রথমতঃ তাহা ছিল তাহাদের মুষ্টিগত গুপ্ত-সম্পদ। দ্বিতীয়তঃ সেগুলির ভাষা ছিল আরবীয় সমাজের সম্পূর্ণ আবোধগম্য। কাজেই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার পক্ষে তাহা অবগত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেগুলির সত্য বিবরণ হযরত প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, আল্লাহ্‌র

প্রেরিত অহি অনুসারে। ইহা হইতে তাঁহার নবুয়তের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে।

আয়াতে বিবি মরিয়মকে হযরত ঈছার আসন্নপ্রায় শুভাগমনের খোশ-খবর দেওয়া হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার—এবং সম্ভবতঃ সেজন্য ধর্ম-মন্দির ত্যাগ করিয়া আসার পর, তাঁহাকে এই সু-সংবাদ জানান হইয়াছিল। নেছা শব্দের আভিধানিক তাৎপর্য হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

কোনও বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে, লটারি করিয়া তাহার ফায়ছালা করার নিয়ম ইহুদী সমাজে দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণতঃ জুয়াখেলার তীরগুলি ইহার জন্য ব্যবহার করা হইত। বিবি মরিয়মের অভিভাবক নির্বাচনের জন্যও তাহারা এই তীরগুলির ব্যবহার করিয়াছিল। আয়াতে ইহাকেই "আকলাম" বলা হইয়াছে। (এবন-জরীর, আল-মানার প্রভৃতি)। এই প্রসঙ্গে আমাদের একদল রাবী যেসব উদ্ভট কেচ্ছা-কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, ধর্মের বা ইতিহাসের হিসাবে তাহার কানাকড়িরও মূল্য নাই। দুঃখের বিষয়, যেসব ব্যাপারকে এই আয়াতেই হযরতের অজ্ঞাত বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে, আমাদের রাবীরা সেইসব বিষয়ের খুঁটিনাটি সংবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

৩১। **টীকা ঃ কালেমা, পায়গাম**—কালেমা শব্দের অর্থ—কথা, নবুয়ত নির্দেশ, সংবাদ, কোনো সাব্যস্ত বিষয়, পায়গাম, ফরমান বা decree ইত্যাদি। পুরস্কারের সংবাদ বা আজাবের সংবাদ সম্বন্ধেও উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, উপক্রম উপসংহার অনুসারে। এখানে সুসংবাদকে কালেমা বলা হইয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين -

"আজাবের নির্দেশ সাব্যস্ত হইয়া গেল কাফেরদের উপর।" ফেরেশতারা বিবি মরিয়মকে বলিতেছেন, "হে মরিয়ম্। আল্লাহ্ তোমাকে একটি সুসাব্যস্ত বিষয়ের খোশ-খবর দিতেছেন, যাহার নাম হইতেছে আল্-মছীহ্ ঈছা এবন-মরিয়ম ইত্যাদি। ইমাম এবন-জরীর ও হাফেজ এবন-কাছীর প্রমুখ তাফ্‌ছীর-কারগণ দেখাইয়াছেন যে, আয়াতে কালেমা শব্দকে কিছুই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। তাহার মুখ্য বিশেষ্য বিষয় হইতেছেন হযরত ঈছা। তাই কালেমা স্ত্রী-বাচক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তাহার সর্বনাম আনা হইতেছে পুরুষ বাচক 'হু'—স্ত্রীবাচক 'হা' ব্যবহার করা হয় নাই।

খ্রীষ্টান প্রচারকরা এই কালেমা শব্দের তাৎপর্য নিয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন দীর্ঘকাল হইতে। গ্রীক দার্শনিক Heraclituse ও Philo প্রমুখের অনুকরণ করিয়া হযরত ঈছার পরবর্তী খ্রীষ্টানগণ, বিশেষ করিয়া যোহন, এই মতবাদটা খ্রীষ্টান ধর্মে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে Christinising the Logos conception বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

Biblica বিশ্বকোষের লেখক, J. G. Adolf D. D. এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

Except in the prologue to the Fourth Gospel, the biblical usage of ** shows no peculiarity ; it means a complex of words (**), presented in the unity of a sentence or thought. The entire gospel can be called 'the logos of God', or even simply the logos. এই প্রবন্ধের উপসংহারের লেখক আরও বলিয়াছেন: The church, unfortunately, even so early as in the second century, began to give greater attention to this philosophical element in the gospel of 'the divine' than to the historical features of the narrative, and the employment of the idea of the logos in this maner, occasioned by this author . . . . became a source of danger to Christianity. (Art. Logos)

গ্রীক দার্শনিকদিগের ও পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিক সমাজগুলির মতবাদের সহিত সন্ধি করার জন্য প্রথম যুগের খ্রীষ্টান লেখক ও প্রচারকগণ, যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত হযরত ঈছার প্রচারিত তাওহীদ-ধর্মের বিকার করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বহু মন্তব্যে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। (দেখুন চৌধুরী নজীর আহমদ প্রণীত "Jesus in Heaven on Earth" বিশেষতঃ তাহার Son God Theory ও Virgin Birth শীর্ষক অধ্যায়)।

মছীহ্ এবন-মরিয়ম—মছীহ্—Christ, গ্রীক—Christas-ansinted—তৈলষিক্ত করা। রাজা ও ধর্ম যাজকদিগকে তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত করার প্রথা (আঃ ইউছুফ)। ইমাম রাজী বলিতেছেন:

سمی مسیحا لانه کان ممسوحا بدهن طاهر مبارک یمسح به الانبیاء

অর্থাৎ—"যে পাক ও মোবারক তৈলের দ্বারা নবীদিগকে অভিষিক্ত করা হইত, হযরত ঈছাও সেইরূপ তৈলের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।" আমার মতে মছীহ্ শব্দের সঙ্গত তাৎপর্য ইহাই।

অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্‌দিগের ও ধর্ম-যাজকগণের ন্যায় হযরত ঈছাও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বা তাঁহার অবতার হওয়ার প্রতিবাদই হইয়া যাইতেছে। এই আয়াতের ও পরবর্তী (8৫) আয়াতের শেষ অংশে স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য قربت হাছেল করিয়াছিলেন যাঁহারা, হযরত ঈছা হইতেছেন সেই সাধু-সজ্জনগণের মধ্যকার একজন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতেছে যে, হযরত ঈছাকে কোর্‌আনে ঈছা এবন-মরিয়ম বা মরিয়মের পুত্র ঈছা বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে, ইহার কারণ কি? মানুষকে পরিচিত করা হইবে তাহার পিতার নাম করিয়া, ইহাই আরব ও ইহুদী সমাজের চিরাচরিত নিয়ম। এখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইল কেন? মুছলমান লেখকগণ সাধারণতঃ ইহার উত্তরে বলেন—যেহেতু হযরত ঈছা বিনা বাপে পয়দা হইয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে এবন-মরিয়ম বা মরিয়মের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, মানুষকে তাহার মায়ের নামে পরিচিত করার নজীর যে, আরব সমাজে বিদ্যমান নাই, ইহা সঙ্গত কথা নহে। শুধু ছাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে ইহার বিপরীত নজীর অনেক পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত হযরত ঈছা যে, বিনা বাপে পয়দা হইয়াছিলেন কোর্‌আন মাজীদের কোন আয়াতে বা হযরতের কোনও ছহীহ্‌ হাদীছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরুষ ও নারীর সংশ্রব ব্যতীত কোনও জীবের—এমন কি উদ্ভিদের—জন্ম হইতে পারে না, ইহা আল্লাহ্‌র চিরন্তন নিয়ম। বিশ্বমানবের লক্ষ লক্ষ বৎসরের সমবেত অভিজ্ঞতার ফলও ইহাই। ইহার ব্যতিক্রম করার শক্তিও আল্লাহ্‌র আছে, ইহা আমরাও জানি এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করিয়া থাকি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, এই ব্যতিক্রমের দাবী কোর্‌আন ও হাদীছ হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, ঐরূপ কোনও দাবীকে ধর্মীয় আকীদা হিসাবে গ্রহণ করা মুছলমানের পক্ষে সঙ্গত হইবে না।

হযরত ঈছাকে এবন-মরিয়ম বলার প্রকৃত কারণ অবগত হইতে হইলে, আমাদিগকে সমসাময়িক ইহুদী ও খৃষ্টান সমাজের ইতিহাস ও ধর্মীয় সাহিত্যের সন্ধান লইতে হইবে। যেখানে তিন প্রকার অভিমতের অস্তিত্ব দেখা যাইবে। ইহুদী সমাজ দীর্ঘকাল হইতে, তাহাদের উদ্ধার কর্তা মছীহ্‌র অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তিনি যে দাঊদ বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন, নিজেদের শাস্ত্রীয়

পুঁথি-পুস্তক অনুসারে তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করিত। কিন্তু যীশুর আবির্ভাবের পর তাহারা বলিতে লাগিল—এই যীশু তো জারজ সন্তান—তাহারা যীশু-জননীর সহিত অন্য পুরুষের অসঙ্গত সংশ্রবের কথা প্রচার করিতে থাকে।*

অন্যদিকে, ইহুদীদের মধ্যে যাঁহারা যীশুকে সেই প্রতিশ্রুত মছীহ্ বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহারা তাঁহার দাউদ বংশের প্রমাণ হিসাবে এবং ইহুদীদের প্রচারিত অপবাদের প্রতিবাদ হিসাবে বলিতে লাগিলেন—"যীশু যোষেফের পুত্র, (লুক, ৩—২৩)। মরিয়মের স্বামীর নাম যোষেফ (মথি ১—৬)। সরকারী কাগজ-পত্রেও যীশু "যোষেফের পুত্র" বলিয়া লিখিত হইতেন। (স্কট প্রণীত টীকা—লুক ঐ)।

কালক্রমে, প্রধানতঃ রাজনৈতিক গরজে, খ্রীষ্টান সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা কিরূপে যীশুকে "ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর" বানাইয়া নিয়াছিলেন, ৩১ টীকায় তাহার আভাস দিয়াছি। কিন্তু এদিক দিয়া এই প্রকার মতভেদের সৃষ্টি হইলেও মরিয়ম যে দাউদ বংশ সম্ভূত, সে সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কোনও মতভেদ ছিল না। তাই এই বিতণ্ডা ও বিসংবাদের বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া, সর্ববাদী সম্মত মত অনুসারে হযরত ঈছার সঙ্গত পরিচয়টা এই আকারে দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে।

৩২। টীকা: "মাতৃক্রোড়ে ও প্রৌঢ়কালে কথা বলা—মূলে مهد মাহ্‌দ ও كهل কাহ্‌লান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মাহ্‌দ শব্দের অর্থ, দুগ্ধ পোষ্য শিশুর অবস্থান-স্থল। মাতৃক্রোড়ে ও হিন্দোলা উভয় হইতে পারে। এখানে "শৈশবকাল'ই উদ্দেশ্য। কাহ্‌লান—শব্দের অভিধানিক তাৎপর্য: "যাহার সমস্ত শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে ও যাহার যৌবন সম্পূর্ণ হইয়াছে (কাবীর)। বয়সের জন্য "যাহার কাল চুলের সঙ্গে সাদা চুল মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে (রাগেব)।

এই আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাফ্‌ছীরকারগণের একদল বলিতেছেন:

হযরত ঈছা তাঁহার মাতার অপবাদ স্খালনের জন্য শৈশবে একবার কথা কহিবেন, তাহার পর কথা বলিবেন নবুয়ত লাভের পর। আর একদল বলিতেছেন:

* According to the Talmud and according to the Celsus Jesus was the child of the adultarous intercourse of Mary with a soldier Stada or Pandera. Ency. Biblica, Col. 29683 ; Jesus Christus in Talmud ; প্রভৃতি।

ان المراد منه بيان كونه متقلبا فى الأحوال من الصبا الى الكهولة' والتغير على الا له تعالى محال- والمراد منه الرد على وفد نجران فى قولهم ان عيسى كان الها-

"আয়াতের মতলব এই যে, হযরত ঈছা শৈশব হইতে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হইতে থাকিবেন। অথচ খোদাতে পরিবর্তন অসম্ভব। নাজরানী প্রতিনিধিদিগের এই (ঈছা ঈশ্বর)—ধারণার প্রতিবাদ করাই ইহার উদ্দেশ্য (জরীর, কাবীর প্রভৃতি)।

আমার মতে ইহাই আয়াতের সুসঙ্গত তাৎপর্য। কোনও বিজ্ঞ লেখক হযরত ঈছার শৈশবে কথা বলার প্রমাণ হিসাবে সূরা মরিয়মের বরাত দিয়াছেন। কিন্তু সূরা মরিয়মের প্রাসঙ্গিক (৩০—৩৩) আয়াতগুলি হইতে সন্দেহাতীতভাবে জানা যাইতেছে যে, হযরত ঈছা সে কথাগুলি বলিয়াছেন বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার এবং নবুয়ত পাওয়ার পর।

কোর্‌আন মাজীদের ইংরাজী অনুবাদক Sale সাহেব এই আয়াতের তাফ্‌ছীর প্রসঙ্গে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের কোনো কোনো উপ-কথাপূর্ণ পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যীশু মাতৃক্রোড়ে থাকার সময়ও লোকের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন। কোর্‌আনের বর্ণনায় এই বিষয়টি তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে।

কিন্তু ধর্মপ্রাণ পাদ্রী সাহেবের, এই তথ্য আবিষ্কারের জন্য পূর্ব দেশীয় খ্রীষ্টানদের জাল পুঁথি-পুস্তকের কি দরকার ঘটিয়াছিল, তাহা খুব সহজে বুঝা যাইতে পারে। যীশু যে, শৈশবকালে লোকের সহিত কথা কহিতেন, পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানদিগের অতি বিশ্বস্ত বাইবেলে, লুকের ২য় অধ্যায়ে, তাহা খুব সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তবু ইহার বরাত না দেওয়ার কারণ এই যে, এই অধ্যায়ের শেষভাগে বলা হইয়াছে যে, যীশু তিন দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হওয়ায় "তাহার পিতামাতা" তাঁহাকে চারিদিকে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন (২, ৪০—৪৬)। তাহা হইলে তো হিতে বিপরীত ঘটিয়া যায়।

৩৩। **টীকা ঃ মরিয়মের বিস্ময়**—ফেরেশতাদের মারফতে নিজের পুত্র-বতী হওয়ার খোশ-খবর শুনিয়া, স্বভাবতই মরিয়মের মনে একটা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—আমি যে অবিবাহিতা কুমারী। কোনও পুরুষ যে আমাকে এ পর্যন্ত স্পর্শ করে নাই। উত্তর আসিল "এই রূপেই।" অর্থাৎ, তুমি যেরূপে বলিতেছ, সেইরূপেই আল্লাহ্‌র চিরন্তন নিয়ম অনুসারেই তুমি

সন্তানের মা হইবে। "এইরূপে" শব্দকে আয়াতের শেষাংশের সহিত মিলাইয়াও অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহাতেও আসল তাৎপর্যের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না।

৩৪। **টীকা: ঈছার অলৌকিক কীর্তিকলাপ**—৪৬, ৪৭ ও ৪৮ আয়াতের "আল্লাহ্ তাহাকে রাছুলরূপে প্রেরণ করিবেন বানি-ইছ্‌রাইল জাতির নিকট" পর্যন্ত, বিবি মরিয়মের প্রতি আল্লাহ্‌র কালাম। তাহার পর হইতে আরম্ভ হইতেছে হযরত ঈছার উক্তি। হযরত ঈছার স্বজাতীয়দিগের কাছে গিয়া কি বলিবেন ও কি করিবেন, সেই ভাবী ব্যাপারগুলির অভিব্যক্তি করা হইতেছে হযরত ঈছার বিশেষ প্রকারের নিজস্ব ভাষায়। আয়াতের বাকধারা পরিবর্তনে, গুঢ় তত্ত্বের প্রতি একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত আছে।

আমাকে আল্লাহ্ যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য দিয়াছেন, তদনুসারে এই আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। স্থানাভাববশতঃ তাহার সংক্ষিপ্তসার, একটা ভূমিকার আকারে পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করিতেছি।

(১) এই সূরার নাম হইয়াছে আল-এমরান। বিবি মরিয়মের পিতার নাম এমরান, তাঁহার স্বজনবর্গের ধর্মসাধনা সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবরণ এই সূরায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) এই সূরার ২ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ হযরত মোহাম্মদের প্রতি কোর্‌আন নাজেল করিয়াছেন এবং তাহার পূর্বে তাওরাত ও ইন্‌জিল নাজেল করিয়াছিলেন সমসাময়িক মানুষের হেদায়েতের জন্য। (এই সব আছমানী কেতাবের সঙ্গে সঙ্গে) তিনি মানুষকে দিয়াছেন ফোর্‌কান বা বিচার-বুদ্ধি।

(৩) এই সূরার প্রথম হইতে কিছু কম বেশী ৮০ আয়াত পর্যন্ত খ্রীষ্টানদিগের বিভিন্ন কুসংস্কারের আলোচনা ও তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। যীশু যে ঈশ্বর হইতে পারেন না, তিনি যে অতি-মানুষ ছিলেন না এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য নবী-রাছুলের তুলনায় তাঁহার যে অতিরিক্ত কোনও ফজিলত ও বিশেষত্ব ছিল না —মোটের উপর ইহা প্রমাণ করাই আয়াতের উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানী কুসংস্কারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় যাহাতে, এমন কোনও বিষয়ের সমর্থন কোর্‌আনে থাকিতে পারে না।

(৪) আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে মাতার জরায়ুতে যেরূপ ইচ্ছা আকার দিয়া থাকেন, ৫ আয়াতে (বাহ্যতঃ অসংলগ্নভাবে) এই কথা বলার অব্যবহিত পরে, ৬ আয়াতে উল্লেখ করা হইতেছে, কোর্‌আনের মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্ আয়াত-

গুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে (৬ টীকা দেখুন)। ধাতুগত হিসাবে যে শব্দের বা আয়াতের একটি মাত্র অর্থ হইতে পারে, তাহা মোহ্কাম এবং তাহাই হইতেছে কোর্আনের সমস্ত শিক্ষার মূল ভিত্তিস্বরূপ। পক্ষান্তরে যে সব শব্দের বিভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইতেছে মোতাশাবেহ্। প্রত্যেক স্থানে এই শব্দগুলির অর্থ নির্ধারণ করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট মোহ্কাম আয়াতগুলির সহিত সুসমঞ্জসভাবে। বিবি মরিয়মের ও হযরত ঈছার প্রসঙ্গেও এই নীতির অনুসরণ করিতে হইবে —সূরার প্রারম্ভভাগে এ ইঙ্গিতও দেওয়া হইতেছে।

(৫) সূরার প্রথমে (২ আয়াতে) কোর্আন ও ফোরকানের সঙ্গে সঙ্গে তাওরাত ও ইঞ্জিলেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহুদীদের সঙ্গে একটা বিরোধনীয় বিষয়ে (কবুলা ডিক্রী হাসিল করার জন্য) এই সূরার ৯২ আয়াতে তাহাদিগকে তাওরাত আনিতে ও তাহা পাঠ করিতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইতেছে। এই শ্রেণীর আয়াত-গুলি হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে পরাজিত করার জন্য আবশ্যক হইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে, প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রমাণ প্রয়োগ করা অনুচিত হইবে না। এই ক্ষুদ্র ভূমিকার পর, এখন আমি মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যীশুর প্রচার-পদ্ধতি: ৪৮ আয়াত হইতে বাকধারার পরিবর্তন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, ইহার পরবর্তী উক্তিগুলি আল্লাহ্‌র নহে, বরং হযরত ঈছার। বাইবেলের বর্ণনা হইতে নিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে যে, যীশু তাঁহার তিন বৎসর নবী জীবনে জনসাধারণের সম্মুখে কথা বলিয়াছেন, হেঁয়ালীর ভাষায়, রূপক উপমা উদাহরণের মধ্য দিয়া। "হেঁয়ালী ব্যতীত তিনি কথা বলিতেন না।" এমন কি তাঁহার খাছ শিষ্য-শাগরেদরাও অনেক সময়, তাহা বুঝিতে পারিতেন না। মার্ক বলিতেছেন: "All these things spake Jesus unto the maltitude in parables ; and without a parable spake he not unto them ; And when they were alone, he expounded all things to his deciples. (4—34)

"এই সমস্ত কথা যীশু জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেন রূপক উপমা উদাহরণের ভাষায়, এবং রূপক ব্যতীত তিনি কথা বলিতেন না। পরে নিভৃত স্থানে তিনি নিজের শিষ্যদিগকে উহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন" (মার্ক ৪ ৩৪)।

এই প্রকার হেঁয়ালীর ভাষায় কথা বলার কারণ সম্বন্ধে শিষ্যগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, যীশু বলেন—"He answered and said unto them because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Therefore speak I to them

in parables" অর্থাৎ—স্বর্গের রাজ্য সংক্রান্ত গূঢ় রহস্যগুলি দেওয়া হইয়াছে কেবল তোমাদিগকে, তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। সেই জন্য আমি রূপক উপমার ভাষায় তাহাদিগের নিকট কথা বলিয়া থাকি। (মথি)।

বাইবেলের উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হযরত ঈছা জনসাধারণের মধ্যে ধর্মকথা প্রচার করিতেন এমন উপমা ও রূপকের ভাষায় যে, তাহারা সে সব কথার মানে-মতলব কিছুই বুঝিতে পারিত না। এমন কি তাঁহার খাছ শিষ্য-শাগরেদরাও অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। খ্রীষ্টান প্রচারকরা কোর্‌আনের বর্ণিত এই ঘটনাগুলিকে, তাফ্‌ছীরের রাবীদিগের সংস্কার অনুসারে, যীশুখ্রীষ্টের অতি-মানুষ এমন কি তাঁহার ঐশিক স্বরূপের প্রমাণ বলিয়া প্রচার করেন। এখানে আয়াতের বর্ণিত শব্দগুলি সম্বন্ধে কোনও প্রকার আলোচনা না করিয়া, আমি পাদ্রী সাহেবদিগকে তাঁহাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্তটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। যীশু কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত মর্ম যখন কেহ বুঝিতে পারে না, অধিকন্তু তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করার কোনও সুযোগ-সুবিধা যখন বর্তমানে নাই, তখন তাঁহার অবোধ্য উক্তি নিয়া মুছলমানদিগকে উত্যক্ত করিতে যাওয়া, তাঁহাদের পক্ষে কখনও সঙ্গত হইবে না।

আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য: আয়াতের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইলে, প্রথমে নজর দিতে হইবে তাহার শব্দগুলির উপর, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আয়াতের نفخ ' طير ' طين ' خلق ' أحى الموتى প্রভৃতি শব্দগুলি সমস্তই বিভিন্ন অর্থবাচক। ইহা ব্যতীত, শব্দগুলিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টি করার, জড়কে প্রাণীরূপে পয়দা করিয়া দেওয়ার এবং মৃত মানুষকে জীবন্ত করিয়া তোলার ক্ষমতা হযরত ঈছার ছিল এবং তিনি সফলতার সহিত সে শক্তির প্রয়োগও করিয়া গিয়াছেন। এইসব কারণে আমি আলোচ্য আয়াতটাকে মোতাশাবেহাত শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করি। আমার ধারণা, সূরার প্রারম্ভে মোহ্‌কাম ও মোতাশাবেহ্‌ আয়াতগুলি সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় পরোক্ষভাবে এই মতের সমর্থন হইয়া যাইতেছে।

সে যাহা হউক, মোটের উপর কথা এই যে, আয়াতটি নিশ্চয়ই মোতাশাবেহ্‌ শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত মোহ্‌কাম আয়াতগুলির সাহায্যে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখিতেছি যে, باذن الله (আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে) পদের আশ্রয় গ্রহণ করার

এক্ষেত্রে কোনও সার্থকতা নাই। আল্লাহ্ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, لا شريك له في الخلق والامر, সৃষ্টিকার্যে ও তাহার পরিচালনে তাঁহার কোনও শরীক নাই, হইতে পারে না। আর তিনি নিজেই অন্য কাহাকে তাঁহার শরীক হওয়ার অনুমতি দিবেন, তাওহীদ বিশ্বাসী কোনো মানুষই ইহা কস্মিনকালে স্বীকার করিতে পারে না।

বিষয়টি ভাল করিয়া বোঝার জন্য প্রথমে একটা উদাহরণ দিতেছি। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, কোর্‌আন মাজীদের বহুস্থানে আল্লাহ্ নিজেকে "আমরা" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বলিতে বহুবচন, আরবীতে বহুবচনের জন্য অন্ততঃপক্ষে তিনজন বুঝায়। যাঁহারা আলোচ্য আয়াতটিকে জাহেরী অর্থে গ্রহণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা কি শত শত আয়াতে বর্ণিত এই نحن, انا বা আমরা শব্দকেও জাহেরী অর্থে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন? আমরা জানি, কেহই শব্দগুলির এইরূপ ভুল অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, এসব ক্ষেত্রে "সম্মানার্থে বহুবচন" ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ আল্লাহ্ যে, احد বা একক, তাহা কোর্‌আন মাজীদের বহু আয়াত হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু কোর্‌আনের প্রচারিত তাওহীদ বিশ্বাসের মূলভিত্তি হইতেছে এই আকীদাটি।

আয়াতের জাহেরী অর্থ এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে কি-না, আমার মতে, তাহারও বিচার করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট মোহ্‌কাম আয়াতগুলি দ্বারা। সংক্ষেপের তাকীদে আমি এখানে প্রধান বিষয় দুইটির আলোচনা করিতেছি:

(ক) হযরত ঈছা মাটি দিয়া একটি পাখীর "সৃষ্টি" করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং তাহা অন্যান্য পাখীর ন্যায় আছমানে উড়িয়া বেড়াইয়াছিল।"

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, ইহা ইছলাম ধর্মের মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কোর্‌আন মাজীদের বহু আয়াতে এই প্রকার সংস্কারের কঠোর প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে কয়েকটা আয়াত নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

(১) আকাশ মণ্ডলের ও মর্তভূমির উদ্ভাবক তিনি, তাঁহার সন্তান আসিবে কোথা হইতে, অথচ তাঁহার ভার্যারই তো অস্তিত্ব নাই; অধিকন্তু তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন প্রত্যেক বস্তুকে এবং প্রত্যেক বস্তুকে সম্যক বিদিত আছেন একমাত্র তিনিই।

তিনিই আল্লাহ্—তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার, তিনি ব্যতীত মা'বুদ

অন্য কেহই নাই, প্রত্যেক বস্তুরই স্রষ্টা তিনি······(আনআম ১০২,১০৩,)।

(২) সাবধান : সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনি, হুকুমের একমাত্র মালেক তিনি। (আ'রাফ ৫৪)।

(৩) "হে মানব! তোমার উপর আল্লাহ্‌র যেসব নিয়ামত আছে, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ: আছে কি তিনি ব্যতীত আরও কোনও খালেক (সৃষ্টিকর্তা) ?" (ফাতের, ৩)।

(৪) "আল্লাহ্! হাঁ, একমাত্র আল্লাহ্ই হইতেছেন প্রত্যেক বস্তুর খালেক, এবং সকল বিষয়ের কারছাজ হইতেছেন তিনি। বল: আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিব, হে জাহেল সমাজ। তোমরা কি ইহার আদেশ দিতেছ আমাকে?" (জুমার ৬২, ৬৪)।

(৫) "এবং আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সবকে তাহারা খোদা বানাইয়া নিয়াছে, যাহারা কোনও কিছুকে সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহারা নিজেরাই ···।" (ফোরকান ৩)। যেমন খ্রীষ্টানরা যীশুখ্রীষ্টকে খোদা বানাইয়া নিয়াছে, অথচ কোন কিছুরই সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

(৬) নিজের সৃষ্টি রাজ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হইতেছে :

هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ؟

"এইসব হইতেছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, এখন আমাকে দেখাও, তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করিয়াছে?"

কোর্‌আনের এই মর্মের আয়াতগুলির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, কোনো কিছু খাল্‌ক বা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও নাই। অথচ আলোচ্য আয়াতে ঐ খাল্‌ক শব্দই ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে এই শব্দের অর্থ করিতে হইবে উপরোক্ত আয়াতগুলির সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া। তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলে ঘোরতর অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আলেম পাঠকগণ নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোর্‌আনে صفت خالقى কে الوهيت- এর দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মোরদাকে জিন্দা করা : আয়াতে হযরত ঈছার প্রমুখাৎ বলা হইতেছে واحى الموتى "আমি মোরদাদিগকে জীবনদান করি (বা করিব)।" কিন্তু আমরা কোর্‌আনের অন্য বহু আয়াতে দেখিতেছি যে, জীবন দেওয়ার ও মৃত্যু ঘটানোর একমাত্র মালিক হইতেছেন আল্লাহ্ (বাকারা, ২৫৮ আয়াত প্রভৃতি)। পক্ষান্তরে কোর্‌আন ও ছহীহ্ হাদীছ হইতে ইহাও সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন

হইতেছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে, কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত, তাহারা জিন্দা হইয়া উঠিতে পারিবে না (জুমার ৪৩; আম্বিয়া ৯৫)। বহু ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহ্ তাআলা শহীদদিগকে ডাকিয়া বলিবেন :

يا عبدى تمن على اعطيك

"হে আমার বান্দাহ্। প্রার্থনা কর আমার কাছে, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" শহিদগণ তখন বলিবেন: "প্রভু হে। আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তুমি, তুমি আবার আমাদিগকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দাও, যাহাতে আবার আমরা তোমার নামে জেহাদ করিতে পারি, আবার শহীদ হইতে পারি।" কিন্তু উত্তর আসিবে : তাহা হইবার নহে—قد سبق القول انهم لايرجعون

আমার চিরন্তন নির্দেশ এই যে, (মরিয়া যাওয়ার পর) আর তাহারা দুনিয়ায় ফিরিয়া যাইবে না (মোছ্‌লেম, নাছায়ী, এবন-মাজা প্রভৃতি)।

এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খাল্‌ক বা স্বষ্টির একমাত্র মালেক হইতেছেন আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও তাহার ক্ষমতা নাই। কোনও পদার্থে প্রাণের সঞ্চার করার বিন্দুমাত্র অধিকারও কোনো মানুষের নাই। মানুষ মরিয়া যাওয়ার পর, কিয়ামতের পূর্বে, তাহার পুনর্জীবিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতটি সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে এই সব আয়াতের সিদ্ধান্ত অনুসারে। এইরূপে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, বস্তুতঃ এই আয়াতের সহিত কোর্‌আনের অন্যান্য আয়াতের বিন্দুমাত্রও অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইতেছে রাবীদিগের সঙ্কলিত ও তাফ্‌ছীরের কেতাবগুলিতে সঞ্চিত কতকগুলি গল্প-গুজবকে নিয়া।

দুঃখের বিষয়, আমরা কোর্‌আনের তাফ্‌ছীর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই কেচ্ছা-কাহিনীকে মৌলিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিতে। তাহার পর কোর্‌আনকে ঐ সকল উপকথার সহিত সমঞ্জস করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি। এমন কি, প্রাসঙ্গিক আয়াতটি সম্পূর্ণভাবে স্মরণ রাখার দরকারও অনেক সময় আমরা অনুভব করি না।

৪৮ আয়াতের প্রথম অংশ হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, হযরত ঈছা কতকগুলি উক্তি করিতেছেন রাছুলরূপে নিয়োজিত হওয়ার পর। আমাদের হযরত (এবং খুব সম্ভব অন্যান্য নবীরাও) নবুয়তের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৪০ বৎসর বয়স অতিক্রম করার পর। কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের উপর এই গুরুভার কখনও অর্পিত হয় নাই, এবং হইতে পারে না।

একটা উদাহরণ দিতেছি—

এবন-এছ্‌হাক বলিতেছেন, "হযরত ঈছা একদা কতকগুলি বালকের সঙ্গে ছিলেন। তখন তিনি কিছুটা মাটি নিয়া সহপাঠীদিগকে বলেন—আমি মাটি দ্বারা তোমাদের জন্য পাখী বানাইয়া দিতেছি। তখন তিনি বালকদের কথামতে পাখী বানাইলেন···তাহা উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল," ইত্যাদি। (এবন-জরীর প্রমুখ)। ফলতঃ হযরত ঈছা যে তখন আল্লাহ্‌র রাছুল ছিলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন না—একথা কাহারও খেয়ালে আসিতেছে না। ইহা ব্যতীত এবন-এছ্‌হাকের বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হইতেছে যে, মাটির পাখীতে হযরত ঈছার ফুৎকার করার পর خرج يطير بين كفيه পাখীটা হযরত ঈছার দুই করপুটের মধ্যে উড়িতেছিল। (এবন-জরীর)।

এই বর্ণনাটা কোনও মতেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। কারণ, (ক) হযরত ঈছার নবী জীবনের ঘটনাকে ইহাতে তাঁহার শৈশবকালের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (খ) এই ঘটনার সাক্ষী হইতেছে দূর অতীতের কোনও পাঠশালার কয়েকটি বালক। (গ) এবন-এছহাকের কল্পনা বা ইহুদীদিগের উপকথা ব্যতীত আর কোথাও এই বালকগণের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। (ঘ) রেজাল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে, মূল রাবী এবন-এছ্‌হাকও আদৌ নির্ভর-যোগ্য নহেন (মীজানুল-এ'তেদাল)।

এই শ্রেণীর যুক্তিহীন, প্রমাণহীন ও হাস্যকর রেওয়ায়তে তাফ্‌ছীরের কেতাব-গুলি পূর্ণ হইয়া আছে। ইহার আর একটা উদাহরণ হিসাবে, আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট লেখকের তাফ্‌ছীর হইতে আর একটা বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি: "অহাব বলিতেছেন, যতক্ষণ লোকেরা উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিত, ততক্ষণ উহা উড়িয়া যাইত। আর যখন উহা তাহাদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত, মৃত অবস্থায় পতিত হইত।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাহার মৃত অবস্থায় ভূপতিত হওয়ার ঘটনা কেহই দেখিতে পায় নাই।

শাব্দিক আলোচনাঃ—পূর্বে বলিয়াছি যে, আয়াতটি মোতাশাবেহ্‌ শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ ইহাতে বর্ণিত কতকগুলি শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে। সুতরাং মোহ্‌কাম বা দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দগুলির সুসঙ্গত তাৎপর্য নির্ধারিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধারণভাবে এই শব্দগুলির যে সব তাৎপর্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহার অসঙ্গতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই নেতিমূলক আলোচনা শব্দগুলির সঙ্গত তাৎপর্য নির্ধারণের

পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে, তাহারও একটু আভাস দিয়া রাখিতেছি—

(১) اخلق আখলোকো—অভিধানের হিসাবে খাল্‌কুন্‌ শব্দের অর্থ হইতেছে—নির্মাণ করা, গঠন করা, একটা পরিমাণে নিরূপিত করা।

(২) لكم লাকুম—তোমাদের মঙ্গলের জন্য। হযরত ঈছা রাছুল হিসাবে বানি-ইছরাইল জাতিকে এই কথা বলিতেছেন। সুতরাং বালক ঈছার মকতবের সহপাঠী বালকদিগকে "পক্ষী সৃষ্টি করার মোজেজা" দেখানোর যে উপকথা এই উপলক্ষে রচনা করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। ইহা ব্যতীত اخلق মোজারের ছিগা। উহার অর্থ—"নির্মাণ করিতেছি ও নির্মাণ করিব" উভয় হইতে পারে। আমি "করিব" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ হযরত ঈছা তাঁহার নবী জীবনে মৃতবৎ বানি-ইছরাইল জাতিকে আবার একটি জীবন্ত জাতিরূপে সংগঠিত করিবেন, নবুয়তের প্রথম পর্যায়ে সেই সুসংবাদ ঘোষণা করা হইতেছে।

(৩) طين তীন—আরবী ভাষায় তীন শব্দের অর্থ—কাদা মাটি, جبلت-طينت বা সহজাতবৃত্তি, মানুষের প্রকৃতিগত সৎ-অসৎ চরিত্র। (কামুছ, জাওহারী, মাওয়ারেদ)। বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদেও এই প্রসঙ্গে Tin (তীন) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। (যিশাইয় ১—২৫)। বাংলা বাইবেলে উহার অনুবাদ করা হইয়াছে—"ক্ষার দ্বারা তোমার খাদ উড়াইয়া দিব।" মোটের উপর বাইবেলের বর্ণনার সারমর্ম এই যে, বানি-ইছরাইলের জাতীয় চরিত্রে যে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দীর্ঘকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, ঈমানের অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা তাহা দূর করিয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে তাহাদিগকে আবার একটা সম্ভ্রান্ত জাতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ করা হইবে।

(৪) طير তায়র—তায়র বহুবচন, একবচনে طائر তা'য়ের। কোর্-আনের অন্যান্য সব স্থানে এই নিয়মে শব্দ দুইটির ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু তথাচ আমাদের একদল তাফ্‌ছীরকার, "কেবল এই আয়াতে" তায়রকে একবচন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ অন্য রাবীরা আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত সংবাদ দিতেছেন যে, হযরত ঈছা বিবিধ প্রকারের বহু পাখী সৃষ্টি করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তায়রুন্‌ শব্দের মূল অর্থ—উড্ডীয়মান হওয়া, যাহা উড়িয়া বেড়ায়—পাখী, মানুষের আমল, বিনয়ী, timid বা ভীরু।

نفخ নাফ্‌খুন,—ইহার অর্থ ফুৎকার বা ফুৎকার করা, ভাবার্থে হৃষ্টপুষ্ট

হওয়া। হযরত ঈছা নিজের অভ্যস্ত রূপক উপমার ভাষায় বলিতেছেন—অতঃপর আমি সেই (কর্দম নির্মিত) পক্ষীগুলিতে ফুৎকার করিব, আর তাহা উড্ডীয়মান পাখী, অথবা হৃষ্টপুষ্ট সমাজে পরিণত হইয়া যাইবে। الانتفاخ।الا هلة। পদের তাৎপর্যও ইহাই। (মাজ্‌মাউল-বেহার)। ফুৎকার করিলে অনেক বস্তু ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে—মূলের এইভাব হইতে হৃষ্টপুষ্ট অর্থ গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক মূল এবারত হইতেছে মাটির পাখীতে ফুৎকার করা এবং তাহা পাখীর ন্যায় হইয়া যাওয়া।

খ্রীষ্টান প্রচারকরা কোর্‌আনের এই পাখী সংক্রান্ত বর্ণনাটাকে যীশুর ঈশ্বরত্বের অন্যতম প্রধান প্রমাণ হিসাবে মুছলমানদিগের মোকাবেলায় পেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে রূপক বর্ণনা, বাইবেল হইতেও তাহা প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। গীত-সংহিতার ৮৪—৩ পদে বর্ণিত হইয়াছে "সত্য চটক পক্ষী এক কুলায় পাইয়াছে, খঞ্জন পক্ষী নিজ শাবক রাখিবার বাসা পাইয়াছে; তোমার বেদিই সেইস্থান, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, আমার রাজন আমার ঈশ্বর," চটক পক্ষী ও খঞ্জন পক্ষীরাই যে, বস্তুত: সদাপ্রভুর বেদীর উপর আবাস স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল, ইহা সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া, গীতটাকে কতিপয় বিশিষ্ট খ্রীষ্টান লেখকও রূপকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বাইবেলের বিখ্যাত টীকাকার B. P. Horne বলিতেছেন:

It is evidently the design of this Passage to intimate to us, that in the house, and at the alter of God, a faithful soul findeth freedom from the fare and sorrow, quiet of mind, and gladness of sprit, like a bird that have a little mansion, for the reception and education of her young.

(Bible, with commentries from Henry and Scott, 1851.)।

এই মন্তব্যের সারমর্ম এই যে, চটকপক্ষী ও খঞ্জনপক্ষী বলিয়া মোমেন বান্দাদের আত্মাকে বুঝাইতেছে। তাহারা সদাপ্রভুর বেদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রশান্ত ও নিশ্চিতভাবে রূহানী আনন্দ ও শাশ্বত শান্তি ভোগ করিতে পারিবে। ফলতঃ পাদ্রী সাহেবরাও এক্ষেত্রে পাখী—অর্থে "আছমানে উড্ডীয়মান পক্ষী" গ্রহণ না করিয়া মোমেন মানুষের আত্মা বলিয়া উহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "হোশেয় ভাববাদীর" পুস্তকে পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে, বিক্ষিপ্ত ও অভিশাপগ্রস্ত ইহুদী জাতি সদাপ্রভুর আহ্বান শুনিয়া আবার জাতীয় কেন্দ্রে সমবেত হইবে ويطيرون مثل الطائر من مصر "এবং মিছর হইতে তাহারা উড়িয়া আসিবে পাখীর মত।" (১১—৭)।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, খাল্ক, তীন ও নাফ্খ প্রভৃতি শব্দগুলি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এই المعنى। متشابه শব্দগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে, মোহ্কাম আয়াতগুলির সিদ্ধান্তের এবং তাওহীদ ধর্মের মৌলিক নীতিগুলির সহিত সমঞ্জস করিয়া। এই নিয়ম অনুসারে আয়াতের তাৎপর্য এইরূপ দাঁড়াইবে: ঈছা বলিলেন: হে বানি-ইছরাইল জাতি। তোমাদের জাতীয় জীবনের মৌলিক অবদানকে অবলম্বন করিয়া, আবার তোমাদিগকে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে সংগঠিত করার চেষ্টা পাইব। এই গঠনের জন্য প্রথমে বাহিরের দিক দিয়া তোমাদিগকে সংহত করিব, তোমাদের সামাজিক কাঠামোটা সুগঠিত হওয়ার পর, তোমাদের অন্তরে অন্তরে জাগাইয়া তুলিব আত্মিক প্রেরণা। এইরূপে তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আবার একটা শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে। কিন্তু এজন্য তোমাদিগকে চলিতে হইবে আমার ফরমাঁবরদার হইয়া। আর সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহি। তোমাদের ন্যায় আমিও আল্লাহ্র বান্দাহ্ সুতরাং তোমরা সকলে বন্দেগী করিবে একমাত্র তাঁহার (৫০ আয়াত দেখুন)।

৩৫। টীকা: অন্ধকে চক্ষুদান, ইত্যাদি—হযরত ঈছা বানি-ইছরাইল জাতিকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিতেন—(১) আমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোকদিগকে সুস্থ করিয়া দিব, (২) মোরদাদিগকে জিন্দা করিয়া তুলিব, (৩) তোমরা যাহা ভোগ কর আর যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখ, তাহার সংবাদ আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। নিম্নে বিষয়গুলির যথাক্রমে আলোচনা করিতেছি:

(১) অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী—মূলে আক্মাহ্ اكمه ও আবরাছ ابرص শব্দ আছে। সকল শ্রেণীর অন্ধকে আক্মাহ্ বলা হয়। আবরাছ برص মাছদার হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ, ধবল বা শ্বেত কুষ্ঠ (White leprosey)।

যে ব্যক্তি বিবেক-বুদ্ধি বর্জিত, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য যাহার চোখে পড়ে না এবং পড়িলেও মোহান্ধ হইয়া থাকার ফলে তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না—সেই শ্রেণীর লোকদিগকে কোর্আনের বহু আয়াতে "অন্ধ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা বাকারার ১৮ আয়াতে ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "বধির তাহারা, মূক তাহারা, অন্ধ তাহারা, সুতরাং তাহারা আর ফিরিবে না।" সূরা আ'রাফের ১৭৯ আয়াতে বলা হইয়াছে:

لهم قلوب لايفقهون بها' ولهم اعين لايبصرون بها' ولهم اذان لايسمعون بها - الايه -

"তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তাহা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করে না, আর তাহাদের চক্ষু আছে কিন্তু তাহা দ্বারা দর্শন করিতে চায় না, এবং তাহাদের কান আছে—কিন্তু তাহা দ্বারা শ্রবণ করার চেষ্টা পায় না...।" সূরা হজ্জের ৪৬ আয়াতে বলা হইতেছে যে, বাহ্যিক দর্শনেন্দ্রীয়ের অন্ধতা প্রকৃত অন্ধতা নহে বরং মানস নেত্রের অন্ধতাই হইতেছে প্রকৃত অন্ধতা।

বস্তুতঃ জ্ঞান-চক্ষের অন্ধতা বা দৃষ্টি বিভ্রম দূর করিয়া দেওয়াই হইতেছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাছুলগণের প্রধান কর্তব্য, এবং হযরত ঈছাও এখানে এই হিসাবে নিজ ওম্মতের "চক্ষুদান" করার চেষ্টা পাইতেছেন। এইরূপে অন্য সমস্ত আধ্যাত্মিক রোগের প্রতিকার চেষ্টা করাও তাঁহাদের নবী জীবনের প্রধান কর্তব্য। فی قلوبهم مرض অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে আছে রোগ—বলিয়া কোর্আন মাজীদের বহু আয়াতে এই সব মানস-ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (দেখুন ৪১—৪৪ ; ১০—৫৭ প্রভৃতি)।

২। **মোরদাকে জিন্দা করা**—এ সম্বন্ধে এই টীকার প্রথমদিকে ও অন্যান্য আয়াতের তাফ্ছীরে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে মোরদাকে জিন্দা করার অর্থ—মৃত জাতিকে নূতন জীবনদান, জনগণকে আত্মার প্রেরণায় নবভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।

৩। **ভোগ ও সঞ্চয়**—আয়াতে تاكلون ও تدخرون শব্দ দুইটি মোজারের ছিগা। ইহার অর্থ—ভোগ করিবে বা করিতেছ এবং সঞ্চয় করিবে বা করিতেছ, উভয় হইতে পারে। আমি অনুবাদে প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই (৪৭) আয়াতের প্রথমে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, হযরত ঈছা এই সব উক্তি করিতেছেন, আল্লাহ্‌র রাছুল হিসাবে। মানুষ পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগ নিয়া আত্মহারা হইয়া থাকিবে, না, পরকালের জন্যও পুণ্য সঞ্চয় করিতে থাকিবে—ইহার ব্যবস্থা সকলকে জানাইয়া দিবেন, ইহাই হযরত ঈছার ঘোষণা। "ভোগ করিতেছ" বা "সঞ্চয় করিতেছ" বলিয়া অর্থ গ্রহণ করিলেও মূল প্রতিপাদ্যের বিশেষ কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

কিন্তু কোনও কোনও রাবী বলিতেছেন ইহা হযরত ঈছার শৈশবের ঘটনা। তাঁহারা ক্রিয়াপদ দুইটিকে বর্তমানকাল হিসাবে গ্রহণ করিতছেন, একটা জঘন্য গল্পকে কোর্আনের দ্বারা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে। গল্পটি এই:

"বাল্যকালে হজরত ঈছা সহপাঠী বা খেলার সাথীদিগকে বলিতেন: তোমাদের মায়েরা অমুক অমুক খাওয়ার জিনিস তৈয়ার করিয়াছে এবং

সেগুলি সারিয়া রাখিয়াছে, যেন তোমরা জানিতে না পার। মায়েরা কোন্ জায়গায়, কোন্ পাত্রে সেগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাও হযরত ঈছা তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন। বালকেরা বাড়ী গিয়া খাওয়ার জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য মায়েদের কাছে আবদার করিলে, তাঁহারা তাহা অস্বীকার করিতেন। কিন্তু ছেলেগুলির সবই জানা ছিল। তাহারা বলিয়া দিত, ওখানে ঐ পাত্রে সেগুলি লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। মায়েরা তখন জিজ্ঞাসা করিতেন— এসব বৃত্তান্ত তোমরা জানিতে পারিলে কি করিয়া? তাহারা বলিয়া দিত— মরিয়মের পুত্র ঈছা আমাদিগকে এই সব তথ্য জানাইয়া দিয়াছেন।

মায়েরা তখন এই ব্যাপার নিয়া খুব বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং পুরুষদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া দিয়া বলিলেন—তোমরা যদি অতঃপর নিজেদের পুত্রদিগকে ঈছার সঙ্গে মিশিতে দেও, তাহা হইলে সে ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে অধঃপাতে দিয়া ছাড়িবে। ইহার পর, ঈছার সংস্রব হইতে রক্ষা করার জন্য ইহুদী সমাজের লোকেরা, সমস্ত শিশুপুত্রদিগকে ধরিয়া একখানা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল।

খেলার সাথীদিগকে দেখিতে না পাইয়া বালক ঈছা তাহাদের সন্ধানে বাহির হইয়া সেই গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ঘরে কি আছে? সেখানকার লোকেরা বলিল, আছে কতকগুলি বাঁদর ও শূয়োর। ঈছা তখন বলিলেন—'তবে তাহাই হউক।' কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরওয়াজা খুলিয়া দেখা গেল, তার মধ্যে কিলবিল করিতেছে কতকগুলা শূকরছানা আর বাঁদরের বাচ্চা।

হযরত ঈছার অসাধারণত্ব প্রমাণ করার জন্য গল্পটার সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং কতকগুলি তাফ্ছীরের কেতাবেও উহাকে স্থানদান করা হইয়াছে॥

৩৬। টীকা: ঈছার বিশেষ পায়গাম—৪৯ ও ৫০ আয়াতে হযরত ঈছার দুইটা বিশেষ পায়গামের উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন:

(ক) তাওরাতের 'যে অংশ' আমার সম্মুখে আছে, আমি তাহার তাছদীক বা সত্যতা স্বীকার করি। من التوراة পদের "মিন্"কে আমি تبعيضی বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, আয়াতের বর্ণিত বিষয়ের সহিত ইহাই সুসমঞ্জস। হযরত ঈছা যদি সমসাময়িক তাওরাতকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সেই তাওরাতের বর্ণিত কতকগুলি হারামকে তিনি হালাল করিয়া দিতে পারিতেন না। আয়াতের এই অংশ দুইটি পরস্পর বিরোধী বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছে (কাবীর), আমার অনুবাদ গ্রহণ করিলে

তাহার উত্তরের জন্য কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেওয়ারও দরকার হয় না। ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতরা যে তাওরাতে বহু তাহ্‌রীফ বা প্রক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা কোর্‌আনে পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার অন্ততঃ একটা বড় অংশ যে, কালক্রমে নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাও স্বীকৃত বিষয়। তাই হযরত ঈছা বলিতেছেন—"প্রকৃত তাওরাতের যে অংশটা আমার সম্মুখে আছে, আমি তাহার তাছ্‌দীক করি"—যেমন আমরা তাওরাত ও ইন্‌জীলের তাছ্‌দীক করিয়া থাকি।

এখানে হযরত ঈছার দ্বিতীয় পায়গাম হইতেছে তাওহীদের শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে নরপূজার প্রতিবাদ। তিনি বলিতেছেন, "আমি প্রভু নহি, একজন বান্দাহ্‌ মাত্র। নিশ্চয় জানিও, আমার ও তোমাদের সকলের প্রভু হইতেছেন, আল্লাহ্‌।" সুতরাং খ্রীষ্টানদিগের নরপূজার কঠোর প্রতিবাদও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইতেছে।

৩৭। টীকা : ঈছা ও আনছার—হযরত ঈছার সংক্ষিপ্ত নবী-জীবনের অল্প কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইহুদী সমাজের পণ্ডিত-পুরোহিতরা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, উচ্চস্তরের অবস্থাপন্ন লোকেরা তাহাদের সহায়তা করিতে লাগিল এবং অবশেষে বিদেশী ও বিধর্মী রাজ-প্রতিনিধির নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার দস্তরমত মামলাও আরম্ভ করিয়া দিল। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ও তাঁহার সতী-সাধ্বী জননীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার তো অবধি ছিল না।

এই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়াইয়া, সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া হযরত ঈছা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্য ধর্মের প্রচার কার্যে, কে আমাকে সাহায্য করিবে?—কাহারা হইবে আমার আন্‌ছার? ঈছার এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিলেন কয়েকজন হাওয়ারী। তাঁহারা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—আমরা আছি আল্লাহ্‌র আন্‌ছার! ঠিক এইভাবে, হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত, হযরত প্রত্যেক হজের মওছুমে, সমাগত জনগণের নিকট ঘোষণা করিতেন :

من رجل يؤويني حتى ابلغ كلام ربي' فان قريشا قد منعوني ان
ابلغ كلام ربي - كثير

"কে আছে এমন ব্যক্তি, যে আমাকে আশ্রয় দিবে—যেমতে আমি আমার পরওয়ারদেগারের কালাম সর্বত্র পৌছাইয়া দিতে পারি? দেখ, কোরেশরা

আমাকে এই কার্যে বাধা দিতেছে।'' এইরূপ প্রচার প্রসঙ্গেই অবশেষে মদীনাবাসী যাত্রীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়…তাঁহারা কি প্রকারে ধন-প্রাণ কোরবান করিয়া ইছলাম ধর্মের খেদমত করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা সোনার অক্ষরে লিখিত হইয়া আছে।

আল্লাহ্‌র (কাজে) আনছার হইবে যে ব্যক্তি, তাহার বায়আতের প্রধান সঙ্কল্প হইতেছে দুইটি—ঈমান ও আমল বা বিশ্বাস ও কর্ম। হাওয়ারীরা বলিতেছেন—আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আর সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি তাঁহার হুজুরে ; এবং এই ব্যাপারে তাঁহারা হযরত ঈছাকেও সাক্ষী করিয়া রাখিতেছেন। এইরূপ একটা আত্মনিবেদিত এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত সত্যকার আনছার জামাআত গঠিত না হইলে, ইছলাম ধর্মের ও মোছলেম জাতির আদর্শ ও নিরাপত্তাকে রক্ষা করার সমস্ত ব্যক্তিগত চেষ্টা, অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও অসম্ভব হইয়া থাকিবে।

৩৮। টীকাঃ তাহাদের তদ্‌বীর ও আল্লাহ্‌র তদ্‌বীর—সূরা ফাতেরের ৪৩ আয়াতে বলা হইয়াছেঃ সতর্ককারী কোনও নবী তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহাদের অহঙ্কার ও দুরভিসন্ধি مكر السيء আরও বাড়িয়া যায়, অথচ لا يحيق المكر السيء الا باهله "দুরভিসন্ধি তো বেষ্টন করিয়া ফেলে, কেবল তাহার উদ্যোক্তাদিগকেই।'' সুতরাং এই আয়াতের ব্যবহার হইতে জানা যাইতেছে যে, মকর-শব্দ যেমন দুরভিসন্ধি ও হীন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ কোনও সৎ ও সঙ্গত মতলব বা তদ্‌বীরের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন সু-মতলব ও কু-মতলব, সৎ অভিসন্ধি ও দুরভিসন্ধি। কাহারও কু-মতলবকে ব্যাহত করার জন্য কোনো কাজ সমাধার মতলব করার অর্থেও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে (রাগেব)। "আল্লাহ্‌ও মকর করিলেন,'' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কাহারও দুরভিসন্ধির প্রতিফল প্রদান করিলেন (মেছবাহুল-মুনীর)। পরবর্তী ৫৪ আয়াতে আল্লাহ্‌র তদ্‌বীরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

---

৬ রুকূ

৫৫ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

৫৫। সেই সময়, যখন আল্লাহ্‌ বলিয়াছিলেনঃ হে ঈছা! নিশ্চয় আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব এবং তোমাকে উন্নীত করিব আমার পানে, আর

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥

সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ করিয়া দিব তোমাকে, অধিকন্তু তোমার অনুসরণ করিয়াছে যাহারা, অমান্যকারিগণের উপরে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব কিয়ামতের দিন পর্যন্ত; (৩৯) তৎপর তোমাদিগের সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে আমার পানে, সেমতে যে বিষয়ে মতভেদ ঘটাইতেছিলে তোমরা, তোমাদের মধ্যে তাহার ফায়ছালা করিয়া দিব।

৫৬ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥

৫৬। ফলতঃ অমান্য করিয়াছে যাহারা —তাহাদিগকে আমরা দণ্ডিত করিব কঠোর শাস্তির দ্বারা— দুনিয়াতে ও পরজীবনে, সে অবস্থায় কেহই থাকিবে না তাহাদের সাহায্যকারী। (৪০)

৫৭ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَ

৫৭। কিন্তু ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্মগুলি সম্পন্ন করিয়াছে যাহারা, নিজেদের অজুরা পুরা-

فِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ০

পুরিভাবে প্রদত্ত হইবে তাহারা; বস্তুতঃ জালেমদিগকে আল্লাহ্ কদাচ পছন্দ করেন না।

৫৮ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ০

৫৮। (হে রাছুল!) এই যে বিবরণ পরম্পরার আবৃত্তি করিতেছি তোমার নিকট, ইহা হইতেছে আমার নিদর্শনগুলির অন্যতম, এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ।

৫৯ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ০

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সমীপে ঈছার অবস্থা হইতেছে আদমের অবস্থার ন্যায়, তাহার সৃজন করিলেন মাটি হইতে তৎপর তাহাকে বলিলেন: "হও।" ফলে হইয়া যাইতেছে। (৪১)

৬০ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ০

৬০। এই সত্য সমাগত হইতেছে তোমার প্রভুর তরফ হইতে, অতএব সংশয়ী লোকদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৬১ فَمَنْ حَاۤجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ

৬১। তোমার নিকট (ঈছা সম্বন্ধে) যে সত্যজ্ঞান সমাগত হইয়াছে, তাহার পরেও, তোমার সহিত হুজ্জত করিতে প্রবৃত্ত হইবে যাহারা, তাহাদিগকে বল: আইস,

أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٥

তোমরা ও আমরা (উভয় পক্ষ) ডাকিয়া আনি নিজ নিজ পক্ষের পুত্রদিগকে, ও নারীদিগকে আর আমরা ও তোমরা সকলে (একত্রে সমবেত হই), তাহার পর আন্তরিকভাবে দোওয়া মোনাজাত করি, যেমতে আমরা আল্লাহ্‌র লা'নত হওয়াইয়া দেই * মিথ্যাবাদীদের উপর! (৪৩)

৬২ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ط وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥

৬২। নিশ্চয় ইহা হইতেছে যথার্থ বৃত্তান্ত, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বুদ আর কেহই নাই; আর বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

৬৩ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ع ٥

৬৩। কিন্তু তবুও যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ (তো) ফাছাদী লোকদিগের সম্বন্ধে সম্যকভাবে বিদিত আছেন।

তাফ্‌ছীর

৩৯। টীকাঃ হযরত ঈছার মৃত্যু ও উত্থান—আয়াতে প্রথমে إذ বা যখন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। পূর্ব (৫৩) আয়াতের সহিত ইহার সম্বন্ধ। অর্থাৎ, ইহুদীরা যখন তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল,

---

* جعل শব্দের বিশেষ তাৎপর্য অনুসারে এই অনুবাদ করা হইয়াছে। রাগেব দেখুন।

সেই সময় আল্লাহ্ হযরত ঈছাকে বলিয়াছিলেন, "হে ঈছা। আমি তোমাকে রক্ষা করিব। ইহুদীরা তোমাকে ক্রুশে দিয়া বা অন্য কোনো প্রকারে হত্যা করিতে পারিবে না" ইত্যাদি।

এই আয়াতের তাফ্ছীরে রাবী ও তাফ্ছীরকারগণ দশ প্রকারের পরস্পর বিরোধী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতভেদের প্রধান কারণ এই যে, অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তাঁহারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে সঞ্চিত একটা সংস্কারকে বজায় রাখার জন্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সে জন্য আয়াতে সুস্পষ্ট তাৎপর্যকে বিকৃত করিয়া নিজেদের সংস্কারের সহিত সমঞ্জস করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই চেষ্টা যে সফল হইতে পারে নাই, এই মতভেদগুলিই তাহার প্রথম প্রমাণ।

এইসব সংস্কার বর্জিত হইয়া এবং কোর্আনের ভাষা ও শব্দবিন্যাস অনুসারে, আয়াতের তাৎপর্য হইবে—ইহুদীরা যখন হযরত ঈছাকে ক্রুশে দিয়া মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিতেছিল—"সেই সময় আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন,হে ঈছা। ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রকে আমি ব্যর্থ করিয়া দিব। তোমাকে তাহারা ক্রুশে দিয়া মারিতে এবং সেমতে তোমাকে (বাইবেল অনুসারে) মাল্উন বা অভিশপ্ত বলিয়া প্রচার করিতে পারিবে না, অথবা অন্য প্রকারেও কতল করিতে পারিবে না। বরং তোমার নবুয়তের 'মিশন' পূরা হওয়ার পর, আল্লাহ্ স্বাভাবিকভাবে তোমার মত্যু ঘটাইবেন এবং নিজের সন্নিধানে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন—ইত্যাদি।

এখানে প্রথম তর্ক উপস্থিত হইয়াছে متو فيك শব্দের অর্থ নিয়া। এই শব্দের মূল মাছদার হইতেছে وفى—ধাতুগত অর্থ পরিপূর্ণ হওয়া বা করা। বিভিন্ন "বাবের" বিশেষত্ব অনুসারে এই মাছদার হইতে উৎপন্ন শব্দগুলির ব্যবহারিক অর্থে অল্পবিস্তর তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মানুষের পার্থিব জীবন-কাল পূর্ণ হইয়া যাওয়া ও তাহার মৃত্যু ঘটা, একই কথা। এই হিসাবে অফাত-শব্দের অর্থ হয়, মওত বা মৃত্যু।

কোর্আন মাজীদের বিভিন্নস্থানে এই মাছদার হইতে উৎপন্ন শব্দগুলির ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ব্যবহারগুলি মনোযোগ পূর্বক আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, কোথায় উহার মাফউল বা কর্মপদ একটি, আবার কোথায় উহা ব্যবহৃত হইয়াছে দ্বিকর্মকরূপে। যেখানে কর্মপদ ব্যবহার করা হইয়াছে দুইটি, সেখানে উহার অর্থ হইতেছে, পরিপূর্ণভাবে দান (বা গ্রহণ) করা। মওত অর্থ সেইসব স্থলে কোনো ক্রমেই গৃহীত হইতে পারে না। যেমন একটু পরে, ৫৬ আয়াতে বলা হইতেছে, يوفيهم اجورهم আল্লাহ্ মোমেনদিগকে

'তাহাদের অজুরা প্রদান করিবেন পুরাপুরিভাবে'। এখানে কর্তা আল্লাহ্ এবং কর্ম—মোমেনগণ ও অজুরা এই দুইটি। পক্ষান্তরে যেসব স্থানে এই ক্রিয়ার কর্মপদ একটি মাত্র, সেখানে উহার একমাত্র অর্থ হইতেছে মৃত্যু। যেমন সূরা ছাজদার ১১ আয়াতে বলা হইতেছে—يتوفكم ملك الموت "মওতের ফেরেশতা যখন তোমাদের অফাত করিবেন"—অর্থাৎ জান কবজ করিবেন, মৃত্যু ঘটাইবেন। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ এখানে হইতে পারে না।

এইরূপ স্থলে, 'অফ্য়োন' মাছ্দার হইতে উৎপন্ন শব্দগুলির অর্থ যে মওত ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না, কোর্‌আনের ব্যবহার হইতে তাহার আরও কয়েকটি নজীর নিম্নে উল্লেখ করিতেছি:

(ক) فكيف اذا توفيهم الملائكة ফেরেশতারা যখন তাহাদের অফাত করিবে, কিরূপ হইবে তখনকার অবস্থা ?—কেতাল।

(খ) وتوفنا مع الابرار—আর হে আল্লাহ্, আমাদের অফাত ঘটাইও সজ্জনগণের দলভুক্ত হিসাবে।—আল-এমরান।

(গ) توفني مسلما আমার মওত ঘটাইও মোছলেম অবস্থায়।—ইউছুফ।

আভিধানিক প্রমাণ: নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট অভিধানকারের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১) وتوفاه الله اى قبض روحه' والوفاة الموت - جوهرى "আল্লাহ্ তাহার অফাত করিলেন—অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহার জান কবজ করিলেন। অফাত অর্থে মওত।"—জওহারী।

(২) توفاه الله اذا قبض نفسه' لسان العرب "আল্লাহ্ তাহার অফাত করিলেন অর্থাৎ তিনি তাহার রূহ্ কবজ করিলেন—লেছানুল-আরব।

(৩) والوفات الموت' وتوفاه الله قبض روحه - قاموس "অফাত অর্থে মৃত্যু; আল্লাহ্ তাহার অফাত করিলেন, অর্থাৎ তাহার রূহ্ কবজ করিলেন।—কামূছ।

(৪) توفاه الله اماته والوفاة الموت - المصباح المنير "আল্লাহ্ তাহার অফাত করিলেন, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু ঘটাইলেন। অফাত অর্থে মওত" মিসবাহ্।

কোর্‌আন মাজীদের ব্যবহার এবং আরবী সাহিত্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের উপরে বর্ণিত প্রমাণগুলি হইতে নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আলোচ্য আয়াতের متوفيك শব্দের একমাত্র অর্থ হইতেছে—আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব। অন্যপক্ষের উল্লেখযোগ্য দলটিও বস্তুতঃ এই অর্থ অস্বীকার করিতে

পারেন নাই। কিন্তু নিজেদের সংস্কারকে বজায় রাখার জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আয়াতের শব্দগুলিকে অগ্রপশ্চাৎভাবে সাজাইয়া উহার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, কোর্আনের বর্ণিত তরতীব অনুসারে আয়াতের অর্থ হইয়া যায়—"সেই সময়, যখন আল্লাহ্ বলিলেন, হে ঈছা, আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব এবং আমার পানে তুলিয়া নিব।" এই তরতীব হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈছার মৃত্যু ঘটিবে আগে, আর তাঁহাকে উন্নীত করা হইবে তাহার পরে। অথচ "ছুন্নত জামাআতের এজমা" অনুসারে, হযরত ঈছাকে আল্লাহ্ আছমানে নিজের কাছে তুলিয়া নিয়াছেন, আজ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্বে। কিয়ামতের করীব আখেরী জামানায় আল্লাহ্ তাঁহাকে আবার দুনিয়ায় নামাইয়া দিবেন এবং সেই সময় তিনি "দাজ্জাল-বধ" করিয়া, ইছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতিকে রক্ষা করিবেন। সুতরাং এই দরকারে আয়াতের শব্দগুলিকে ওলট-পালট করিয়া লইতে হইবে।

আমি তাঁহাদের এই 'যুক্তিবাদ'কে অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। কারণ, যে কোর্আনকে আল্লাহ্ ইছলাম ধর্মের প্রধানতম মো'জেজা হিসাবে দুনিয়ায় নাজেল করিয়াছেন এবং এই মো'জেজার ঘোষণা আজ ১৪ শত বৎসর ধরিয়া দুনিয়ার দিকে দিকে, সম্পূর্ণ সার্থকতার সহিত, বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার শব্দ যোজনার ব্যতিক্রম না করিলে, পরের শব্দ পূর্বে না বসাইলে, তাহার সঠিক তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না, এরূপ কথা বলার দুঃসাহস আমার নাই। তাহার কোনও দরকার আছে বলিয়াও আমি মনে করি না।

ছুন্নত-জামাআত শব্দের অর্থ কি, কবে ও কাহাদের দ্বারা এই শব্দ দুইটি মুছলমানের ধর্মীয় সাহিত্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা কবে, কোথায় তাঁহাদের এই এজমা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া আমি সময় নষ্ট করিতে চাই না। পাঠকগণকে অতি সংক্ষেপে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট আলেম ও ইমামের সমর্থন আমার পক্ষে আছে। তাহার চারিটা মাত্র নজীর উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

(১) ইমাম এবন-হাজম বলিতেছেন :

وان عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن توفاه الله تعالى عز وجل ثم رفعه اليه، وقال عز وجل (وما قتلوه وما صلبوه) - وقال تعالى (انى متوفيك - ورافعك الى) - وقال الله تعالى عنه انه قال (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتنى كنت

انت الرقيب عليهم' وانت على كل شيئ شهيد) - وقال تعالى (الله يتوفى الا نفس حين موتها' والتى لم تمت فى منامها) - فالوفاة قسمان' نوم وموت فقط' ولم يرد عيسى عليه السلام بقوله (فلما توفيتنى وفاة النوم' فصح انه انما عنى وفاة الموت - المحلى ج ١ ص ٢٣ -

মর্মানুবাদ—হযরত ঈছা নিহত হন নাই এবং ক্রুশে দিয়াও তাঁহাকে নিহত করা হয় নাই। পরন্তু আল্লাহ্‌ তাঁহার মওত ঘটাইয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহাকে তুলিয়া নিয়াছিলেন নিজের পানে। আল্লাহ বলিতেছেন—"ইহুদীরা হযরত ঈছাকে কতলও করে নাই, অথবা শূলে দিয়াও মারে নাই।" আল্লাহ্‌ ঈছাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব এবং তোমাকে তুলিয়া নিব নিজের পানে।" আল্লাহ্‌ হযরত ঈছার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—ঈছা বলিয়াছিল, "আমি তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম আমার জীবনকাল পর্যন্ত। কিন্তু তুমি যখন আমার মৃত্যু ঘটাইলে, তখন হইতে তুমিই ছিলে তাহাদের নেগাহ্‌বান।" আল্লাহ্‌ আরও বলিতেছেন—"আল্লাহ্‌ প্রাণ-গুলিকে অফাত ঘটাইয়া থাকেন তাহার মওতের সময়, আর মৃত্যু হয় না যাহার, তাহার নিদ্রাকালে।" কিন্তু "যখন আমার অফাত ঘটাইয়াছিলে" বলিয়া হযরত ঈছা নিজের নিদ্রার অবস্থা প্রকাশ করিতে নিশ্চয় ইচ্ছা করেন নাই। অতএব ইহা সঙ্গতভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হযরত ঈছার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে স্বাভাবিক মওতের দ্বারা। (মোহাল্লা ১—২৩)।

(২) আলেম সমাজকে ইমাম মালেকের পরিচয় দিতে [illegible] হাদীছের বিখ্যাত অভিধানকার মোল্লা মোহাম্মদ তাহের বলিতেছেন :

[illegible] الاكثر ان عيسى عم لم يمت - وقال مالك مات وهو ابن [illegible] وثلاثين سنة مجمع البحار - حكم -

"অধিকাংশের মতে হযরত ঈছার মৃত্যু হয় নাই। কিন্তু ইমাম মালে[illegible] বলিতেছেন, তিনি মরিয়া গিয়াছেন ৩৩ বৎসর বয়সে।" মাজমাউল-বেহার ১—২৮৬ পৃষ্ঠা।

(৩) হযরত এবন-আব্বাছকে আমাদের আলেম ও তাফ্‌ছিরকারগণ, সাধারণভাবে حبر الامة ও ইমামুল মোফাছ্‌ছেরীন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একটা রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

عن بن عباس رض فى قوله انى متوفيك ' اى مميتك - اخرجه البخارى فى ترجمته تيسير الوصول ج ١ ص ١٠٣

"এবন-আব্বাছ্ বলিয়াছেন, এই আয়াতে বর্ণিত—আমি তোমার অফাত ঘটাইব—অর্থে আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব" (বোখারী)।

(৪) শাহ্ অলিউল্লাহ্ ছাহেব এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলিতেছেন—অর্থাৎ- متوفيك শব্দের অর্থ হইতেছে, مميتك আমি তোমার মওত ঘটাইব। (ফাৎহুল-খাবীর, ৪ পৃষ্ঠা)।

এই হিসাবে আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে, হযরত ঈছার বিরুদ্ধে যখন ইহুদীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি আরম্ভ করিয়া দেয় এবং লোকচক্ষে হেয় ও ঝুটা নবী প্রতিপন্ন করার জন্য, তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে, এবং সম্ভব হইলে, ক্রুশে দিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় আল্লাহ্ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন—হে ঈছা! নিশ্চিন্ত থাক, এই অধর্মীর দল কোনও প্রকারেই তোমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। অন্যান্য নবী-রাছুলের ন্যায় তোমারও স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হইবে এবং তুমিও তাহাদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার মাকামে উন্নীত হইবে।

রাফ্‌উন: رفع—আল্লাহ্ হযরত ঈছাকে উন্নীত করিবেন (তাঁহার পানে) ইহাই হইতেছে আয়াতের অনুবাদ। কিন্তু আরব সমাজে প্রচলিত সংস্কারের মোহ কাটাইতে না পারায়, অনেকে ইহার মতলব নিতেছেন—আল্লাহ্ হযরত ঈছাকে "জীবন্ত অবস্থায়" তুলিয়া নিবেন তাঁহার পানে—অর্থাৎ "চৌথা আছমানে।" তাঁহারা বলিতেছেন, এই ওয়াদা অনুসারে আল্লাহ্ তাঁহাকে দুই হাজার বৎসর পূর্বে আছমানে তুলিয়া নিয়াছেন। এখন তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে মিশিয়া আরশের চারিপাশে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। হযরত ঈছা পার্থিব দেহ নিয়া উড়িতেছেন কি করিয়া, এই সংশয়ের নিরাকরণ করিবার জন্য তাঁহারা ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, আছমানে চড়ার পর তাঁহার পাখনা গজাইয়াছিল; ইত্যাদি।

তাঁহারা ধারণা করিয়া নিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র অবস্থান স্থল হইতেছে আছমান। আল্লাহ্ যখন নিজের "পানে" তাঁহাকে তুলিয়া নিয়াছেন, তখন আছমান নামক স্থানে গমন করা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর থাকিতে পারে না। এই উক্তির উল্লেখ করিয়া ইমাম রাজী বলিতেছেন:

মোশাব্বেহা বা আল্লাহ্‌র আকারবাদীরা বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ্ আছমানে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই আয়াতকে তাহারা নিজেদের দাবীর প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এই কেতাবের বিভিন্ন স্থানে অকাট্য

যুক্তি-প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, আল্লাহ্ অনন্ত, অসীম, স্থান কাল ও দিকে তিনি সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। "الى। বা আমার পানে"—শব্দ দেখিয়া বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কারণ নাই। একদা হযরত ইবরাহীম বলিয়াছিলেন : انى ذاهب الى ربى - الا يه। আমি যাত্রা করিতেছি আমার "প্রভুর পানে" (সূরা ছাফ্‌ফাত)। অথচ তিনি যাইতেছিলেন এরাক হইতে সিরিয়ার দিকে। ফলতঃ আলোচ্য শব্দের অর্থ হইবে—তোমাকে আমার নির্ধারিত (الى محل كرامتى) উচ্চ মর্যাদার মাকামে উন্নীত করিব (কাবীর ২—৬৯০)।

এ সম্বন্ধে, কোর্‌আন ও হাদীছের আরও কয়েকটা ব্যবহারের নজীর উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(ক) আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে, আল্লাহ্ হযরত ঈছাকে "রাফ্‌অ" করিবেন। আল্লাহ্‌র ৯৯ নামের মধ্যে একটি হইতেছে রাফে' (رافع) ইহার অর্থ যিনি কোনো কিছুকে রাফ্‌অ করেন। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে "লেছানুল-আরবে" বলা হইয়াছে :

الرافع الذى يرفع المؤمن بالاسعاد واوليائه بالتقريب -

যিনি "মোমেনদিগকে সুমতি সম্পন্ন করেন এবং নিজের অলিদিগকে تقرب বা নৈকট্যের মর্যাদা প্রদান করেন।" হযরত ঈছাকে আল্লাহ্ এই মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

(খ) সূরা নূরের ৩৬ আয়াতে মাছজিদ প্রভৃতি এবাদতগাহগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : فى بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيه اسمه -

"সেই গৃহগুলিতে, যে গুলিকে (رفع) 'রাফ্‌অ' করার ও তাহাতে আল্লাহ্ তাঁহার জেকের করার হুকুম দিয়াছেন...।" মাছজিদগুলিকে শূন্যে তুলিয়া রাখিতে নিশ্চয় আদেশ দেওয়া হয় নাই। ইহার অর্থ ترفع اى تشرف সম্ভ্রমদান করা (রাগেব)।

(গ) সূরা ফাতেরের ১০ আয়াতে বলা হইতেছে—

اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه -

"তাহারই পানে উঠিয়া যায় সমস্ত পাক কালাম আর সমস্ত সৎকাজকে আল্লাহ্ বোলন্দ করিয়া থাকেন।" ইহার অর্থ—নেক কালামগুলিকে আল্লাহ্ কবুল করেন এবং নেক আমলগুলিকে উচ্চমর্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানেও "আল্লাহ্‌র পানে" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

অন্যপক্ষের যুক্তি-প্রমাণ—আমার বক্তব্য ও তাহার যুক্তি-প্রমাণ সম্বন্ধে

উপরে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ হইতে যে সব দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

অন্যপক্ষের প্রথম প্রমাণ হইতেছে—মে'রাজের হাদীছ। এই হাদীছের সারমর্ম এই যে, হযরত রাছুলে কারীম মে'রাজের রাত্রে, দোছরা আছমানে হযরত ঈছার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেখানে তাঁহারা পরস্পরকে অভিবাদন ও প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, হযরত ঈছা জীবন্ত অবস্থায় (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) আছমানে উঠিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই জীবন্ত অবস্থায় আজও সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

মে'রাজ সম্বন্ধে আমার মতামত যথাযথস্থানে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিয়াছি। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ হাদীছগুলির বর্ণনা অনুসারে, মে'রাজের রাত্রে রাছুলে কারীম, হযরত ঈছা ব্যতীত আরও বহু নবীর সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। আদম, ইব্রাহীম, মূছা, ইউছুফ, ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ আম্বিয়ার সঙ্গে মোলাকাতের বিবরণও ঐ সব হাদীছেই মওজুদ আছে। সুতরাং তাঁহাদের এই যুক্তি ও এই প্রমাণ অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্য কোনও নবীরই এ পর্যন্ত মৃত্যু হয় নাই, তাঁহারা সকলে জীবন্ত অবস্থায় দুনিয়া হইতে আছমানে উঠিয়া গিয়াছেন, এবং সেইভাবে আজও আছমানে অবস্থান করিতেছেন।

অন্যপক্ষের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, হযরত ঈছা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়ায় নাজেল হইবেন, "এবং দুনিয়াকে তিনি ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন, যেমন পূর্বে তাহা জুলুমে ও অনাচারে পূর্ণ হইয়াছিল।" সুতরাং জানা যাইতেছে যে, হযরত ঈছা মৃত্যুর পূর্বে আছমানে উঠিয়া গিয়াছিলেন এবং আজও জীবন্ত অবস্থায় সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

তাঁহাদের এই "সুতরাং" শব্দের কোনো সঙ্গতি আছে বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণ, মৃত্যুর পরেও তো আল্লাহ্ তাঁহাকে দুনিয়ায় নাজেল করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের মত অনুসারে, হযরত ঈছা যখন দুনিয়াতে বহু যুগের বহু মৃত মানুষকে কবর হইতে—আল্লার হুকুমে—জীবন্ত করিতে পারিয়াছেন, তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁহাকে জীবন্ত করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। হযরত ঈছার দুনিয়ায় নাজেল হওয়া সম্বন্ধে যে সব বিবরণ বিভিন্ন হাদীছের কেতাবে

বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে, দাজ্জালকে কতল করাই হইবে, তাঁহার এই পুনরাগমনের প্রধান কর্তব্য (মোছলেম, তিরমিজী, মেশকাত, এবন-জরীর প্রভৃতি)। 'মালাহেম' বা ভবিষ্যতের সংঘটনীয় ব্যাপারগুলির বিভিন্ন স্থানে যে সকল অসামান্য সমস্যার সৃষ্টি হইয়া আছে, এই দাজ্জাল হত্যার ব্যাপারটা হইতেছে তাহার অন্যতম।

নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ও হযরত ঈছার পুনরাগমন সংক্রান্ত রেওয়ায়তগুলিকে যদি অবশ্য-বিশ্বাস্য হাদীছ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিশ্চিতভাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত রাছুলে কারীমের জীবনকালেই দাজ্জালের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তাঁহার এন্‌তেকালের কিছুদিন পরে স্বাভাবিকভাবে তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইহার কয়েকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১) জাবের, আবু-জর, এবন-ওমর প্রমুখ ছাহাবীরা আল্লাহ্‌র নামে হলফ করিয়া বলিতেছেন, "এবন-ছাইয়াদই দাজ্জাল"—(বোখারী, মোছলেম, আহমদ প্রভৃতি)।

(২) ছাহাবী জাবের বলিতেছেন, "আমি নিজ কানে শুনিয়াছি, ওমর হযরতের সম্মুখে হলফ করিয়া বলিতেছেন যে, এবন-ছাইয়াদই দাজ্জাল। অথচ হযরত, ওমরের এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই"—(বোখারী, মোছলেম)।

(৩) ছাহাবী জাবেরের আর একটি বর্ণনায় জানা যাইতেছে, স্বয়ং হযরতও এবন-ছাইয়াদকেই দাজ্জাল বলিয়া আশঙ্কা করিতেন (মেশকাত)।

পাঠক দেখিতেছেন, রেওয়াতগুলি সরল, প্রাঞ্জল ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে এবং সেগুলি সমস্তই বোখারী ও মোছলেমের হাদীছ। সুতরাং এ সম্বন্ধে অন্যপক্ষ কোনও চুঁ-চেরা করিতে পারেন না। এ অবস্থায় হযরত ঈছার আবার দুনিয়ায় আসার বিশেষ কোনও দরকারই থাকিতেছে না।

অন্য দুইটি প্রতিশ্রুতি—আয়াতে হযরত ঈছাকে চারটি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম দুইটি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রতিশ্রুতিতে হযরত ঈছাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক করার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। মানুষের সম্বন্ধে যত প্রকার অপবাদ রটনা করা হয়, মাতৃনিন্দাই হইতেছে তাহার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। ইহুদীরা প্রকাশ্যভাবে বলিয়া বেড়াইত, ঈছা জারজ সন্তান। তাঁহার মাতা ভ্রষ্টা। পান্‌থার নামক এক সৈনিকের সহিত মেরীর ব্যভিচারের ফলে যীশুর জন্ম হইয়াছিল। অন্যপক্ষে খ্রীষ্টানরা

যীশুকে জারজ বলিয়া স্বীকার না করিলেও বলিত যে, যীশু-জননী হযরত মরিয়ম গর্ভবতী হইয়াছিলেন, পবিত্রাত্মা দ্বারা। এই অস্পষ্ট ও অবোধ্য উক্তি দ্বারা ইহুদীদের আরোপিত অপবাদের খণ্ডন করা হয় নাই, বরং প্রকারান্তরে সমর্থনই করা হইতেছে।

তাওরাতের নির্দেশ অনুসারে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াইয়া বা ক্রুশে আবদ্ধ করিয়া যাহার জীবন নাশ করা হয়, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে সে হইয়া যায় মাল্‌উন বা অভিশপ্ত। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১—২৩)। ইহুদীরা এই হিসাবে আল্লাহ্‌র মহান নবী হযরত ঈছাকে মাল্‌উন বলিয়া প্রচার করিত। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানরাও ছালিবে বা ক্রুশে যীশুর মৃত্যু হওয়ার কথা এবং সে মতে তাঁহার অভিশপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করিয়া থাকে, (গালাতীয় ৩—১৩)। খ্রীষ্টানী বাইবেলের অন্যত্রও এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমর্থন পাওয়া যায়। (দেখুন ২ করন্থীয়, ৫—২১)। এই সব অপ-কলঙ্ক ও অন্ধ বিশ্বাসের বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলোক জ্বালাইলেন, সতী-সাধ্বী বিবি মরিয়মকে ও তাঁহার মহামান্য পুত্র হযরত ঈছাকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সমস্ত অপবাদ ও অপবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া দিলেন —হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা, কোরআন মাজীদের খোদায়ী তা'লীম অনুসারে। আখেরী জামানায় নাজেল হইয়া, হযরত ঈছা ইছলামকে পুনর্জীবিত করিবেন— এই ধারণা কতদুর সঙ্গত বা অসঙ্গত, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। আমি কিন্তু না বলিয়া পারিতেছি না যে, নাবী আখেরুজ-জামান আসিয়া হযরত ঈছার সত্য স্বরূপকে নবজীবন দান করিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

যাহারা হযরত ঈছার শিক্ষার অনুসরণ করে না, মুখে খ্রীষ্টান বলিয়া তারা যতই আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করুক না কেন, তাঁহার তাবেদার বলিয়া তাহারা গণ্য হইতে পারে না। হযরত ঈছার নবী জীবনের প্রধান শিক্ষা হইতেছে, অমিশ্র তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ এবং নরপূজার কঠোর প্রতিবাদ। সুতরাং মুছলমান সমাজই হইতেছে তাঁহার একমাত্র তাবেদার জামাআত। আমার মনে হয় নাস্তরীয় ও Unitarian প্রভৃতি কয়েকটা দল বাদে, খ্রীষ্টান নামে পরিচিত অন্য কোনও সম্প্রদায়কে বাইবেল অনুসারে খ্রীষ্টান আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হইতে পারে না।

আয়াতে বলা হইতেছে, "আল্লাহ্ ঈছার অনুসরণকারীদিগকে তাঁহার অমান্য-কারীদের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবেন, কিয়ামত পর্যন্ত।" ৫৫ ও ৫৬ আয়াতের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এই উক্তির প্রকৃত মর্ম স্বতঃসিদ্ধভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

৪০। **টীকাঃ মান্য ও অমান্য করা**—প্রথম যুগের মুছলমান আল্লাহ্‌র

কেতাবের অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, অন্যদের তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য এবং অর্থবলে ও অস্ত্রবলে অতিশয় দুর্বল হইলেও অল্প সময়ের মধ্যে অমান্যকারীদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইছলামের আদেশ-নিষেধগুলি উপেক্ষিত হইতে লাগিল। জুয়া আসিল, শরাব আসিল, ব্যভিচার আসিল। ধর্মের স্থান অধিকার করিল অনৈক্য ও আত্মবিচ্ছেদ। জেহাদের প্রেরণার পরিবর্তে সমাজ জীবনে ব্যাপকভাবে আশ্রয় করিয়া বসিল চারুশিল্পের নামকরণে অতি জঘন্য বিলাস-উপকরণগুলি, অর্থাৎ সব দিক দিয়া মুছলমান ইছলামকে কার্যতঃ বর্জন করিয়া বসিল। তাই ৫৫ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী তাহাদের উপর বর্তিয়া যাইতেছে ষোল আনা রকমে। এমন কি, আজ দুনিয়ার মুছলমান হইয়া পড়িয়াছে সেই মাগযুব ও জাল্লীন দল দুইটির পদানত গোলাম, তাহাদের কৃপাজীবী দাসানুদাস।

فليبك على الاسلام من كان باكيا -

৪১। **টীকা: ঈছা ও আদম**—আদম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে এই সূরার ৩০ টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। সূরা আ'রাফে এবং আরও কয়েকটি স্থানে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে (আ'রাফ ১৮৯, ৯০ ও ৯১ আয়াত, (তা-হা ১২১ আয়াত প্রভৃতি)। এই সকল স্থানে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, আদম অর্থে মানব সমাজকেই বুঝিতে হইবে।

তাফ্‌ছীরের কেতাবগুলির বিভিন্ন রেওয়ায়তে বলা হইয়াছে যে, নাজরান ডেপুটেশনের খ্রীষ্টান পাদরী পণ্ডিতরা যীশুখ্রীষ্টের বিনাবাপে পয়দা হওয়ার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—মোহাম্মদ। তুমি দেখাও দুনিয়ার আর কোনও মানুষ পিতার সংশ্রব ব্যতিরেকে পয়দা হইয়াছে? ইহা যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রধান প্রমাণ।

ইহার উত্তরে কোর্‌আনে বলা হইতেছে—ঈছার অবস্থা বা উদাহরণ অন্য সব মানুষের ন্যায়, মৃত্তিকার অংশ বিশেষ হইতে আল্লাহ্ তাহাকে পয়দা করিয়াছেন। হযরত রাছুলে কারীমও নাজরানী পাদরীদিগকে বলিয়াছিলেন—দুনিয়ার অন্য সব নারীরা যে প্রকারে গর্ভ ধারণ করে, যীশু-জননী মরিয়মও সেই প্রকারে গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন।

আয়াতে আর একটি সূক্ষ্ম তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। বলা হইতেছে, ''আল্লাহ্ আদমের সৃষ্টি করিলেন, তৎপর তাহাকে বলিলেন ''হও''—ফলে হইয়া যাইতেছে।'' ''ইয়াকুনো'' মোজারের ছিগা, ইহার অর্থ—হইয়া যায় বা যাইতেছে, অথবা ভবিষ্যতে হইয়া যাইবে (রাগেব দেখুন)। ''আদি মানব হযরত

আদম" সম্বন্ধে এই ছিগা ব্যবহার করা সঙ্গত হইতে পারে না। আল্লাহ্ তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন যখন, তখনই তো তিনি হইয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহাকে "হও" বলার সার্থকতা কি হইতে পারে? বস্তুতঃ সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে হইয়া চলিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলিবে—এই মানব সমাজ।

এই মতবাদের প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিয়াছেন—"আল্লাহ্ আদমকে পয়দা করিয়াছেন মাটি হইতে, আর সব মানুষ তো জন্মগ্রহণ করে পিতার বীর্য হইতে।" কিন্তু কোর্‌আনের স্পষ্ট ঘোষণা অনুসারে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে মাটি হইতে। (হজ্জ, ৫ আয়াত)। এইরূপে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয় "কুন্" শব্দ হইতে, অর্থাৎ হুকুমের দ্বারা, (নাহল ৪০, বাকারা ১১৭ আয়াত, প্রভৃতি)। মানব সৃষ্টির ব্যাপার সম্বন্ধে, সূরা নেছার প্রথম রুকূর তাফ্‌ছীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

৪২। **টীকাঃ পাদ্রীদের চ্যালেঞ্জ**—বিচার আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ার পর, নাজরানের পাদ্রী-পুরোহিতরা তাঁহাদের আসল মতলবটা প্রকাশ করেন। তাফ্‌ছীরের কয়েকজন রাবীর ভিত্তিহীন বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া সাধারণতঃ বলা হয় যে, যুক্তি-প্রমাণে কোনও ফল না হওয়ায়, হযরতই খ্রীষ্টানদিগকে "মোবাহালা" করার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

বিষয়টা সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য, সর্বপ্রথমে এবতেহাল ও মোবাহালা মাছ্‌দার দুইটির বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। উভয় শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে—ধীরে-সুস্থে কোন কাজ করা, ঢিল দেওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়া। প্রার্থনার স্থলে উহার অর্থ হইবে, الاسترسال فيه و التضرع—ধীরচিত্তে ও চরম বিনীতভাবে দোওয়া করা, (রাগেব)। মোবাহালা—শব্দের অর্থ, দুই-পক্ষের পরস্পরের সম্বন্ধে দোওয়া করা। ছাড়িয়া দেওয়া অর্থ হইতেছে, আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িয়া দেওয়া। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদিগকে পছন্দ করেন না, সুতরাং তাহারা নিজেদের কর্মফলে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে দূরে অপসারিত হইয়া পড়ে। লা'নত শব্দের অর্থও হইতেছে ইহাই। এই হিসাবে মোবাহালার তাৎপর্যে লা'নতের ভাবও আসিয়া পড়ে। ইমাম রাজী ও রাগেব প্রমুখ এইরূপ তাৎপর্য দিয়াছেন। কিন্তু আয়াতে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে نبتهل ইহার মাছ্‌দার হইতেছে ابتهال। ইব্‌তেহাল। মোবাহালার অর্থ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য থাকিলে এখানে (نبتهل) (নোবতাহেল) না বলিয়া (نباهل) "নোবাহেল" বলা হইত।

হযরত রাছুলে কারীমই প্রথমে খ্রীষ্টান পাদরীদিগকে মোবাহালা করার আহ্বান জানাইয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইমাম বোখারী, নাজরানবাসীদের আগমন বৃত্তান্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে হোজায়ফা এবন-ইয়ামান ছাহাবীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিতেছেন :

قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران الى رسول الله صلعم يريدان ان يلا عنه -

"আকেব ও ছাইয়েদ নামক নাজরানের নেতৃদ্বয় রাছুলুল্লাহ্‌র নিকট আসিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে 'মোলাআনা' করার উদ্দেশ্যে।" (১৭ যুজ)। মোলাআনা অর্থে পরস্পর পরস্পরকে কোন বিষয় নিয়া লানত করা—দুই দলের মধ্যে যাহারা মিথ্যাবাদী, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত হউক, এইরূপ ঘোষণা করা। হাকেমের একটি হাদীছে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। ছাহাবী জাবের বলিতেছেন—নাজরান ডেপুটেশনের পাদরীরা হযরতকে বলিলেন, যীশু সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? উত্তরে হযরত বলিলেন, তিনি রূহুল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র দাস ও রাছুল। এই কথার সুযোগ নিয়া প্রধানদ্বয় উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—

هل لك ان نلاعنك على انه ليس كذلك ؟ قال وذلك احب اليكم ؟ قالوا نعم - قال فاذا شئتم -

"আমরা এ সম্বন্ধে আপনার সহিত মোলাআনা করিতে চাই, আপনি কি প্রস্তুত আছেন? হযরত বলিলেন, ইহাই কি আপনাদের মতে সর্বাধিক প্রিয়? তাঁহারা বলিলেন হাঁ। হযরত তখন বলিলেন, সে অবস্থায় যখন আপনাদের ইচ্ছা হয় (আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি)"।

সকালে এই মোলাআনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নাজরানের বিশপ ও পাদরীরা, আত্মসত্যে দৃঢ়বিশ্বাসের অভাবে, তাহাতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। কিন্তু হযরত রাছুলে কারীম, নিজের স্বজনবর্গ হিসাবে আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাছান ও ইমাম হোছেনকে ডাকাইয়া আনিলেন। আবুবাকর, ওমর এবং ওছমানও নিজেদের সন্তান-সন্ততিদিগকে লইয়া উপস্থিত ছিলেন, (ফাৎহুল-বায়ান ২—৫৫ প্রভৃতি)। প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাদরী ছাহেবদের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ও পরাজয় স্বীকারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে অন্যান্য বহু ছাহাবী উপস্থিত হন নাই।

৭ রুকূ

৬৪। হে আহ্‌লে-কেতাব! যে সঙ্গত ও বিচারসম্মত বাক্যটি আমাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে সাধারণ (সত্যরূপে গৃহীত হইয়া আছে) —আইস, আমরা সকলে তদনুসারে অঙ্গীকার করি যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত করিব না, আমরা কোনো কিছুকে তাঁহার শরীক করিব না, আর আমাদের কোনও ব্যক্তি অন্য কোনও মানুষকে রাব্ বা প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিবে না; কিন্তু তাহারা যদি (ইহাতে) অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তোমরা (আহ্‌লে-কেতাবদিগকে) বলিয়া দিও: জানিয়া রাখ, আমরা হইতেছি আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পিত মোছলেম। (৪৩)

৬৪ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

৬৫। হে আহ্‌লে-কেতাব! তোমরা ইবরাহীমের সম্বন্ধে হুজ্জত করিতেছ কি কারণে?—অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো নাজেল করা হইয়াছিল তাহার (বহু যুগ) পরে; তবে কি তোমরা বুঝিয়া দেখ না!

৬৫ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاۤجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৬৬। দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল, তাহা নিয়া তোমরা তো হুজ্জত করিয়াছ—কিন্তু যে বিষয়ে তোমরা কিছুই অবগত নহ, তাহা নিয়া আবার হুজ্জত আরম্ভ করিয়া দিতেছ কি কারণে; বস্তুতঃ (ঐ সব ব্যাপার সম্বন্ধে) এক-মাত্র আল্লাহ্‌-ই অবগত আছেন এবং তোমরা (তাহা) অবগত নহ। (৪৫)

٦٦ هَا نْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬৭। ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, নাছরানীও ছিল না, বরং সে ছিল একজন সত্যব্রত মোছলেম; আর সে মোশরেকদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

٦٧ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৬৮। সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে ইবরাহীমের (আদর্শের) যোগ্য-অধিকারী হইতেছে নিশ্চয় সেই সব লোক—তাহার তাবেদারী করিয়াছিল যাহারা, এবং এই নবী ও মোমেনগণ; বস্তুতঃ এই মোমেনগণের অলি (অভিভাবক) হইতেছেন আল্লাহ্‌। (৪৬)

٦٨ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৯। (হে মোছলেম উম্মত!) আহ্লে-কেতাবদিগের এক শ্রেণীর লোক, কোনো গতিকে তোমাদিগকে পথহারা করার জন্য খুবই উৎসুক হইয়া আছে; অথচ নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও তাহারা গোমরাহ্ (পথহারা) করিতে পারিতেছে না, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিতেছে না। (8৭)

٦٩ وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ط وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

৭০। হে আহ্লে-কেতাব! তোমরা আল্লাহ্র আয়াতগুলিকে অমান্য করিতেছ কি কারণে, অথচ তোমরা (সেগুলির সত্যতা) নিজেরাই স্বীকার করিতেছ।

٧٠ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

৭১। হে আহ্লে-কেতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশাইয়া দিতেছ, আর (কেন) তোমরা সত্যকে গোপন করিয়া ফেলিতেছ —জানিয়া-শুনিয়া?

٧١ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ع

তাফ্ছীর

8৩। টীকা: বিশ্বধর্মের উদাত্ত ঘোষণা—আল্লাহ্র প্রদত্ত কোনো কেতাব বা ধর্মগ্রন্থের বাহক যে সকল জনসমাজ, তাহাদের প্রত্যেককে আহ্লে-কেতাব নামে অভিহিত করা হয়। (কাছীর)। কিন্তু কোর্আনে বহুস্থানে ইহুদী ও নাছারা সমাজগুলিকে আহ্লে-কেতাব নামে আহ্বান করা হইয়াছে। সে জন্য আহ্লে-কেতাব বলিতে সাধারণতঃ তাহাদিগকে

বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু নামটি ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এইজন্য ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মধ্যে অনেকে পারসিক ধর্ম অবলম্বীদিগকেও আহ্লে-কেতাব বলিয়া গণ্য করিতেন। সংক্ষেপে আহ্লে-কেতাবদিগকে খোদায়ী কেতাবের প্রাপক হওয়া চাই। (এবন-হাজ্‌ম-মেলাল ; এবন-কাছীর)।

আয়াতে দুনিয়ার সব আহ্লে-কেতাব সম্প্রদায়কে, সকল সত্য ধর্মের মূলীভূত তিনটি প্রধান শিক্ষার পানে আহ্বান করা হইতেছে। ইহাই সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। ইছলামের পক্ষ হইতে আহ্বান জানান হইতেছে, আইস, সকলে আমরা অঙ্গীকার করি ঃ

"আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কিছুরই এবাদত্‌ করিব না"।
"আমরা কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিব না"।
"আমরা কেহ কাহাকে প্রভুরূপে গ্রহণ করিব না"।

সকলের গৃহীত সাধারণ সত্য—সূরা এমরানের কিঞ্চিৎ-অধিক আশিটি আয়াত নাজরান ডেপুটেশনের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদের বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহা সর্ববাদী সম্মত স্বীকৃত বিষয়। সূরা বাকারার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, ইহুদী সমাজের কুকীর্তি ও কুসংস্কারগুলি। কোর্আনের যুক্তি-প্রমাণগুলি তাহারা খণ্ডন করিতে পারে নাই, কিন্তু তবু নিজেদের হঠকারিতা হইতে বিরত হয় নাই। তাহার পর, আল-এমরানের আয়াতগুলিতে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দিয়া খ্রীষ্টানদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, তাহাদের গৃহীত সংস্কারগুলির সহিত হযরত ঈছার প্রচারিত ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। বরং সেগুলি হইতেছে, তাঁহার প্রচারিত ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কিন্তু সব জানিয়া-শুনিয়াও তাহারা যুক্তি-প্রমাণ বিরুদ্ধ নিজেদের সংস্কারগুলিকে ধরিয়া থাকিল, নিজেরা জোর গলায় মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়া তাহার প্রাত্যাখ্যান করিল। এই অবস্থায়, কোর্আন শান্তি ও সমন্বয়ের এই উদার মহান প্রস্তাব নিয়া দুনিয়ার সকল আহ্লে-কেতাব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাইতেছে—তাহাদের সকলের গৃহীত সাধারণ সত্যটা গ্রহণ করিতে—যাহার ফলে পরস্পরের সংঘাত-সংঘর্ষের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ; বিশ্বমানব বিশ্বধর্মের পতাকাতলে সমবেত হইবার সুযোগ পাইবে।

"সাধারণ সত্য" বলিয়া যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতেছে একটি প্রতিজ্ঞার—তাওহীদের পূর্ণ স্বরূপের Negative (নেতিমূলক) দিকগুলির পরিচয়। কিন্তু উহার অস্তিবাচক বা positive

দিকটাই হইতেছে প্রকৃত প্রতিপাদ্য। যেমন, কালেমায়ে তাওহীদে বলা হইয়াছে—আল্লাহ্ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য প্রভু আর কেহই নাই। ইহার ফলিত অর্থ এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র এবাদত করিবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত করিবে না। পুণ্য অর্জনের জন্যই প্রথমে দরকার হয় পাপ বর্জনের।

''আহ্‌লে-কেতাব'' বলিতে ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে, এবং খুব সম্ভব, পার্সিক সমাজকেও বুঝাইতেছে। আলোচ্য আয়াতে যে তথ্যগুলির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এই সম্প্রদায়গুলিরও গৃহীত সাধারণ সত্য। ইহার কয়েকটা নজীর নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১) হযরত মূছা ছিনাই পাহাড়ে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যে দশ মহা-আজ্ঞা comandments প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রথম আজ্ঞায় বলা হইতেছে—

انی انا الرب الاهک الذی اخرجتک من ارض مصر من بیت
العبودیة - لا یکن لک الها اخر غیری - لا تتخذ لک صورة ولا تمثیلاً
- کل ما فی السماء من فوق وما فی الارض اسفل وما فی السماء
من تحت الارض — لا تسجد لهن ولا تعبدهن فانی انا ربک العزیز
الغیور.....—(سفر الخروج ' الاصحاح العشرون —

''আমি তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার, আমি তোমাদিগকে মিসর হইতে দাসত্বের আবাস হইতে—বাহির করিয়াছি। আমি ব্যতিরেকে তোমার আর কোনও মা'বুদ না থাকুক! উর্ধ্বে আছমানে যাহা কিছু আছে, নিম্নে জমিনে যাহা কিছু আছে এবং জমিনের নিম্নস্থ পানিতে যাহা কিছু আছে, তাহার কোনওটি হইতে তুমি কোনও মূর্তি নির্মাণ করিও না, কোনও প্রতীক গ্রহণ করিও না, তুমি তাহাদিগকে ছেজদা করিও না, তুমি তাহাদের এবাদত করিও না—জানিয়া রাখিও, আমি হইতেছি তোমার পরাক্রান্ত ও গায়রাত্মন্দ প্রভু—।* (যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায় ও ২য় বিবরণ ৬—১৩)।

(২) খ্রীষ্টানদের বাইবেলে লিখিত আছে, যীশুখ্রীষ্টের নবুয়তের প্রথম সময়, তিনি ইবলীছ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই পরীক্ষার শেষভাগে ইবলীছ তাঁহাকে বলিয়াছিল—''তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম (ছেজদা)

---

* হিন্দু পরিভাষায় অনুবাদিত হওয়ায় প্রচলিত বাইবেলের বাংলা তরজমা বহুলাংশে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমি ইবরানী হইতে অনুবাদিত প্রাচীন আরবী তাওরাত হইতে মূল এবারত উদ্ধৃত করিয়া তাহার সঠিক তরজমা করিয়া দিলাম।

কর, তাহা হইলে এই সব (মালমাত্তা ইত্যাদি) আমি তোমাকে দিব।" যীশু ইহার উত্তরে বলিলেন, "দূর হও, শয়তান! কেননা লেখা আছে—তুমি ছেজদা করিবে একমাত্র তোমার (রাব্) প্রভু-পরওয়ারদেগারকে, আর এবাদত করিবে একমাত্র তাঁহার (মথি ৪—১০)। জীবনের চরম মুহূর্তে যীশু শিষ্য-বর্গের সাক্ষাতে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন :

وهذه هى حياة الأبد - ان يعرفوك انت الاله الحق وحدك والذى
ارسلته يسوع المسيح - انجيل يوحنا (١٧ — ٣)

"আর ইহাই শাশ্বত জীবন যে, তাহারা তোমাকে—একমাত্র বারহাক মা'বুদ তোমাকে চিনিবে, আর (চিনিবে) যাহাকে তুমি রাছুলরূপে প্রেরণ করিয়াছ, সেই ইয়াছু-মাছীহ্‌কে। —যোহন ১৭ – ৩।

এই উদ্ধৃত অংশগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পাঠকগণকে অনুরোধ জানাইতেছি। যীশুখ্রীষ্টের শেষোক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যীশু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন,—আমি ঈশ্বর নই, আমি তাঁহার প্রেরিত রাছুল। এইগুলিকেই আয়াতে মুছলমান, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা গৃহীত "সাধারণ সত্য" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পার্সিক সমাজের ধর্মীয় ইতিহাসেও এই সাধারণ সত্যগুলির সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। জাতীয় জীবনের প্রাথমিক যুগে, অন্যান্য প্রাচীন জাতি-গণের ন্যায় তাহারাও প্রকৃতি পূজা করিত। জামশেদ বাদশার সময় ও প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনায়, এই প্রকৃতি পূজা জঘন্য পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়া-ছিল। জারদাশ্‌ত আসিয়া ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু শস্ত্রশক্তির ও শাস্ত্রশক্তির অধিকারীরা এই মহান সংস্কারকের বিরুদ্ধে উত্থান করিলে, উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হইয়া যায়। কিন্তু বহু দিনের সংঘাত-সংঘর্ষের পর, তাওহীদবাদী পারসিকরা জয়যুক্ত হন, এবং মোশরেক পার্সীরা দলে দলে পূর্ব অঞ্চলে পালাইয়া আসে। ভারতের তথাকথিত আর্য জাতির ও তাহাদের প্রচারিত জড়পূজা, নরপূজা, প্রেত-(দেও বা দেব) পূজা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, এই কুসংস্কার কলুষিত পলাতক পার্সীদিগের অসাধু প্ররোচনার ফলে।

Historians History of the World, 2, 559—663 ; S. A. Kapadia, M. P. ; L. R. C. P. ১৯—২১ পৃষ্ঠা ; এম. এ. তাহের রেজভী কৃত "The People of the Book, বিশেষতঃ তাহার পঞ্চম অধ্যায় ;

ইমাম এবন-হাজম কৃত মিলাল, শাহরাস্তানী কৃত, ঐ।

পৌত্তলিকরা পারস্য দেশ হইতে পলাইয়া আসার পরেও আয়াতের বর্ণিত সাধারণ সত্যগুলি তাহাদের বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে মওজুদ ছিল এবং কতকগুলি আজও মওজুদ আছে। Zoraster বা জারদাশ্‌তের শিক্ষায় আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

(১) یکے ست نه یکے در شمار سمیرام اسپ له' سمیرام هرداء -

(২) هیچ چیز باو نمان - لیس کمثله شیء -

(৩) همتانه دارد - لم یکن له کفوا احد - هستی ده همه - خالق کل شیء -

(৪) جزاغاز وانجام انبار ودشمن ومانند ویار وپدر ومادر و زن و فرزند وجاے سوی وتن ومانند وتن آسا وتنانی ورنگ وبوی است -

দাছাতীরের একটি "স্তোত্রে" আছে—

(৫) توئی نخستی که نیست نخست ترے پیشتر از تو
توئی باز پس ترے که نیست باز پس تراز پست - *

* মাওলানা মোহাম্মদ আলী বিদ্যার্থীর Mohammad in World Scriptures নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

উদ্ধৃত অংশগুলির অনুবাদ—(১) তিনি একক, (২) তাঁহারি সমতুল আর কিছুই নাই, (৩) তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টি কর্তা, (৪) তিনি অনাদি, অন্তহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। তাঁহার জনক নাই, জননী নাই. স্ত্রী নাই, পুত্র নাই। তিনি কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহার দেহ নাই, আকার নাই। তিনি অরূপ স্বরূপ।

(৫) তুমিই অনাদি, যে অনাদির পূর্বে কোনও আদি নাই।
তুমি সর্বান্ত, যাহার পর অন্য কোনো অন্ত নাই।

এই সকল উদাহরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, পার্সিকদিগের মূল ধর্ম-পুস্তক বলিয়া গৃহীত জেন্দ বা দাছাতীরও আল্লাহ্‌র অনাবিল তাওহীদের শিক্ষাই প্রচার করিয়াছে। এই "সাধারণ সত্য"-গুলিকে মূলভিত্তি করিয়াই কোর্‌আন বিশ্বমানবের জন্য বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং তাহারই নাম ইসলাম।

আয়াতের ৩য় প্রতিজ্ঞা—সূরা তাওবার ৫ রুকূর প্রথম ভাগে, বিশেষতঃ

তাহার ৩১ আয়াতে এবং তাহার তাফ্ছীরে, এই প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কোনও পণ্ডিত বা পুরোহিত, কোনও আলেম বা পীর-ফকীরকে নিজেদের প্রভু বানাইয়া লইও না—ইহার অর্থ এই যে, তাহাদের নির্দেশ, উপদেশ বা সিদ্ধান্তকে আমরা ধর্মের সিদ্ধান্ত বলিয়া বিনাবিচারে স্বীকার করিয়া লইব না। অন্ধ অনুকরণের ফলে ও গুরুপূজার শয়তানী প্ররোচনার অভিশাপে, দুনিয়ার লোক শ্রীকৃষ্ণকে, রামচন্দ্রকে, শাক্য সিংহকে, শ্রীচৈতন্যকে, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতিকে, এমন কি কচ্ছপ ও বরাহের ন্যায় নিকৃষ্ট জীবকেও সোজাসুজিভাবে "শ্রীভগবান" বা তাঁহার অবতার বানাইয়া নিয়াছে। এই অন্ধবিশ্বাসের সমর্থন আমরা করিব না—ইহা হইতেছে আয়াতে বর্ণিত "সাধারণ সত্য"গুলির তৃতীয় প্রতিজ্ঞা।

৪৪। **টীকা ঃ ইবরাহীম সম্বন্ধে হুজ্জত**—যখন কোর্‌আন মাজীদের এই আয়াতগুলি নাজেল হইতেছিল, আরব দেশে তখন ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদিগের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত ইছলাম ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তিও তখন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারা সকলেই হযরত ইবরাহীমকে patriarch, কুলপতি ও ধর্মগুরু বলিয়া দাবী করিত।

এই সময়, ইহুদীরা মুছলমানদিগের নিকট আসিয়া বলিত—ইহুদী হইয়া যাও সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানরাও তাহাদিগকে ঐ [illegible] আহ্বান জানাইত। (বাকারা, ১৩৫)। ইহুদী ও খ্রীষ্টান সমাজের [illegible] পরস্পরের ধর্মকে অমূলক বলিয়া নিন্দা করিত (ঐ, ১১৩)। ব[illegible] এই বাদ-প্রতিবাদেব সময় তাহারা নিজেদের পুঁথি-পুস্তকের প্র[illegible] করিতেও ত্রুটী করিত না।

ইহুদী ধর্মের প্রবর্তন হয় ইবরাহীমের ইন্তেকালের দীর্ঘকাল [illegible] খ্রীষ্টের বা ঈছার জন্ম হইয়াছে, তাহারও অনেক দিন পরে। সুত[illegible] ইবরাহীম মূছায়ী ধর্মের বা ঈছায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন—এ[illegible] বলা কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না [illegible] ইবরাহীম ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, একমাত্র আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পিত[illegible] মোছলেম।

৪৫। **টীকা ঃ "কিছু জ্ঞান"**—মোসির (মূছার) পঞ্চ পুস্তকে অল্প ক[illegible] স্থানে প্রাসঙ্গিকভাবে হযরত ইবরাহীমের নাম মাত্রের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টা[illegible]র বাইবেলে স্থানে স্থানে তাঁহার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী সাধ[illegible] ও সংগ্রামের এবং তাঁহার প্রবর্তিত শিক্ষা ও আদর্শের কোনও সন্ধান সেখানেও

পাওয়া যায় না। বরং তাঁহার গুরুত্ব লাঘব করার চেষ্টাই তাহাতে করা হইয়াছে। (যোহন, ৮—৫৬, ৫৭, ৫৮ এবং রোমীয় ৪—১ হইতে ৬ পদ)। ফলতঃ হযরত ইবরাহীম সম্বন্ধে সমসাময়িক ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের যাহা জানা ছিল, তাহা অতি সামান্য, অতি নগণ্য।

আয়াতে "যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান ছিল"—বলিয়া এই তথ্যকে বুঝান হইতেছে। পরন্তু "যে বিষয়ে কিছু জ্ঞান নাই"—বলিয়া, তাওহীদের বাস্তব প্রতিষ্ঠাতা মহাজ্ঞানী, মহাসাধক ও মহাত্যাগী হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্‌র সেই اسوة حسنة বা সুন্দর জীবন-আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। ৬৬ আয়াতে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত শব্দে তাঁহার সেই জীবন-আদর্শের কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪৬। **টীকা: ইবরাহীমী আদর্শের প্রকৃত ওয়ারেছ**—যাহারা তাঁহার তাবেদারী করিয়াছিল-অর্থে, হযরত ইবরাহীমের উম্মতকে বুঝাইতেছে। ইহার পরেই বলা হইতেছে—"এবং এই নবী ও (তাহার উম্মতের) মোমেনগণ।" হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়ত ও তাঁহার উম্মতের স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য প্রথমে নবী শব্দ ব্যবহার করা এবং তাহার পর "ওয়াও আতেফা" আনা হইয়াছে।

হযরত ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ঘোর পৌত্তলিক সমাজে, পুরোহিত ও পূজারীদের পরিবারে। কিন্তু প্রথম বয়স হইতে তাঁহার অন্তরে পূর্বপুরুষের অন্ধ-অনুকরণের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের ভাব জাগিয়া উঠে। তিনি স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি নিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং শের্ক ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন—এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিদ্রোহকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া ক্ষান্ত হন। তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি হইতেছে মক্কার বায়তুল হারাম বা কা'বার মসজিদ।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাও পয়দা হইয়াছিলেন মক্কার পৌত্তলিক সমাজে, পূজারী-পুরোহিত পরিবারে, সর্বব্যাপী পৌত্তলিকতার পরিবেশে। ইবরাহীম যাহা করিয়াছিলেন, মোস্তফাও তাহাই করিলেন। কা'বার ৩৬০টি পুতুল ও প্রতীক চিরদিনের জন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল, মানব সমাজের এক-তৃতীয়াংশ পৌত্তলিকতার অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিল। বৃদ্ধ পিতার পুত্র 'বলিদান' এবং যুবক পুত্র ইছমাইলের আত্ম-কোরবান, এইভাবে সার্থক হইয়াছিল। এ বিষয়ের আলোচনা পূর্বে কয়েক স্থানে হইয়া গিয়াছে এবং পরেও বহু স্থানে ইহার অবতারণা করা হইয়াছে।

৪৭। **টীকা: আহ্‌লে-কেতাবদিগের অপচেষ্টা**—মুছলমানদিগকে তাহাদের ধর্ম হইতে বিচ্যুৎ করিয়া ফেলার জন্য, ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা চিরদিনই নানা প্রকার অভিসন্ধি ও অপচেষ্টার আশ্রয় নিয়া আসিতেছে। ইহুদী নেতাদের একটা অভিনব দুরভিসন্ধির কথা ৭১ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুছলমানদিগকে গোমরাহ্ করার জন্য বিভিন্ন দেশের খ্রীষ্টান দলপতিরা গত দুই শত বৎসর ধরিয়া বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য হাজার হাজার মিশনারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ পুঁথি-পুস্তক ও প্রচারপত্র মুদ্রিত করা হইয়াছে, এবং সরকারী ও বেসরকারী তহবিল হইতে এজন্য কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করা হইয়াছে। নিজেদের ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে মুছলমানদের মনে সন্দেহ ও অনাস্থার সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহাদের এই অপচেষ্টা কার্যতঃ ব্যর্থবিড়ম্বনায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, মোছলেম জাতির এই আত্মবিস্মৃতি ও অধঃপতনের যুগেও, ইছলাম ধর্ম স্বকীয় সহজাত শক্তির বলে, দুনিয়ার সকল কেন্দ্রে জয়যুক্ত হইয়া চলিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান প্রচারকরা যে অল্পবিস্তর সফলতা অর্জন করিয়াছেন, নিজেদের ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের নানা ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারগুলিই তাহার জন্য প্রধান দায়ী।

আমি যতদূর জানি, ইংলণ্ড এই প্রচারণায় দুনিয়ায় অন্য সব দেশকে পরাজিত করিয়াছে। মুছলমানরা প্রত্যেক নামাযের প্রথমে যে ফাতেহা সূরা পাঠ করিয়া থাকেন, সেকালে ইংলণ্ডের ধর্মযাজকদিগের দ্বারা তাহার যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বাংলা তরজমা এইরূপ: "সকল প্রশংসা আমাদের ঈশ্বর দয়াময় মোহাম্মদের জন্য। হে লোক সকল, আনন্দ ধ্বনি কর এবং সেই মোহাম্মদ ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিদান কর। তবেই আমাদের ভীষণ শত্রুগণ দমিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" *

আল্লাহ্‌র হাজার হাজার শোকর, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, জামালুদ্দীন আফগানী ও স্যার ছৈয়দ আহমদ প্রমুখ অদ্ভুত কর্মা মহাজনদের অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ কর্মনিষ্ঠার ফলে, কওমের অন্তরে আত্মরক্ষার জন্য যে আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিফল হয় নাই, তাহাদের এন্‌তেকালের সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবন চাঞ্চল্যের অবসান ঘটে নাই। বরং তাহা বহুগুণে বাড়িয়া চলিয়াছে।

---

* Ecclastical History of England, Normandy, vol. 3, 175.

৮ রুকু

৭২। এবং আহ্‌লে-কেতাবদিগের এক-দল লোক (তাহাদের তাবেদার-দিগকে) বলিয়াছে : মুছলমানরা যাহাতে ঈমান আনিয়াছে, তোমরা তাহাতে ঈমান প্রকাশ করিবে দিনের প্রথম দিকে, এবং দিনের শেষভাগে তাহা অমান্য করিবে —ইহার ফলে মুছলমানরা (তোমাদের ধর্মে) ফিরিয়া আসিতে পারে। (৪৮)

٧٢ وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي
أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا
آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ج صلے

৭৩। এ অবস্থায়, তোমাদের দীনের তাবেদারী করিয়া আসিয়াছে যাহারা—তাহারা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করিও না ; (৪৯) তুমি (হে রাছুল।) বলিয়া দাও : প্রকৃত হেদায়ত হইতেছে আল্লাহ্‌র এই হেদায়ত যে, তোমরা (হে আহ্‌লে-কেতাব) যাহা প্রদত্ত হইয়াছিলে অন্যকেও তাহা প্রদান করা হইতে পারে, অথবা অন্যরাও তোমাদের প্রভুর হুজুরে তোমাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারে ; বলিয়া দাও: নিশ্চয় সমস্ত এনাম (এন্‌আম তো হইতেছে আল্লাহ্‌র এখতি-য়ারভুক্ত, যাহাকে ইচ্ছা তাহা প্রদান করেন : বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন (নিয়ামত বণ্টনে)

٧٣ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ
تَبِعَ دِينَكُمْ ط قُلْ إِنَّ
الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ لا أَنْ
يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ
أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط
قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ج
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللّٰهُ

সুবিশাল, সর্বজ্ঞানী,—(৫০)

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۙ

৭৪। —যাহাকে ইচ্ছা, নিজের কৃপার জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করিয়া থাকেন; মহান এনামের মালেক তিনি।

৭৪ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৫। পক্ষান্তরে আহ্‌লে-কেতাবদিগের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাহার কাছে "কেন্তার" পরিমাণ সোনারূপা আমানত রাখিলেও সে তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিবে, আবার তাহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, একটি মাত্র "দীনার" দিয়া যদি তাহাকে বিশ্বাস কর, সে তাহা পরিশোধ করিবে না—যদি না তুমি তাহার উপর সর্বদা খাড়া হইয়া থাক; কারণ এই যে, তাহারা বলিয়া থাকে: "আমাদের উপর উম্মী-আরব সমাজের কোনো অধিকার নাই, বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যার প্রচার করিতেছে, জানিয়া শুনিয়া। (৫১)

৭৫ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاۤئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৬। নিশ্চয়, কেহ যদি নিজের একরার-অঙ্গীকার পুরা করে ও পরহেজ করিয়া চলে, সে অবস্থায় (জানা উচিত যে,) আল্লাহ্ পরহেজগার লোকদিগকে পছন্দ করিয়া থাকেন।

٧٦ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭৭। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্‌র একরারকে ও নিজেদের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিগুলিকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে যাহারা—পরজীবনে তাহাদের প্রাপ্য অংশ কিছুই থাকিবে না, এবং আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে কালাম করিবেন না ও তাহাদের প্রতি নজর করিবেন না কেয়ামতের দিন, আর পাকছাফ করিবেন না তাহাদিগকে—বস্তুতঃ তাহাদের জন্য অবধারিত আছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (৫২)

٧٧ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৮। এবং উহাদের মধ্যে এরূপ এক শ্রেণীর লোক আছে, "কেতাব" পাঠ করার সময় যাহারা নিজেদের "জিহ্বা-গুলিকে কুঞ্চিত" করিয়া থাকে—যেন তাহাকে তোমরা কেতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ তাহা কেতাবের অংশ নহে, (৫৩) তাহারা আরও বলিয়া থাকে যে,

٧٨ وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ

উহা (নাজেল হইয়াছে) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, অথচ বস্তুত: তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সমাগত নহে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যার প্রচারণা করিতেছে—জানিয়া-শুনিয়া। (৫৪)

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

৭৯। আল্লাহ্‌ যে-মানুষকে নিজের কেতাব দিবেন এবং বিবেক-বুদ্ধি ও নবুয়ত প্রদান করিবেন, ইহার পরও সে লোকদিগকে বলিবে: "সকলে তোমরা আমার বান্দাহ্‌ হইয়া যাও, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া"—ইহা সম্ভব হইতে পারে না—বরং সে বলিবে—তোমরা সকলে আল্লাহ্‌-ওয়ালা হইয়া যাও, তোমরা যাহা শিক্ষা দিতেছ ও পাঠ করিতেছ তদনুসারে,—

79 مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ لا ○

৮০। এবং সে ব্যক্তি এরূপ আদেশও তোমাদিগকে দিতে পারে না যে, ফেরেশ্‌তাদিগকে ও নবীদিগকে 'রাব' (প্রভু) রূপে গ্রহণ করিবে; সে কি

٨٠ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ط

তোমাদিগকে, মুছলমান হইয়া থাকার পরও, কাফের হইয়া যাওয়ার আদেশ প্রদান করিতে পারে॥ (৫৫)	أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝

তাফ্‌ছীর

৪৮। টীকাঃ ষড়যন্ত্রের উদাহরণ—আহ্‌লে-কেতাবদিগের একদল লোক, মুছলমানদিগকে তাহাদের ধর্ম হইতে বিচ্যুত করার জন্য যে কতদূর উৎসুক, ৬৯ আয়াতে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া হইতেছে—

ইহুদী দলপতিরা তাহাদের তাবেদারদিগকে পরামর্শ দিয়াছিল, তোমরা মুছলমানদের কাছে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের স্বীকৃত বিষয়গুলির উপর নিজেদের আস্থা ও ঈমান প্রকাশ কর। এইভাবে মুছলমানের ছদ্মরূপে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া থাকার কিছুকাল পরে প্রকাশ্যভাবে তাহাদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। বলিবে, সত্য ধর্মের সন্ধানে বড় আশা করিয়া ইছলামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সব ভুয়া, সব ধাপ্পাবাজী। তার চাইতে আমাদের ধর্ম হাজার গুণে ভাল। কিছুকাল এইরূপে কাজ চালাইতে পারিলে, কতক কতক মুছলমানের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে, হয়ত তাহারা আবার আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিতে পারে।

একদিকে এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছে, অন্যদিকে কোর্‌আনের এই আয়াত আসিয়া ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে— হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রমুখাৎ। ইহা কোর্‌আনের ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন্ত মো'জেজা।

৪৯। টীকাঃ মোমেনদিগের প্রতি সতর্কবাণী—৭২ আয়াতে ইহুদী ষড়যন্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ার পর, ৭৩ আয়াতে মোমেনদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহারা যেন অন্য ধর্ম অবলম্বীদিগের উপর আস্থা স্থাপন না করে। বলা হইতেছে, "তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে যাহারা, তাহারা ব্যতীত অন্য কাহাকেও তোমরা বিশ্বাস করিও না।" তাফ্‌ছীর-কারগণের সাধারণ মত এই যে, আয়াতের এই অংশটুকু হইতেছে, ইহুদীদের উক্তির জের, ৭২ আয়াতের অবশিষ্টাংশ। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে, আয়াতের

তাফ্‌ছীরে বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উহ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাকদীম-তাখীর বা শব্দ যোজনার অগ্র-পশ্চাৎ করার আবশ্যকতা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন অক্ষরকে 'জায়েদ' বা অতিরিক্ত (আর্ষ প্রয়োগ) বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও সমাধানের পরিবর্তে সমস্যার জটিলতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, ইমাম রাজীর ন্যায় সুবিজ্ঞ তাফ্‌ছীরকারও ইহাকে من المشكلات الصعبة বা কঠিন মুশকিল আয়াত বলিয়া মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অথচ প্রকৃত কথা এই যে, এই মুশকিলটা তাঁহাদের নিজস্ব সৃষ্টি। ইহুদী-দিগের উক্তি ৭২ আয়াতের পূর্ণচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে। ৭৩ আয়াতের অন্যসব অংশের ন্যায় এই অংশটাকেও, মুছলমানদিগের ও হযরতের প্রতি আল্লাহ্‌র উক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া নিলে এইসব অনর্থক ও অনাবশ্যক বিড়ম্বনার কোনও কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহার কোনও উপায় নাই। কারণ, পূর্ববর্তী কোনো তাফ্‌ছীরকার বলিয়া গিয়াছেন যে, "আলোচ্য অংশটা যে, ইহুদীদের কথার শেষ অংশ, সে সম্বন্ধে তাফ্‌ছীর লেখকগণ সকলে একমত।" কাজেই যে কোনও উপায়ে হউক এই মতটাকে বহাল রাখিতে হইবে।

কিন্তু আমি তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি-তেছি না। কারণ, (১) এ সম্বন্ধে তাফ্‌ছীরকারগণ সকলেই যে একমত, ইহা প্রকৃত কথা নহে। ইমাম এবন-হাইয়ান এই আয়াতের তাফ্‌ছীরে বলিতেছেন :

قال ابن عطية : لا خلاف بين اهل التاويل ان هذ القول من كلام الطائفة ' انتهى - و ليس كذلك ' بل من المفسرين من ذهب الى ان ذلك من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود و تزويرهم -

"এবন-আতিয়া বলিয়াছেন : তাফ্‌ছীর বর্ণনাকারীরা বলিয়াছেন যে, এই অং-শটা ইহুদীদের উক্তি। এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই।" কিন্তু ইহা সঙ্গত কথা নহে। বরং তাফ্‌ছীরকারগণের মধ্যে এরূপ লোকও আছেন, যাঁহাদের মতে এই অংশটা আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্ এই আয়াতে মুছলমানদিগের অন্তরগুলিকে সুস্থিত করিয়া দিতেছেন, যেন ইহুদীদিগের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার সময় সংশয়হীন ও মজবুত হইয়া থাকিতে পারে, (মুহীৎ ২—৪৯৪)।

এক্ষেত্রে প্রধান বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, ঈমান-শব্দের তাৎপর্য নিয়া। বিজ্ঞ পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, দুনিয়ার অন্য সমস্ত উন্নত ভাষার ন্যায়

আরবী ভাষার শব্দগুলির তাৎপর্যভেদ ঘটিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে ব্যবহৃত ছেলা বা উপসর্গগুলির তারতম্য অনুসারে। এই হিসাবে آمنوا ক্রিয়া পদেরও অর্থ ভেদ ঘটিয়া থাকে। এই শব্দের ছেলা যদি "বে" আসে, তাহা হইলে অর্থ হইবে ঈমান আনা, আর ছেলা "লাম" আসিলে তাহার অর্থ হইবে—আস্থা স্থাপন করা, তাহার সততা সম্বন্ধে বিশ্বাস করা, ইত্যাদি। কোর্‌আন মাজীদের শত শত আয়াত হইতে এই অর্থভেদের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

আলোচ্য (৭৩) আয়াতে লাম ছেলা আসিয়াছে। সুতরাং অর্থ হইবে—"তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে যাহারা, তাহারা ব্যতীত আর কাহারও উপর আস্থা স্থাপন করিও না।" এই দাবীর প্রমাণ হিসাবে এখানে কোর্‌আন হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১) ইউছুফের ভ্রাতারা তাঁহাকে কেনআনের কূপে ফেলিয়া আসার পর তাঁহাদের পিতাকে বুঝাইতেছেন—ইউছুফকে নিজেদের জিনিসপত্রের নিকট রাখিয়া আমরা খেলা করিতে গিয়াছিলাম, সে অবস্থায় তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে, و ما انت بمؤمن لنا কিন্তু আমাদের উপর আপনি তো আস্থা স্থাপন করিবেন না। (ইউছুফ ১৭)।

(২) সূরা তাওবার ৬১ আয়াতে হযরত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين

"যে রাছুল—ঈমান রাখেন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আস্থা রাখেন মোমেনদিগের উপর।" প্রথম অংশে বলা হইয়াছে, "ইয়ুমেনো বিল্লাহে" বে-ছেলা দিয়া। ফলে অর্থ হইয়াছে—"তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছেন।" সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে—"ইয়ুমেনো লিল্‌-মোমেনীন"। এখানে বের পরিবর্তে লাম ছেলা ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে "মোমেনদিগের প্রতি ঈমান আনিয়াছেন"—এরূপ অর্থ না নিয়া অর্থ করা হইয়াছে—তিনি মোমেনদিগের প্রতি আস্থাবান।

মোটের উপর কথা এই যে, ইছলামের পরিভাষায় ঈমান বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অর্থ হইতেছে সত্যতা স্বীকার করা এবং তাহার ছেলা আসিয়া থাকে বে-অক্ষর। পক্ষান্তরে লাম-ছেলা ব্যবহার করা হয় যেখানে, সেখানে উহার অর্থ হইবে—নির্ভর করা, আস্থা স্থাপন করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। এখানে লাম-ছেলা ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং ৭২ আয়াতের প্রথম পদাংশের অর্থ হইবে—আস্থা স্থাপন করিও না, উহার "ঈমান আনিও না" অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না।

বলিতে ভুলিয়াছি, হাফেজ এবন-কাছীরও ৭৩ আয়াতের আলোচ্য অংশের ঠিক এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলিতেছেন—

اى لا تطمئنوا وتظهروا سر كم الا لمن تبع دينكم -

"নিঃশঙ্ক হইয়া বসিও না এবং নিজেদের গোপনীয় তথ্যগুলি তাহাদের কাছে প্রকাশ করিও না।"

ইহাই কোর্‌আনের ব্যবহার ও আরবী সাহিত্যের নিয়ম অনুসারে সুসঙ্গত ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের তাৎপর্যে কোনও প্রকার জড়তা ও জটিলতা থাকিতেছে না, কোনও উহ্য স্বীকার করিতে হইতেছে না, কোন শব্দ বা বর্ণকে জায়েদ বা অতিরিক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে না, এবং আয়াতের তরতীবেও কোনও প্রকার অদল-বদল করিতে হইতেছে না।

৫০। **টীকা : প্রকৃত হেদায়ত**—হেদায়ত অর্থে—পথ প্রদর্শন করা, পথে পরিচালিত করা ও মাঞ্জিলে পৌঁছাইয়া দেওয়া। স্থানভেদে এগুলির মধ্যকার কোনও একটি অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এই হেদায়তের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে দুইটি—পূর্ণ তাওহীদের অনাবিল উপলব্ধি এবং বিশ্বমানবের মধ্যে সাম্যভাব ও সংজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। দুনিয়ার বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জনপদে, বিভিন্ন জাতির নিকট আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নবী ও রাছুলের আগমন হইয়াছিল। মুছলমানরা নীতি ও ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে, তাঁহাদের মধ্যকার বিদিত ও অজ্ঞাত, সকলকে বারহাক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা—এবং আমাদের দেশের হিন্দুসমাজ—জোরগলায় দাবী করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের গোত্র-গোষ্ঠী ব্যতীত, নবুয়ত লাভের অধিকারী আর কেহ হইতে পারে না। আয়াতে এই সঙ্কীর্ণ ধারণার প্রতিবাদ করা হইতেছে।

হেদায়তের প্রধান কথা এই যে, সকল জাহানের সৃষ্টিকর্তা যিনি, সকলের পালন ও পুষ্টিকর্তা যিনি—সকল দেশের, সকল যুগের ও সকল বর্ণের সমগ্র মানব সমাজের প্রতি তিনি সমানভাবে করুণানিধান, সমানভাবে কর্মফলের প্রবর্তক। তাঁহার ন্যায়রাজ্যে পণ্ডিত-পুরোহিত আবিষ্কৃত এইসব হীনতার ও সঙ্কীর্ণতার বিন্দুমাত্রও স্থান নাই। সুতরাং মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়তকে অস্বীকার করার অধিকারও কাহারো নাই।

অন্যরাও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদিগকে বিচারে পরাজিত করিতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেওয়া বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তোমাদিগকে পরাজিত

করিতে পারে। বলা বাহুল্য, বিচারক্ষেত্রে তাঁহারা পরাজিত হইয়া আসিয়াছেন সর্বক্ষেত্রে।

বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের কতকগুলি পদ উল্লেখ করিয়া, এই প্রসঙ্গে হযরত মোহাম্মদের নবুয়ত সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। ইহা খুবই সঙ্গত কাজ। কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা খ্রীষ্টান বা ইহুদীদিগের স্বীকারোক্তি বা কবুলা ডিক্রি হিসাবে উহার উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু নিজেদের ধর্ম সংক্রান্ত কোনও আমল বা আকীদার সমর্থনে বা প্রতিবাদে ঐ সকল বর্ণনাকে প্রমাণ হিসাবে আদৌ ব্যবহার করিতে পারি না। দ্বিতীয় বিবরণের প্রমাণ দিয়া, মাছীলে মূছার অনুকরণে "মাছীলে মাছীহের" সঙ্গতি সপ্রমাণ করার জন্য, এক সম্প্রদায়ের লেখক দীর্ঘকাল হইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এইজন্য এই সতর্কবাণীর বিশেষ দরকার বোধ করিতেছি।

৭৪ আয়াতটি পূর্ব আয়াতের উপসংহার-স্বরূপ। এখানে বলিয়া দেওয়া হইতেছে—আল্লাহ্ স্বেচ্ছাচারী নহেন। যাঁহাকে নবীরূপে নির্বাচিত করিলে আল্লাহ্র রাহীম বা কৃপানিধান স্বরূপের প্রতিষ্ঠা হইবে সম্যকরূপে, তাঁহাকেই তিনি নিজের রেছালত বা নবুয়তের জন্য নির্বাচিত করিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি যথাসময় ও যথাস্থানে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে মনোনীত করিয়াছেন।

৫১। টীকা ঃ আহ্‌লে-কেতাবদিগের সাধুসজ্জন ব্যক্তিগণ—আহ্‌লে-কেতাবদিগের সমস্ত লোকই নিন্দাভাজন নহে। তাহাদের মধ্যে সাধুসজ্জন লোকও আছেন। সুতরাং সাধারণভাবে সকলের নিন্দা করা অন্যায় হইবে। এখানে তাহাদের বিশ্বস্ততা বা আমানতদারীর প্রশংসা করা হইতেছে। এই সূরার ১১২, ১১৩ ও ১১৪ আয়াতে খ্রীষ্টান সাধু-সন্ন্যাসীদিগের কতিপয় সদগুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। সূরা মায়েদার ৮২ আয়াতে ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের তুলনায় সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কেন্তার অর্থে, ধন ভাণ্ডার, ধনের স্তূপ। ভাবার্থে প্রচুর ধন। সে কালের স্বর্ণমুদ্রার নাম দীনার। ভাবার্থে সামান্য অর্থ। মাথার উপর খাড়া হইয়া থাক অর্থাৎ সদাসর্বদা তলব-তাকাদা করিতে থাক, নাছোড়-বান্দা হইয়া আদায়ের চেষ্টা করিতে থাক।

এই মানসিকতার মূল কারণ—আয়াতে বলা হইতেছে যে, ইহুদী সমাজ যে, সাধারণভাবে এই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া থাকে, তাহার মূল কারণ হইতেছে, তাহাদের প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। মিছর হইতে পালাইবার সময়

স্বয়ং সদাপ্রভু তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, উৎসবের বাহনা করিয়া মিছর-বাসীর নিকট হইতে তাহাদের বস্ত্র ও সোনারূপার অলঙ্কারগুলি চাহিয়া আন, আর সেগুলি নিজেদের পুত্র-কন্যাদিগকে পরাইয়া দেও। "এইরূপে মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।" এই অপহরণের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য, সদাপ্রভু মিস্রীয়দের মনে ইহুদীদের সম্বন্ধে দয়ার উদ্রেক করিয়া দিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৩—৩২, ১২—৩৬)। এই সমস্ত অপহরণ করিয়া নিয়া তাহারা মিছর হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

ইহুদীদের সকল প্রকার সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু বিদেশীদের নিকট হইতে সুদ নেওয়ায় কোনও পাপ হয় না। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩—১৯, ২০)। সদা-প্রভু দয়াপরবশ হইয়া নির্দেশ দিতেছেন, সাত বৎসর পরে সমস্ত সুদ মাফ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, বর্জিত বিধি হিসাবে, ইহাও বলিয়া দিতেছেন, পরজাতীয় লোকরা এই নির্দেশের বহির্ভূত। অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে চিরকাল সুদ আদায় করা যাইবে, (ঐ ১৫—৩)।

উম্মী শব্দের অর্থ—অক্ষরজ্ঞানহীন, যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না। আরবেরা তখন সাধারণতঃ লিখিতে পড়িতে জানিত না, এইজন্য তাহাদিগকে উম্মী বলা হইত। অন্যমতে 'উম্মুল-কোরা' শব্দ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। (রাগেব)। 'উম্মুল-কোরা' অর্থে জনপদসমূহের জননী। হেজাজ প্রদেশের, বিশেষতঃ মক্কা শহরের যে এই বিশেষণ গ্রহণের অধিকার আছে, ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকগণের প্রায় সকলেই আজ তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মোটের উপর, ইহুদীরা নিজেদের "শাস্ত্রের" শিক্ষা অনুসারে, বিদেশী, বিধর্মী ও ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সম্বন্ধে নিজেদের কোনও নীতিগত বা আইনগত বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করিত না। ইহার ফলেই তাহাদের মধ্যে এই হীন মনোবৃত্তির প্রভাব ঘটিয়াছিল।

৫২। টীকা ঃ অঙ্গীকার পালন—একরার-অঙ্গীকার দুই প্রকার—আল্লাহ্‌র হুজুরে মানুষের একরার এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের সঙ্গে তাঁহার প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি। ৭৬ ও ৭৭ আয়াতে যথাক্রমে একরার পালন করার পুণ্যফল এবং তাহা ভঙ্গ করার দণ্ডের উল্লেখ করা হইয়াছে।

কোর্‌আন-হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে এই একরার-অঙ্গীকারগুলি পালন করিয়া চলা হইতেছে মোমেন বান্দার একটা অপরিহার্য লক্ষণ। পক্ষান্তরে ঐগুলিকে ভঙ্গ করিয়া চলাই হইতেছে মোনাফেকের আলামত। পাঠকগণ

কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে(৪—১৬, ২৩—৮, ৭০—২৩, ৮—২৭ প্রভৃতি) এই নির্দেশগুলি দেখিতে পাইবেন। বোখারী, মোছ্‌লেম প্রভৃতি হাদীছের বিশ্বস্ত কেতাবগুলিতে এ সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ মওজুদ আছে। হযরত রাছুলে কারীম বলিতেছেন: - لا ايمان لمن لا امانة له و لا دين لمن لا عهد له

"বিশ্বাসঘাতকের ঈমান নাই এবং একরার ভঙ্গকারীর ধর্ম নাই" (মেশকাত)।

এই আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যাইবে যে, এখানে মূলতঃ আহ্‌লে-কেতাবদিগের জাতীয় চরিত্রের বিভিন্ন দিকের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। অবশ্য মোছ্‌লেম সমাজকে এইসব বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়াও আয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

"আল্লাহ্‌র একরার" অর্থে, তাঁহার হুজুরে, তাঁহার নামে বা তাঁহার নির্দেশ অনুসারে সমাধিত সমস্ত একরার ও অঙ্গীকারকে বুঝাইতেছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কালাম করিবেন না এবং তাহাদের পানে দৃকপাত করিবেন না—পদ দুইটির রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ, নানা কুকর্মের প্রতিফলে তাহারা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। সেই পাপের প্রতিফল হইতে রক্ষা পাওয়ার তাহার কোনও উপায় ছিল না। তাই সদাপ্রভু নিজের ঔরসজাত পুত্র (Begotten son) যীশুর শোণিতে তাহাদের সমস্ত পাপের কাফ্‌ফারা করিয়া দিয়াছেন। যীশুর শোণিতে বিশ্বাস করিলেই মানুষ সমস্ত কলুষ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। আয়াতের শেষ অংশে এই অন্ধবিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হইয়াছে—আল্লাহ্‌র হুজুরে "পাকছাফ" বলিয়া পরিগণিত হওয়ার জন্য দরকার হয় অনুতাপের, আন্তরিক তাওবার।

৫৩। টীকা: **"জিহবা কুঞ্চিত করা"**—"লাইওন" শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ, দড়ি পাকান। কিন্তু উহার সঙ্গে লেছান বা জিহ্বা শব্দের সংযোগ ঘটিলে, আরবী ভাষার ব্যবহার অনুসারে, উহার অর্থ হইবে – কোনও কথার যোগ-বিয়োগ করা। ইমাম রাগেব বলিতেছেন:

لوى لسانه بكذا كناية عن الكذب و تخرص الحديث -

"সে তাহার জবানকে মোচড় দিল" বাক্যের তাৎপর্য হইবে—সে মিথ্যা বলিল, "কোনো কথা নিজে গড়িয়া লইল।" ইমাম রাজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: - لوى لسانه عن كذا اذا غيره

"সে এ বিষয় সম্বন্ধে নিজের জিহ্বাকে পাক দিল, অর্থাৎ সে তাহা বদলাইয়া ফেলিল" (কাবীর)। মোজাহেদ সোজাসুজিভাবে ইহার অর্থ

করিয়াছেন "তাহ্‌রীফ" বলিয়া। ফলতঃ ভাবার্থে আয়াতের তাৎপর্য হইবে—একদল ইহুদী আল্লাহ্‌র কেতাব পাঠ করার সময়, নিজেদের তরফ হইতে কতক কথা তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া দেয়, এবং সেগুলিকে আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া চালাইয়া দিতে চায়। আমাদের সমাজেও বহুদিন ধরিয়া "লাওলাকা—লামা খালাক্‌তোল আফলাক" আল্লাহ্‌র কালাম বা কোর্‌আনের আয়াত বলিয়া সাধারণ-ভাবে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। তবে আল্লাহ্‌র হাজার হাজার শোকর, গত যুগের সেই অন্ধকার, কোর্‌আন ও হাদীছের আলোকে এবং হক্কানী আলেমগণের সাধনার ফলে, বর্তমানে কতকটা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

৫৪। **টীকাঃ আল্লাহ্‌র কালামে জালিয়াতী**—বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম বলিয়া যে সব পুঁথি-পুস্তক ইহুদী ও খ্রীষ্টান সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা যে বহুলাংশে বিকৃত হইয়াছে, মূলের বহু অংশ যে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন নূতন পুঁথি-পুস্তক যে পরবর্তী সময়ে তাহাতে শামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। কোর্‌আন মাজীদ চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে অনাবিল ভাষায় এই সত্যের ঘোষণা করিয়াছিল।

৫৫। **টীকাঃ যীশুর নামে অপবাদ**—হযরত ঈছার প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে ইনজীল নাজেল হইয়াছিল, সাধু পৌল ও Eusebius প্রভৃতি খ্রীষ্টান ধর্মনায়কগণের "Pious fraud" বা সাধু প্রবঞ্চনার মাহাত্ম্যে তাহা পরে একখানা নূতন পুস্তকে পরিবর্তিত হইয়া যায়। খ্রীষ্টানদের বর্তমান বাইবেল কোর্‌আনের বর্ণিত ইন্‌জীল নহে। বরং এখন তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে হযরত ঈছার জীবন কাহিনী সম্বন্ধে কতকগুলি উদ্ভট ও অনৈতিহাসিক পৌরাণিক কেচ্ছা-কাহিনীর সমষ্টি মাত্র। আয়াতে বলা হইতেছে যে, ঈছা ছিলেন আল্লাহ্‌র সত্য নবী, তাঁহার বা তাঁহার ন্যায় অন্য কোনও সত্য নবী আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নিজের এবাদত-বন্দেগীর নির্দেশ কাহাকেও দিতে পারেন না। সুতরাং খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ ও পৌত্তলিকতা, হযরত ঈছার শিক্ষা ও সাধনার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

---

৯ রুকূ

৮১। আর (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ নবিগণের (নিকট) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ ۱

النَّبِيّنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ
كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط
قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ
عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا
اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا
مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ٥

হইতে একরার লইলেন: "আমরা তোমাদিগকে যখন কেতাব ও হেকমত প্রদান করি, তাহার পর যখন তোমাদের কাছে সেই রাছুল আগমন করেন যিনি হইবেন তোমাদের সঙ্গেকার সত্যের তাছ্‌দীককারী—(তখন) তোমরা তাহাতে ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। তোমরা কি (এই) একরার করিতেছ, আর আমার হুজুরে ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেছ? তাহারা বলিল—(হাঁ) একরার করিলাম; আল্লাহ্‌ বলিলেন—সেমতে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও রহিলাম সাক্ষী তোমাদের সঙ্গে।"(৫৬)

٨٢ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥

৮২। ইহার পর (এই সত্য পালনে) বিমুখ হইবে যাহারা, অভিচারী হইতেছে তাহারাই।

٨٣ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ
وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا

৮৩। তবে কি তাহারা আল্লাহ্‌র (প্রবর্তিত) দীনকে ব্যতীত আর কিছুর চেষ্টা করিতেছে—অথচ আছমানে ও জমিনে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই অনুগত হইয়াছে তাঁহারই—ইচ্ছায় বা বিনা ইচ্ছায়, আর অবস্থা এই যে, তাহাদের সকলকে ফিরিয়া

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○

যাইতে হইবে তাঁহারই পানে।

৮৪ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ص
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ز
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

৮৪। (হে রাছুল।) তুমি বলিয়া দাও: যাহা আমাদের প্রতি নাজেল করা হইয়াছে, আমরা ঈমান আনিয়াছি তাহার প্রতি, এবং ইবরাহীমের, ইছ্‌মাইলের, ইছ্‌হাকের, ইয়াকুবের ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যাহা নাজেল করা হইয়াছে তাহার প্রতি—আর মূছা, ঈছা ও অন্য সব নবী নিজেদের প্রভু-পরওয়ার-দেগারের হুজুর হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছেন সে সমস্তের প্রতি—তাঁহাদের মধ্যে (নবী হিসাবে) কোনও তারতম্য করি না আমরা, আর আমরা হইতেছি সেই প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি আত্ম-সমর্পিত (মোছ্‌লেম)।

৮৫ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ج
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ○

৮৫। বস্তুতঃ ইছলাম ব্যতিরেকে অন্য কোনও ধর্মের উদ্দেশ করিবে যে ব্যক্তি, তাহার পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র হুজুরে তাহা গৃহীত হইতে পারিবে না, অথচ আখেরাতে সে-ই হইবে সর্বনাশ-গ্রস্তদের অন্যতম। (৫৭)

৮৬। কিরূপে আল্লাহ্ সেই লোক সমাজকে সুপথে পরিচালিত করিবেন—ঈমান আনার পর ও রাছুলকে বারহাক বলিয়া স্বীকার করার পর এবং তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণগুলি উপস্থিত হইয়া যাওয়ার পরও যাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে। অবস্থা এই যে, জালেম লোকদিগকে আল্লাহ্ সুপথে পরিচালিত করেন না। (৫৮)

٨٦ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ٥

৮৭। এই যে লোকগুলি, ইহাদের কর্মফল এই যে, তাহাদের উপর বর্তিয়া যায় আল্লাহ্র লানত এবং ফেরেশতাগণের ও মানুষদিগের সকলের (লানত)।—

٨٧ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ٥

৮৮। তাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হইবে তাহারা, তাহাদের আজাবের লাঘব করা হইবে না এবং অবসরও দেওয়া হইবে না তাহাদিগকে।

٨٨ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۙ٥

৮৯। তবে ইহার পর তাওবা করিবে যাহারা এবং নিজদিগকে শুধরাইয়া লইবে যাহারা, সে অবস্থায় (জানা উচিত যে,)

٨٩ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا قف فَاِنَّ

اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাপরায়ণ, কৃপানিধান। (৫৯)

٩٠ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ۝

৯০। নিশ্চয় ঈমান আনার পর কাফের হইয়া যায় যাহারা, তাহার পর কোফরী মানসিকতাকে বর্ধিত করিয়া চলে, তাহাদের তাওবা নিশ্চয় কবুল করা হয় না, এবং এই যে লোকগুলি, পথহারা হইয়াছে ইহারাই।

٩١ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ ع

৯১। নিশ্চয় কাফের হইল যাহারা এবং সেই কোফরের অবস্থায় মৃত্যু হইল যাহাদের, তাহাদের কাহারও পক্ষ হইতে সারা জমিন-ভরা স্বর্ণ ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দেওয়া হইলেও তাহা কবুল করা হইবে না; এই যে লোকগুলি, ইহাদের জন্য অবধারিত আছে যাতনাদায়ক দণ্ড এবং কেহই থাকিবে না তাহাদের সাহায্যকারী।

তাফ্‌ছীর

৫৬। **টীকা ঃ নবিগণের একরার**—নবিগণের একরার বলিতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের নিজেদের একরারকে বুঝাইতেছে, আয়াতের

শাব্দিক অনুবাদ অনুসারে কয়েকজন তাফ্ছীরকার এই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বহু তাফ্ছীরকার ও আলেমের মতে "নবিগণের একরার" বলিতে তাঁহাদের উম্মতগুলির একরারকেও বুঝিতে হইবে। এই মতের সমর্থনে তাঁহারা কতকগুলি যুক্তি-প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন (কাবীর ২—৭২৭)। কিন্তু উভয় মতের বিরুদ্ধে বলিবার কথাও কিছু কিছু আছে।

আমার মতে, আল্লাহ্ একরার গ্রহণ করিয়াছিলেন নবীদিগের নিকট হইতে এবং নবীরা ঐ একরার পালনের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন নিজ নিজ উম্মতের প্রতি। এই একরারের বিবরণ দেওয়ার অব্যবহিত পরে, (৮২ আয়াতে) বলা হইতেছে যে, এই একরার পালনে বিমুখ হইবে যাহারা, তাহারা হইতেছে ফাছেক বা অভিচারী। নবিগণের সম্বন্ধে এইরূপ বিমুখ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আয়াতের এ অংশ নবিগণের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

উল্লিখিত একরার সংক্রান্ত বিবরণের সারমর্ম এই যে, মোহাম্মদ মোস্তফা হইতেছেন দুনিয়ার শেষ নবী। তাঁহার আবির্ভাবের পর অতীতের যাবতীয় নবী ও রাছুলগণের নবুয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের উম্মতগণকে এই শেষ নবীর উপর ঈমান আনিতে ও তাঁহাকে সাহায্য করিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য, অতীত নবিগণের উম্মতদিগকে মোহাম্মদ মোস্তফার সহায়তা করিতে বলা হইতেছে, সমগ্র আখেরী জামানার নবী হিসাবে। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবের পর অন্য কোনো নবীকে স্বীকৃতি দান, তাঁহাদের কাহারও পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অন্যথায় মদদ করার পরিবর্তে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণই করা হইবে। পাঞ্জাবের মির্জা ছাহেব নিজেকে مثيل مسيح ঈছার অনুরূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুরূপের কথা দূরে থাকুক, আসল মছীহ্ও যদি সশরীরে দুনিয়ায় নামিয়া আসিতেন, তাহা হইলেও মোস্তফার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁহার পক্ষেও গত্যন্তর থাকিত না। হযরত রাছুলে কারীম স্বয়ং উম্মতকে ইহা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই মর্মের হাদীছগুলির সার শিক্ষা এই যে, "মূছা ও ঈছা যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমার (মোহাম্মদের) তাবেদারী করা ব্যতীত তাঁহাদেরও গত্যন্তর থাকিত না।"

(হাদীছগুলি সম্বন্ধে এবন-কাছীর, এই আয়াতের তাফ্ছীর দেখুন)।

পার্সিক, হিন্দু, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ববর্তী নবী-

রাছুল ও মুনি-ঋষিগণের বর্ণিত এই শ্রেণীর বহু নির্দেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী আজও মওজুদ আছে।

৫৭। টীকা : ইছলামই একমাত্র সত্য ধর্ম—এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

৫৮। টীকা : মোর্তাদদের কথা—ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের মোশরেক হইয়া যাইবে যাহারা, এখানকার আয়াতগুলিতে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনো ব্যক্তি বা জাতি সম্বন্ধে এই আদেশকে সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে না।

আল্লাহ্ জালেম কওমকে সুপথে পরিচালিত করেন না—আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে।

৫৯। টীকা : ধর্ম নিয়া খেলা করা—ঈমান আনার পর যাহারা ইছলাম ধর্মকে বর্জন করিয়া, কাফের মোশরেকদিগের ধর্মে যোগদান করে, তাহাদিগকে মোর্তাদ বলা হয়। ইছলামের ব্যবস্থায় ইহা হইতেছে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু নিজেদের ভুল বুঝিয়া যাহারা যথাসম্ভব সত্বর অনুতপ্ত হয়, এবং আত্ম-সংশোধন করিয়া নেয়, ক্ষমাময় ও করুণানিধান আল্লাহ্ সেই সত্যকার অনুতপ্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। মওতের পূর্ব পর্যন্ত এই সুযোগ থাকে। কিন্তু মওত উপস্থিত হওয়ার পর সে সুযোগ শেষ হইয়া যায়। দুনিয়ার সমস্ত সোনা তাহার পক্ষ হইতে, কাফ্‌ফারারূপে ব্যয় করা হইলেও তাহা গৃহীত হইতে পারিবে না। সূরা নেছার ১৭, ১৮ আয়াতে বিষয়টা আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

চতুর্থ পারা

১০ রুকূ

৯২। পরম কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিবে না তোমরা—যাবৎ না তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তু হইতে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে; আর অবস্থা এই যে, যে কোনও বস্তু তোমরা ব্যয় কর না

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى
تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۵ وَمَا
تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ

اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

কেন, আল্লাহ্ (হইতেছেন) সে সম্বন্ধে সম্যক বিদিত। (৬০)

۹۳ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ط قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৯৩। ইয়াকুব যাহাকে নিজের উপর নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল, তাহা ব্যতীত আলোচ্য খাদ্যগুলির সমস্তই—তাওরাত নাজেল না হওয়া পর্যন্ত—বানি-ইছ্রাইলের পক্ষে হালাল ছিল; অন্যথায় তাওরাত লইয়া আইস আর তাহা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

۹۴ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ صلے

৯৪। সেমতে ইহার পরেও আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রটনা করিবে যেসব লোক, তাহারা তো হইতেছে জালেম।

۹۵ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৯৫। বল, আল্লাহ্ সত্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, অতএব (হে আহ্লে-কেতাব সমাজ!) তোমরা সত্যাশ্রয়ী ইবরাহীমের ধর্মপথের অনুসরণ করিয়া চল; বস্তুতঃ সে মোশরেকদিগের দলভুক্ত না।

৯৬ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ج

৯৬। নিশ্চয় (জানিও), সমগ্র মানব সমাজের জন্য সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে এবাদতখানা, বাক্কাতেই অবস্থিত আছে তাহা— বহু কল্যাণে পূর্ণ হইয়া আছে তাহা, এবং তাহা হইতেছে সারা জাহানের জন্য পথ প্রদর্শক—(৬১)

৯৭ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ج ۵ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯৭। তাহাতে আছে বিভিন্ন নিদর্শন —বিশেষতঃ মাকামে ইবরাহীম, এবং কোনও মানুষ তাহাতে প্রবেশ করিলে নিরাপদ হইয়া যায় ; এবং রাহা খরচের সংস্থান করিতে পারে যে ব্যক্তি, (সেই শ্রেণীর) সমস্ত মানুষের জন্য এই গৃহের হজ করা হইতেছে অবশ্য কর্তব্য; তবে যদি কোনো ব্যক্তি অমান্য করে, (তাহার জানা উচিত যে,) আল্লাহ্‌ হইতেছেন সমস্ত জাহান হইতে বে-নিয়াজ। (৬২)

৯৮ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ صلے ق وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৯৮। বল : হে আহ্‌লে-কেতাব সমাজ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলিকে তোমরা অমান্য করিতেছ, কি কারণে? অথচ তোমাদের কৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ হইতেছেন প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

৯৯। বল: হে আহ্‌লে-কেতাব সমাজ, কেহ ঈমান আনিলে, তাহাকে তোমরা আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবারিত করিতেছ, সেই পথকে বক্ররূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছ, কি কারণে? অথচ তোমরা নিজেরাই হইতেছ (তাহার সত্যতার) প্রত্যক্ষ সাক্ষী; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আদৌ গাফেল নহেন।

٩٩ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ
تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ
اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ
شُهَدَآءُ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

১০০। হে মোমেনগণ। কেতাব দেওয়া হইয়াছিল যাহাদিগকে, তোমরা যদি তাহাদের কোনও দলের অনুগত হইয়া চল, তবে তোমাদের ঈমানের পরেও তাহারা তোমাদিগকে আবার কাফেররূপে পরিণত করিয়া দিবে।

١٠٠ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنْ
تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১০১। আর তোমরা কাফের হইয়া যাইতে পার কেমন করিয়া, অথচ তোমাদেরই সম্মুখে আল্লাহ্‌র কেতাবের তেলাঅত করা হইতেছে, অধিকন্তু আল্লাহ্‌র রাছুল (বিদ্যমান) আছেন তোমাদের মধ্যে! বস্তুতঃ দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র স্মরণ গ্রহণ করিল যে ব্যক্তি, সত্য সরল (মুক্তি) পথের

١٠١ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ
تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ
وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط وَمَنْ
يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ

দিকে পরিচালিত করা হইল তাহাকে। إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তাফ্‌ছীর

৬০। **টীকাঃ বের্‌ বা পরম কল্যাণ**—বের্ অর্থে ঈমান ও আমলের সমস্ত সৎ ও সত্য বিষয়কে বুঝাইয়া থাকে। ইহার বিস্তারিত তাৎপর্য সম্বন্ধে সূরা বাকারার ২২ রুকূ এবং তাহার ১৭৭ আয়াত বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। মানুষের প্রিয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রথম আসে, তাহার মালের কথা, এবং পরিণামে আসে তাহার জানের পরীক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে আছে তাহার পৈতৃক সংস্কারগুলির প্রশ্ন। আল্লাহ্‌র হুকুম মত, যথাসময়ে যথাযথভাবে এই সমস্তের মায়া-মোহ ত্যাগ করিতে পারে যেসব বান্দাহ্, পরম কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিবে কেবল তাহারাই।

এই আয়াতের তাছফ্‌ীর সম্বন্ধে প্রথমে প্রশ্ন আসিতেছে যে, এখানে সম্বোধন করা হইতেছে কাহাদিগকে? তাফ্‌ছীরকারগণের সাধারণ মত এই যে, এই আয়াতে সম্বোধন করা হইতেছে মোছলেম জনসাধারণকে। তাঁহাদের মতে, পূর্বের বা পরের আয়াতগুলির সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। আহ্‌লে-কেতাবদিগের আলোচনার মধ্যে, মুছলমানদিগকে প্রকৃত ও পরম কল্যাণ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। মুফ্‌তী আবদুহুর মত এই যে, এখানেও সম্বোধন করা হইতেছে, আহ্‌লে-কেতাবদিগকে।

আমার মতে, পূর্ব রুকূর ৮৩ আয়াত পর্যন্ত খ্রীষ্টানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং ৮৪ আয়াত হইতে মুছলমানদিগকে তাহাদের করণীয়-অকরণীয় সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং এই আয়াতে সেই প্রসঙ্গটা শেষ হইয়া যাইতেছে। তাহার পরে ৯৩ আয়াত হইতে ইহুদীদের সম্বন্ধে বিচার আলোচনার সূচনা করা হইতেছে নূতন পর্যায়ে, তাহাদের উপস্থাপিত কতকগুলি সংশয়ের খণ্ডন করার জন্য। সুতরাং তরতীবের দিক দিয়া কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখিতেছি যে, কোর্‌আন নাজেল হইয়াছিল, দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরিয়া। মোছলেম সমাজের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আয়াতগুলি লিখিয়া রাখা হইত নাজেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এবং সে লেখার বিন্দুবিসর্গও আজ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় নাই। সুতরাং অন্য পুঁথি-পুস্তকের ন্যায় ইহাতে বিষয়গুলির তরতীব স্বভাবতঃই রক্ষিত হইতে পারে নাই।

৬১। **টীকাঃ ইহুদীদের প্রতিবাদ**—৯ রুকুর প্রথম আয়াতে নবী-দিগের মীছাক বা অঙ্গীকার গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে এই একরারের মর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম হইতে হযরত ঈছা পর্যন্ত সমস্ত নবী ও রাছুল, দুনিয়ার শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমনের খোশ-খবর দিয়া গিয়াছেন এবং নিজ নিজ উম্মতকে তাঁহার তাবেদারী করার তাকীদ করিয়াছেন। ইহার পর ৮৩ আয়াতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মোছলেম সমাজ হযরত ইবরাহীমের ও তাঁহার বংশের অন্যান্য নাবিগণের উপর ঈমান রাখে।

এই সব ঘোষণায় বিব্রত হইয়া ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতরা ন্যায়ের ফাঁকি আবিষ্কার করিয়া উপরোক্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতে লাগিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল: মোহাম্মদ ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি ইবরাহীমের নবুয়তে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার কথা সত্য নহে। কারণ উটের গোশ্তকে তিনি হালাল বলিয়া ব্যবস্থা দিতেছেন, অথচ ইবরাহীমের মিল্লাতে তাহা হারাম বলিয়া নির্ধারিত হইয়া আছে।

আয়াতে ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, যেসব খাদ্যকে তোমরা হারাম বলিয়া নির্ধারণ করিতেছ, ইবরাহীমের সময়ও তাহা হালাল ছিল, এবং তাঁহার পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহা হালাল বা বৈধ খাদ্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইছরাইল অর্থাৎ ইয়াকুব (কোনও কারণে) সেগুলিকে নিজের সম্বন্ধে অবৈধরূপে গ্রহণ করে। প্রচলিত তাওরাতে লেবীয় পুস্তকের ৭—২২, ২৩ আয়াতে ছাগল, গরু ও উটের চর্বি মাত্র হারাম করা হয়। পরবর্তী ১১ আয়াতে গোটা উটকে হারাম করিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাওরাত নাজেল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতে উট হারাম করা হয় নাই।

এই উট হারাম হওয়ার পশ্চাতে একটা কেচ্ছা আছে। যাকোব বিদেশে যাইতেছেন, সেই সময় তিনি একদা একা রাত্রি যাপন করিতেছেন, সেই অবস্থায় ''এক পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তিনি জয়ী হইতে পারিলেন না দেখিয়া যাকোবের (ইয়াকুবের) শ্রোণীফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হইল। পরে সে পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।

পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইছ্‌রাইল (ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধকারী) নামে আখ্যাত হইবে।....এই কারণে ইছ্‌রাইল সন্তানেরা অদ্যাপি শ্রোণীফলকের উপরিস্থ মাংস ভক্ষণ করে না।" (পুরাতন নিয়ম, ৩২ অধ্যায়)।

কোর্‌আন মাজীদে দশ-বার স্থানে ইয়াকুব নামই ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং ইয়াকুবের স্থলে ইছ্‌রাইল নাম ব্যবহার করা হইয়াছে, আমি যতদুর জানি, মাত্র দুইটি স্থানে, তাহার প্রথম হইতেছে এইটি। সম্ভবতঃ ইহুদীদের প্রতিবাদের মূল ভিত্তির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই এখানে ইছ্‌রাইল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই কেচ্ছাটার সার কথা হইতেছে—ঈশ্বরের সহিত একজন নবীর (অন্ততঃ একজন বান্দার) এক রাত ব্যাপী মল্লযুদ্ধ। ইহাকে আবার আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া দুনিয়াময় ঢোল পিটান হইতেছে!

৬২। টীকা ঃ দ্বিতীয় সংশয়ের উত্তর—এই আয়াতে ও ইহার পরবর্তী ৯৭ আয়াতে ইহুদীদের দ্বিতীয় সংশয়ের প্রতিবাদ করা হইতেছে, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণের দ্বারা। তাহারা বলিতেছিল, যেরূশালেম বা বায়তুল মোকাদ্দাছই হইতেছে দুনিয়ার সর্বপ্রথম 'এবাদতগাহ্'। মোহাম্মদ তাহা ত্যাগ করিয়া ও কা'বাকে গ্রহণ করিয়া ইবরাহীমী মিল্লাতের চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

এই প্রচারণার প্রতিবাদে কোর্‌আনে যাহা বলা হইতেছে, তাহার সারমর্ম এই যে, মাছজেদুল হারাম বা কাবা মছজিদই হইতেছে, বস্তুতঃই দুনিয়ার প্রথম এবাদতগাহ—এবং হজরত ইবরাহীম হইতেছেন তাহার প্রতিষ্ঠাকারী। বিশেষতঃ তাহার নির্মাণ সমাধা হইয়াছিল বায়তুল-মোকাদ্দাছের বহু পূর্বে।

কা'বা যে হযরত ইবরাহীমের নির্মিত, কোর্‌আন মাজীদে তাহা পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। আরব জাতি স্মরণাতীতকাল হইতে সকলে সমবেতভাবে ইহা স্বীকার ও প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রাচীন সাহিত্যেও কা'বার প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। জগতের অন্যান্য ধর্মমন্দিরগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, (১) দুনিয়ার সকল দেশের সকল মানবের জন্য তাহার কোনোটাই নির্মিত হয় নাই। (২) খাছ আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীর জন্য তাহার পূর্বে আর কোনও গৃহ নির্মিত হয় নাই।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কা'বার মোকাবেলায় বাইতুল-মোকাদ্দাছের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহাদের ধর্মপুস্তক বাইবেলের Chronology অনুসারে, হযরত ইবরাহীমের মৃত্যু হইয়াছে স্মষ্টিসনের ২১৫১ সালে বা

খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫৩ সনে। ইছ্‌রাইলবংশীয়রা মিসরে অধিবাস স্থাপন করেন স্থষ্টি-সনের ২২৯৮ সালে বা খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০৬ সনে। সুতরাং হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর ১৪৭ বৎসর পরে ইছ্‌রাইলীয়রা মিসরে গমন করিয়াছিলেন। "ইছ্‌রাইল সন্তানেরা ৪৩০ বৎসরকাল মিসরে অবস্থান করিয়াছিলেন" (যাত্রা ১২—৪০)। "মিসর দেশ হইতে ইছ্‌রাইল-সন্তানদের বাহির হইয়া আসিবার ৪৮০ বৎসর.... শলোমন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন" (১ রাজাবলি ৬—১)। "আর সাত বৎসরে ঐ গৃহের নির্মাণ সমাপ্ত হয়" (ঐ, ৩৮ পদ)। সুতরাং হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর (১৪৭ + ৪৩০ + ৪৮০ + ৭ = ১০৬৪ বৎসর) পরে হযরত ছোলায়মান কর্তৃক বায়তুল-মোকাদ্দাছ বা যেরূশালেম-মাছজিদের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর অন্ততঃ ৩৬ বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম কা'বার নির্মাণকার্য সমাধা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাইবেল অনুসারে কা'বা নির্মিত হইয়াছিল বায়তুল-মোকাদ্দাছের পূর্ণ ১১ শত বৎসর পূর্বে। এই হিসাব অনুসারে বায়তুল-মোকাদ্দাছের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১০৪সালে। ইহার সঙ্গে ১৯৫৯ সাল যোগ করিতে হইবে। সুতরাং আজ হইতে (১০৪+১৯৫৯+১১০০=) ৩১৬৩ বৎসর পূর্বে ইবরাহীম কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মিত হইয়াছিল।

আরব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ কর্তৃক সঞ্চিত বহু প্রাচীন ইতিবৃত্তে এবং আরব কবিদিগের রচিত কবিতায়, মক্কার ও কা'বার দীর্ঘকালের ইতিহাস সুরক্ষিত হইয়া আছে। ইহা ব্যতীত, ইউরোপের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকও মক্কা ও কা'বা সম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বলে হিরোদোতাস (Herodotus, জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৪ সনে), Diodrus Siculus, (জন্ম যীশুর একশতাব্দী পূর্বে) এবং Ptolemy প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক যুগের বহু পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণেও ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

মাকামে ইবরাহীম: কা'বা যে হযরত ইবরাহীমের প্রতিষ্ঠিত, ৯৬ ও ৯৭ আয়াতে তাহার ৪টা অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে: যথা, বাক্কা, মাকামে ইবরাহীম, নিরাপদ স্থান ও চিরাচরিত হজ্ প্রথা। প্রথমে মাকামে ইবরাহীমের কথা বলিতেছি।

মাকাম—অর্থ, কিয়ামের স্থান। কিয়াম অর্থ, দাঁড়ান। যেমন নামাযের কিয়াম, মওলুদের কিয়াম প্রভৃতি। ইছলামের পরিভাষায় নামায ও এবাদতের জন্য দাঁড়ানকেই কিয়াম বলা হয়। হযরত ইবরাহীম যে স্থানে দাঁড়াইয়া নামায

আদা করিতেন, তাহাই মাকামে ইবরাহীম নামে আবহমান কাল হইতে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। ইছলামের পূর্বেও কোরেশ সমাজের ও অন্যান্য আরব গোত্রের সকলেই তাহাকেই মাকামে ইবরাহীম বলিয়া জানিয়া ও মানিয়া আসিয়াছে। হযরত রাছুলে কারীম স্বয়ং এবং তাঁহার ছাহাবিগণ সেইস্থানকেই মাকামে ইবরাহীম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, (বোখারী, বায়হাকী প্রভৃতি—মান্‌ছুর)। তাওয়াফ করার পর মাকামে ইবরাহীমে দুই রাক্‌আত নফল নামায পড়ার ব্যবস্থা আছে। হযরত রাছুলে কারীমও তাওয়াফ করার পর ঠিক ঐ স্থানে সেই নফল নামায আদা করেন। ছাহাবী জাবের একবারের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন:

اتى المقام فقال و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ' وصلى ركعتين -

অর্থাৎ হযরত (তাওয়াফের পর) মাকামে ইবরাহীমে উপস্থিত হইলেন এবং "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করিবে"—এই আয়াত পাঠ করিলেন আর সেখানে দুই রাকআত নফল নামায আদা করিলেন (মোছলেম, মালেক, তিরমিজী প্রভৃতি)। অতএব নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে যে, কা'বা প্রাঙ্গণের যে স্থানটি মাকামে ইবরাহীম বলিয়া চিহ্নিত হইয়া আছে, তাহাই এবং একমাত্র তাহাই মাকামে ইবরাহীম এবং হযরত ইবরাহীমের নামায পড়ার স্থান।

২য় নিদর্শন—কা'বা নিরাপদ স্থান—কা'বা নিরাপদ স্থান হইয়া আছে, তাহা নির্মিত হওয়ার দিন হইতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আরব সমাজের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ভীষণভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে খুন-খারাবীর কোনো দিন নিবৃত্তি ঘটে নাই। কে, কবে, কোথায়, কাহা-দ্বারা নিহত হইবে—এই আশঙ্কায় সর্বদাই তাহারা বিব্রত হইয়া থাকিত। কিন্তু কা'বার সীমানায় প্রবেশ করার পর তাহারা নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিত। কোনও প্রকার হিংসা-প্রতিহিংসার চিন্তাও তাহারা সেখানে করিত না, ইহাই ছিল তাহাদের অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় সংস্কার। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই সংস্কারকে তাহারা মান্য করিয়া আসিয়াছে এবং আজও এই নিয়ম পূর্বের ন্যায় বলবৎ হইয়া আছে। সুতরাং কা'বার এই বিশেষণটা যে ঐতিহাসিক সত্য, তাহা প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে স্বীকার করিতে হইবে।

কা'বার ৩য় নিদর্শন—বাৎসরিক হজ্‌—কা'বার সাংবাৎসরিক হজ সমাপন করার রীতি, যীশু জন্মের বহু শতাব্দি পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। হযরত ইবরাহীমই যে, আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে ইহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন,

এ বিশ্বাসও আরব সমাজে দূর অতীতের হজ অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রথম দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। হজ সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থাগুলিরও আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। আজ হইতে প্রায় ৩৮৫০ বৎসর পূর্বে Herodotus তখন কা'বা ঘরে অবস্থিত লাত নাম্নী মূর্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক Diodrus Siculus খ্রীষ্টপূর্ব ৬০—৫৭ সালের মধ্যবর্তী কালে মিসর দেশ পর্যটন করেন। (Ency. Br.)। তিনি আরবদেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "There is in this country, a temple greatly revered by the Arabs. অর্থাৎ এদেশে একটা 'মন্দির' আছে, আরব জাতি যাহার অত্যন্ত সম্ভ্রম করিয়া থাকে।" এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর স্যার উইলিয়ম মূরের ন্যায় লেখকও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—These words must refer to the Holy House of Mecca, for we know of no other, which ever commanded such universal homage. (Life of Mohammad, c. iii,) "এই শব্দগুলি নিশ্চয় মক্কার পবিত্র গৃহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কারণ, কা'বা ব্যতীত অন্য কোনোটি কস্মিনকালে এইরূপ সার্বজনীন শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া আমরা বিদিত নহি।

মক্কা ও বাক্কা—মক্কার আর এক নাম বাক্কা (রাগেব, ফাত্হুল্-বোলদান প্রভৃতি)। ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্রে এই নামের ব্যবহার দেখা যায়। সূরা বাকারার ১১২ টীকায় জাবুরের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হযরত দাউদ সদা প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—فطوبى للسكان فى بيتك الخ—Blessed are they that dwell in Thy house, মোবারকবাদ তাহাদের জন্য, যাহারা বাস করিতেছে তোমার গৃহে। ফলতঃ এখানে তিনি আল্লাহ্‌র ঘরের বা বায়তুল্লাহ্‌রই মহিমা কীর্তন করিতেছেন।

---

১১ রুকূ

১০২। (হে মোমেন সমাজ!) তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সমীহ করিয়া চলিবে যেরূপভাবে তাঁহার সম্বন্ধে সমীহ করা উচিত—সেইরূপ-ভাবে, এবং (সতর্ক থাকিও) যেন তোমরা মরিতে পার মোছলেম অবস্থাতেই। (৬৩)

١٠٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

١٠٣ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ص وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১০৩। এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশিকে আঁকড়াইয়া ধরিবে মজবুতভাবে, সকলে একত্রে আর (খবরদার!), যেন ফের্কায় ফের্কায় বিভক্ত হইয়া পড়িও না,— এবং তোমরা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ রাখিও যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন, কিন্তু সেই (শোচনীয় অবস্থায়) তোমাদের মধ্যে মনের মিল ঘটাইয়া দিলেন, সেমতে তোমাদের জাতীয় জীবনের প্রভাত হইল ভাই ভাইরূপে। অবস্থা এই যে, তোমরা ছিলে একটা অগ্নিপূর্ণ খন্দকের কিনারায়, তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন; এইরূপে আল্লাহ্ নিজের আয়াতগুলিকে তোমাদিগের নিকট বিশদভাবে বয়ান করিয়া দিতেছেন, যেন তোমরা সৎপথে চলিতে পার। (৬৪)

١٠٤ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

১০৪। আর, তোমাদিগের মধ্যে একটি জামাআত এমন থাকা উচিত, যাহারা (জনগণকে) আহ্বান করিবে সৎকাজের পানে, আর (তাহাদিগকে) বারণ করিবে

মন্দ কাজ হইতে; বস্তুতঃ এই যে লোক সমাজ, সিদ্ধকাম হইবে ইহারাই। (৬৫)

الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০৫। আর তোমরাও যেন সেই সমাজের মত (বিভ্রান্ত) হইয়া পড়িও না, যাহারা ফের্কায় ফের্কায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটাইয়াছে—সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণগুলি তাহাদের কাছে পৌঁছিয়া যাওয়ার পরও; এই যে লোকগুলি, ইহাদের জন্য অবধারিত আছে গুরুতর আজাব,--

١٠٥ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ لا

১০৬। সেই দিনে, যেদিন প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে কতকগুলি মুখ আর কতকগুলি হইয়া যাইবে মসি-মলিন, সেমতে মসি-মলিন হইবে যেসব মুখ, (তাহাদিগকে বলা হইবে): নিজেদের ঈমানের পর তোমরা কি কাফের হইয়া গিয়াছিলে ? সেমতে যে কোফর অবলম্বন করিয়াছিলে তোমরা, তাহার প্রতিফলে এই আজাব ভোগ করিতে থাক।

١٠٦ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ج فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ قف اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

১০৭। পরন্তু প্রফুল্ল হইবে যাহাদের মুখ,

١٠٧ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ

তাহারা তো অবস্থান করিবে আল্লাহ্র রহমতে; সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী।	وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ ط هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○
১০৮। এগুলি হইতেছে আল্লাহ্র আয়াত —যাহার তেলাওত করিতেছি তোমার নিকট বারহাকভাবে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের উপর জুলুম করিতে কখনও ইচ্ছুক নহেন।	١٠٨ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِينَ ○
১০৯। এবং আছমানে যাহা কিছু আছে ও জমিনে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তের একমাত্র মালেক হইতেছেন আল্লাহ্, বস্তুতঃ সব ব্যাপারই ফিরিয়া যাইবে আল্লাহ্রই পানে।	١٠٩ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ع

তাফ্ছীর

৬৩। **টীকা ঃ তাক্ওয়া**—তাক্ওয়ার তাফ্ছীর সম্বন্ধে বাকারার ৩ ও ৪ টীকা দেখুন। এই আয়াতে মোমেন বান্দাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে—অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ বা সন্তোষ-অসন্তোষ সম্বন্ধে—সতর্ক থাকিতে যথোচিতভাবে। কিন্তু যথোচিতভাবে আল্লাহ্র ফরমাঁবরদারী করিয়া চলা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সূরা তাগাবোনের ১৬ আয়াতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে, فاتقوا الله ما استطعتم। আল্লাহ্র তাক্ওয়া বা সমীহ করিতে থাকিবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া। অর্থাৎ সাধ্যপক্ষে তাহাতে ত্রুটি করিবে না। এই শ্রেণীর সমস্ত আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে মূলনীতি হিসাবে, সূরা বাকারার ২৮৬ আয়াতে বলা হইয়াছে--لا يكلف الله نفسا الا وسعها

"আল্লাহ্ কোনো মানুষের উপর তাহার সাধ্যের অতীত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না।"

৬৪। **টীকা: আল্লাহ্‌র রশিকে আঁকড়াইয়া ধরা**—এখানে আল্লাহ্‌র রশি বলিতে কোর্‌আন মাজীদকে বুঝাইতেছে। স্বয়ং হযরত রাছুলে কারীম এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (এবন-কাছীর, এবন-জারীর, দুররুল মানছুর প্রভৃতি)। আয়াতে মোমেনদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে: এই কোর্‌আনকে মজবুত-ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবে—তোমরা সকলে, সমবেতভাবে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে, "আর তোমরা বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন ফের্কায় বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িও না।" এইরূপে কোর্‌আনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সেখানে দেখিতে পাইবে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট ফরমান—

فان تنا زعتم في شئي فردوه الى الله و الرسول ان كنتم مؤمنين بالله و اليوم الاخر -

"অতঃপর কোনও বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া যায় তাহাকে পেশ করিবে আল্লাহ্‌র ও এই রাছুলের সমীপে।" আল্লাহ্‌র হুজুরে পেশ করিবে অর্থাৎ তাঁহার শাশ্বত কালাম কোর্‌আন মাজীদের সমীপে পেশ করিবে এবং রাছুলের হুজুরে পেশ করার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, রাছুলের হাদীছগুলির সমীপে তাহা পেশ করিবে—তাহার আলোকে নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ-গুলির মীমাংসা করিয়া লইবে। তাহা হইলে, দলে দলে বিভক্ত হইবার সঙ্গত কারণ আর কিছুই থাকিবে না—অবশ্য যদি তোমরা সত্যকারভাবে আল্লাহ্‌র উপর ও রোজ কিয়ামতের সত্যতা সম্বন্ধে সত্যকারভাবে ঈমান আনিয়া থাক। অন্যথায় বুঝা যাইবে যে, তোমরা সত্যকারভাবে ঈমানদার নহ।

কিন্তু দুনিয়ার মুছলমান, আল্লাহ্‌র এই গুরুতর নির্দেশকে কিরূপ ধৃষ্টতার সহিত অমান্য করিয়া চলিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ধর্মক্ষেত্রে আজ আমরা বহুদলে বিভক্ত, মারাত্মক মতভেদের বাহক। শুধু ইহাই নহে, এই বিভক্ত হইয়া পড়াকেই আজ আমরা ইছলামের সর্বপ্রধান শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, বিভাগ-বিচ্ছেদের এই অভিশাপ অমান্য করাকেই প্রায় কাফেরীর শামিল করিয়া নিয়াছি। কর্মক্ষেত্রের দুর্দশাও ঠিক এইরূপ। আল্লাহ্ বলিতেছেন, انما المؤمنون اخوة—মুছলমানরা পরস্পর ভাই ভাই বই আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু আমরা কার্যতঃ প্রমাণ করিয়া দিতেছি যে, মুছলমান পরস্পরের দুশমন ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না!

অগ্নিপূর্ণ খন্দক: অগ্নিপূর্ণ খন্দকের কিনারায় যাহারা অবস্থান করে,

একটু পা নড়িয়া গেলে অথবা বাহিরের কেহ একটা ধাক্কা দিলে, সেই খন্দকে পড়িয়া যাওয়ার ও পুড়িয়া মরার সম্ভাবনা তাহাদের থাকে। এখানে প্রাক-ইছলাম যুগের আরব সমাজের কথা বলা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অনেকে অগ্নিকুণ্ড বলিতে জাহান্নামকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সে যাহা হউক, আল্লাহ্ আমাদিগকে যে অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমরা আজ আবার সেই কুণ্ডে ইন্ধন যোগাইয়া চলিয়াছি।

১০৪ আয়াতের তাফ্‌ছীর সম্বন্ধে ১১০ আয়াতের টীকা দেখুন।

৬৫। **টীকা: আহ্‌লে-কেতাবদিগের আচরণ**—আল্লাহ্‌র আয়াত বলিতে, তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ এবং তাঁহার প্রকাশিত কোর্‌আন মাজীদের সমস্ত আয়াতকে বুঝাইয়া থাকে। এখানে এ সমস্তকেই বুঝাইতেছে। ইহুদীদিগের উপস্থাপিত সংশয়গুলির প্রতিবাদে উপরের আয়াতগুলিতে যে সব ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে এবং কা'বার যে সব নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ সমস্তই আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সত্যের নিদর্শন।

কেহ মুছলমান না হইতে ও না থাকিতে পারে এজন্য ইহুদী ও খ্রীষ্টান প্রধানবর্গ, চিরদিনই নানা প্রকার অসাধু চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। ৯৮ ও ৯৯ আয়াতে তাহাদের এই প্রকার অসঙ্গত আচরণের নিন্দা করা হইয়াছে। তাহার পর ১০০ আয়াতে মোমেন সমাজকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। বলা হইতেছে—তোমরা যদি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের "কোনও দলের" তাবেদারী করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে, ছলে-বলে-কৌশলে, কাফের বানাইয়া ছাড়িবে।

কিন্তু যে জাতির মধ্যে অহরহ আল্লাহ্‌র আয়াতগুলির তেলাওত করা হইতেছে এবং যাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাছুল মোহাম্মদ মোস্তফা, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শের মধ্য দিয়া চিরজীবন্ত হইয়া আছেন, মোমেন থাকার পর কাফের হইয়া যাওয়ার কোনো কারণই তাহাদের থাকিতে পারে না।

আয়াতে "কোনো দলের" অনুসরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা একটা অতি গভীর ও অতি গুরুতর বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। মুছলমান ও ইছলাম সম্বন্ধে যাঁহাদের মনে কিছু দরদ আছে, তাঁহাদের সকলের উত্তমরূপে জানিয়া রাখা দরকার যে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রকাশ্য প্রচারের বা তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলির দ্বারা আমাদের দেশের মোছলেম জাতির

যতটা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে তাঁহাদের "জনহিতকর" প্রতিষ্ঠান ও সেবা সমিতিগুলি দ্বারা। আমাদের এই দেশের সর্বত্র "রেড ক্রসের" জয়জয়কার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ এই ক্রুস বা ক্রসের ব্যাপারটাই হইতেছে মুছলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসের প্রধানতম বিরোধের বিষয়।

পক্ষান্তরে, যোগ্য আলেমগণের বাস্তব ও সক্রিয় চেষ্টার অভাবে, আমাদের দেশে অশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুশিক্ষার প্রাদুর্ভাবও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাওহীদের আকীদায় যেখানে ও যেদিক দিয়া যে পরিমাণে শিথিলতা অনুপ্রবেশ করিবে, ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, নরপূজা বা অন্য প্রকারের মোশরেকীভাব সেখানে সেই পরিমাণে সহজে আস্তানা গাড়িয়া বসিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে ভাবিবার ও বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু উপস্থিতের মত ইহাই যথেষ্ট হইবে—نکتها هست بسے - محرم اسرار کجاست

---

১২ রুকু

১১০। তোমরাই হইতেছ (সেই) শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে (বাছিয়া) বাহির করা হইয়াছে জনগণের (মঙ্গলের) জন্য, তোমরা নির্দেশ দিবে সৎ ও সঙ্গত কাজের, আর বারণ করিবে অসৎ ও অসঙ্গত কাজ হইতে, এবং তোমরা নিজেরা ঈমান রাখিবে আল্লাহ্‌র প্রতি; বস্তুতঃ আহ্‌লে-কেতাব লোকেরাও যদি ঈমান আনিত, তবে তাহাদের পক্ষে তাহাই হইত মঙ্গলজনক; তাহাদের মধ্যে কতক লোক হইতেছেন মোমেন এবং তাহাদের

১১০। كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ

وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অধিকাংশ লোকই হইতেছে ফাছেক (অভিচারী)। (৬৬)

111 لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ط

وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

১১১। সামান্য কিছু কষ্ট দেওয়া ব্যতীত, তোমাদের কোনো (গুরুতর) ক্ষতি করিতে পারিবে না তাহারা, আর তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইবে তাহাদিগকে, অতঃপর সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না তাহারা। (৬৭)

112 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ

مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا

يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ

১১২। অপমানকে "সাঁটাইয়া" দেওয়া হয় তাহাদের উপর—যেখানে পাওয়া যায় তাহাদিগকে, তবে আল্লাহ্‌র কোনও ফরমানের-বলে অথবা মানুষের কোনো প্রতিশ্রুতির ফলে, আর তাহারা আল্লাহ্‌র গজবের উপযোগী করিয়া নিল আপনাদিগকে, এবং দারিদ্র্যকে আপতিত করা হইয়াছিল তাহাদের উপর; ইহার কারণ এই যে—আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে তাহারা অমান্য করিত এবং নবীদিগকে কতল করিয়া ফেলিত, নাহক-ভাবে; তাহারা নাফরমানী

حَتَّى ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ق

করিয়াছিল এবং সীমালঙ্ঘন করায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (৬৮)

113 لَيْسُوْا سَوَاءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ٥

১১৩। সকলে সমান নহে তাহারা; আহ্‌লে-কেতাবদিগের মধ্যে এমন একটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দল আছে—যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলির তেলাঅত করিয়া থাকে রাত্রি-কালে, এবং ছেজদা করিয়া থাকে (আল্লাহ্‌র হুজুরে)। (৬৯)

114 يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ٥

১১৪। তাহারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র উপর, আদেশ দিয়া থাকে সৎ-কাজের এবং বারণ করিয়া থাকে অসৎকাজ হইতে এবং নিজেরা সৎকর্মগুলি সত্বর পালন করিতে সদা আগ্রহশীল তাহারা।

115 وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ٥

১১৫। বস্তুতঃ যে কোনো সৎকাজ সম্পন্ন করিবে তাহারা—সেগুলি নিশ্চয় অস্বীকৃত হইবে না;

১১৬। নিশ্চয় কাফের হইয়া রহিল যাহারা, তাহাদের ধন-দৌলত ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র (দণ্ড) হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না ; এবং জাহান্নামের অধিবাসী তাহারা, তাহারা তাহাতে চির-স্থায়ী।

١١٦ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

১১৭। এই দুনিয়ার জিন্দেগী সম্বন্ধে যাহা ব্যয় করিতেছে তাহারা, তাহার মেছাল হইতেছে একটা হিমঝঞ্ঝার মত, সেই ঝঞ্ঝা গিয়া পৌঁছিল এমন এক কওমের শস্যক্ষেত্রের উপর—নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছে যাহারা, ফলে হালাক করিয়া ফেলিল তাহাকে ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর জুলুম করেন নাই, বরং জুলুম করিতেছে তাহারাই নিজে-দের উপর। (৭০)

١١٧ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

১১৮। হে মোমেনগণ! আপন কওমের লোক ব্যতীত (অন্য

١١٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

...ন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে ...ও না—তোমাদের ...বনাশ করার কোনও চেষ্টাই তাহারা বাদ দিতেছে না ; কোনো গতিকে তোমরা বিপন্ন হইয়া পড়, ইহাই তাহাদের অভিলাষ,— হিংসা-বিদ্বেষ তো তাহাদের মুখ হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, আর তাহারা নিজের অন্তরে গোপন করিয়া রাখিয়াছে যাহা, তাহা হইতেছে আরও গুরুতর। (৭১)

تَتَّخِذُوا ... مِن
دُونِكُم ... و نَكُم
خَبَالًا ط ... ا مَا عَنِتُّم ج
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ ج صلے وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ٥

১১৯। দেখ, তোমরা তো মহব্বত করিয়া থাক তাহাদিগকে, অথচ তাহারা তো তোমাদের সহিত একটুও মহব্বত রাখে না, এবং তোমরা সব কেতাবে বিশ্বাস করিয়া থাক, অথচ তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, বলে —আমরা ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু যখন আলাহেদা হইয়া যায়—তখন

119 هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ
وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ج وَإِذَا لَقُو
كُمْ قَالُوا آمَنَّا صلے ق ج وَإِذَا
خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ

مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

রাগবশতঃ নিজেদের আঙ্গুলগুলি কামড়াইতে থাকে; বল : নিজেদের রাগদ্বেষ নিয়া মরিয়া যাও। (তোমাদের) মনের কথা আল্লাহ্ অবগত আছেন সম্যকরূপে।

١٢٠ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ط وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ع

১২০। তোমাদের ভাল হইলে তাহাদের তাহা মন্দ লাগে, আর তোমাদের মন্দ হইলে তাহারা তাহাতে প্রফুল্ল হইয়া ওঠে; কিন্তু তোমরা যদি ছবর করিয়া থাক আর সংযমী হইয়া চল, তাহা হইলে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনোরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না; নিশ্চয় তাহাদের কৃতকর্মগুলিকে বেষ্টন করিয়া আছেন আল্লাহ্।

তাফ্‌ছীর

৬৬। **টীকা: প্রচারক জামাআত**—পূর্ব রুকূর ১০৪ আয়াতে মোমেনদিগকে নিজেদের মধ্যে একটি প্রচারক জামাআত গঠন করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই সংস্রবে এই আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মতরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন, এই উদ্দেশ্যে। ইমাম রাজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

و تحقيق الكلام انه ثبت في وصول الفقه ان ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف - ٣٨—٢ -

মর্মার্থ—"উছুল শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে, সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনো গুণ বা বিশেষণের উল্লেখ করা হইলে, প্রতিপন্ন হইবে যে, সেই গুণ ও বিশেষণগুলি হইতেছে সেই সিদ্ধান্তের কারণ।"

আয়াতে মোমেনদিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে যে, সঙ্গত বিষয়ের আদেশ দেওয়া ও অসঙ্গত কাজ হইতে মানুষকে নিবারিত করাই হইতেছে তাহাদের পরম সাধনা। সুতরাং সহজে বোঝা যাইতেছে যে, যে উম্মত ঐ কর্তব্যগুলি পালনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে, শ্রেষ্ঠ উম্মতের খোদায়ী খেতাব হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যায়। এখন মোছলেম উম্মতের ধর্মীয় নায়ক ও রাষ্ট্রীয় নেতাদিগকে এবং মুছলমান জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই মহিমান্বিত খেতাবের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আজ পর্যন্ত আমরা কি চেষ্টা করিয়াছি? এই দুই রুকূর আয়াতগুলির প্রধান নির্দেশ হইতেছে, মোছলেম কওমের মধ্যে, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দলিল-প্রমাণ অনুসারে, ঐক্য ও সংহতির প্রতিষ্ঠা। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা দ্বারা সেই সংহতি সাধনার সাহায্য হইয়াছে, না, আত্মবিচ্ছেদ ও সংঘাত-সংঘর্ষের মাত্রা পূর্ব অপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে?

আয়াতের শেষভাগে বলা হইতেছে—আহ্‌লে-কেতাবরা ঈমান আনিলে, তাহাদের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হইত। অর্থাৎ সে অবস্থায় তাহারাও এই শ্রেষ্ঠ উম্মতে দাখিল হইয়া, নিজেদের ও স্বদেশবাসীর বিশেষ উপকার করিতে পারিত। কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না—কারণ, তাহাদের অধিকাংশ লোকই হইতেছে ফাছেক বা অভিচারী।

৬৭। **টীকা: আল্লাহ্‌র অভয় দান**—এই সূরায় এযাবৎ যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার সার শিক্ষা হইতেছে, মোমেন উম্মতের জাতীয় জীবন গঠনের প্রয়োজন ও আয়োজনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা যখন নিকট-বর্তী হইয়া আসে, তখন নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার এবং নিজেদের অভাব ও ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া লওয়ার দরকার হইয়া থাকে অধিক পরিমাণে।

তাই উপরের আয়াতগুলিতে, আত্মসংশোধন ও সংগঠনের উপদেশ দেওয়ার পর, এই আয়াতে মোমেনদিগকে অভয় দেওয়া হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা হইতেছে ওহোদ যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে কোর্‌আনের ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ সাফল্যের বাস্তব প্রমাণ সম্বন্ধে পরবর্তী রুকূর আয়াতগুলিতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৬৮। **টীকা: কাফেরদিগের কর্মফল**— ضرب শব্দ বিভিন্ন ভাবার্থে

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে উহার অর্থ হইবে الصاق। বা সাঁটাইয়া দেওয়া। (কাবীর)। যেমন লেই বা আঠা দিয়া একখানা কাগজকে অন্য একখানা কাগজের সহিত সাঁটিয়া বা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। ইহার ফলে উহার একখানা কাগজ অন্য কাগজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। ইহুদীদিগের উপর অপমান ও দারিদ্র্য সাঁটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—অর্থাৎ সর্বত্রই তাহারা হেয় ও হীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, আর্থিক অবস্থার দিক দিয়াও তাহাদের এইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল। তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

এই হীনতার অভিশাপে তাহারা জর্জরিত হইতেছিল নিজেদের দুষ্কর্মগুলির প্রতিফলে, আয়াতের শেষ অংশে ইহাও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, পরাধীনতা, দারিদ্র্য এবং জাতীয় জীবনের হীনাবস্থা নিয়মিত নহে, লানত। এই কর্মফল হইতেছে আল্লাহ্‌র অলঙ্ঘ্য বিধান, সকল জাতির সকল মানুষের জন্য শাশ্বত ও চিরন্তন নিয়ম। মোছলেম সমাজের চিন্তানায়কগণকে, নিজেদের বর্তমান অবস্থার দিক দিয়া, এই তথ্যটা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখার অনুরোধ জানাইতেছি।

নিজেদের দুষ্কর্মের প্রতিফলে ইহুদীজাতি নিরাশ্রয় অবস্থায়, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদিগকে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অধিকার দিয়াছিলেন, সর্বপ্রথমে আল্লাহ্‌র সত্য নবী রাহ্‌মাতুল-লিল্‌ আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফা—মদীনায় উপস্থিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায়, আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে। ইহাই হইতেছে, "আল্লাহ্‌র ফরমান অনুসারে" কথার প্রথম ঐতিহাসিক নজীর। ইহার পর, মানুষের প্রতিশ্রুতির নজীর হিসাবে, তাহাদের বর্তমান "ইছ্‌রাইল রাষ্ট্রের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার নিজেদের রাজনৈতিক গরজে, তাহাদের সাহায্যে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও স্থিতি। সেই গরজের অবসান হইয়া যাইবে যেদিন, ইহুদী রাষ্ট্রের চির অবসানের সূচনাও আরম্ভ হইয়া যাইবে সেই দিন হইতে। আমার মনে হয়, তাহার সূচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

৬৯। **টীকা ঃ তাহারা সকলে সমান নহে**—আয়াতের প্রথমে বলা হইতেছে যে, আহ্‌লে-কেতাবগণ সকলে সমান নহে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ঈমানের কথাও বলা হইতেছে। এখানে আহ্‌লে-কেতাব বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইতেছে, তাহা নিয়া বিনা কারণে একটা মতভেদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই মতভেদের দুইটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, ঈমানের সংজ্ঞা হিসাবে মুছলমানরা যাহা বুঝিয়া থাকে, এই আয়াতের সঙ্গে তাহার মিল হইতেছে না। কিন্তু শরিয়তের এই পারিভাষিক সংজ্ঞায় মূল ঈমানকেই বুঝাইতেছে। হাদীছের বর্ণনা অনুসারে ইহার সত্তরাধিক শাখা-প্রশাখাও রহিয়াছে। যেমন, হায়া ও اما طة لاذى عن الطريق পথ হইতে ক্লেশদায়ক বস্তুকে সরাইয়া দেওয়া (বোখারী, মোছলেম)। এই প্রমাণ অনুসারে একদল লেখক বলিয়াছেন যে, ঈমানের এই শাখা-প্রশাখার হিসাবে তাহাদিগের ঈমান আনার কথা বলা হইয়াছে।

তাফ্‌ছীরকারগণের সাধারণ মত অনুসারে, হযরত মূছা ও হযরত ঈছার উম্মতের মোমেনদিগের কথাই আয়াতে বলা হইয়াছে। ইঁহাদের আর একদলের মত এই যে, আবদুল্লাহ্ এবন-ছালাম, আছাদ এবন-ওবেদ, ছালাবা এবন-শো'বা, ছালমান ফার্সী, ছোহেব রুমী প্রমুখ যে সব ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পার্সী প্রভৃতি আহ্‌লে-কেতাব হযরত রাছুলে কারীমের সময় ইছলাম ধর্ম কবুল করিয়াছিলেন, আয়াতে তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

আমি শেষোক্ত মত দুইটিকে সঙ্গত বলিয়া মনে করি। হযরত মূছা ও হযরত ঈছার উম্মতের যেসব লোক তখনকার নবী ও কেতাবকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মোমেন হওয়া সম্বন্ধে তো কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এইরূপে, হযরতের সময়ে যাঁহারা ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিশ্চিত্‌ভাবে মোমেন। শেষোক্ত মতের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, ইছলাম গ্রহণের পর আর কাহাকেও আহ্‌লে-কেতাব বলা যাইতে পারে না। সুতরাং এই মতটি যুক্তিবিরুদ্ধ। কিন্তু ইহা সঙ্গত কথা নহে। সাহিত্যে ব্যবহৃত সব শব্দের সব সময় শাব্দিক অনুবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা সর্ববিদিত বিষয়। আরবীতে ইহাকে مجاز মাজাজ ও كناية কেনায়া প্রভৃতি বলা হয়। প্রধানতঃ ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— مجاز ما كان ও مجاز مايؤل, অর্থাৎ এক সময়ে যাহা ছিল এবং ভবিষ্যতে যাহা হইতে যাইতেছে। এইসব ব্যবহারকে ইংরাজী ভাষায় Fugrative ও Allegorical, বলা হইয়া থাকে। আমার মতে, এখানে مجاز ما كان-এর হিসাবে ইছলাম গ্রহণকারী ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে আহ্‌লে-কেতাব বলা হইয়াছে, এক সময় তাঁহারা আহ্‌লে-কেতাব সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া। যেমন, অবসরপ্রাপ্ত জজ্‌কে আমরা ডাকিয়া থাকি জজ ছাহেব বলিয়া, কোনো পুরুষে কেহ কাজী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশের লোককে কাজী ছাহেব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। আমাদের সকল উছুল শাস্ত্রে ও বালাগাত্ বা অলঙ্কার শাস্ত্রে

এ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। কোর্‌আন ও হাদীছের সাহিত্যেও ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ মওজুদ আছে।

৭০। **টীকাঃ কাফেরদিগের অনর্থক ব্যয়**—বদর যুদ্ধের ভীষণ পরাজয়ের পর মক্কার কোরেশ সমাজ দীর্ঘ এক বৎসর সময় ধরিয়া মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহারা এই উপলক্ষে যে বিপুল ধন সংগ্রহ করিয়াছিল, হযরতের জীবন-চরিতে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতির সময় এই ধন তাহারা ব্যয় করিতে থাকে, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রকারের রণসম্ভার সংগ্রহের জন্য।

আলোচ্য আয়াতটি—এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কয়েকটি রুকূর আয়াতগুলি নাজেল হইয়াছিল, কোরেশদিগের এই আক্রমণের প্রস্তুতির সময়, খুব সম্ভব অতি অল্প সময় পূর্বে। আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইতেছে যে, তাহাদের অর্থব্যয় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, অন্যদিক দিয়া কিছু কিছু ক্ষতি সহ্য করা ব্যতীত, মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়া তাহারা মুছলমানদিগের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিতে পারে নাই। ১৩ রুকূতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

৭১। **টীকাঃ দুশ্‌মনদের সম্বন্ধে সতর্কতা**—মোছলেম জাতির ও ইছলাম ধর্মের দুশমন চিরকালই ছিল, এবং চিরকাল থাকিবে। হযরত নূহের সময়, হযরত ইব্‌রাহীমের সময়, হযরত ঈছার সময় এবং অন্যান্য নবী-রাছুলগণের নবুয়তের সময়, এই ঐতিহাসিক ধারার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই সব সময়ে শত্রুপক্ষের কোন্ কোন্ চা'লবাজীর এবং মুছলমানদিগের কি কি ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে, মোছলেম জাতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, রুকূর শেষ আয়াতগুলিতে তাহার সারৎসার আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমরা সে সম্বন্ধে সদা-সচেতন ও সদা-সতর্ক হইয়া চলি, ইহাই আমাদের রাহ্‌মানুর রাহীম আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। আয়াতগুলির বর্ণনা অতি সরল, অতি প্রাঞ্জল এবং সর্বসাধারণের সহজবোধ্য। এই উপদেশের গুরুত্ব আমার কওম উপলব্ধি করুক, আমার বৃদ্ধ বয়সের এই পরিশ্রম সার্থক হউক।

---

১৩ রুকূ

১২১। এবং (হে রাছুল! স্মরণ কর) সেই সময়ের কথা, যখন

١٢ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ

তুমি প্রাতঃকালে নিজ পরিজনের (নিকট) হইতে বাহির হইয়া, যুদ্ধের জন্য মুছলমানদিগকে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অবস্থাপিত করিতেছিলে; আর অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ হইতেছেন সম্যক শ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা- (৭২)

تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ط والله سميع عليم لا

১২২। —যখন তোমাদের মধ্যকার দুইটি দল কাপুরুষের ন্যায় দুর্বলতা প্রকাশের ইচ্ছা করিতেছিল—অথচ তাহাদের উভয় দলের সহায় ছিলেন আল্লাহ্; নিশ্চয় আল্লাহ্র উপর নির্ভর করাই মোমেনদিগের কর্তব্য। (৭৩)

١٢٢ اذ همت طائفتن منكم ان تفشلا لا والله وليهما ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون ٥

১২৩। অবস্থা এই যে, (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদিগকে মদদ করিয়াছিলেন, অথচ (সে সময়) তোমরা ছিলে (সংখ্যায়) অতি নগণ্য, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংযত হইয়া চলিবে, সেমতে তোমরা হইতে পারিবে শোকরগোজার।

١٢٣ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة ج فاتقوا الله لعلكم تشكرون ٥

১২৪। সেই সময়, যখন তুমি মুছলমানদিগকে বলিতেছিলে— তিন হাজার ফেরেশতা নামাইয়া আল্লাহ্ তোমাদিগকে মদদ করিলে,

١٢٤ اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلثة الاف من

الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ؕ

তাহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে না ?

١٢٥ بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

১২৫। হাঁ ; (হে আমার মোমেন বান্দাগণ।) তোমরা যদি ছবর করিয়া থাক ও সংযত হইয়া চল, সে অবস্থায় যদি তাহারা এইরূপ জোরেশোরে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়া দেয়, তাহা হইলে তোমাদের পরওয়ার-দেগার পাঁচ হাজার যুদ্ধের ব্যাজধারী ফেরেশতাদিগের দ্বারা তোমাদের মদদ করিবেন। (৭৪)

١٢٦ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ

১২৬। আর আল্লাহ্ ইহাকে তোমা-দিগের জন্য (প্রকাশ) করিলেন, শুধু তোমাদিগের মনে স্বস্তি সঞ্চারের জন্য কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, মদদ হইতে পারে একমাত্র প্রবল ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে,—(৭৫)

١٢٧ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ○

১২৭। যেমতে তিনি বিধ্বস্ত করিয়া দিবেন একটা অংশকে, অথবা এমনভাবে হতমান করিয়া দিবেন যে, তাহার ফলে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে সর্বনাশগ্রস্ত অবস্থায়।

১২৮। (হে রাছুল!) এ ব্যাপারে কোনও এখতিয়ার তোমার নাই—হয় তো তিনি তাহাদের ক্ষমা করিবেন, হয় ত বা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন—কারণ তাহারা হইতেছে জালেম। (৭৬)

١٢٨ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰلِمُونَ ○

১২৯। এবং অবস্থা এই যে, যাহা কিছু আছমানে আছে, আর যাহা কিছু জমিনে আছে, আল্লাহ্ হইতেছেন সে সমস্তের একমাত্র মালেক; যাহাকে ইচ্ছা আজাব করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দণ্ড দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন মহা ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

١٢٩ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ع ○

তাফ্ছীর

৭২। টীকাঃ ওহোদের অগ্নি-পরীক্ষা—বদর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের পর, বৎসরাধিক কাল ধরিয়া, মক্কার কোরেশ সমাজ নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল, মদীনা আক্রমণের জন্য। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে, কোরেশ নেতা আবু-ছুফিয়ান যে বিরাট বাণিজ্য সম্ভার নিয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে মক্কায় ফিরিয়া আসে, এবং ভাবী যুদ্ধের আয়োজনের জন্য তাহা কোরেশদের মন্ত্রণা-গৃহে তালাবদ্ধভাবে মওজুদ রাখা হয়। ইহা দ্বারা ৫০ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ও এক হাজার উটও তাহাদের তহবিলে জমা হইয়াছিল। কোরেশরা ইহা দ্বারা বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ করিয়া নেয়। হেজাজের ঈহুদীগোত্রগুলির অনেককে তাহারা মদীনা আক্রমণে সম্মত করিতে সমর্থ হয়।

৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহে কোরেশের এই সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী মদীনার শহরতলীতে, ওহোদ পর্বতের প্রান্তরভাগে চড়াও হইয়া আসে।

তাহাদের সঙ্গে ছিল আরবের তিন হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। প্রাথমিক পরামর্শ ও ভোট গ্রহণের পর, হযরত রাছুলে কারীম এক হাজর মুছলমানকে সঙ্গে নিয়া মোকাবেলার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ এবন-উবাই নামক কুখ্যাত মোনাফেক ও তাহার দলের নেতারা, নানা প্রকার কুপরামর্শ দিয়া, তাহার মধ্য হইতে তিন শত লোককে নিয়া মদীনায় ফিরিয়া যায়। ফলে তিন হাজার শত্রু সৈন্যের মোকাবেলায় হযরত মাত্র সাত শত মোজাহেদ সঙ্গে নিয়া কোরেশের মোকাবেলায় নিজেদের শিবির স্থাপন করেন। ইহার পববর্তী ঘটনা সম্বন্ধে রুকূর প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সেনানায়করূপে মোস্তফা: পরদিন ফজরের জামাআতের পর, মোহাম্মদ মোস্তফা ময়দানে উপস্থিত হইলেন। সাত শত মোজাহেদ সেখানে উপস্থিত। দুশ্‌মনের অবস্থান ও ময়দানের অবস্থা অনুসারে হযরত মোজাহেদ-দিগকে বিভিন্ন ঘাঁটিতে স্থাপন করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। মুসলমানদিগের পশ্চাৎদিকের পর্বতশ্রেণীর মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল। হযরত তাহার প্রবেশ পথের মুখে ৫০জন সুনিপুণ তীরন্দাজকে বসাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ তাকিদের সহিত বলিয়া দিলেন—যখনই দেখিবে, শত্রুসৈন্য এই পথ দিয়া ময়দানে প্রবেশ করার চেষ্টা পাইতেছে, তখনই সকলে একত্রে তীর বর্ষাইয়া তাহাদের অগ্রগতি বন্ধ করিয়া দিবে। সাবধান! যুদ্ধের অবস্থা যাহাই হউক, আমার অনুমতি না লইয়া কেহই ঘাঁটি ত্যাগ করিবে না। মোজাহেদদিগের আক্রমণের প্রথম চোটে, কোরেশের তিন হাজার যোদ্ধা ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া তীরন্দাজদিগের অধিকাংশ ঘাঁটি ছাড়িয়া ময়দানে নামিয়া আসিলেন। খালেদ-এবনুল-অলীদ দুইশত নির্বাচিত ঘোড়ছওয়ার সঙ্গে নিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঘাঁটি অরক্ষিত দেখিয়া নিজের ছওয়ারদিগকে নিয়া তিনি অসতর্ক ও বিক্ষিপ্ত মুসলমানদিগকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিলেন। ইহার ফলে মুছলমানদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সকলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন, এবং সকলে বিক্ষিপ্তভাবে পাল্‌টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। মোছলেম কুল জননী বিবি আয়েশা ও অন্যান্য মহিলারা এই সময় অসামান্য সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া, সেই ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রের চারিদিকে ছুটিয়া ছুটিয়া তৃষ্ণার্ত যোদ্ধাদিগকে পানি খাওয়াইতেছিলেন, আহতদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন। এক মোছায়বা

(উম্মে আমারা) ধৈর্যের ও বীরত্বের যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, দুনিয়ার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, স্বয়ং হযরত এই সংঘর্ষে আহত হইলেন। চারটা দাঁত শহীদ হইল, শত্রুর প্রস্তরাঘাতে তাঁহাকে আহত হইতে হইল। কিন্তু শেষে তাঁহারই আহ্বানে আবার মুছলমানরা সংঘবদ্ধ হইল, কোরেশরা আবার পরাজিত হইল। এই হইল ওহোদ যুদ্ধের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রুকূর প্রথম আয়াতে এই ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৭৩। **টীকা: দুইটি দলের ভীরুতা**—বোখারীর বর্ণিত একটি হাদীছ হইতে জানা যাইতেছে যে, বানুহারেছা ও বানুছালমা নামক দুইটি আরব গোত্র সম্বন্ধে এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৭৪। **টীকা: ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য**—১২৩ হইতে ১২৬ আয়াত পর্যন্ত কোরেশদের আক্রমণের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রতি মুছলমান সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে। কোরেশ সমাজ ও তাহাদের মিত্র গোত্রগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে মুছলমানদিগের উপর চড়াও হইয়া আসিয়াছিল তিন বার। ইহার ফলে তিনটি গুরুতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া যায়—প্রথম বদর, দ্বিতীয় ওহোদ এবং তৃতীয় আহজাব। বদর যুদ্ধে মুছলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন, আর আক্রমণকারীরা ছিল এক হাজার। ওহোদ যুদ্ধে মুছলমান ছিল ৭০০ জন, আর কাফের ৩ হাজার। এই সময়, ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকসহ মদীনায় মুসলমান পুরুষের সংখ্যা ছিল অনধিক তিন হাজার।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যে যুদ্ধে শত্রুদের সংখ্যা ছিল যে পরিমাণ, মুছলমানদিগকে সেই পরিমাণ ফেরেশতা দ্বারা মদদ করার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। বদরের যুদ্ধে মুছলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন আর কোরেশদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। এখানে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা মদদ করার সংবাদ দেওয়া হইতেছে। এইরূপে ওহোদ যুদ্ধে কোরেশদিগের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এখানে ওয়াদা দেওয়া হইতেছে তিন হাজার ফেরেশতার। আহজাব বা খন্দক যুদ্ধে দুশ্‌মনের মোট সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ইহুদী গোত্রগুলি ভাবগতিক ভাল করিয়া বুঝিয়া নেওয়ার জন্য দূরে দূরে সরিয়া ছিল। তাহাদিগকে বাদ দিয়া কোরেশদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। ১২৫ আয়াতে এই যুদ্ধে পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা মুছলমানদিগকে মদদ করা হইবে বলিয়া ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী বদর বা ওহোদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

কারণ, ঐ যুদ্ধ দুইটি তো ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে।

১২৫ আয়াতের ক্রিয়াপদগুলির, বিশেষতঃ তাহার (من فورهم هذا) "এইরূপ প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত যদি তোমাদিগকে আক্রমণ করে"—পদাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে ভবিষ্যতের কোনো প্রচণ্ড আক্রমণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। তাহা আহজাব বা খন্দক যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। কোর্‌আনের অন্যান্য বর্ণনায়, বিশেষতঃ সূরা আনফালের ১২ আয়াতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৭৫। **টীকাঃ সুসংবাদ ও সান্ত্বনা**—'ফেরেশতা দ্বারা মদদ দেওয়ার এই যে ওয়াদা, তোমাদের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিজয়ের খোশ-খবর দেওয়া আর তোমাদের অন্তরে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে এসব উপলক্ষ ও উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, মদদ দেওয়ার মূল মালিক তো হইতেছেন আল্লাহ্।'

৭৬। **টীকাঃ হযরতের ব্যাকুলতা**—ওহোদ যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হওয়ার পর হযরত রাছুলে কারীম চেহারার রক্ত মুছিতে ছিলেন আর বলিতেছিলেন :

كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم و هو يدعوهم الى ربهم -

"যে কওম নিজেদের নবীর এই দশা করিতে পারে—তাহারা কিরূপে সফলতা লাভ করিতে পারে।" হযরতের এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর রাবী বলিতেছেন, তখন আল্লাহ এই (১২৮) আয়াত নাজেল করিলেন। এই অংশ রাবীর উক্তি এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। এইরূপে বহু শানে-নজুল যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রচনা করিয়া নেওয়া হইয়াছে, মরহুম শাহ্ অলিউল্লাহ্ ছাহেবও তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। ঠিক এই আয়াত সম্বন্ধে অন্য রাবীরা অন্যান্য প্রকার শানে-নজুল বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছের বর্ণনা হইতে এইটুকু মাত্র জানা যাইতেছে যে, হযরত (=হাজ্‌রাত্) রাছুলে কারীম মর্মাহত হইয়াছিলেন, কোরেশরা হেদায়ত কবুল করিতেছে না, তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া নিজদিগকে আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন করিয়া নিতেছে বলিয়া। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছাহাবী আবদুল্লাহ্ বলিতেছেন :

كانى انظر الى رسول الله صلعم يحكى نبيا من الانبياء ضربه قومه ' و هو يمسح الدم عن وجهه و يقول—رب اغفر لقومى فانهم لا يعلمون -

"আমি যেন এখনো দেখিতেছি, স্বজাতি কর্তৃক প্রহরিত হইয়াছিলেন, হযরত এমন নবীর কথা বলিতেছিলেন। এই সময় হযরত মুখের রক্ত মুছিতে-ছিলেন আর বলিতেছিলেন: হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার কওমকে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা অবুঝ। (মোছলেম—২—১০৮)।

---

১৪ রুকূ

১৩০। হে মোমেনগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে সুদ খাইও না, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিও, যাহাতে তোমরা কৃতার্থ হইতে পারিবে।

۱۳۰ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ج

১৩১। এবং সেই জাহান্নাম হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিও—যাহাকে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে কাফের-দিগের জন্য (৭৭)

۱۳۱ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ج

১৩২। আর তোমরা ফরমাঁবর-দারী করিয়া চলিবে আল্লাহ্‌র ও রাছুলের—সেমতে রহম করা হইবে তোমাদের উপর।

۱۳۲ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ج

১৩৩। আর নিজেদের পরওয়ার-দেগারের মাগ্‌ফেরাত হাছেল করার ও (তাঁহার) জান্নাত্ লাভের জন্য সদা ত্বরিত হইয়া চলিবে—(সেই জান্নাতের পানে) সমগ্র আছমান ও জমিনের অনু-রূপ যাহার প্রসার (এবং) যাহাকে

۱۳۳ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا

প্রস্তুত রাখা হইয়াছে পরহেজগার লোকদিগের জন্য, —(৭৮)

اعدت للمتقين ۙ

১৩৪।—সেইসব পরহেজগার, যাহারা (সৎকাজে) ব্যয় করিয়া থাকে—উভয় সচ্ছলতার ও অভাবের অবস্থায়, এবং যাহারা হইতেছে ক্রোধ সংবরণকারী ও লোকের অপরাধ সম্বন্ধে ক্ষমাশীল; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন (এইসব) সদাশয় ব্যক্তিদিগকে—

١٣٤ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ط والله يحب المحسنين ج

১৩৫। এবং যখন তাহারা কোনও কুকর্ম করিয়া বসে, অথবা নিজে-দের উপর অত্যাচার ঘটাইয়া দেয়, অমনি তাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধ-গুলির ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে—কিন্তু নিজেদের (পাপ-) কাজের উপর হঠ করিয়া জমিয়া থাকে না, আর (ঐ কাজগুলিকে অন্যায় বলিয়া) তাহারা উপ-লব্ধিও করিতে থাকে। (৭৯)

١٣٥ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ص ومن يغفر الذنوب الا الله قف ص ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٥

১৩৬। এই যে লোকগুলি, উহাদের জন্য অবধারিত আছে তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে মার্জনা, আর কানন-কলাপ, যাহার নিম্নদেশ হইতে বহিয়া চলিয়াছে নদনদীমালা, তাহাতে চিরস্থায়ী হইবে তাহারা; দেখ, সাধকদিগের কর্মফল কতই না সুন্দর।

١٣٦ اولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ط

১৩৭। তোমাদের পূর্বেও নানা প্রকার ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা দুনিয়ার দেশে দেশে ভ্রমণ কর এবং ভ্রমণ করিয়া দেখ যে, সত্যকে ঝুটলাইয়া দিয়াছিল যাহারা, কি হইয়াছিল তাহাদের শেষ পরিণতি। (৮০)

١٣٧ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ لا فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ o

১৩৮। ইহা হইতেছে, মানব সাধারণের জন্য স্পষ্ট ঘোষণা এবং পরহেজগার লোকদিগের জন্য পথের দিশারী ও সৎ-উপদেশ।

١٣٨ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ o

১৩৯। আর (হে মোমেনগণ।) তোমরা অবসন্ন হইয়া পড়িও

١٣٩ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا

وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

না, বিষণ্ন হইয়া থাকিও না, তোমরাই প্রবল হইয়া থাকিবে— যদি তোমরা (সত্যকার) মোমেন হইয়া থাক। (৮১)

١٤٠ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ط وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○

১৪০। তোমাদের যদি কোনো আঘাত লাগিয়া থাকে, (মনে রাখিও যে,) ঐ কওমের উপরও আঘাত লাগিয়াছে সমানভাবে; আর (স্মরণ রাখিও যে,) এই দিনগুলিকে আমরা বিভিন্ন মানব সমাজের জন্য অদলবদল করিয়া থাকি; (৮২) যেমতে আল্লাহ্ জাহের করিবেন মোমেনদিগকে, এবং তোমাদের মধ্য হইতে কতিপয় লোককে গ্রহণ করিবেন শহীদরূপে; বস্তুতঃ অবিচারী (জালেম) লোকদিগকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

١٤١ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ○

১৪১। এবং যে-মতে মোমেনদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন এবং কাফেরদিগকে হতাশ করিয়া ফেলিবেন। (৮৩)

١٤٢ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ

১৪২। তোমরা কি ধরিয়া নিয়াছ যে, (শুধু মুছলমান হওয়ার দাবী করিয়াই) তোমরা বেহেশ্‌তে দাখিল হইয়া যাইবে, অথচ তোমা-

দের মধ্যে কে জেহাদ করিল, কে (যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিভীষিকায়) ছবর করিয়া থাকিল, আল্লাহ্ তাহা-দিগকে এ যাবৎ প্রকাশ্যভাবে তাহা জাহের করিয়া দেন নাই।	الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○
১৪৩। অথচ মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তাহার কামনা করিয়া আসিতেছিলে তোমরা ; সেমতে এখন তোমরা তাহা বুঝিয়া দেখিয়াছ, আবার চাক্ষুষ দেখিতেছ। (৮৪)	١٤٣ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ع

তাফ্ছীর

৭৭। **টীকা: ইছলামের সমাজ-সংস্কার নীতি**—ইছলাম ধর্ম তাহার আবির্ভাবের প্রথম দিন হইতেই তৎকালীন সমাজদেহের বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধির সংস্কার আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু সে সংস্কারের পদ্ধতি ছিল অভিনব এবং সেজন্য তাহার ফলও হইয়াছিল অনুপম। মাদক নিবারণ, দাস প্রথার মূলোচ্ছেদ, সুদী কারবারের অবসান, নারী সমাজের উদ্ধার, জাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি সফল ও সম্ভব হইয়াছিল তাহার এই নীতির ফলে।

সুদ ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করাও হইয়াছিল, এই নিয়ম অনুসারে। সে সময় আরব বা ইহুদী মহাজনরা দুস্থ লোকদিগকে টাকা বা খাদ্যশস্য ইত্যাদি কর্জ দিত সুদের হার ও পরিশোধের তারিখ নির্ধারিত করিয়া। ওয়াদা মত সুদ ও আসল পরিশোধ করিতে না পারিলে মহাজন পরিশোধের মিয়াদ বাড়াইয়া দিত এবং তাহার বিনিময়ে আসলের টাকা ডবল করিয়া নিত। এইরূপে একশত টাকা আসল দুইশত টাকায় পরিণত হইয়া যাইত। পরবর্তী ওয়াদা খেলাফ হইলে আসলের এই দুইশত টাকা চারশত টাকায় পরিণত হইয়া যাইত।

ইছলাম সকল প্রকার সুদের লেনদেনকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করিয়া দিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ একদিনে নয়—ক্রমে ক্রমে। একদিকে নানা সৎশিক্ষার দ্বারা মুছল-

মানের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা হইতেছে, দুস্থ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অভাব দূর করার জন্য জাকাত, ওশর ও বায়তুল-মাল তহবিলের প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। এই পর্যায়ের কাজ কতকটা অগ্রসর হওয়ার পর, এই আয়াতে আদেশ দেওয়া হইতেছে পৌন-পৌনিক সুদকে মাত্র রহিত করিয়া। এই আয়াতটি নাজেল হওয়ার কয়েক বৎসর পরে, হযরত রাছুলে কারীমের এন্তেকালের অল্পকাল পূর্বে সূরা বাকারার ৩৮ রুকূর আয়াতগুলির দ্বারা সকল প্রকার সুদের আদান-প্রদানকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, সূরা বাকারার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি এই আয়াতের পরিপূরক, প্রতিবন্ধক নহে।

সেকালে আমাদের দেশের একদল উগ্র ও ব্যগ্র সমাজ সংস্কারক, এই আয়াতকে অবলম্বন করিয়া ফৎওয়া দিতে আরম্ভ করেন যে, দ্বিগুণ চতুর্গুণ হারে সুদ নেওয়া হারাম, কিন্তু সংযত ও সঙ্গত হারে সুদ নেওয়া হারাম হইতে পারে না। এই শ্রেণীর বন্ধুরা প্রথমে সূরা বাকারার আয়াতগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহার পর আলোচ্য আয়াতটিরও সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কোর্‌আনের এই "সুদ হারাম"—আদেশ সম্বন্ধে অন্যদিক দিয়া আরও কতকগুলি সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং তখনকার সাময়িক পত্রিকায় সেই মন্তব্যগুলি বহুলভাবে প্রচারিতও হইয়াছিল। সেই সময় বিভিন্ন প্রবন্ধে এইসব অসঙ্গত সংশয়ের যে উত্তর দিয়াছিলাম, বর্তমানে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। খুব সম্ভব, বর্তমান যুগের মুছলমানদের অনেকেই তাহা পড়িবারও সুযোগ পান নাই। সুদ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলির উল্লেখ থাকারও দরকার আছে বলিয়া মনে করিতেছি। এইজন্য উপরোক্ত আলোচনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রকৃত পক্ষে "দ্বিগুণ চতুর্গুণ" বলিয়া, সুদ না গ্রহণ করার মূল নিষেধটাকে qualify করা বা কোন শর্তে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। বরং সে সময় হেজাজ অঞ্চলে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য সূরা ইছরাইলের একটা আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি। সেকালের আরব সমাজের কেহ কেহ অভাব-অনটন ঘটার আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানদিগকে, বিশেষতঃ কন্যা সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলিত। এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করার জন্য বলা হইয়াছে—

و لا تقتلوا اولاد كم خشية املاق

"তোমরা নিজেদের সন্তানগুলিকে মারিয়া ফেলিও না, অভাব-অনটনের আশঙ্কায়।" উপরোক্ত বন্ধুগণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিলে, এখানে বলা যাইতে

পারিবে যে, অভাব-অনটনের আশঙ্কা যদি না থাকে তাহা হইলে সন্তান হত্যা করা বৈধ বা জায়েজ হইয়া যাইবে?

সুদ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ঃ সুদ রহিত করার এই ব্যবস্থা দিয়া ইছলাম মাজলুম মানবতার যে উপকার করিয়াছে, দুনিয়ার ইতিহাসে তাহারও তুলনা নাই। কিন্তু এখানে উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক ধর্ম ইছলাম, শুধু এই নেতিমূলক আদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই; দুস্থ মানুষের অভাব দূর করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বায়তুল-মাল তহবিল গঠন করার নির্দেশও দিয়াছে। কোর্‌আন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে, জাকাত দেওয়ার আদেশ ও সুদ লওয়ার নিষেধ একই আয়াতে অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ঃ ইহুদী, খ্রীষ্টান ও হিন্দু সমাজে যেসব পুঁথি-পুস্তক ধর্মশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, আমি যতটা জানি, তাহার কোন-টিতে সুদের ব্যবসায়কে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। বরং মহাজনী কারবার চালাইবার জন্য বিত্তশালী লোকদিগকে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

এই দাবীর প্রথম প্রমাণ হিসাবে হিন্দু সমাজের ধর্মশাস্ত্রগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশ্বকোষের লেখক বলিতেছেন—"পুরাণাদীতে কুসীদ ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণে, ১২৫ অধ্যায়ে(?), কুসীদ ব্যবসায়ের বিস্তর প্রশংসা বর্ণিত আছে।....অনাবৃষ্টি, রাজভয় ও মূষিকাদির দ্বারা কৃষ্যাদিকার্যের বিঘ্ন হইতে পারে, কুসীদে এইরূপ কোন বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেশ বিশেষে বাণিজ্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, কিন্তু কুসীদ সর্বদেশেই সমান।" কোষকার এখানে আবার ২১৫ অধ্যায়ের বরাত দিয়াছেন। কিন্তু মূলের সঙ্গে মিলাইয়া মনে হইতেছে, সম্ভবতঃ তাঁহার প্রদত্ত বরাতের এই উভয় সংখ্যাই ভুল। (বিশ্বকোষ, কুসীদ)।

এ দেশের হিন্দু সমাজের প্রধানতম ব্যবহার শাস্ত্র হইতেছে, মনু-সংহিতা। ইহাতে সুদ ব্যবসায়ের জোর সমর্থন করা হইয়াছে। এই সংহিতার অষ্টম অধ্যায়, বিশেষতঃ তাহার ১৫১ হইতে ১৫৭ শ্লোক পর্যন্ত "উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের" মধ্যে আদান-প্রদানের যেসব ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, তাহার নিষ্ঠুরতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে! নমুনা হিসাবে তাহার ১৫১ শ্লোকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ভগবান মনু" বলিতেছেন:

কুসীদ বৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রমতি পঞ্চতাম ।।

"যদি মাসে মাসে ধনের সুদ না লয়, তবে মূলে ও সুদে দ্বিগুণ হইয়া উঠিলে,

দ্বিগুণই পাইবে—ইহার অধিক পাইবে না ; মাসে মাসে গ্রহণ করিলে দ্বিগুণের অধিক লইতে পারে। ধান, ক্ষেত্রফল এবং উর্ণাদি (মেষাদি) পশুর লোম ও বলদাদি, পাঁচগুণ লইতে পারে, অধিক লইতে পারে না।" কোর্আন সর্বপ্রথমে এই "দ্বিগুণ চতুর্গুণ" বর্ধিত হারের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতেছে।

বাইবেল ও সুদ ব্যবসা ঃ সুদ সম্বন্ধে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দুইটি নির্দেশ দেখা যাইতেছে। সদাপ্রভু বলিতেছেন ঃ

(১) "তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দেও, তাহার কাছে সুদ গ্রাহিতার ন্যায় হইও না ; তোমরা তাহার উপরে সুদ চাপাইবে না।" (যাত্রা পুস্তক, ২২—২৫, ২৬)।

(২) "তুমি সুদের জন্য, রৌপ্যের সুদ, খাদ্য সামগ্রীর সুদ, কোন দ্রব্যের সুদ পাইবার জন্য, আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না। কিন্তু তুমি সুদের জন্য বিদেশীকে ঋণ দিবে, তবে তোমার যে ভ্রাতা, সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহাকে তুমি কর্জ দিবে বিনা সুদে ;" (২য় বিবরণ, ২৩—১৯, ২০)।

এই নির্দেশ দুইটিতে সুদ গ্রহণের নিষেধ আছে—কেবল ইহুদী দেশের, অর্থাৎ ইহুদী জাতির নিকট হইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল জাতির নিকট হইতে অবাধে সুদ গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করা হইতেছে।

ফলতঃ ইসলামের পূর্বে, অন্য কোন ধর্মশাস্ত্রে সুদ নিবারণের কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নাই, বরং অবাধে সুদের ব্যবসা চালাইয়া যাওয়ার অনুমতিই দেওয়া হইয়াছে,—সাইলকী নিষ্ঠুরতার সমর্থনই করা হইয়াছে।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হইতেছে—"এবং সেই জাহান্নাম হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে, যাহাকে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে কাফেরদিগের জন্য।" অর্থাৎ, সুদ খাওয়া পরিত্যাগ না করিলে, কাফেরদিগের সমান পর্যায়ের আজাব তোমাদের উপর বর্তিয়া যাইবে। ইহার ফলিতার্থ কি দাঁড়াইতেছে, পাঠকগণ নিজেরাই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

৭৮। **টীকা ঃ আল্লাহ্‌র ও রাছুলের ফরমাঁবরদারী**—নীতিভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হইয়া মানুষ অধঃপতনের কোন্ স্তরে নামিয়া যাইতে পারে, আহ্‌লে-কেতাবদিগের নজীর দিয়া পূর্বের আয়াতগুলিতে তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা করা হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে এড়াইয়া চলার জন্য মানুষের দরকার হয় একজন পথপ্রদর্শকের, এমন একজন অভিজ্ঞ অগ্রপথিকের, যিনি অগ্রে অগ্রে চলিয়া, সহজ সরল ও নিরাপদ পথ ধরিয়া চলিয়া যাইবেন

মান্জিলের দিকে। পথের সন্ধান আল্লাহ্ বলিয়া দিয়াছেন এবং বান্দাদিগের জন্য তাহার অগ্রপথিক বানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বপ্রধান অগ্রপথিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন যিনি —সেই মোহাম্মদ মোস্তফাকে। তাই আয়াতে আল্লাহ্র ও তাঁহার রাছুলের ফরমাঁবরদারী বা হুকুম মানিয়া চলার জন্য মোছলেম বান্দাদিগকে আদেশ করা হইতেছে।

৭৯। **টীকাঃ পরহেজগারের লক্ষণ**—পরহেজগার বান্দাহ্র তিনটা লক্ষণ ১৩৪ ও ১৩৫ আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে—

(১) তাহারা সৎকাজে ব্যয় করিয়া থাকে সুখে-দুঃখে, সকল অবস্থায়। আল্লাহ্র হুজুরে এই দানের মূল্য নির্ধারিত হয় মনের আগ্রহের হিসাবে, ধনের পরিমাণ হিসাবে নহে। কাঙ্গাল যে একটা তামার পয়সা দেয়, তাহা হয় তো অনেক সময় ধনীর একটা স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অনেক মূল্যে গৃহীত হয়। তবুও তাহার দেওয়া চাই এবং তাহার নিকট হইতে নেওয়া চাই। কোটিপতি ধনকুবের হইতে কপর্দকহীন কাঙ্গাল পর্যন্ত, সকলে যেন সমানভাবে অনুভব করিতে পারে যে, তাহারা সকলে সমবেতভাবে ও সমান মর্যাদায়, উম্মতে মোহাম্মদীর বিশ্বজনীন ভ্রাতৃসমাজের একজন সদস্য।

(২) মানুষ সাধারণতঃ প্রবৃত্তির কুহকে ও পরিবেশের কুফলে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এক এক সময় এমন অন্যায় করিয়া বসে, যাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয় স্বয়ং তাহাকেই। আল্লাহ্র অনুগত বান্দাহ্ ও নাফরমান বান্দাহ্র মধ্যে তারতম্যের পরিচয় পাওয়া যায় এইখানে। পরহেজগার বান্দাহ্ নিজের অন্যায় বুঝিতে পারে, তাহার সুপ্ত বিবেক জাগ্রত হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিতে থাকে। তখন সে পরওয়ারদেগারের দরগাহে উপস্থিত হয়! তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকেঃ ক্ষমা কর, দয়ার সাগর প্রভু হে ক্ষমা কর, তোমার গাফুরুর রাহীম নামের দোহাই দিয়া বলিতেছি—ক্ষমা কর, রক্ষা কর আমাকে। তুমি ছাড়া আর কেহই নাই, আমায় ক্ষমা কর!

(৩) ক্রোধ সংবরণকারী যাহারা ও অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ যাহারা —তাহারা মোত্তাকী বা পরহেজগার বান্দাদের অন্তর্গত। হযরত বলিয়াছেনঃ

ليس الشديد بالصرع ' انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب - متفق عليه -

"কুস্তী লড়িয়া মানুষকে মাটির উপর আছাড় মারিতে পারে যে, বলবান সে নহে, বরং প্রকৃত বলবান হইতেছে সেই ব্যক্তি, প্রচণ্ড ক্রোধের সময় নিজের মনকে বশে রাখিতে পারে যে ব্যক্তি।"—বোখারী, মোছলেম।

অন্য হাদীছে এরশাদ হইতেছে—হযরত মূছা আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রভু! তোমার বান্দাদের মধ্যে তোমার নিকট সবচাইতে বেশী পিয়ারা হয় কোন্ ব্যক্তি? আল্লাহ্ বলিলেন, من اذا قدر غفر, (দণ্ড দেওয়ার) শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করিতে সক্ষম হয় যে ব্যক্তি।—বায়হাকী, মেশকাত। প্রবৃত্তি মানুষের অধীন থাকিবে, মানুষ প্রবৃত্তির অধীন হইয়া যাইবে না, ইহাই হইতেছে সারকথা।

৮০। টীকাঃ ইতিহাসের শিক্ষা—সত্যকে ঝুটলাইয়া দেওয়ার অর্থ—সত্যকে মিথ্যারূপে এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে, সঙ্গতকে অসঙ্গতরূপে, কর্তব্যকে অকর্তব্যরূপে গ্রহণ করা। এই কর্তব্য ও অকর্তব্যের কতকগুলি ঘটনার কথা ইতিপূর্বে, ১৩ রুকূর আয়াতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। বদর যুদ্ধে তোমরা আশাতীতভাবে জয়লাভ করিয়াছিলে কি গুণে, আর ওহোদ যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়ী হওয়ার পরও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গেলে কোন্ কারণে, প্রথমে তাহা ভাবিয়া দেখ। তাহার পর দুনিয়ার জাতিগুলির উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, এই উভয় অবস্থা হইতেছে, আল্লাহ্‌র একটা শাশ্বত, সর্বব্যাপী ও অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। সেই নিয়মটার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেছে—কর্মফল।

৮১। টীকাঃ আল্লাহ্‌র ঘোষণা—উপরে কর্মফলের তথ্যটা বুঝাইয়া দেওয়ার পর, তাহারই তাকীদ হিসাবে, সকল জাতির সকল মানুষের জন্য এই ঘোষণা প্রচার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, নিজেদের আমল অনুসারে সকলকে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং সকলেই পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে। আল্লাহ্‌র এই "সৎ উপদেশ" অনুসারে কর্মে তৎপর হইয়া চলিবে যাহারা, তাহারাই প্রবল হইয়া থাকিবে।

৮২। টীকাঃ ওহোদ যুদ্ধের ফলাফল—হযরতের স্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করার ফলে, মুছলমানরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরেশরা যে মুছলমানদের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। আমরা দেখিতেছি, "মোজাহেদদের পুনরাক্রমণের পর কোরেশরা ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।" চলিয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ পলাইয়া গিয়াছিল। দিনের বেলা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত মুছলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। সেকালে রাত্রে যুদ্ধ স্থগিত থাকাই ছিল সাধারণ নিয়ম। আহত গাজীদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইল। নিহত শহীদগণের কাফন-দাফনের কাজ সমাপ্ত করা

হইল, ইহাতে যথেষ্ট সময় লাগার কথা। এই সময় সংবাদ পাওয়া যায় যে, কোরেশরা পলায়নের গ্লানি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাল সকালে আবার মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিতেছে। ইহার অল্পক্ষণ পরে, ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে বেলালের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল জেহাদের গুরুগম্ভীর আহ্বান—মোছলেম বীরবৃন্দ, প্রস্তুত হও, এখনই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইল যে, কাল যাঁহারা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, আজ কেবল তাঁহারাই যাত্রা করিবেন। বানি খোজাআ গোত্রের সমাজপতি মাছআব, মদীনার সংবাদ জানিতে আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া যাওয়ার সময় আবু-ছুফিয়ানের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। তিনি নিরপেক্ষ গোত্রের লোক বলিয়া আবু-ছুফিয়ান তাঁহার কাছে মদীনার খবর জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়া দিলেন—মোহাম্মদ তোমাদিগকে আক্রমণের জন্য যাত্রা করিতেছেন। শীঘ্রই মুছলমানরা আসিয়া পড়িতেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আবু-ছুফিয়ান নিজের দলবল নিয়া মক্কার পথে পলাইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ওহোদ যুদ্ধে মুছলমান পক্ষ আদৌ পরাজিত হয় নাই। ওহোদ যুদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, কোরেশদের তুলনায় তাহাদের ক্ষতি অধিক হইয়াছিল, তাহা কোনো মতেই স্বীকার করা যায় না। আমাদের ঐতিহাসিকরা নিজ মুখে স্বীকার করিতেছেন যে, এক আমীর হামজার আক্রমণে ৩০ জন কোরেশ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, প্রাণপণে যুদ্ধ করার পর মুছলমান পক্ষের ৭০ জন গাজী শাহাদাত লাভ করেন। অথচ তাঁহারাই আবার ঘোষণা করিতেছেন যে, কোরেশ পক্ষে নিহত হইয়াছিল মাত্র ২৩ জন।

এই শ্রেণীর অসাবধান ইতিহাস লেখকের বর্ণনা, কোর্‌আনের তাফ্‌ছীরেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বিস্তারিতভাবে বিষয়টির আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

৮৩। **টীকা: সমান আঘাত**—মুছলমানদিগকে বলা হইতেছে—তোমাদের অবসন্ন হইয়া পড়ার কোনও কারণ নাই। তোমরা যে আঘাত পাইয়াছ, তাহার অনুরূপ আঘাত তোমাদের শত্রুপক্ষও তো পাইয়াছে। পাইয়াছে, অর্থাৎ এই ওহোদ যুদ্ধে পাইয়াছে। অসতর্ক ঐতিহাসিকদিগের ভুল বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রাখার জন্য, "পাইয়াছিল" বলিয়া ইহার অনুবাদ করা অন্যায় হইবে। কারণ, প্রথমতঃ বদর যুদ্ধে কোরেশদের ক্ষতি হইয়াছিল মুছলমানদিগের দুইগুণ। (এমরান, ১৬৫)। বিশেষতঃ এখানে مس মাজীর উপর قد দাখেল হইয়াছে, সুতরাং উহার অর্থ হইবে মাজী কারীব হিসাবে।

বদরের পর ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং নিকটবর্তী ওহোদকে ছাড়িয়া দূরবর্তী বদর যুদ্ধের আয়াতটিকে সংশ্লিষ্ট করা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না। অসতর্ক ঐতিহাসিকরা বলিয়াছেন, ওহোদ যুদ্ধে মুছলমানরা ভীষণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। এই ভ্রান্ত বিবরণের সহিত কোর্‌আনের আয়াতকে সমঞ্জস করিতে যাওয়ার কোনো সঙ্গতি নাই, কোনো দরকারও নাই।

৮৪। **টীকা ঃ আঘাতের শিক্ষা**—ওহোদ যুদ্ধে মুছলমান পক্ষ যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহার ফল হইতেছে প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ মোছ্‌লেম নামে পরিচিত মদীনার অধিবাসীদিগের মধ্যে কে সত্যকার মোমেন আর কে সত্যকার মোনাফেক, তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রতিপন্ন হইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ ৭০ জন শহীদকে আল্লাহ্ এই দিন "গ্রহণ" করিয়াছেন—কবুল করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগের, বীরত্বের ও ঈমানের আদর্শ চিরদিনই মোছ্‌লেম জাতিকে জীবনের প্রেরণা যোগাইতে থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে এই শহীদদল নিজেদের ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে কোরবান করিয়া সমগ্র জাতিকে শাশ্বত জীবনের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন।

৮৫। **টীকা ঃ জেহাদ অপরিহার্য**—সূরা বাকারার ২১৪ আয়াতে ইহার অনুরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সূরার ১৬৭ টীকা দেখুন।

"তোমরা ইতিপূর্বে মৃত্যু কামনা করিয়াছিলে" পদে, ওহোদ যুদ্ধের পূর্ব-বর্তী একটি গুরুতর ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী জুমআর দিন হযরতের আহ্বানে মদীনায় এক পরামর্শসভার অধিবেশন হয়। তখনকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রবীণ ছাহাবীদিগের অনেকেই নগর প্রাচী-রের বাহিরে গিয়া মোকাবেলা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। হযরতও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু অন্য একদল—বিশেষতঃ যুবক সমাজ—এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—বাহিরে গিয়া আক্রমণ না করিলে, কোরেশের স্পর্ধা বাড়িয়া যাইবে, আরব-গোত্রগুলি আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া মনে করিবে। বীর কেশরী আমীর হামজা আবেগপূর্ণ ভাষায় এই মতের সমর্থন করিলেন। স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র রাহে মরণ বরণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ধর্ম ও জাতির দুশ্‌মনদিগের মোকাবেলায় নতি স্বীকার করিতে পারিব না—ইহাই ছিল এ-পক্ষের প্রধান বক্তব্য। ফলতঃ ভোটের আধিক্যে এই পক্ষেরই জয় হয় এবং সেমতে ছাহাবীদিগকে সঙ্গে লইয়া হযরত যথাসময় ময়দানে উপস্থিত হইলেন। আয়াতে এই সত্যটা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

১৫ রুকূ

১৪৪। মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাছুল মাত্র, তাঁহার পূর্বে আরও বহু রাছুল গুজরিয়া গিয়াছেন; এ অবস্থায় যদি তিনি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তাহা হইলে তোমরা কি পায়ের গোঁড়ালির উপর ভর দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু (জানিয়া রাখিও,) যদি কেহ এইরূপে ঘুরিয়া দাঁড়ায়, সে আল্লাহ্‌র বিন্দু-মাত্র ক্ষতিও করিতে পারিবে না; পক্ষান্তরে শোকরগোজার বান্দা-দিগকে আল্লাহ্ সত্বরই (তাহা-দের) কর্মফল প্রদান করিবেন। (৮৬)

١٤٤ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ٥

১৪৫। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষে মরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে—মৃত্যুর সময় অব-ধারিত হইয়া আছে; বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার সুফল লাভ করিতে চায়; তাহার কিছু তাহাকে দিয়া দিব, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের সুফল পাইতে চায়, (আমলের বদলা)

١٤٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ

نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ٥

তাহাকেও কিছুটা প্রদান করিব ; কিন্তু শোকরগোজার বান্দাদিগের আমলের বদলা আমরা সত্বরই প্রদান করিব। (৮৭)

١٤٦ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ لا مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ٥

১৪৬। আর (তোমাদের পূর্বে) কত নবীর সঙ্গী হইয়া কত বিপুল সংখ্যক আল্লাহ্‌ওয়ালা বান্দারা যুদ্ধ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র রাহে (জেহাদ করিতে) যে সব বিপদ-আপদ তাহাদের উপর বর্তিয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে তাহারা অবসন্ন হয় নাই, দুর্বলতা প্রদর্শন করে নাই, এবং নতি স্বীকার ও হীনতা প্রকাশও করে নাই; বস্তুতঃ (এই শ্রেণীর) ধৈর্যশীল লোকদিগকে আল্লাহ্ পছন্দ করিয়া থাকেন।

١٤٧ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ٥

১৪৭। আর তাহারা বলার মধ্যে বলিত : হে আমাদের প্রভু! হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! মাফ করিয়া দিও আমাদের অপরাধ-গুলিকে, সীমা লঙঘনের কাজ-গুলিকে, মজবুত করিয়া রাখিও আমাদের কদমগুলিকে এবং কাফের কওমগুলির বিরুদ্ধে আমা-দিগকে মদদ করিও ! (৮৮)

১৪৮। ফলতঃ আল্লাহ্ তাহাদিগকে দান করিলেন দুনিয়ার কর্মফল এবং আখেরাতের মহান পুরস্কার; বস্তুতঃ আল্লাহ্ পছন্দ করেন (এই শ্রেণীর) সদাশয় বান্দাদিগকে। (৮৯)

১৪৮। فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ع

তাফ্ছীর

৮৬। **টীকা ঃ নবীর মৃত্যুতে ধর্ম মরে না**—যে ঘটনা প্রসঙ্গে এই আয়াতটি নাজেল হইয়াছিল, তাহা হইতেছে আমাদের ভীষণতর সঙ্কট মুহূর্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে তীর, বর্শা ও প্রস্তরের আঘাতে হযরত যখন গুরুতরভাবে আহত, প্রত্যেক মোছলেম নরনারী যখন প্রাণপণে স্ব-স্ব কর্তব্য পালনে ব্যতিব্যস্ত, সেই চরম মুহূর্তে, ঘোষণা করা হইল—ان محمدا قد قتل "মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন"! এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে মুছলমানদের অনেকে বজ্রাহতের মত সংবিৎহারা হইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে আয়াতে বলা হইতেছে—মোহাম্মদ রাছুল হইলেও মানুষ। তাঁহার পূর্বে নবী-রাছুল আসিয়াছেন, নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্র পয়গাম যথাযথভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং হায়াত ফুরাইলে মরিয়া গিয়াছেন। তাহার পর মুছলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—মোহাম্মদ যদি এইভাবে মরিয়া যান, অথবা অন্যান্য নবিগণের ন্যায় তাঁহাকেও যদি ইছলামের শত্রু-দুশ্মনদের হাতে নিহত হইতে হয়, তাহা হইলে নবী মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া তোমরা কি আল্লাহ্র দীনকে ছাড়িয়া বসিবে? এরূপ করা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উম্মতের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। যদি কেহ এরূপ করে, তবে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি হইবে না—সর্বনাশ হইয়া যাইবে তাহার নিজের।

এই আয়াতের একটা মো'জেজা নিম্নে "মোস্তফা চরিত" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

হযরতের পরলোক গমনে ভক্তগণ যে অসাধারণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। মদীনার নরনারিগণ

করুণকণ্ঠে নানাপ্রকার শোকগাথা আবৃত্তি করিয়া হযরতের অনন্ত ও অনুপম গুণ-গরিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহামতি আবু-বকর সেদিন যে অসাধারণ ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হইতে পারে না। তিনি বিবি আয়েশার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন—ওমর উলঙ্গ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান, বহু লোকজন তাঁহার চারিদিকে সমবেত। এই অবস্থায় ওমর বলিতেছেন: "হযরত মরেন নাই। যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, আমি তাহার মুণ্ড উড়াইয়া দিব।" আবু-বকর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ধীরভাবে সেই জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন—এবং হাম্‌দ নাআতের পর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات - و من كان منكم يعبد الله فان الله حى لا يموت - قال الله: وما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل، افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ؟ و من ينقلب على عقبيه، فلن يضر الله شيئا - و سيجزى الله الشاكرين -

অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মোহাম্মদের পূজা করিত—সে জ্ঞাত হউক যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছেন। আর তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পূজা করিত, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ জীবিত —তিনি মরেন না। আল্লাহ্ বলিতেছেন: 'মোহাম্মদ একজন প্রেরিত বই আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্বেও বহু রাছুল গুজরিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তাহা হইলে কি তোমরা (আল্লাহ্‌র পথ হইতে) ফিরিয়া দাঁড়াইবে? হাঁ, যাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইবে, তাহারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না;—এবং শীঘ্র আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিবেন।' আল্লাহ্ তাঁহার কেতাবে হযরতকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, হে মোহাম্মদ! তোমাকে ও তাহাদিগকে অর্থাৎ সকলকেই মরিতে হইবে।

ছাহাবাগণ বলিতেছেন—আবু-বকরের মুখে কোর্‌আনের এই বাণীগুলি শ্রবণ করিয়া সকলের চৈতন্য হইল। ওমরের বাহু শিথিল হইয়া আসিল, তাঁহার হাতের তরবারি মাটিতে পড়িয়া গেল। আমাদিগের তখন বোধ হইতেছিল, যেন এই আয়াতগুলি আজ নূতন শুনিতেছি। স্বয়ং ওমর ফারূক বলিতেছেন: আবু-বকরের মুখে আল্লাহ্‌র এই স্পষ্ট আয়াতগুলি শ্রবণ করিয়া

আমার সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিল, আমার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। *

মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাছুল—এ-কথার অর্থ এই যে, মোহাম্মদকে আল্লাহ্ দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার পয়গাম নিয়া, তাঁহার কালাম নিয়া তাঁহার প্রবর্তিত একটা জীবন পদ্ধতি বা শরিয়ত নিয়া। তিনি সেই কালাম ও সেই শরিয়তকে নিজের কথা, কাজ ও আদর্শের দ্বারা বিশ্বমানবকে জানাইয়া, বুঝাইয়া ও হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কাজ শেষ হইলে আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজের কাছে তুলিয়া লইবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গাম, তাঁহার কালাম ও তাঁহারই আদেশ-উপদেশে প্রতিষ্ঠিত মোস্তফার আজীবন সাধনা ও সংগ্রামের আদর্শ দুনিয়ায় চিরজীবন্ত ও চিরচলন্ত হইয়া থাকিবে। মোছলেম উম্মত তাহার জীবনসাধনার সকল দিকে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, তাহারই অনুসরণ করিয়া।

এই আয়াত সম্বন্ধে আলোচনা করার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আয়াতে বলা হইতেছে যে, মোহাম্মদের পূর্ববর্তী নবীরা সকলে গত হইয়া, অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছেন—হয় স্বাভাবিকভাবে, না হয় অন্য কর্তৃক নিহত হইয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের গত হওয়ার মাত্র এই দুইটি পদ্ধতি আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের তিরোধানের অন্য কোন পদ্ধতি নাই। কোর্‌আনের নির্দেশ অনুসারে হযরত ঈছাও একজন রাছুল ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবন অবসানও এই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। তাঁহার মৃত্যুর জন্য অন্য কোনো সৃষ্টি ছাড়া বিশেষ নিয়ম নির্ধারিত হইয়া থাকিলে এখানে সেই বর্জিত বিধির উল্লেখ নিশ্চয়ই করা হইত। পরবর্তী (১৪৫) আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, মওতের একটা সময় নির্ধারিত আছে। দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের আবহমান কালের অভিজ্ঞতার ফলে, মানুষের বয়স সম্বন্ধে একটা সর্বোচ্চ পরিমাণও মোটামুটিভাবে অবধারিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হযরত ঈছার বয়স বর্তমানে দুই হাজার বৎসরও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। خلوا من قبله الرسل পদে الرسل। বলিতে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাছুলগণকে বুঝাইতেছে, তাফ্‌ছীরকার-গণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (দেখুন কাবীর, এবন-জরীর, গারায়েবুল কোর্‌আন, রূহুল-মাআনী প্রভৃতি)। মরহুম মুফতী আবদুহ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

* বোখারী প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থ ও তাবরী প্রভৃতি।

قد خلت و مضت الرسل من قبله فماتوا - و قد قتل بعض النبين
كزكريا و يحيى - فلم يكن لاحدهم الخلد ' و هو لابد ان تحكم
عليه سنة الله بالموت......افائن مات كما مات موسى و عيسى او قتل
كما قتل زكريا ويحيى......الخ - تفسير - ج ٣ ' ص ١٠٣١ -

মর্মানুবাদ : "হযরতের পূর্বে রাছুলগণ গত হইয়াছেন, মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই অমর হইয়া ছিলেন না। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্‌র প্রবর্তিত নিয়ম। সুতরাং মোহাম্মদও যদি মরিয়া যান, যেমন মূছা ও ঈছা মরিয়া গিয়াছেন, অথবা তিনি যদি নিহত হন—যেমন জাকারিয়া ও ইয়াহিয়াহ্ নিহত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তোমরা কি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে?"

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "হযরত ঈছা মারিয়া গিয়াছেন"—এ-কথা প্রমাণিত হইলে কাদিয়ানী মতবাদও সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হইয়া যায় না। কারণ, আল্লাহ্‌র এই চিরাচরিত ছুন্নত বা নিয়মের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কুত্রাপি এরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে, কোনো নবী বা রাছুল মরিয়া যাওয়ার পর কোনরূপে আবার দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা একটা নূতন সংস্করণের অবতারবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৮৭। **টীকা : দুনিয়া বা আখেরাতের কামনা**—আয়াতের শেষ অংশে বলা হইতেছে যে, কেহ যদি কেবল দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থী হয়, তাহার কিছুটা সে ভোগ করিতে পারিবে, ইত্যাদি। ইহার তাফ্‌ছীর সম্বন্ধে ৪৮ আয়াত ও তাহার টীকা দেখুন।

৮৮। **টীকা : জেহাদের স্বরূপ**—উপরের আয়াত দুইটি হইতে প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, হযরতের পূর্বেও বহু নবী নিজেদের তাবেদার আল্লাহ্‌ওয়ালা মুছলমানদিগকে সঙ্গে নিয়া জেহাদ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তখনকার মুছল-মানদিগের ঈমান ও আকীদার বিষয়ও মোছলেম উম্মতকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। আল্লাহ্‌র রাহে অনুষ্ঠিত হয় যে সব সাধনা ও সংগ্রাম, তাহাতে অনেক সময় সাধককে নানা প্রকার বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হয়। পূর্ববর্তী উম্মতগুলিকেও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তাহারা বিচলিত হয় নাই, শত্রুর প্রচণ্ড প্রতাপের সম্মুখেও কখনও নতি-স্বীকার করে নাই!

অন্যদিকে, ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের হীন চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও যে তাহাদের অন্তরে স্থানলাভ করিতে পারে নাই, ১৪৭ আয়াতে বর্ণিত মোমেন মোজাহেদদিগের মোনাজাত হইতেও তাহা জানা যাইতেছে। জেহাদ করিতেছে বলিয়া তাহার মনে বিন্দুমাত্র অহমিকা প্রবেশ করিতে পারে নাই। বরং তাহাদের নজর পড়িয়াছিল কেবল নিজেদের দোষ-দুর্বলতার উপর। সে জন্য তাহাদের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতেছে ত্রুটি স্বীকার, ক্ষমা প্রার্থনা ও জেহাদের অধিকতর সুযোগলাভের আকুল মোনাজাত। তাহারা শুধু চাহিয়াছিল জাতির মঙ্গল, মুছলমানের অর্থাৎ ইছলামের বিজয়।

৮৯। টীকা: মোমেন বান্দাহ্‌র পুণ্য ফল—১৪৫ আয়াতে বলা হইয়াছে—কেবল দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা করিবে যাহারা, তাহারা তাহার কিছু অংশ ভোগ করিতে পারিবে। ইহার অর্থ এই যে, দুনিয়ার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইলেই যে, মানুষের কামনা অনুসারে সমস্তটাই তাহার প্রাপ্য হইয়া যায়, তাহাও ঠিক কথা নহে। ইহা ব্যতীত আখেরাতের সুমহান পুণ্যফলের কিছুই তাহার প্রাপ্য হইবে না (শূরা ২০ আয়াত)।

---

১৬ রুকু

১৪৯। হে মোমেনগণ! তোমরা যদি বশীভূত হইয়া চল কাফের-দিগের, তবে তাহারা তোমা-দিগকে বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিবে, ফলে তোমরা হইয়া যাইবে সর্বনাশগ্রস্ত।

١٤٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

১৫০। বরং আল্লাহ্-ই হইতেছেন তোমাদের একমাত্র অলি-অভি-ভাবক, এবং তিনিই হইতেছেন সর্বোত্তম মদদগার। (৯০)

١٥٠ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

১৫১। আল্লাহ্‌র সহিত অন্যকে শরীক ঠাওরানোর ফলে—যাহার অনুকূলে কোনও যুক্তি-প্রমাণই আল্লাহ্ নাজেল করেন নাই—তাহাদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করিয়া দিব, আর তাহাদের শেষ আশ্রয় হইতেছে জাহান্নাম, বস্তুতঃ অতি নিকৃষ্ট হইতেছে জালেমদিগের (এই) আশ্রমটি। (৯১)

১৫১ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ج وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ط وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ٥

১৫২। আর দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র যে ওয়াদা ছিল, আল্লাহ্ তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিতেছিলেন, যখন তোমরা কতল করিতেছিলে তাহাদিগকে—যাবৎ না তোমরা হীনতা প্রকাশ করিলে আর যুদ্ধের ব্যাপারে মতভেদ ঘটাইলে এবং নিজেদের অভিপ্রেত বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিয়াও (রাছুলের) নির্দেশ অমান্য করিয়া দিলে ; (৯২) তোমাদের একদল হইয়া পড়িল দুনিয়ার তলবগার, আর তোমাদের অন্যদল চাহিতেছিল আখেরাতের কল্যাণ,—সে অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে তোমাদের (মোকাবেলা) হইতে সরাইয়া দিলেন—তোমাদিগকে আজমায়েশ করার উদ্দেশ্যে, এবং (তাহার

১৫২ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ج حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ط مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج

পর) তোমাদের দোষ-দুর্বলতা-গুলি মা'ফ করিয়া দিলেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন মোমেনদিগের প্রতি রহমত-পরায়ণ।

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللَّهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

১৫৩। (স্মরণ কর), যখন তোমরা (আত্মরক্ষার জন্য উপত্যকার) উপর দিকে চড়িতেছিলে (এমন বিহ্বলভাবে যে,) কাহারো দিকে ফিরিয়া দেখার সামর্থ্যও তোমাদের ছিল না, অথচ আল্লাহ্র রাছুল তোমাদিগকে ডাকিতেছিলেন তোমাদের পশ্চাৎ-ভাগে অবস্থিত যোদ্ধা দলের মধ্য হইতে—ইহার ফলে আল্লাহ্ তোমাদের উপর বর্তাইয়া দিলেন বিপদের উপর বিপদ—যেন (এই উপদেশের ফলে) যে সুযোগ তোমরা হারাইয়াছিলে আর যেসব আপদে তোমরা বিপন্ন হইয়াছিলে, সে জন্য দুঃখিত হইয়া না থাক ; বস্তুতঃ তোমাদের সমস্ত আমল সম্বন্ধে আল্লাহ্ হইতেছেন সম্যক খবরদার। (৯৩)

١٥٣ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥

১৫৪। তখন, দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার পর, আল্লাহ্ তোমাদের উপর নামাইয়া দিলেন শান্তি-প্রদ তন্দ্রা, যাহা আচ্ছন্ন করিয়া নিল তোমাদের এক দলকে, আর অন্যদলটা আত্মচিন্তাতেই বিব্রত হইয়া রহিল—আল্লাহ্

١٥٤ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ لا وَطَآئِفَةٌ

সম্বন্ধে তাহারা পোষণ করিতে-ছিল অজ্ঞতামূলক ধারণা—(৯৪) তখন তাহারা বলিতেছিল, এ ব্যাপারে আমাদেরও কি কিছু এখতিয়ার আছে? তুমি বল: সমস্ত এখতিয়ারের মালেক তো আল্লাহ্; নিজের মনের কথা তাহারা গোপন করে—তোমার কাছে প্রকাশ করে না; তাহারা (অন্যত্র) বলিয়া থাকে: আমাদের যদি এই ব্যাপারে কিছু এখতিয়ার থাকিত, তাহা হইলে আমা-দিগকে এখানে (আসিয়া) নিহত হইতে হইত না; বলিয়া দাও: তোমরা সকলে যদি নিজ নিজ গৃহে থাকিয়া যাইতে, তাহা হইলেও নিহত হওয়া যাহাদের জন্য অবধারিত ছিল, নিজের বধ্যভূমির দিকে তাহারা বাহির হইয়া আসিত, (৯৫) আরও (কথা) এই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের মনের ভাব-

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ
بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُولُونَ
هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ
شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ
كُلَّهُ لِلّٰهِ ط يُخْفُونَ فِي
أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُونَ
لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا
هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ
مَضَاجِعِهِمْ ج وَلِيَبْتَلِيَ

اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ٥

গুলিকে (সাধারণ সমক্ষে) প্রকাশ করিয়া দেওয়ার এবং তোমাদের অন্তরের অভিসন্ধিগুলি যাচাই-বাছাই করিয়া দেখান; নিশ্চয় আল্লাহ্ সকলের অন্তরের সব বিষয় সম্যকরূপে অবগত আছেন।

১৫ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ
يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ لا
اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ج وَلَقَدْ
عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ع

১৫৫। নিশ্চয় দুই (যোদ্ধার্থী) জামাআত (ওহোদের ময়দানে) সমবেত হইয়াছিল যেদিন, সে-দিন তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল যাহারা, শয়তান তাহাদিগকে পদস্খলিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের কোনো কোনো কাজের সূত্র ধরিয়া, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিশ্চয় মাফ করিয়া দিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

তাফ্ছীর

৯০। **টীকা: মোমেন ও কাফের** —মোমেন মানে যে বিশ্বাস করে, সত্য বলিয়া স্বীকার করে। কাফের অর্থে যে অমান্য করে, সত্য বলিয়া স্বীকার করে না। ইছলামের পরিভাষায় যাহারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস করে, যাহারা আল্লাহ্‌র কেতাবকে, তাঁহার প্রেরিত রাছুলকে এবং

কেতাব ও রাছুলের মারফতে প্রকাশিত আদেশ-নিষেধগুলিকে পালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, মোমেন বলিতে তাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে। ইহার বিপরীত, ইছলামের আদর্শ ও শিক্ষাগুলিকে সত্য বলিয়া মান্য করে না যাহারা, তাহাদিগকে বলা হয় কাফের বা অমান্যকারী। ইহাতে ঘৃণা বা হিংসা-বিদ্বেষসূচক কোনো ভাব নাই। প্রকৃত অবস্থার অভিব্যক্তি ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

আয়াতে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, তোমরা যদি কাফেরদিগের বশীভূত হইয়া চল, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে নিজেদের সাধানা ও সিদ্ধির পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিবে, তোমাদিগকে ছলে-বলে-কৌশলে কাফের বানাইয়া ছাড়িবে। বশ্যতা স্বীকার বলিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল প্রকার আনুগত্য ও বশ্যতাকে বুঝাইতেছে।

মদীনায় মোনাফেকদের একটা বড় দল তখনও জমিয়া বসিয়াছিল। মোমেনদিগকে কুমন্ত্রণা দেওয়াই ছিল তাহাদের জীবনের প্রধান ব্রত। ওহোদ যুদ্ধের ব্যাপারেও তাহারা কতকগুলি মুছলমানকে কুপরামর্শ দিয়া বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার জন্য দুনিয়ার মোছলেম সমাজকে সাধারণভাবে এবং হযরতের ছাহাবীদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে।

উপরের আয়াতের উপসংহার হিসাবে ১১০ আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, কাফেররা তোমাদের বন্ধু বা অভিভাবক কখনই হইতে পারে না। তাহাদের উপর তোমরা কখনও নির্ভর করিও না। বরং তোমরা নির্ভর করিয়া থাকিবে আল্লাহ্‌র উপর। তাঁহার হুকুমমত কাজ করিতে থাক, তিনিই তোমাদের সকল মঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

৯১। টীকা: শের্ক ও তাওহীদ—সকল শক্তির একমাত্র মালেক হইতেছেন আল্লাহ্। মানুষকে কোনও অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিতে পারে, অথবা তাহাকে কোনো ইষ্টের অধিকারী করিয়া দিতে পারে, দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুর সে ক্ষমতা বিন্দুমাত্রও নাই। এই বিশ্বাসের নাম তাওহীদ। কিন্তু সেই কেন্দ্রকে বর্জন করিয়া এবং গায়রুল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করিয়া, মোশ্‌রেক সমাজ নিজেদের জন্য হাজার হাজার দেব-দেবী ও তাহাদের কল্পিত অসংখ্য ভূত-প্রেতকে ইষ্টানিষ্টের অধিকারী বলিয়া নিয়াছে। তাহাদের ভয়ে তাহারা সর্বদাই ভীত এবং তাহাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত। ফলতঃ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অভিশাপে তাহাদের অন্তরগুলি

সদাই ভয়বিহ্বল হইয়া থাকে। সেজন্য প্রকৃত তাওহীদের সেবক মোমেনের মোকাবেলায় তিষ্ঠিয়া থাকিয়া তাহারা কস্মিনকালেও বিজয়ী হইতে পারে না।

ছোলতান শব্দের অর্থ Authority, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ ফরমানের দ্বারা, অথবা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত মানুষের বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা। ইহার প্রত্যেকটিই পৌত্তলিকতার ও বহু-ঈশ্বরবাদের প্রতিবাদ চিরকালই করিয়া আসিয়াছে।

৯২। টীকা ঃ ওহোদের কর্মফল—ওহোদ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। পাঠকগণ তাহাতে দেখিয়াছেন যে, তিন হাজার কোরেশ যোদ্ধার মোকাবেলায়, মাত্র সাতশত হইয়াও, মোছলেম মোজাহেদগণ বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, কোরেশ যোদ্ধাদের অনেকেই ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল। কিন্তু তীরন্দাজদিগের ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া আসার ফলে শেষ মুহূর্তে যে বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছিল, ওহোদ যুদ্ধের সমস্ত বিপদের জন্য দায়ী ছিল তাহাই।

আয়াতে এই কঠোর সত্যটা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। মুছলমান গাজীরা আল্লাহ্‌র মদদ প্রাপ্ত হইবে, এ ওয়াদা আল্লাহ্ ঘোষণাও করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই (রূম ৪৭; ইউনুছ ১০৩, মোমেন ৫১, প্রভৃতি।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মোমেনদিগকে আল্লাহ্ পুনঃপুনঃ আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী করিতে এবং তাঁহার রাছুলের ও আমীরের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ মোস্তফা ছিলেন একাধারে রাছুল ও সিপাহসালার উভয়ই। অথচ মুছলমানদের একদল তাঁহার হুকুম অমান্য করিয়া গনিমতের মালের লালসায় ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া আসিল। প্রথম বিজয় ছিল আল্লাহ্‌র মদদেরই কল্যাণ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাহা পণ্ড হইয়া গেল মুছলমানদের নাফরমানীর স্বাভাবিক ফলে। আয়াতে এইসব অবস্থার উল্লেখ করার পর, সেই বিভ্রান্ত মুছলমানদের সম্বন্ধে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হইতেছে —কারণ তাঁহারা এই ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনার বিভ্রমবশতঃ—ঈমানের ক্রটির জন্য নহে। ছরদারের তাবেদারী না করিলে ভবিষ্যতে ও সর্বক্ষেত্রে এইরূপ বিপদ উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এই কথা বুঝাইয়া দেওয়াই আয়াতের উদ্দেশ্য।

৯৩। টীকা ঃ গম غم **বা বিপদ**—'গম'-শব্দের মূল অর্থ, মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া। ভাবার্থে উহার তাৎপর্য হইতেছে, বিপদ-আপদের ফলে মানুষের দেহ মন ও মস্তিষ্ক বিষাদে ও অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া, দিশাহারা হইয়া

পড়া। নিজেদের দোষ-ক্রটির এবং ঘোরতর বিপদগুলির অনুভূতি ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠার ফলে, ছাহাবিগণের অনেকে বাস্তাবিকই এইরূপ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৯৩ আয়াতে সংশ্লিষ্ট ছাহাবিগণের দোষ-ক্রটিগুলি মাফ হইয়া যাওয়ার ঘোষণা করা হইয়াছে। এই আয়াতে তাঁহাদিগকে প্রবোধ দেওয়া হইতেছে, অতীতের শোকসন্তাপ ভুলিয়া যাওয়ার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

৯৪। টীকাঃ শান্তিপ্রদ তন্দ্রা—যুদ্ধের দৈহিক ক্লান্তি, স্বজনগণের বিচ্ছেদ শোক, আত্মগ্লানি প্রভৃতির ফলে ছাহাবারা যে কিরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। এই সময় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ক্ষমার ঘোষণা করা হইল, প্রবোধ দেওয়া হইল, কোরেশদল মক্কায় পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইল। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে মানুষের নিদ্রালুতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং নিদ্রা গিয়া মানুষ অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠে। আয়াতে নোআছ্‌ শব্দ আছে, উহার অর্থ তন্দ্রা, কোনো কোনো মতে সাধারণ নিদ্রাই উহার অর্থ (রাগেব)।

৯৫। টীকাঃ মোনাফেকদিগের হা-হুতাশ—১৫৪ ও ১৫৫ আয়াতে, মদীনার মোনাফেকদিগের হীন মানসিকতার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। মুছলমান সমাজ এখন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কিন্তু ইহুদীদের মনে তাহাতে এতটুকু আনন্দেরও উদ্রেক হইল না। বরং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাদের মনস্তাপ আরও বাড়িয়া গেল। ৭ শতের মধ্যে ৭০ জন শহীদ হইল। এই শক্রক্ষয়ে তাহাদের মনে আনন্দের বান ডাকা উচিত ছিল। কিন্তু এই মাগজুব জাতির পণ্ডিত-পুরোহিতরা ইহাতেও আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। কি দুর্জয় ইহাদের হেম্মত! থাকিয়া গেল তাহাদের চিরদিনের সম্বল গোপন কানাঘুষা—Whispering Campaign.

---

১৭ রুকু

১৫৬। হে মোমেনগণ। তোমরাও যেন সেই লোকগুলির মত হইয়া যাইও না—যাহারা নিজেরা হইয়া রহিল কাফের, অধিকন্তু তাহাদের ভ্রাতারা

১৫৭ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

যখন বিদেশে ছফর করে অথবা গাজীর কর্তব্য আঞ্জাম দিতে থাকে, (এই কাফেররা) তাহাদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে, এই (বোকা) লোকগুলি যদি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহারা মরিত না, নিহতও হইত না, যেমতে পরিণামে এই ধারণাকে আল্লাহ্ তাহাদের মনস্তাপের কারণে পরিণত করিয়া দিবেন ; নিশ্চয় জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন একমাত্র আল্লাহ্ ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন তোমাদের সমস্ত আমল সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা। (৯৬)

وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১৫৭। আর তোমরা যদি আল্লাহ্র রাহে নিহত হও অথবা মরিয়া যাও, সে অবস্থায় আল্লাহ্র তরফ হইতে (তোমাদের জন্য) যে রহমত ও মাগফেরাত আসিবে, তাহা হইবে কাফেরদিগের সমস্ত সঞ্চয় অপেক্ষাও উত্তম। (৯৭)

١٥٧ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

১৫৮। আর স্বাভাবিকভাবে মারয়া যাও অথবা কাহারো দ্বারা নিহত হও, নিশ্চয় তোমাদের

١٥٧ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِ

সকলকে পরিণামে সমবেত হইতে হইবে আল্লাহ্‌রই হুজুরে।

১৫৯। ইহার পরেও (হে মোহাম্মদ!) তুমি তাহাদের সম্বন্ধে সদয় হইয়া রহিলে, (তোমার প্রতি) আল্লাহ্‌র রহমত বশতঃ, কিন্তু তুমি যদি রূঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয় হইতে, তাহা হইলে তোমার পরিবেশ হইতে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত; সেমতে তুমি তাহাদিগকে মা'ফ কর আর তাহাদের জন্য (আল্লাহ্‌র হুজুরে) মাগফেরাত প্রার্থনা করিতে থাক, এবং সমস্ত দরকারী ব্যাপারে পরামর্শ করিয়া নিও তাহাদের সঙ্গে, তৎপর (কোনো বিষয় সমাধা করার) সঙ্কল্প করিবে যখন, তখন নির্ভর করিবে আল্লাহ্‌র উপর; নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন নির্ভরকারী লোকদিগকে। (৯৮)

১৬০। আল্লাহ্ যদি তোমাদিগকে মদদ করেন, তাহা হইলে কেহই থাকিবে না তোমাদিগের পরাভবকারী, আর তিনি যদি তোমাদিগকে ত্যাগ করেন, সে অবস্থায় তাঁহার পর তোমা-

الى الله تحشرون ۝

۱۵۹ فبما رحمة من الله لنت لهم ج ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ص فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ج فاذا عزمت فتوكل على الله ط ان الله يحب المتوكلين ۝

۱٦۰ ان ينصركم الله فلا غالب لكم ج وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم

مِن بعده ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون ٥

দিগকে মদদ করিতে পারে, কে আছে এমন (শক্তিমান ব্যক্তি) ? আর আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাই হইতেছে মোমেনদিগের কর্তব্য। (৯৯)

١٦١ وما كان لنبي ان يغل ط ومن يغلل يات بما غل يوم القيمة ج ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ٥

১৬১। আর (জানিয়া রাখিবে যে,) নবুয়তের কোনো বিষয়কে গোপন করা কোনো নবীর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না; অবস্থা এই যে, গোপন করিবে যে ব্যক্তি, সেই গোপন করা বিষয়টা কিয়ামতের দিন লইয়া আসিবে সে নিজে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অর্জিত কর্মের (ফল) দেওয়া হইবে পুরাপুরিভাবে, আর অবিচার করা হইবে না তাহাদের উপর। (১০০)

١٦٢ افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماوه جهنم ط وبئس المصير ٥

১৬২। বল দেখি, আল্লাহ্‌র সন্তোষলাভের (পন্থা) অনুসরণ করিয়া চলিল যে ব্যক্তি, সে কি (ন্যায়তঃ) সেই ব্যক্তির সমান (বিবেচিত) হইতে পারে, যে নিজের আমলের দ্বারা নিজকে আল্লাহ্‌র অসন্তোষভাজন করিয়া নিয়াছে, আর জাহান্নাম হইয়া গিয়াছে যাহার শেষ আশ্রম ? বস্তুতঃ তাহা হইতেছে অতি নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। (১০১)

١٦٣ هم درجت عند الله ط والله بصير بما يعملون ٥

১৬৩। আল্লাহ্‌র সমীপে ইহারা হইতেছে বিভিন্ন পর্যায়ের লোক; বস্তুতঃ তাহাদের কৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ হইতেছেন সম্যক পর্যবেক্ষক।

١٦٤ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

১৬৪। আল্লাহ্ মোমেনদিগের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে রাছুলরূপে অভ্যুত্থিত করিলেন, যে রাছুল তাহাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত-গুলির তেলাঅত করিতেছে, আর তাহাদিগকে (সকল কলুষ হইতে) পাক-ছাফ করিয়া দিতেছে এবং তাহাদিগকে কেতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতেছে, যদিও পূর্বে ইহারা (পড়িয়া) ছিল সুস্পষ্ট বিভ্রমের মধ্যে। (১০২)

١٦٥ اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا لا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৬৫। তোমাদের উপর (ওহোদ যুদ্ধে) যেসব মছিবত উপস্থিত হইয়াছিল, (বদরে) তাহা-দিগকে তাহার দুইগুণ ক্ষতি-গ্রস্ত করিয়াছিলে তোমরা, কিন্তু তোমরা (ওহোদের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে) বলিয়া উঠিলে—"ইহা ঘটিয়া গেল কোথা হইতে?" (হে রাছুল!) তুমি বলিয়া দাও—"ঘটিয়া গেল কার্যতঃ তোমাদের তরফ হইতে"; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

১৬৬। এবং দুইটি দল যেদিন (ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে) পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপদ আসিয়াছিল, তাহাও ঘটিয়াছিল আল্লাহ্‌রই নির্দেশ অনুসারে, এই জন্য যে, আল্লাহ্ মোমেনদিগকে তাহাদের সত্যরূপে প্রকট করিয়া দিবেন,—(১০৩)

١٦٦ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

১৬৭। আরও এই জন্য যে, মোনাফেক হইয়া আছে যাহারা, তাহাদিগকেও লোকচক্ষে জাহির করিয়া দিবেন, সেই সময় তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল: আইস, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ কর। অথবা আত্মরক্ষার কাজে সহায়তা কর। তাহারা বলিল: আমরা যুদ্ধ করিতে যদি জানিতাম, তাহা হইলে (পূর্বেই) তোমাদের অনুসরণ করিতাম, সেদিন তাহারা (প্রকাশ্যভাবেও) ঈমানের তুলনায় অধিকতর নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছিল কোফরের, তাহারা মুখে এরূপ ভাব প্রকাশ করে, তাহাদের অন্তরে যাহা নাই; বস্তুতঃ তাহারা যাহা গোপন করিয়া রাখিতেছে, আল্লাহ্ তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। (১০৪)

١٦٧ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۖ ج وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوْا ط قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ ج يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ج

১৬৮। (সেই সব মোনাফেক) যাহারা নিজেদের ভ্রাতাগুলি সম্বন্ধে বলিতেছিল, আমাদের কথা শুনিলে, ইহারা নিহত হইত না, অথচ নিজেরা থাকিল বসিয়া ; বল, তাহা হইলে নিজেদের উপর হইতে মওতকে অপসারিত করিয়া দাও—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৬৮ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

১৬৯। আর (হে মোমেনগণ!) আল্লাহ্‌র রাহে কতল করা হয় যাহাদিগকে, সাবধান, তাহাদিগকে তোমরা কখনও মৃত বলিয়া মনে করিও না ; না, কখনই নহে, বরং তাহারা হইতেছে জীবিত, নিজেদের পরওয়ারদেগারের হুজুরে রেজ্‌ক প্রাপ্ত হইতেছে তাহারা,—

১৬৯ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ٥ لا

১৭০। আল্লাহ্‌ যেসব নিয়ামত তাহাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহার ফলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আছে তাহারা—আর তাহাদের পরবর্তীদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধেও তাহারা আনন্দিত হইতেছে যে, (শহীদ হইয়া আসিলে) তাহাদেরও ভয়ের কারণ কিছু থাকিবে না, এবং কখনও দুঃখিত হইবে না তাহারা। (১০৫)

১৭০ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ٥

১৭১। তাহারা আনন্দিত হয় আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য, আরও এই জন্য যে, আল্লাহ্ মোমেনদিগের সাধনার ফলকে কখনই পণ্ড করিয়া দেন না।

171। يستبشرون بنعمة من الله وفضل لا وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ع

তাফ্‌ছীর

৯৬। **টীকা : মোনাফেকদের মিথ্যা ভাষণ**—মোনাফেকদিগের উক্তির সার এই যে প্রবাসে গমন করিয়া বা যুদ্ধে যোগদান করিয়া যাহারা মরিয়া গিয়াছে বা নিহত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে উহারা মরিতও না, আর মারাও পড়িত না।

এখানে প্রথম বিবেচ্য হইতেছে এই ছফর বা প্রবাস শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে। বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে মানুষ মরে না, এ ধারণা কোনো মানুষেরই হইতে পারে না, তা সে প্রবাস যাত্রা শুধু দেশ ভ্রমণের জন্য হউক, আর কাজ-কারবার উপলক্ষে হউক। প্রকৃত পক্ষে এখানে প্রবাস যাত্রা অর্থে—জেহাদের জন্য প্রবাস যাত্রা। এক্ষেত্রে পথের মধ্যে শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। পরবর্তী ১৫৭ আয়াতে এই মতের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। বলা হইয়তেছে— لئن قتلتم فى سبيل الله او متم "তোমরা যদি নিহত হও আল্লাহ্‌র রাহে অথবা মরিয়া যাও" তাহা হইলে তোমাদের জন্য থাকিবে আল্লাহ্‌র সদয় মাগফেরাত ও বিপুল রহমত, ইত্যাদি। এখানে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সাধারণ মত অনুসারে জেহাদে শহীদ হওয়া আর ব্যবসা-বাণিজ্যাদির জন্য প্রবাসে মরিয়া যাওয়ার ফজিলত ও বদলা একই দাঁড়াইতেছে। ইহা খুবই অসঙ্গত কথা। তাহার পর, এই আয়াতে বলা হইতেছে—যদি তোমরা নিহত হও আল্লাহ্‌র রাহে অথবা মরিয়া যাও, ইহার অর্থ এই যে, যদি তোমরা নিহত হও বা মরিয়া যাও—আল্লাহ্‌র রাহে।

৯৭। **টীকা : শহীদের সার্থক মরণ** —আল্লাহ্‌র রাহে আত্মদান করিয়া অমর হয় যে শহীদ, আল্লাহ্‌র হুজুরে ও তাঁহার রাছুলের দরবারে তাহার দর্জা যে কত অধিক, একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রাছুলে কারীমের বহু হাদীছে, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমিও এই তাফ্‌ছীরের বিভিন্ন স্থানে যৎসামান্য বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা পাইয়াছি।

৯৮। **টীকাঃ ছাহাবীর প্রতি সদয় ব্যবহার**—ওহোদ যুদ্ধের সমস্ত দোষ-দুর্বলতা ও ভুল-ক্রটি সত্ত্বেও হযরত রাছুলে কারীম ব্যক্তিগতভাবে কাহারও উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই, কাহাকেও কোনো প্রকার ভর্ৎসনা করেন নাই। এই দুর্ঘটনায় তাঁহাকে দৈহিকভাবে যে নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কখনও তাহার উল্লেখও করেন নাই। তাই আয়াতে তাঁহার এই ধৈর্য ও সদয় ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে—"নিদারূণ পরিস্থিতির পরেও তুমি তাহাদের প্রতি সদয় হইয়াছিলে, অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি নিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের সকলকে সতর্ক হওয়ার উপদেশ দিতেছিলে। তাহাদের এই বুদ্ধিবিভ্রমজনিত অপরাধগুলিকে আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। এখন তুমিও ইহাদিগকে মাফ করিয়া দাও, আর ইহাদের ভাবী কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র দরগাহে দোয়া কর।"

এই প্রসঙ্গে হযরতকে আদেশ দেওয়া হইতেছে, সমস্ত দরকারী ব্যাপারে ছাহাবীদিগের সহিত পরামর্শ করিতে। এই "শূরা" বা পরামর্শ করার ব্যবস্থা হইতেছে ইছলামী শাসন বিধানের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে হযরতকে পরামর্শ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সূরা শূরার ৩৮ আয়াতে মোছলেম সমাজের সাধারণ কর্তব্য হিসাবে বলা হইয়াছে—وامرهم شورى بينهم

"এবং তাহাদের সমস্ত দরকারী বিষয়ের ফায়ছালা হইবে আপোষের যুক্তি-পরামর্শের দ্বারা।"

৯৯। **টীকাঃ তাওআক্কোল** – আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কাজ করিয়া যাও, তাঁহার প্রদত্ত উপাদান উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করিতে থাক। তাহার পর সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর—তাওআক্কোল করার ফলিতার্থ হইতেছে ইহাই। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১০০। **টীকাঃ নবীর কর্তব্য**—ওহোদ যুদ্ধের ব্যাপারটাকে, মুছলমানের জাতীয় ইতিহাসের গুরুতর দুর্ঘটনা বলিয়া সাধারণতঃ উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা এক হিসাবে ঠিক হইলেও সব হিসাবে ঠিক নহে। এই যুদ্ধে সাত শতের মধ্যে ৫০ জন মাত্র বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন, রাছুলের সুস্পষ্ট নির্দেশের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন এবং ইহাই হইয়াছিল সমস্ত বিপদের প্রথম ও প্রধান

কারণ। এ সম্বন্ধে কোনো মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই যুদ্ধে, চরম বিপর্যয়ের সময়ও, নরনারী নির্বিশেষে, অন্য সকলে যে ধৈর্যের, যে সাহসের, যে কর্মকুশলতার এবং যে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ রাখা দরকার।

এই সূরায় মুছলমানদিগের দোষ-ত্রুটিগুলির সমালোচনা করা হইয়াছে সুবিস্তারিত ভাবে এবং ইহার কার্যকারণ পরম্পরার সূক্ষ্ম বিচার করা হইয়াছে, নানা দিক দিয়া কপট মুছলমান বা মোনাফেক দল যে মোছলেম কওমের জাতীয় জীবন সাধনার কত বড় দুশমন, বিভিন্ন ঘটনার নজীর দিয়া, তাহাও আয়াতে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সমালোচনাগুলি বিরক্তিজনক হইয়াছিল প্রধানতঃ মোনাফেক ও তাহাদের মন্ত্রদাতা ইহুদী প্রধানদিগের পক্ষে। তাহারা ইহাকে অন্যায় বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। অপরাধী মুছলমানদের মধ্যেও কেহ কেহ এই সমালোচনার জন্য অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। তাই আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র হুজুর হইতে যেসব অহী নাজেল হয়, তাহা প্রকাশ করাই রাছুলের কর্তব্য। তাহার কোনো অংশ চাপিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ইহা দ্বারা এই সমালোচনার মহৎ উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

১০১। টীকা ঃ যাচাই-বাছাই হওয়া আবশ্যক—ওহোদের যুদ্ধ ঘটে হিজরতের তৃতীয় সনে। তখন মদীনার অধিবাসীদিগের মধ্যকার যাহারা মোছলেম নামে আত্মপরিচয় দিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একদল ছিল আদর্শ মুছলমানের, আর একদল ছিল পরীক্ষাবিমুখ মুছলমানের। ইহা ব্যতীত একদল লোক ছিল মুছলমান জাতির ও ইছলাম ধর্মের চরম দুশমন। কোলে বসিয়া বুকে ছুরি মারার জন্য তাহারা ছদ্মবেশে মুছলমানদের জামাআতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের ছাঁটাই-বাছাই করার জন্য দরকার হয় পরীক্ষার। ১৬২ ও ১৬৩ আয়াতে এই শ্রেণীবিভাগের কথা বলিয়া মুছলমানদিগকে বলা হইতেছে, তাহাদের মধ্যকার দুষ্ট বলদগুলি সম্বন্ধে সাবধান হইতে। কারণ ওহোদ যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষায় এই মেকীগুলির স্বরূপ সকলে বুঝিয়া নিতে পারিয়াছে।

১০২। টীকা ঃ আল্লাহ্‌র পরম অনুগ্রহ—মোহাম্মদ মোস্তফা হইতেছেন বিশ্বমানবের পক্ষে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত, মহত্তম অনুগ্রহ। তিনি মানুষের নবী, পয়দা হইয়াছিলেন মানুষ সমাজে, আসিয়াছিলেন মানুষ-সাধারণের কাছে, জ্ঞানে-কর্মে মানুষকে তাঁহার কর্তব্য বুঝাইয়া দিতে। কেতাব ও হেক-

মতের তাৎপর্য সম্বন্ধে সূরা বাকারার ১০১ টীকা দেখুন।

১০৩। **টীকা ঃ বিপদ আসিল কোথা হইতে ?**—১৬৫ আয়াতে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে যে,বিপদ-আপদ ঘটিয়াছিল স্বয়ং তোমাদের দ্বারা। পরবর্তী ১৬৬ আয়াতে বলা হইতেছে যে, ওহোদের যুদ্ধে তোমাদের উপর বিপদ আসিয়াছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে। আয়াত দুইটির বক্তব্য বাহ্যতঃ পরস্পরের বিপরীত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়াত দুইটির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য নাই। প্রত্যেক কর্মের একটা ফল নির্ধারিত আছে এবং তাহা নির্ধারিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র ন্যায়বিধান অনুসারে। এই হিসাবে আল্লাহ্ হইতেছেন সমস্ত কর্মফলের আদি কারণ। মানুষ আল্লাহ্‌র বিধানকে অমান্য করিয়া কোনও অসৎ কর্মে লিপ্ত হইলে, তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয় তাহাকে, নিজের কৃতকর্মের স্বাভাবিক প্রতিফলে। এই হিসাবে তাহার কর্তা মানুষকেও বলা হয়। সৎকর্ম সম্বন্ধেও এই কথা।

১০৪। **টীকা ঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য**—১৬৬ আয়াতের শেষ অংশ এবং ১৬৭ আয়াতের প্রথম অংশ, প্রকৃতপক্ষে একই আয়াত। এই দুইটি অংশকে এমনভাবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে কি কারণে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আয়াতের মর্ম এই যে, কে মোনাফেক এবং কে মোমেন, আল্লাহ্‌র তাহা অবিদিত ছিল না কিন্তু জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে তাহা এতদিন বুঝিয়া নিতে পারে নাই। ওহোদের অগ্নি-পরীক্ষায় তাহা লোকচক্ষে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

১০৫। **টীকা ঃ অমর শহীদ**—সূরা বাকারার ১৫৪ আয়াতে এই মাজমুনটা প্রায় অবিকলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সূরার ১২0টীকা দেখুন। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, শহিদগণের পরজীবনের সুখ-সৌভাগ্যের কথা। ইহা ব্যতীত তাঁহারা কিরূপ আগ্রহের সহিত অনাগত শহীদদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাও আয়াতের শেষভাগে উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

১৮ রুকূ

১৭২। সেই সব ঈমানদার বান্দাহ্—	١٧٢ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ
প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও	
—আল্লাহ্‌র ও রাছুলের ডাকে	وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا

— أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ج

সাড়া দিয়াছিল যাহারা, তাহাদের জন্য অবধারিত আছে মহান পুণ্যফল। (১০৬)

١٧٣ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا صلے ق وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ٥

১৭৩। লোকে তাহাদিগকে বলিয়াছিল, (মক্কার) লোকেরা তোমাদের (আক্রমণ করার) জন্য বিপুল সমর বাহিনী সংগ্রহ করিয়াছে, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে ভয় করিয়া চলাই তোমাদের কর্তব্য—কিন্তু ইহাতে তাহাদের ঈমান আরও মজবুত হইয়া গেল, সেমতে তাহারা বলিয়া দিল : আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি হইতেছেন অতি উত্তম কারছাজ।

١٧٤ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لا وَّاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ٥

১৭৪। সেমতে আল্লাহ্র নিয়ামত ও রহমতে তাহারা (মদীনায়) ফিরিয়া আসিল, কোনো অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই—বস্তুতঃ আল্লাহ্র সন্তোষলাভের (পন্থার) অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা ; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন মহা অনুগ্রহপরায়ণ (১০৭)

١٧٥ إِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ص فَلَا

১৭৫। নিশ্চয় এই (ভীতি প্রদর্শক) শয়তান, তাহার বন্ধু-বান্ধবের ভয় দেখাইতেছিল তোমাদিগকে, কিন্তু

—(সাবধান !) তোমরা কখনও তাহাদিগকে ভয় করিবে না— এবং ভয় করিয়া চলিবে আমার, যদি তোমরা (সত্যকার) মোমেন হইয়া থাক।

تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ○

১৭৬। আর (হে রাছুল!) কোফরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে যাহারা, তুমি যেন তাহাদের ব্যবহারে দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র (সত্যধর্মের) কিছু মাত্র ক্ষতি তাহারা করিতে পারে না ; অথচ তাহাদের জন্য (অবধারিত) রহিয়াছে গুরুতর দণ্ড।

١٧٦ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ج انهم لن يضروا الله شيئا ط يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة ج ولهم عذاب عظيم ○

১৭৭। নিশ্চয় কোফরকে যাহারা কিনিয়া নিল ঈমানের বিনিময়ে, আল্লাহ্‌র (সত্যধর্মের) কিছুমাত্র ক্ষতিও তাহারা করিতে পারিবে না, আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যাতনাদায়ক আজাব। (১০৮)

١٧٧ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ج ولهم عذاب اليم ○

১৭৮। এবং কাফের হইয়া গেল যাহারা—তাহারা যেন মনে না করে যে, আমাদের প্রদত্ত অবকাশ হিতজনক হইবে তাহাদের জন্য, আমরা তাহাদিগকে ঢিল দিয়া থাকি—যাহার পরিণামে তাহারা

١٧٨ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ط انما نملي لهم

লِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

নিজেদের পাপ আরও বাড়াইয়া নেয়; আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে অপমানজনক শাস্তি।

١٧٩ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১৭৯। তোমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছ, মোমেনদিগকে সে অবস্থায় ছাড়িয়া রাখা আল্লাহ্‌র পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না—যাবৎ না তিনি নাপাককে পাক (সমাজ) হইতে বাছাই করিয়া দিবেন; এবং গায়েবের সংবাদ তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়াও আল্লাহ্‌র মনজুর হইতে পারে না, তবে আল্লাহ্ আপন রাছুলদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা (ইহার জন্য) নির্বাচিত করিতে পারেন; অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাছুলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখিও; বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাসবান হইয়া থাক ও (অসৎ কাজ হইতে) পরহেজ করিয়া চল, তাহা হইলে, মহা পুণ্যফলের অধিকারী হইতে পারিবে তোমরা। (১০৯)

١٨٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

১৮০। আর আল্লাহ্ তাহাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা

يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرا لهم ط بل هو شر لهم ط سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ط ولله ميراث السموت والارض ط والله بما تعملون خبير ع

সম্বন্ধে কৃপণতা করিতেছে যাহারা —তাহারা যেন ইহাকে নিজেদের পক্ষে হিতজনক মনে না করে; না, না,—বরং ইহা হইতেছে তাহাদের পক্ষে অমঙ্গল; এই কৃপণতার পাপ তাহাদের গলায় তওক হইয়া যাইবে কিয়ামতের দিন; বস্তুতঃ আছ্‌মানের ও জমিনের যাবতীয় 'মীরাছের' মালেক হইতেছেন আল্লাহ্‌— এবং তোমাদের সমস্ত আমল সম্বন্ধে আল্লাহ হইতেছেন সম্যকভাবে খবরদার। (১১০)

তাফ্‌ছীর

১০৬। **টীকা ঃ আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া**—ওহোদ যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনের ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এইদিন যাঁহারা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাছুলের ডাকে সাড়া দিয়া, কোরেশদিগকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, এই আয়াতে তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে।

১০৭। **টীকাঃ ক্ষুদ্র-বদর অভিযান**—প্রথমদিন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার সময়, আবু-ছুফিয়ান হযরতকে সম্বোধন করিয়া চ্যালেঞ্জ দিয়াছিল— আগামী বৎসর ক্ষুদ্র-বদর প্রান্তরে তোমাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হইবে! মুছল-মানদের পক্ষ হইতে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হইয়াছিল। মক্কায় ফিরিয়া যাওয়ার পর আবু-ছুফিয়ান বিশেষ ব্যাগ্রতার সহিত আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহার পর দুই হাজার যোদ্ধার এক সৈন্য বাহিনী ও বিপুল রণসম্ভার নিয়া সে যথাসময় মক্কা হইতে বাহির হইয়া আসে এবং مر الظهران পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

এই সময় সে মদীনায় গুপ্তচর পাঠাইতে ত্রুটি করে নাই। এখানে পেঁাছিয়া

কোনো এক 'অজ্ঞাত' কারণে হঠাৎ তাহার মত বদলাইয়া যায়। সে তখন আর কতকগুলি লোক পাঠাইয়া মুসলমানদিগকে বুঝাইতে চায় যে, কোরেশরা এবার প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য, সবদিক দিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। তোমাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দেওয়াই তাহাদের সঙ্কল্প। ১৭৩, ১৭৪ ও ১৭৫ আয়াতে এতদসংক্রান্ত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে।

গুপ্তচরদিগের এইসব প্রচারণা অবগত হইয়া মদীনার মোছলেম বীরবৃন্দের কণ্ঠে ঈমানের যে সুদৃঢ় ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, ১৭৩ আয়াতে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই সময় হযরত ঘোষণা করেন—

'والذى نفسى بيده لاخرجن ولو وحدى - فخرج ومعه سبعون راكبا
يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل -

"যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, সেই আল্লাহ্‌র কছম করিয়া বলিতেছি, আমি নিশ্চয় যাইব। এমন কি, একা যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত। তাহার পর ৭০ জন ঘোড়ছওয়ারের এক মোজাহেদ বাহিনীর সেনাপতিরূপে যাত্রা করিলেন—আমাদের দীনদুনিয়ার নায়ক মোহাম্মদ মোস্তফা (আল্ মানার ৪—২৩৮)। ইহাও রাছুলের ছুন্নত, কিন্তু হুজরার ছুন্নত নহে—ময়দানের ছুন্নত। যে ছুন্নতের উপর আমল করিতে কোনো তাপ ঝঞ্ঝা নাই, একটা পয়সাও খরচ হয় না, তাহার উপর আমল করার ব্যাপারে সমাজ জীবনে কত কোন্দল-কোলাহল, কত সংঘাত-সংঘর্ষের উদ্রেক হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু রাছুলের এই জীবন্ত সুন্নতের, এই মহিমান্বিত আদর্শের জন্য, কোনও আগ্রহের নিদর্শন তো কোনো অঞ্চল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

১০৮। টীকা ঃ মোনাফেকদের স্বরূপ—এই আয়াতে মোনাফেকদিগের বর্তমান আচরণের কথা বলা হইতেছে। তাহারা যখন দেখিতে পাইল যে, মদীনার উদ্যম উৎসাহের কথা শুনিয়া আবু-ছুফিয়ান মধ্যপথ হইতে পলাইয়া গিয়াছে, মোহাম্মদ বিজয়ীরূপে মদীনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষে সুনিশ্চিতভাবে ধরা পড়িয়াছে, তখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে অন্যান্য ইছলাম বিরোধী দলের সহিত যোগদান করিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহির হইতে একটা বড় রকম আক্রমণের ব্যবস্থা হইল, ভিতর হইতে তাহারাও আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিবে, ইহাই ছিল তাহাদের ষড়যন্ত্র, এবং এই জন্যই খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে শহর পরিত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী আয়াতেও তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

১০৯। টীকাঃ **ভবিষ্যতের আভাস**—বর্তমানে মোছ্‌লেম সমাজ ঘরে-বাহিরে শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আছে, ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। খাবিছ মোনাফেকদিগকে আল্লাহ্‌ বাছাই করিয়া দিবেন। বাহিরের আরব গোত্রগুলির অনেকে অনতিবিলম্বে ইছ্‌লামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে,অথবা মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। ইহুদী গোত্রগুলি শীঘ্রই পরাভূত হইবে। এই শ্রেণীর ব্যাপারগুলি ছিল তখন ভবিষ্যতের ব্যাপার। তাই আয়াতে বলা হইতেছে, এই সব ভাবী ঘটনা এখন তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তবে সময় আসিলে, রাছুলকে তাহা জানাইয়া দিব। সুতরাং রাছুলের আদেশ মত কাজ করিয়া যাওয়াই হইতেছে তোমাদের কর্তব্য। বলা বাহুল্য, হযরতের মহামান্য ছাহাবীরা এই আদেশ পালনে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই, তাহাই হইতেছে ইছ্‌লামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস।

১১০। **টীকাঃ কৃপণতার অভিশাপ**—জাতীয় জীবনকে সুসংগঠিত করার এবং তাহাকে সকল গৌরবে ও সকল কল্যাণে মণ্ডিত করিয়া নেওয়ার জন্য আবশ্যক হয় জেহাদের, আবশ্যক হয় ব্যক্তিগণের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করিয়া দেওয়ার। তার জন্য দরকার হয় জেহাদের, তার জন্য দরকার হয় জাকাতের, তার জন্য দরকার হয় অবস্থাপন্ন লোকদিগের অর্থ সাহায্যের। কিন্তু কৃপণতার অভিশাপ হইতেছে এ সমস্তের ঘোরতার প্রতিবন্ধক।

---

১৯ রুকূ

১৮১। لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

১৮১। যাহারা বলিয়াছে—আল্লাহ্‌ হইতেছেন ফকীর আর আমরা হইতেছি ধনবান—তাহাদের কথা আল্লাহ্‌ নিশ্চয় শ্রবণ করিয়াছেন—তাহাদের উক্তিগুলি আমরা লিখিয়া রাখিব, আরও (লিখিয়া রাখিব) তাহাদের নাহক নবী হত্যাকে—আর বলিব, জাহান্নামের আজাব ভোগ করিতে থাক।

১৮২। তাহারা নিজ হাতে (দুনিয়ায়) যেসব আমল করিয়া আসিয়াছে, এই আজাব হইতেছে তাহারই প্রতিফল, আরও (কারণ এই) যে, আল্লাহ্ বান্দাদিগের প্রতি জুলুমবাজ নহেন। (১১১)

١٨٢ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ج

১৮৩। ইহারাই ত বলিয়াছে—আল্লাহ্ আমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার নিয়াছেন যে, কোনও রাছুলের প্রতি আমরা ঈমান আনিব না, যাবৎ না সে এমন কোরবান উপস্থিত করে, (আছমান হইতে) আগুন আসিয়া যাহাকে খাইয়া ফেলিবে; বল: আমার পূর্বে অনেক রাছুল তো তোমাদের কাছে আসিয়াছিলেন—বহু দলিল-প্রমাণ সঙ্গে নিয়া এবং তোমাদের কথিত আগুনের কোরবানকেও সঙ্গে নিয়া, বল দেখি—সেই নবীদিগকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে কি কারণে? তোমরা সত্যবাদী হইলে (এই প্রশ্নের উত্তর দেও!)। (১১২)

١٨٣ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ط قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

১৮৪। সেমতে, তাহারা যদি তোমাকে ঝুটলাইয়া থাকে, (তাহাতে অভিনব কিছুই নাই), তোমার পূর্বে এমন রাছুলদিগকেও ঝুটলাইয়া

١٨٤ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ

দেওয়া হয়—যাহারা সঙ্গে আনিয়াছিল সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ, লিখিত প্রস্তর ফলক ও উজ্জ্বল কেতাব।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ط

১৮৫। প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর আস্বাদ লইতে বাধ্য, এবং (মৃত্যুর পর) কিয়ামতের দিন তোমরা নিজেদের আমলের পুণ্যফলগুলি পুরাপুরিভাবে প্রাপ্ত হইবে ; তখন জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করিয়া দেওয়া হইবে যে ব্যক্তিকে, সফল-জীবন হইল সে ব্যক্তি ; বস্তুত: দুনিয়ার জীবন তো মোহের উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

١٨٥ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٥

১৮৬। অবশ্য তোমাদের আজমায়েশ করা হইবে তোমাদের মালের সম্বন্ধে, তোমাদের জ্বানের সম্বন্ধে—এবং তোমাদিগকে অনেক যাতনাদায়ক বিষয় শুনিতে হইবে আহ্‌লে-কেতাবদিগের নিকট হইতে ও মোশরেকদিগের নিকট হইতে ; সে অবস্থায় তোমরা যদি ছবর করিয়া থাক আর গর্হিত কাজ হইতে বাঁচিয়া চলিতে পার—

١٨٦ لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا

নিশ্চয় তাহা হইবে অন্যতম অভিপ্রেত কাজ। (১১৩)

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

১৮৭। এবং স্মরণ কর, যখন আমরা আহ্লে-কেতাবদিগের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার নিয়াছিলাম—তোমরা আল্লাহ্র কেতাবকে জনগণের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবে আর তাহাকে গোপন করিবে না, কিন্তু সেই অঙ্গীকারকে তাহারা ফেলিয়া দিল নিজেদের পিঠের পশ্চাতে এবং সেই কেতাবকে তাহারা বিক্রয় করিল অতি নগণ্য মূল্যে, বস্তুতঃ কতই না নিকৃষ্ট ছিল তাহাদের এই খরিদ-বিক্রয়।

١٨٧ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

১৮৮। আর মনে করিও না যে, (পাপ) কাজ করিয়া আনন্দিত হয় যাহারা, এবং যে কাজ তাহারা করে নাই—অথচ তাহার জন্য প্রশংসা লাভের অভিলাষী হয় যাহারা, তাহারা আল্লাহ্র দণ্ড হইতে রেহাই পাইতে পারিবে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য অবধারিত আছে যাতনাদায়ক আজাব।(১১৪)

١٨٨ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৮৯। বস্তুতঃ আছমান-জমিনের একমাত্র মালেক হইতেছেন আল্লাহ্; আল্লাহ্ হইতেছেন সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٨٩ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ع

তাফ্ছীর

১১১। টীকাঃ **কৃপণদের কটূক্তি**—ইহার পূর্বে, ১৮০ আয়াতে কৃপণতার নিন্দা করা হইয়াছে। এখানে সেই প্রসঙ্গে ইহুদী ধনকুবেরদিগের কয়েকটা হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

তাহারা বলে, আল্লাহ্ মানুষের কাছে কর্জ চাহিতেছেন, তাঁহার কাজে ব্যয় করার জন্য আমাদের নিকট হইতে দান-খয়রাত পাওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কোর্আনের বর্ণিত আল্লাহ্, নিতান্ত নিঃস্ব-ফকীর, আর আমরা হইতেছি অবস্থাপন্ন ধনবান। ইহা ছিল কোর্আনের ও ইছলামের বিরুদ্ধে তাহাদের শ্লেষ উক্তি। আয়াতের শেষ অংশে ও পরবর্তী ১৮২ আয়াতে এই ধৃষ্টতার প্রতিফল সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই বিবরণ দেওয়া হইতেছে জাতি হিসাবে, অতীত ও বর্তমানের ইহুদী সমাজগুলি সম্বন্ধে, সমগ্রভাবে। ব্যক্তিবিশেষের কোনো সাময়িক কাজ বা কথা সম্বন্ধে ইহাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টির বহুবচনাত্মক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলিই ইহার অকাট্য প্রমাণ।

লেখা, লিখিয়া দেওয়া, লিখিয়া রাখা প্রভৃতি শব্দের ভাবার্থ—যাহা অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য বা ব্যতিক্রমহীন অবস্থা। যেমন বলা হইয়াছে, ছিয়ামকে বা জেহাদকে মোমেনদের উপর "লিখিয়া দেওয়া" হইয়াছে। অর্থাৎ ইহুদীরা এইসব ধৃষ্টতার প্রতিফল অবশ্যই পাইবে, কোনোক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না।

১১২। টীকাঃ **ইহুদীদের অন্যায় যুক্তিবাদ**—তাওরাতের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, ইহুদীরা হযরতের উপর ঈমান আনিতেছে না—নিজেদের এই আচরণের সমর্থনে তাহারা বলিতে আরম্ভ করে যে, যাবৎ না কোনও নবী এমন কোনো কোরবান উপস্থিত করিতে পারেন—আছমানী আগুন নামিয়া যাহা খাইয়া ফেলিবে—পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিবে।

কোর্‌আন মাজীদ তাহাদের এই দাবীর সমর্থনও করে নাই প্রতিবাদও করে নাই। কারণ, তাহার কোনো দরকারই ছিল না।

কোর্‌আন ইহুদীদের যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহাদের দাবীর অসততা ও অসত্যতা একসঙ্গে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। কোর্‌আন বলিতেছে: তোমাদের উক্তি অনুসারে, মোহাম্মদের পূর্বে অনেক নবী-রাছুল আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে দলিল-প্রমাণেরও কোনো অভাব ছিল না, এবং তোমরাও তাঁহাদিগকে ভাববাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। কিন্তু তোমরা এই নবীদিগকে হত্যা করিলে তোমাদের শাস্ত্রের কোন্ বিধান অনুসারে? তাহার পর, তোমাদের যেসব নবী, তোমাদের বর্তমান দাবী অনুসারে, অগ্নি কোরবান তোমাদের সম্মুখে সম্পন্ন করিয়া দেখাইলেন, তাঁহাদিগকেও তোমরা হত্যা করিয়া ফেলিলে, তোমাদের কোন্ অঙ্গীকার অনুসারে? যদি সত্যবাদী হও, তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর দাও!

ইহুদীরা বলিতেছে—যে নবী হোমীয়বলির অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইবেন, তাঁহার উপর ঈমান আনা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে ইতিপূর্বে বহু নবী ও রাছুলের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ইহুদী জাতি তাঁহাদিগকে নবী-রাছুল বলিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছে। অথচ তাহাদের স্বীকৃত এই নবী-রাছুলের মধ্যে অনেককেই তাহারা নিজেরাই হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের এই উক্তির মধ্যে সত্যের বা সততার লেশমাত্রও নাই।

১১৩। **টীকা: মোমেনদের আজমায়েশ**—মুছলমানদিগের জন্য এই শ্রেণীর সতর্কবাণী কোর্‌আন মাজীদে পুনঃপুনঃ ঘোষিত হইয়াছে। ইহুদী তাহার শত্রু, খ্রীষ্টান তাহার শত্রু এবং মোশরেকরাও তাহার শত্রু। কিন্তু তাহাদের শত্রুতার দ্বারা ইছলাম ধর্মের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই, হইবেও না। ফলে বিচারের পরিবর্তে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিবে অপপ্রচারের, রূঢ় ভাষায় মুছলমানদের অন্তরে আঘাত করার। বর্তমান জামানায় খ্রীষ্টান প্রচারকরা অগ্রপথিক হইয়া ময়দানে অবতরণ করিয়াছিলেন। এক শতাব্দী হইতে তাঁহাদের ভারতীয় মন্ত্রশিষ্যরা নিজেদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া, এই জঘন্যতার চিত্রকে জঘন্যতর করিয়া তুলিয়াছেন। আয়াতের শেষ অংশে মোছলেম কওমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তোমরা যদি ধৈর্যচ্যুত হইয়া না পড়, আর যদি অন্যায়কে বর্জন করিয়া চলিতে পার—অর্থাৎ তাহাদের অন্যায়ে উত্তেজিত হইয়া তোমরাও যদি মিথ্যার ও অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ না কর—তাহা হইলে সেইটাই হইবে কাজের মত কাজ।

১১৪। **টীকাঃ না করা কাজের জন্য যশের অভিলাষ**—অন্যায় কাজ করিয়া আনন্দিত হওয়া, আর কাজ না করিয়া লোকের প্রশংসা কুড়াইবার প্রবৃত্তি—এই দুইটাই হইতেছে মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। দুঃখের বিষয়, এই দুইটি ব্যাধি আজকাল অতিমাত্রায় সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেক ও বিচার শক্তি এতই আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, এতবড় একটা মারাত্মক ব্যাধিকে, ব্যাধি বলিয়া অনুভব করার সামর্থ্য হইতেও আজ আমরা বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছি। কখনও কাহারও মনে অনুভূতির উদ্রেক হইলে, তিনি নিজের চিকিৎসার কথা ভুলিয়া, অন্যের চিকিৎসার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠেন। এসব ভাল লক্ষণ নয়।

---

২০ রুকূ

١٩٠ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ

১৯০। নিশ্চয় আছমান ও জমিনের স্বজনে এবং দিবা-রাত্রের পরস্পর অনুগমনে, বহু নিদর্শন রহিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানী লোকদিগের জন্য—

١٩١ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

১৯১। —সেই সব (তত্ত্বজ্ঞানী) লোকের জন্য, যাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া থাকে দাঁড়ান অবস্থায়, বসিয়া থাকা অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়, এবং তাহারা চিন্তা করিতে থাকে আছমান ও জমিনের স্বষ্টি-কৌশল সম্বন্ধে,—(ফলে তাহাদের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনিয়া ওঠে): "হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! এ সমস্তকে তুমি

কখনও অনর্থকভাবে পয়দা কর নাই। মহা মহিমান্বিত তুমি, অতএব আগুনের আজাব হইতে আমাদিগকে বাঁচাইয়া নিও। (১১৫)

هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১৯২। হে আমাদের পরওয়ারদেগার। যাহাকে তুমি আগুনে দাখিল করিয়া দিবে, তাহাকে তুমি করিয়া দিবে হতমান; আর অত্যাচারী (জালেম)-দিগের জন্য কেহই থাকিবে না মদদ্গার।

১৯২ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

১৯৩। হে পরওয়ারদেগার। আমরা শুনিলাম এক ঘোষণাকারীর আহ্বান, সে আহ্বান করিতেছে ঈমানের দিকে, (সে বলিতেছে)—তোমরা সকলে "বিশ্বাস" স্থাপন কর তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি, সেমতে আমরা ঈমান আনিলাম—হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। সেমতে আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলিকে তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্য, মাফ করিয়া দাও, আর আমাদের মধ্যে যাহা কিছু মন্দ আছে, সেগুলিকে আমাদিগ হইতে অপসারিত করিয়া দাও। আর আমাদের মৃত্যু ঘটাইও সাধুসজ্জনগণের সহগামী হিসাবে। (১১৬)

১৯৩ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا صلے رَبَّنَا ق فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ج ○

১৯৪। এবং হে আমাদের পরওয়ারদেগার, তোমার রাছুলগণের মারফতে আমাদিগকে যেসব ওয়াদা দিয়াছ, তাহা আমাদিগকে

১৯৪ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ٥

দান কর, এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না—নিশ্চয় ওয়াদার অন্যথা কর না তুমি। (১৯৭)

١٩٥ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ
لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ
سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا
لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط

১৯৫। সেমতে তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার তাহাদের প্রার্থনা মন্‌জুর করিয়া বলিলেন—"কোনও সাধকের সাধনাকে আমি কখনও পণ্ড করিয়া দেই না—তা সে পুরুষ হউক বা নারী হউক, পরস্পরের অংশ তোমরা,—অতএব হিজরত করিয়াছে যাহারা ও নিজেদের আবাস ভূমি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাদিগকে, আর আমার রাহে নির্যাতিত হইল যাহারা, এবং যুদ্ধ করিল ও নিহত হইল যাহারা—তাহাদের মন্দগুলিকে নিশ্চয় তাহাদের মধ্য হইতে অপসারিত করিয়া দিব, এবং তাহাদিগকে সেই জান্নাতে দাখিল করিয়া দিব—যাহার নিম্নদেশ হইতে বহিয়া চলিয়াছে নদনদীমালা, আল্লাহ্‌র হুজুর হইতে (সমাগত) পুণ্যের পুরস্কার হিসাবে;

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

আর আল্লাহ্‌রই কাছে আছে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার।"

١٩٦ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ط

১৯৬। (হে রাছুল।) কাফেরদিগের এই যে দেশ-বিদেশে গমনাগমন; তুমি যেন ইহা দ্বারা প্রতারিত হইও না;—

١٩٧ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১৯৭। অতি সামান্য সম্বল ইহা, ইহার পর জাহান্নামই হইবে তাহাদের আশ্রয়স্থল, বস্তুত: কতই না নিকৃষ্ট সে আশ্রয়।

١٩٨ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ○

১৯৮। কিন্তু আল্লাহ্ সম্বন্ধে সমীহ করিয়া চলিবে যাহারা, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাতগুলি, যাহার নিম্নদেশ দিয়া বহিয়া চলিতেছে নদনদীমালা, তাহারা সেখানে হইবে চিরস্থায়ী— আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মেহমানী হিসাবে; এবং আল্লাহ্‌র কাছে রহিয়াছে যাহা, সাধুসজ্জনগণের জন্য তাহা হইতেছে অতি-উৎকৃষ্ট।

١٩٩ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ

১৯৯। এবং আহ্‌লে-কেতাবদিগের মধ্যে এরূপ লোকও নিশ্চয় আছে যাহারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র উপর ও তোমাদের উপর যাহা নাজেল হইয়াছে তাহার উপর এবং তাহাদের উপর যাহা

নাজেল করা হইয়াছে তাহার উপর, আল্লাহ্‌র হুজুরে সদা বিনীত তাহারা— আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে না তাহারা ; এই যে লোকগুলি—ইহাদের পুণ্যফল অবধারিত আছে ইহাদের পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন হিসাব গ্রহণে ত্বরিত। (১১৮)

اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

২০০। হে মোমেনগণ ! তোমরা নিজেরা (সকল পরীক্ষায়) ছবর করিয়া থাকিবে, আর একে অন্যকে ছবর করিতে প্রবুদ্ধ করিবে এবং (সর্বদা) জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে—তাহা হইলে তোমরা (দীন দুনিয়ায়) কামিয়াব হইতে পারিবে। (১১৯)

٢٠٠ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ع

তাফ্‌ছীর

১১৫। **টীকাঃ সৃষ্টিতেই স্রষ্টার নিদর্শন**—সূরা বাকারার ১৬৪ আয়াতে বিষয়টা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে কুদরতের আটটা বিষয়কে কাদেরের নিদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। ঐ সূরার ১২৫ টীকা দেখুন।

১১৬। **টীকাঃ ঘোষণাকারীর আহবান**—আহ্বানকারী বলিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বুঝাইতেছে। কোর্‌আন হইতেছে সেই আহ্বানের চিরন্তন ধ্বনি—আর জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা ও চিন্তাশীলতা হইতেছে তাহার বাহন বা উপকরণ।

১১৭। **টীকাঃ আল্লাহ্‌র ওয়াদা**—দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র নবুয়ত ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রথমদিন হইতেই শেষ নবীর অবির্ভাব পর্যন্ত এই ওয়াদা বলবৎ হইয়া

আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ হইয়া থাকিবে। অন্যান্য আয়াতের ন্যায়, সূরা মোমেনের ৫১ আয়াতে বলা হইয়াছে—

انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحيواة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد -

"আমাদের রাছুলগণকে আর (তাহাদের অনুসারী) মোমেনদিগকে নিশ্চয়ই মদদ করিব দুনিয়ার জীবনে এবং কিয়ামতের দিনে।" এখন, এই সাহায্য লাভের উপযুক্তরূপে নিজদিগকে গড়িয়া তোলাই হইতেছে আমাদের কর্তব্য। সূরার শেষ আয়াতে তাহার বাস্তব স্বরূপ আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১১৮। **টীকা: একদল ন্যায়নিষ্ঠ আহ্‌লে-কেতাব**—ইতিপূর্বে এইরূপ একটা প্রসঙ্গে নাস্তরী ও Unitarian বা একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানদিগের উল্লেখ করিয়াছি। এই আয়াতের তাফ্‌ছীর লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় গত সেপ্টেম্বর মাসের একখণ্ড Islamic Review হাতে আসিল। কাগজখানা খুলিয়াই নজর পড়িল The Reverend A. Pecoc সাহেবের নবীদিবসের অভিভাষণ। তিনিও একজন একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান এবং তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন একজন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান হিসাবে। তাঁহার এই অভিভাষণেও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগুলির সমর্থন হইয়া যাইতেছে।

১১৯। **টীকা: সফলতার মূল উপকরণ**—মোমেন বান্দাকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—তোমরা সব পরীক্ষায় ও সকল বিপদ-আপদে, নিজেরা ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিবে আর পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যধারণ করার জন্য প্রবুদ্ধ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে সর্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বিভিন্ন ছাহাবীর বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, হযরত রাছুলে কারীম, মধ্যরাত্রের পর তাহাজ্জুদের জন্য শয্যাত্যাগ করিতেন এবং সূরা আল-এমরানের শেষ আয়াত দশটির তেলাঅত করিতেন (বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, নাছায়ী প্রভৃতি)।

সূরা নেছা ৪ *
سورة النساء

১ রুকূ

بسم الله الرحمن الرحيم ○	করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে।
۱ يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ج واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ط ان الله كان عليكم رقيبا ○	১। হে মানব! (১) তোমরা সতর্ক হইয়া চলিতে থাকিবে নিজেদের সেই প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্বন্ধে—যিনি তোমাদিগকে পয়দা করিয়াছেন একই নাফ্‌ছ (২) (বা মূল উপাদান) হইতে এবং তাহা হইতে পয়দা করিয়াছেন তাহার যুগলার্ধকে, আর এতৎ উভয়ের মধ্যবর্তিতায় (দুনিয়ায়) বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন বহু পুরুষকে ও নারীকে, এবং (হে মানব!) তোমরা সতর্ক হইয়া চলিবে আল্লাহ্ সম্বন্ধে—যাঁহার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট স্বাধিকার লাভের দাবী উপস্থিত করিয়া থাক, আরও (সতর্ক হইয়া চলিবে) জরায়ু সম্পর্কিত আত্মীয়তা সম্বন্ধে; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন তোমাদের উপর নেগাহ্‌বান। (৩)

---

* এই সূরায় স্ত্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া, ইহার নামকরণ হইয়াছে "নেছা"। ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তী অনেক পরিস্থিতির সমাধান সম্বন্ধে এই সূরায় অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের ৪র্থ সনে নাজেল হইয়াছিল। অবশ্য কিছু অংশ তাহার পরেও নাজেল হইয়া থাকিতে পারে। বিবি আয়েশার একটি বর্ণনা হইতেও ইহার নাজেল হওয়ার সময় নিঃসন্দেহরূপে নির্ধারিত হইয়া যাইতেছে (বোখারী)।

২। আর, এতীমদিগকে তাহাদের বিষয়-সম্পত্তিগুলি সমর্পণ করিও এবং (নিজেদের) নিকৃষ্ট জিনিসের সহিত তাহাদের উৎকৃষ্ট জিনিসের অদল-বদল করিও না ; আর নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির সহিত মিশাইয়া দিয়া তাহাদের বিষয়-সম্পত্তিগুলিকে ভোগ করিও না ; নিশ্চয় ইহা হইতেছে মহা পাপ। (৪)

٢ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ
بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْٓا
اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ط
اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ٥

৩। আর, এতীমদিগের প্রতি সুবিচার করিতে সমর্থ হইবে না -- এরূপ আশঙ্কা যদি তোমাদের হয়, তাহা হইলে নিজেদের পছন্দ মত অন্য নারীদের মধ্য হইতে বিবাহ করিতে পার—দুই দুইটি বা তিন তিনটি অথবা চার চারটি (পর্যন্ত), (৫) কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে) সু-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে (বিবাহ করিবে) মাত্র একজনকে, (৬) অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত (নারী)-দিগকে ; (৭) এই-ব্যবস্থাতে তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ;

٣ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي
الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ
لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ
وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا
مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ
اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ط

৪। আর তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদিগের মোহর (পরিশোধ

٤ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ

করিয়া) দিবে সন্তুষ্টচিত্তে ও ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে; তবে তাহারা যদি মোহরের কিছু অংশ তোমাদিগকে সন্তুষ্ট মনে প্রদান করে, সে অবস্থায় তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে পার। (৮)

نحلة ط فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا o

৫। আর যে ধন-সম্পত্তিকে আল্লাহ্ তোমাদিগের অবলম্বন স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন, নির্বোধ মালেক-দিগের হস্তে তাহা সমর্পণ করিও না, কিন্তু সেই মাল হইতে তাহাদের ভরণপোষণ চালাইতে থাকিও আর তাহাদিগকে সঙ্গত কথা বলিও। (৯)

٥ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا o

৬। আর এতীমদিগকে তোমরা যাচাই করিতে থাকিবে তাহারা বালেগ হওয়া পর্যন্ত; তখন যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে কতকটা সুমতির সন্ধান পাও, তবে তাহা-দের বিষয়-সম্পত্তিগুলি তাহা-দিগকে ফিরাইয়া দিবে, অধিকন্তু এতীমগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে (এবং নিজেদের সম্পত্তি ফিরাইয়া নিবে)—এই আশঙ্কায় তাহাদের সম্পত্তিগুলি বাহুল্যভাবে শীঘ্র শীঘ্র খাইয়া ফেলিও না; এবং (এতীমের অলিদিগের মধ্যে)

٦ وابتلوا اليتمى حتى اذا بلغوا النكاح ج فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ج ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ط

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ط فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

যে ব্যক্তি অবস্থাপন্ন—তাহার তো বিরত থাকাই উচিত, কিন্তু যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, সে (এতীমের মাল হইতে) ভোগ করিতে পারে সঙ্গতভাবে; অতঃপর যখন তোমরা এতীমদিগকে তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে যাইবে, তখন তাহাদের (সহিত এই আদান-প্রদান) সম্বন্ধে (কয়েক-জনকে) সাক্ষী করিয়া রাখিবে; বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্ই হইতেছেন যথেষ্ট।(১০)

৭ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ط نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝

৭। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া (মরিয়া) যায়—পুরুষদিগের জন্য তাহাতে অংশ আছে এবং (এইরূপে) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যাহা কিছু পরি-ত্যাগ করিয়া (মরিয়া) যায়—স্ত্রীলোকদেরও তাহাতে অংশ আছে, তাহা অল্পবিস্তর যাহাই হউক না কেন; সুনির্ধারিত এই প্রাপ্য অংশগুলি। (১১)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا

৮। আর (সম্পত্তি) বণ্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ ও নিঃস্ব

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

ব্যক্তিরা যদি সেখানে উপস্থিত হয়, সে অবস্থায় ঐ সম্পত্তি হইতে তাহাদিগকে কিছু দিয়া দিবে এবং তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবে সৌজন্য সহকারে। (১২)

৯ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

৯। আর সেই (পরামর্শদাতা) লোকদিগের ভাবা উচিত যে, তাহাদিগকে দুর্বল সন্তান-সন্ততি রাখিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইলে তাহারাও সেই সন্তানদের পরিণাম ভাবিয়া নিশ্চয় ভীত হইয়া পড়িবে, অতএব আল্লাহ্‌র ভয় করা ও সুসঙ্গত কথা বলাই তাহাদের উচিত। (১৩)

১০ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ع

১০। নিশ্চয় এতীমদিগের বিষয়-সম্পত্তিগুলিকে অন্যায়ভাবে ভোগ করে যাহারা—তাহারা তো নিজেদের উদর পূর্ণ করে আগুন ভক্ষণ করিয়া; বস্তুতঃ তাহাদিগকে নিশ্চয় উপনীত হইতে হইবে (জাহান্নামের) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। (১৪)

তাফ্ছীর

১। **টীকা ঃ আন্-নাছ, মানব সকল**—"নাছ" অর্থে মানব। মূলে আন্-নাছ الناس ব্যবহার করা হইয়াছে। এই শব্দের উহ্য লাম-কে, استغراق لام বা সাকুল্যিক লাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এবং নাছ শব্দের অর্থ হইবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র মানব সমাজ। অর্থাৎ আয়াতের বর্ণিত তথ্যটি যেমন অতীত কালের মানব সমাজ সম্বন্ধে সত্য ছিল, বর্তমান যুগের মানব সমাজ সম্বন্ধেও তাহা সেইরূপ আছে এবং ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুক্কায়িত যুগ-যুগান্তরের জন্যও তাহা সেইরূপ সত্য হইয়া থাকিবে।

২। **টীকা ঃ নাফ্ছ=সত্তামূল**—আয়াতে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব সমাজকে পয়দা করিয়াছেন একই প্রকার 'সত্তা' হইতে। মূলে "নাফ্ছ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অভিধান হিসাবে, এই শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য হইতে পারে। যেমন—

(১) রূহ্ বা প্রাণ।

(২) দাম্ বা শোণিত।

"وسمى الدم نفسا' لان النفس التى هى اسم لجملة الحيوان' قيامها بالدم "

"এবং শোণিতকে নাফ্ছ বলা হয়, কারণ সমস্ত জীবের সাধারণ নাম হইতেছে যে "নাফ্ছ,' শোণিত হইতেই তাহার স্থিতি।"—মিছ্বাহুল-মুনীর।

(৩) প্রত্যেক বস্তু عين বা 'স্বয়ং' অর্থবাচক। যেমন তিনি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন, ইত্যাদি।

(৪) হাকীকাৎ, সত্তামূল বা essence, জীবন ধাতু, ইত্যাদি। কয়েক জন বিশিষ্ট তাফ্ছীরকার এই শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন جنس (genus) বা সমমূল সত্তা বলিয়া।

বিস্তারিত তাফ্ছীরের জন্য পরিশিষ্ট দেখুন।

৩। **টীকা ঃ সৃষ্টিগত সাম্য, আত্মীয়তার মর্যাদা**—আরহাম—রা'হম শব্দের বহুবচন। অভিধানিক অর্থ স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু বা (Womb)। রহম ও রা'হম একই রহমৎ মাছদার হইতে উৎপন্ন। আল্লাহ্র এক নাম রহমান। তাহারও মূল ধাতু হইতেছে রহমৎ। আল্লাহ্ নিজের রহমান নাম হইতে জরায়ুকে রা'হম নাম দিয়াছেন, এই মর্মের এক হাদীছ কুদছীও

আবু-দাউদে বর্ণিত হইয়াছে। ভাবার্থে আত্মীয়তা। আত্মীয়তার উদ্ভব হয় জনক ও জননী উভয়ের মধ্যবর্তিতায়। পিতৃ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা দুনিয়ার সকল সমাজে অল্পবিস্তর স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মাতৃ সম্পর্কে যে আত্মীয়-তার উদ্ভব হয়, ইছলামের পূর্বে দুনিয়ার কোনো জাতিই তাহাকে স্বীকৃতি দেয় নাই। কারণ মাতৃ-অধিকারকে বা নারীর অধিকারকে, অস্বীকার করাই ছিল প্রাক্-ইছলাম যুগের সকল সভ্য জাতির দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মীয় নির্দেশ। হাওয়া মূল পাপের প্রথম আধার; সুতরাং বিশ্বমানবের সমস্ত পাপ-তাপের প্রত্যয়-ভাগিনী আদমের কন্যাগণ মূলতঃ তাঁহারই গর্ভজাত, সুতরাং আদি জননীর ন্যায় তাঁহারা সকলেই হইতেছেন Devils gate betrayer of the tree, the first deserter of the Divine-Law—শয়তানের প্রবেশদ্বার, জ্ঞানবৃক্ষ সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতিনী, স্বর্গীয় বিধানের সর্বপ্রথম অমান্যকারিণী।" নারীর আত্মা বলিতে কিছু আছে কি-না, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইহাই ছিল খ্রীষ্টান জগতের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেণ্ট অ্যাণ্টনী, জেরোম, গ্রেগেরী, মিশিয়ান প্রভৃতি ধর্মযাজক ও আচার্যগণ সকলেই নারীকে শয়তানের অবলম্বন Scarpon everready to sting সদা দংশন-উন্মুখ বৃশ্চিক, The poison of asp, the malic of dragon. বলিয়া অভিসম্পাৎ করিয়াছেন। St. Augustin বলিয়া-ছেন—রমণী মাতৃরূপিণী হউক বা ভগ্নীরূপিণী হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না, we have to beware of Eve in every woman. প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মধ্যে ইভ বা হাওয়া বিদ্যমান আছে জানিয়া নারী সম্বন্ধে আমা-দিগকে সতর্ক হইতে হইবে।

হিন্দু ধর্মে নারী জাতির উপর স্থায়ী অত্যাচার চালাইয়া যাওয়ার যেমন দৃঢ় কঠোর ব্যবস্থা রচনা করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে মানুষ হিসাবে নারীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হইতেছে। "বিশ্বমানবের আদি সৃষ্টিকর্তা ভগবান মনু" বলিতেছেন—নারী প্রকৃতির যেসব জঘন্য স্বভাবের জন্য তাহারা ঘৃণ্য ও পরিবর্জনীয় হইয়াছে, সে সমস্তই হইতেছে "প্রজাপতি নির্মগজ" অর্থাৎ স্বয়ং প্রজাপতি বা বিধাতার সৃষ্টি'—সুতরাং তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। মনু-সংহিতা, নবম অধ্যায়, ১৪ হইতে ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। অবিবাহিতা হিন্দু নারী পিতা প্রভৃতি অভিভাবকের পণ্যদ্রব্য মাত্র। বিবাহেও তাহাদের সম্মতির দরকার হয় না। না হওয়ার যুক্তি সম্বন্ধে হিন্দু আইনের সু-বিখ্যাত লেখক গোপাল শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—"The Hindus, however, say that when one cannot have one's mother and father,

on's brother and sister, or any other relation, according to on's choice, why then should the person have a wife or a husband according to the person's own choice ? If all other dear and near relations are one's own without a choice, one may as well have a wife or a husband dear to oneself, though chosen by others."

হিন্দুরা বলেন: "মানুষ যখন নিজের পিতা-মাতা বা ভ্রাতা-ভগ্নিকে অথবা অন্য আত্মীয়কে নিজে নির্বাচন-করিয়া নিতে পারে না, সে অবস্থায় কেবল স্ত্রী বা স্বামী নির্বাচনের সময় তাহাকে এ অধিকার দেওয়া হইবে কি কারণে? যখন অন্য প্রিয় নিকট আত্মীয়গণকে তাহার নির্বাচন ব্যতিরেকে মানুষ আপনার করিয়া নিতে পারিতেছে, তখন অন্যের নির্বাচিত স্বামী বা স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই আপনার করিয়া নিতে পারিবে।"

এই আয়াতের প্রথম অংশে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব সমাজকে, নরনারী নির্বিশেষে একই মূল উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে নিকৃষ্ট বলিয়া অথবা আদমের বেঁকা হাড়ের পয়দায়েশ বলিয়া, তাহার প্রতি অবিচার-অনাচার চালাইয়া যাওয়ার কোনই সঙ্গতি নাই। এইরূপে দুনিয়ার সমস্ত মানবকে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতির দোহাই দিয়া, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো প্রকার স্থায়ী ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখারও কোনো কারণ নাই।

মানুষ যেমন সৃষ্টিগতভাবে অভিন্ন, সেইরূপ তাহারা সকলে জ্ঞান ও কর্মগত ভাবে, লক্ষ্য ও আদর্শগতভাবে এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে, এক অভিন্ন ও অবিভাজ্য মানব সমাজে পরিণত হইয়া, আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে দুনিয়াতে স্বর্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করুক, ইহাই হইতেছে কোর্‌আনের মর্মবাণী, ইহাই হইতেছে ইছলামের চরম পয়গাম ও আদর্শ। এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিয়া তোলার জন্য মোছলেম নামে এই ভ্রাতৃ সমাজের সৃষ্টি, এবং এই উদ্দেশ্যে একটা সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাই কোর্‌আন ও হাদীছের সকল আদেশ-নিষেধের ও সকল বিধি-ব্যবস্থার প্রাণবস্তুরূপে গৃহীত।

বলা বাহুল্য, একটা সুস্থ, সবল ও সচল সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে, সর্বাগ্রে আবশ্যক হয় পারিবারিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলার। ব্যক্তি-জীবন গঠনেরও স্বাভাবিক কারখানা হইতেছে পারিবারিক জীবনের এই সুমধুর ও সুকঠিন পরিবেশ। এই পারিবারিক জীবনকে সঙ্গতভাবে গঠন করার কতক-গুলি বাস্তব পদ্ধতি সূরা নেছার প্রথমদিকে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হইতেছে—আল্লাহ্ হইতেছেন তোমাদিগের কার্যকলাপের সদা পর্যবেক্ষক। অর্থাৎ তাঁহার আদেশ-উপদেশগুলির মর্যাদা হানি করা হইলে, কুদরতের অটল কানুন অনুসারে তোমাদের জীবন বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে, তোমরা লক্ষ্য সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়িবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হইয়া আল্লাহ্‌র খেলাফতের ভার বহনে অযোগ্য প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং জাতি হিসাবে তোমাদের অস্তিত্বের আর কোনো স্বার্থকতা থাকিবে না, আবশ্যকতাও থাকিবে না।

৪। **টীকাঃ এতীমদিগের ধন-সম্পত্তি**—ইয়াতীম—পিতৃহীন বালক, একবচন। বহুবচনে উভয় আয়তাম ও ইয়াতামা।

ইয়াতীমা—পিতৃহীন বালিকা ; একবচন। বহুবচনে শুধু ইয়াতামা। পূর্বে এতীম ছিল এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তাহার সে সময়কার স্বার্থ সম্বন্ধ বহুক্ষেত্রে বজায় থাকে বলিয়া বালেগ হওয়ার পরেও তাহাদিগকে এতীম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। (কামুছ, নেহায়া, রাগেব প্রভৃতি)।

পিতার মৃত্যুর পর এতীমদিগের বিষয়-সম্পত্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হয় তাহাদের অলি বা অভিভাবকগণের উপর। অনেক সময় দেখা যায়, যে, অভিভাবকগণ সেই সব গচ্ছিত বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে এতীমদিগের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন না।

সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, এতীমরা বালেগ হইয়া গেলেও অভিভাবকগণ নানা প্রকার টালবাহানা করিয়া এতীমদিগকে তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে অসম্মত হন। ইহা ছাড়া অনেক সময় এওজ ফের করার অছিলায়, নিজেদের নিকৃষ্ট সম্পত্তি এতীমকে দিয়া তাহার বদলে এতীমের ভাল সম্পত্তি গ্রাস করিয়া নেন। কোনো কোনো অভিভাবক আবার এতীমদের সম্পত্তি ও তাহার আয়কে নিজেদের সম্পত্তির সঙ্গে এজমালে ভোগ-দখল করিতে থাকেন। এতীম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখা যায়, তাহার সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অন্ততঃপক্ষে সম্পত্তির উদ্বৃত্ত আয়ের কিছুই প্রায়ই এতীমের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। কোর্‌আনে উদাহরণ হিসাবে মাত্র তিনটি ব্যাপারের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর আরও নানা প্রকার কৌশল অবলম্বিত হইতে পারে। কোর্‌আন এই শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতাকে حوبا كبيرا কবীরা গোনাহ্ বা মাহা-পাতক বলিয়া মুছলমানদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ দিতেছে।

ইহা যে কত বড় মহাপাতক, একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ. এই শ্রেণীর তঞ্চক ও খিয়ানৎ সকল ক্ষেত্রেই অন্যায়, সুতরাং

এতীমদের সম্বন্ধে তাহা শতগুণ অধিক আপত্তিজনক। দ্বিতীয়তঃ, এই এতীমগুলি অভিভাবকগণের অতি নিকট-আত্মীয়, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছুল কর্তৃক এইসব অলি ও অভিভাবকগণের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। তাহারা ও তাহাদের বিষয়-সম্পত্তিগুলি অভিভাবকদিগের নিকট আমানৎরূপে গচ্ছিত রহিয়াছে। এ অবস্থায়, আল্লাহ্ ও রাছুলের গচ্ছিত আমানতে খিয়ানৎ করিতে সাহসী হয় যে ব্যক্তি, নিজের দুস্থ ও নিঃসহায় নিকটাত্মীয়ের প্রতি করুণা, সহানুভূতি ও সৌজন্যের পরিবর্তে তঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সমর্থ হয় যে অভিভাবক, তার চাইতে বড় মহাপাতকী আর কে হইতে পারে ?

৫। **টীকাঃ এতীমাকে বিবাহ করা**—এতীমদিগের উপর অনুষ্ঠিত একটা অত্যাচারের কথা পূর্ব আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিয়া অভিভাবকেরা এতীমদিগের বিষয়-সম্পত্তিগুলি গ্রাস করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করার পর, এতীমা বা পিতৃহীনা কুমারীদিগের একটা অতি শোচনীয় দুর্ভোগের উল্লেখ এই আয়াতের প্রথমভাগে করা হইয়াছে।

বিশ্বস্ত ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানা যাইতেছে যে, সূরা নেছা নাজেল হওয়ার পর্ব পর্যন্ত, পিতৃহীনা কুমারী কন্যারা তাহাদের অলি বা নিকট-বন্ধুদিগের দ্বারা নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছিল। এতীমা সম্পত্তির অধিকারিণী ও রূপবতী হইলে, অভিভাবক, (যেমন, চাচাতো ভাই) তাহাকে বিবাহ করিয়া নিতেন, অথচ তাহার প্রাপ্য মোহর ও খোরপোশ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। অনেক সময় এতীমার বিষয়-সম্পত্তির শরীকও অভিভাবকেরা হইতেন। বিবাহের পর সে সম্পত্তিতে এতীমার বস্তুতঃ কোন প্রকার দখল-অধিকার থাকিত না। পক্ষান্তরে এতীমা সুশ্রী না হইলে, অভিভাবক নিজে তাহাকে বিবাহ করিতেন না এবং শরিকী সম্পত্তি পরহস্তগত হওয়ার ভয়ে অন্যের সহিত তাহার বিবাহ হইতেও দিতেন না। তখন তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বন্দিনীর অবস্থায় এই অভিশপ্ত জীবনের বোঝা বহিয়া চলিতে হইত। বিবি আয়েশা ও ছাহাবী এবন-আব্বাছ প্রভৃতি এই শোচনীয় পরিস্থিতির বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।। (বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, নাছায়ী, তায়ছীর তাফ্ছীর প্রভৃতি।)

আয়াতের এই অংশে মুছলমান জাতিকে সাধারণভাবে এবং এতীমের অভিভাবকদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইতেছেঃ তোমর যখন মনে মনে বুঝিতেছ যে, এতীমাদিগের প্রতি তোমরা সুবিচার করিবে না, বা করিতে পারিবে না, তখন তাহাদিগকে রেহাই দিয়া দুনিয়ার অন্য যে কোন (বৈধ) স্ত্রীলোককে বিবাহ কর। অর্থাৎ এই শ্রেণীর অভিভাবকদের পক্ষে

এতীমা বিবাহ করা ধর্মতঃ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

"এতীমাদিগকে বিবাহ করা" বস্তুতঃ অসম্ভব বলিয়া এক শ্রেণীর আলেম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতে, বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পিতৃহীন কুমারীদিগের বিবাহই বৈধ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আইনের পরিভাষা অনুসারে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর আর কাহাকেও এতীম বলা যায় না। আমার মতে, এই বাদবিতণ্ডার এখানে কোনো সার্থকতা নাই। আরবী ভাষায় এবং বস্তুতঃ দুনিয়ার প্রত্যেক উন্নত ভাষায়, দুই প্রকার শব্দার্থ গ্রহণ করার নিয়ম আছে। প্রথম, মূল বা ধাতুগত অর্থ—আরবীতে যাহাকে বলা হয় (حقيقت) হাকিকৎ। দ্বিতীয়, মূলের বিকল্পার্থ। মূল অর্থ গ্রহণ অসম্ভব ও অসঙ্গত হইলে, উপক্রম-উপসংহার অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ অনুসারে গৃহীত অর্থ—আরবীতে ইহাকে বলা হয় (مجاز) মাজাজ। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এই দুইটিকে যথাক্রমে অভিধা ও লক্ষণা শক্তি এবং ব্যঞ্জনা শক্তি বলা হয়। ইহা কাব্যের প্রাণবস্তু স্বরূপ। আরবী ভাষা ও ইছলামী সাহিত্যে হাকিকৎ ও মাজাজের এই আলোচনা যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, অভিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন।

সাহিত্যের সাধারণ ধারা অনুসারে কোর্‌আন মাজীদের নানা স্থানেও মাজাজ বা ব্যঞ্জনা অর্থে অনেক শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। হাফেজ জালালুদ্দীন ছায়ূতী প্রমুখ বহু বিজ্ঞ লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ছায়ূতী "এৎকান" পুস্তকে একটি স্বতন্ত্র (৫২) অধ্যায়ে কোর্‌আনে গৃহীত মাজাজ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

বালাগাৎ বা অলঙ্কার শাস্ত্রে মাজাজের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ইহার একটি হইতেছে অতীতের বা ভবিষ্যতের অবস্থা হিসাবে কোনো বস্তুর নামকরণ,—مجاز ماكان و مجاز مايول যেমন, কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার পরও আমরা বলি—দারোগা ছাহেব, কাজী ছাহেব ইত্যাদি। এইরূপ আরবী মাদ্রাছার ছাত্রদিগকে বলি মৌলবী ছাহেব, হজ্জ যাত্রীদিগকে বলি হাজী ছাহেব। কারণ, প্রথম শ্রেণীর লোক অতীতে দারোগা বা কাজী ছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ভবিষ্যতে মৌলবী বা হাজী হইবেন। এখানেও বিবাহযোগ্যা কুমারীদিগকে "এতীমা" বলা হইয়াছে ঠিক এই হিসাবে। (এৎকান ২—৩৭)।

কোর্‌আনে মাজাজের ব্যবহার সম্বন্ধে বহু উদাহরণ আলেম সমাজ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেগুলির উল্লেখ না করিয়া, আমি উপরের (২য়) আয়াতটির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এখানে অনাবিল ভাষায় এতীমা-

দিগকে তাহাদের বিষয়-সম্পত্তিগুলি ফিরাইয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, বালেগ হওয়ার পূর্বে সম্পত্তি ফিরাইয়া পাওয়ার অধিকার তাহাদের জন্মে না। পক্ষান্তরে বালেগ হওয়ার পর আর সে এতীম থাকিতেছে না। সুতরাং আপত্তিকারীদের মত অনুসারে অভিভাবকরাই চিরদিন এতীমের সম্পত্তির অলি-অছি হইয়া থাকিবে। কারণ,

(ক) সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত এতীমকে তাহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

(খ) সাবালেগ হওয়ার পর সে আর এতীম থাকে না।

(গ) অথচ কোর্আনে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে বলা হইয়াছে এতীমকে— অ-এতীমকে নহে।

(ঘ) মূল প্রাপক এখন আর এতীম নহে—সুতরাং সে আর সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইতে পারে না।

ইহা কদর্থ এবং ইহার ন্যায় আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে উপস্থাপিত বিতণ্ডা হঠকারিতা মাত্র। এখানে বলা হইতেছে—

و آتوا اليتامى اموالهم اے الذين كانوا يتامى—اتقان ب ٢ ح ٣ ج ٣

"এতীমদিগকে তাহাদের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কর—অর্থাৎ যাহারা এতীম ছিল, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর।"—এৎকান ৩৭।

বিবাহের শর্ত ও সংখ্যা—বিবাহের প্রথম ও প্রধান শর্ত হইতেছে নারীদিগের প্রতি সুবিচার। এই হিসাবে অভিভাবকদিগকে বলা হইতেছে, এই নীতির ব্যত্যয় ঘটার আশঙ্কা থাকিলে, সমাজের আর সকলের ন্যায় অন্য স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পার। এখানে বিবাহের সংখ্যা নির্ধারিত করিয়া বলা হইতেছে যে, মুছলমান চারিটা পর্যন্ত স্ত্রী এক সময় গ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ এক সময় চারিটার অধিক স্ত্রী রাখিতে পারিবে না। দুই দুইটা; তিন তিনটা ও চার চারটা—অর্থে দুইটা করিয়া, তিনটা করিয়া, চারটা করিয়া।

আয়াতে দুইটা, তিনটা, চারটা—এই শব্দ তিনটির মধ্যে و ওয়াও বর্ণ ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহার অর্থ হয় 'এবং'। কিন্তু আরবী ব্যাকরণে ইহার ব্যতিক্রমেরও নিয়ম আছে। এই ব্যতিক্রমের ফলে ওয়াও বর্ণ او আও (অথবা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম বৈধ বা আবশ্যক হইবে, তাহার নিয়মও নির্ধারিত হইয়া আছে। ইহার মধ্যকার প্রথম ও প্রধান নিয়ম—

و قد تخرج الواو عن افادة مطلق الجمع ' و ذالك على اوجه - احدها ان تستعمل بمعنى او و ذالك فى التقسيم - نحو الكلمة اسم و فعل و حرف - موارد ص ١٣١٧

অর্থাৎ مطلق جمع বা সাকুল্যিক বহুবচনের পর্যায় হইতে ওয়াও কখনও কখনও বাহির হইয়া যায়, এবং এই ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে কয়েক প্রকারে। প্রথম, যেখানে ওয়াও واو আও او (= এবং অথবা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং ইহা সংঘটিত হয় বিভাগ করা সম্বন্ধে। যেমন বলা হয়—কলেমা বা শব্দ হইতেছে —এবং এছম (বিশেষ্য), ফে'ল (ক্রিয়া) ও হরফ (অব্যয়)। এছম স্বতন্ত্রভাবে একটি কলেমা, ফে'ল স্বতন্ত্রভাবে একটা কলেমা এবং হরফ স্বতন্ত্রভাবে একটা কলেমা। واو বা এবং ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে না, যে, এছম, ফে'ল, হরফই একত্রে কলেমা, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে কলেমা নহে।

আলোচ্য আয়াতে বৈধ স্ত্রীর সংখ্যাকে ৪ স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। দুইটাও বৈধ, তিনটাও বৈধ, চারটাও বৈধ—ইহাই এই আয়াতের তাৎপর্য। এই সংখ্যাগুলির সাকুল্যিক যোগফল এক্ষেত্রে ইহার তাৎপর্য হইতে পারে না—।

ছুদ্দী নামক তাফ্‌ছীরের জনৈক রাবী এবং তাঁহার একজন অনুসরণকারী এখানে নানা প্রকার ভাষাগত বিতণ্ডা উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন। যেমন—

(১) আলোচ্য আয়াত হইতে স্ত্রীসংখ্যার সীমা নির্ধারণ সপ্রমাণ হয় না।

(২) আয়াতে স্ত্রীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও চারে সীমাবদ্ধ করার কোনো প্রমাণ আয়াতে নাই। কারণ আয়াতে "ওয়াও" ব্যবহার করা হইয়াছে, সুতরাং এবারতের সমষ্টিগত সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে এই সংখ্যা নয় দাঁড়ায়, ১৮ পর্যন্ত যাইতে পারে।

(৩) চার-সংখ্যা নির্ধারণ সম্বন্ধে যেসব হাদীছ পেশ করা হয়, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, (ক) এগুলি হইতেছে خبر و احاد ইহা দ্বারা কোর্‌-আনের সিদ্ধান্ত মনছুখ হইতে পারে না। (খ) রাছুলুল্লাহ্‌র আমল অনুসারে নয়টি স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রমাণিত হইতেছে।

আমার মতে ছুদ্দী প্রভৃতির এই সব বক্তব্য প্রমাণহীন; বরং প্রমাণের বিপরীত কথা। এই অভিমতের সমর্থনে দুইটি প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

১ম প্রমাণ:— واو বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে او অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২য় প্রমাণ:—বিভিন্ন বিশ্বস্ত হাদীছ হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হইতেছে যে, এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর হযরত রাছুলে কারীম নিজের ছাহাবিগণকে

চারের অধিক স্ত্রী বর্জন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেমতে তাঁহারা চারিজন স্ত্রী রাখিয়া অবশিষ্টদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। উদাহরণ হিসাবে তিনজন বিশিষ্ট ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি —

عن ابن عمر ' ان غيلان بن المسلمة الثقفى السلم و له عشرة نسوة فى الجاهلية فا سلمن معه ' فقال النبى صلى الله عليه و سلم امسك اربعا و فارق ساير هن - رواه احمد - و الترمذى - وابن ماجة -

(১) আবদুল্লাহ্-এবন-ওমর বলিতেছেন—গীলান-এবন-ছালাম ছাকাফী ইছলাম গ্রহণ করিলেন। প্রাক্-ইছলাম যুগে তাঁহার দশটি স্ত্রী ছিল, তাঁহারাও মুছলমান হইয়াছিলেন। অতঃপর হযরত রাছুলে কারীম গীলানকে বলিলেন —উহাদের মধ্য হইতে চারিটিকে রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে পরিত্যাগ কর। (আহমদ, তিরমিজী ; এবন-মাজা)।

عن نوفل ابن معاوية قال اسلمت و عندى خمسة نسوة فسالت النبى صلى الله عليه وسلم - قال فارق واحدة وامسك اربعا - فعمدت الى اقدمهن صحبة عندى عاقر منذ ستين سنة' ففارقتها - (رواه الشافعى فى مسنده' ايضآ رواه فى شرح السنة)

(২) নওফল-এবন-মাআভীয়া বলিয়াছেন, আমি যখন মুছলমান হই, তখন আমার পাঁচ স্ত্রী বিদ্যমান। তখন আমি হযরত রাছুলে কারীমকে (এ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : একটিকে আলাহিদা করিয়া দেও, বাকী ৪টা রাখিয়া লও। সেমতে আমি আমার বৃদ্ধা ও ষাট বৎসরের বন্ধ্যা স্ত্রীকে বর্জন করিলাম। (মাছ্‌নাদে শাফেয়ী, শার্হে ছ ছোন্না)

عن قيس بن حرث قال اسلمت وعندى ثمان نسوة فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال "اختر منهن اربعآ - ابن ماجة -

(৩) কায়েছ-এবন-হারছ্ বলেন, আমি যখন মুছলমান হই, তখন আমার আটটি স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আমি হযরত রাছুলে কারীমের খেদমতে উপস্থিত হইয়া কিংকর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। হযরত উত্তরে বলিলেন : উহাদিগের মধ্য হইতে চারিটি রাখিয়া নেও। (এবন-মাজা)

এইগুলি ও এই শ্রেণীর হাদীছগুলি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আলোচ্য আয়াতটি নাজেল হওয়ার পর হইতে, ছাহাবীরা হযরত রাছুলে

কারীমের নির্দেশ মতে, চারের অধিক স্ত্রীকে অবৈধ বলিয়া বর্জন করিয়াছেন। যতগুলি "Reported case" এযাবৎ জানা গিয়াছে, তাহার একটিতেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে না।

হযরত রাছুলে কারীমের সময়ে, খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন যুগে, ছাহাবিগণের জীবনকালে কোনও মুছলমান কস্মিনকালে চারের অধিক বিবাহ করিয়াছে, ইহার একটি নজীরও কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার সম-সাময়িক যুগটাই হইতেছে আরবী সাহিত্যের পরম উৎকর্ষের যুগ। বহু সুবিজ্ঞ সাহিত্যিক এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি সেযুগে ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে জীবিত ছিলেন ; আরবী সাহিত্যের যে নিগূঢ় তথ্যটি ছুফী ছাহেব পরে আবিষ্কার করিলেন, তাহা কি এই সাহিত্যিকগণের কাহারও জানা ছিল না ? জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা, কোর্‌আন যাঁহার উপর নাজেল হইয়াছিল, নিজে বুঝিবার ও উম্মতকে বুঝাইবার জন্য, তিনিও কি কোর্‌আনের একটা ওয়াও বর্ণের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সঙ্গত তাৎপর্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ? তিনিও কি উম্মতকে আয়াতের ভুল তাৎপর্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ?

মোটের উপর কথা এই যে, মুছলমান জাতি যখন হইতে ইছলামের সত্য আদর্শ হইতে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, বাদশাহাৎ আসিয়া যখন হইতে খেলাফতের স্বচ্ছন্দ অধিকার করিয়া বসিল এবং আলেম ও ফকিহ্‌গণ যখন হইতে বাদশাহী দরবারের খেল্‌আৎ ও অজীফাকে জীবনের প্রধান কাম্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, স্খলিত চরিত্র নওয়াব বাদশাহ-দিগের এবং দুরাচারী আমিরগণের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহারা নিজের ঈমানের বা স্বাধীন চিন্তার প্রতি সেই হইতে চরম অনাচার করিতে আরম্ভ করেন। কালক্রমে তাঁহাদের সেই হীনমন্যতা বিভিন্ন মজহাবের ফেকা শাস্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

ইহার পর হাদীছের দ্বারা কোর্‌আনের আদেশ-নির্দেশ মানছুখ বা রদ হওয়ার কথা। আমার মতে, এই আলোচনার মূলে কোন সঙ্গতি নাই। কারণ, কোর্‌আনের নির্দেশের সহিত এই সমস্ত হাদীছের কোনো বৈপরীত্য বা বিরোধ নাই। কোর্‌আন যাহা বলিয়াছে, হাদীছেও ঠিক সেই কথা বলা হইতেছে। পক্ষান্তরে কোনো শ্রেণীর হাদীছের দ্বারা কোর্‌আনের আদেশ নির্দেশ বারিত হইতে পারে-না-পারে আমার মতে এ প্রশ্নটাই হইতেছে মূলতঃ অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। কোর্‌আন আল্লাহ্‌র কালাম। এই কালামকে

প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার উপর, তাহার কোন অংশকে বারিত ও রহিত করার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। বরং দৃঢ় ভাষায় ও স্পষ্টক্ষারে তিনি ইহার প্রতিবাদই চিরদিন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রাছুলের হাদীছ বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে সব হাদীছ, তাহার কোনো একটির সহিতও কোর্‌আনের কোন আয়াতের বিরোধ বা contradiction ঘটে নাই, ঘটিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে রাছুলে কারীমের সকল কার্য ও সমস্ত বাণী কোর্‌আনেরই বাস্তব প্রকাশ-রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। রাছুলের উক্তিগুলিও ওহী। আল্লাহ্‌ বলিতেছেন :— وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى "আমার রাছুল নিজের খেয়াল অনুসারে (ধর্ম সম্বন্ধে) কোনো কথা বলেন না, সেগুলি তো আল্লাহ্‌র হুজুর হইতে প্রেরিত ওহী বই আর কিছুই নয়।"

৬। **টীকা ঃ ওয়াহেদোতান, মাত্র একজনকে**—এক বিবাহ ইছলামের আদর্শ ; আর একাধিক বিবাহ হইতেছে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। আলোচ্য আয়াতে এই ব্যতিক্রমের অনুমতি দেওয়া হইতেছে এবং তাহাও অনধিক চারিটা পর্যন্ত। প্রথমে বলা হইয়াছে যে, এই সূরা নাজেল হইয়াছে ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তীকালে। ওহোদ যুদ্ধের ফলে যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারের বিধি-ব্যবস্থাগুলিই এই সূরার প্রধান আলোচ্য। ইতিহাসের পাঠকগণ অবগত আছেন, এই যুদ্ধে মদীনার যুদ্ধক্ষম মুছলমানরা প্রায় সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মোট সাতশত মাত্র। এই যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন ৭০ জন মুছলমান। অর্থাৎ মোছলেম-মদিনার পুরুষ-শক্তির শতকরা দশভাগ এই যুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আহত ও অকর্মণ্যদের সংখ্যা অধিকন্তু। কাজেই, এই যুদ্ধের ফলে স্থানীয় মোছলেম পরিবারগুলিতে একই দিনে বিধবা ও এতীমের সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আরও বহু যুদ্ধ-বিগ্রহও তখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়।

একাধিক বিবাহ করার যে অনুমতি আয়াতে দেওয়া হইয়াছিল, এই পরিস্থিতিটাও তাহার একটা কারণ হইতে পারে। কিন্তু ইহা তাহার একমাত্র কারণ কখনই নয়। ইহা ব্যতীত কোর্‌আনের কোনো আদেশ-নিষেধের কোনও উপলক্ষ, কারণ বা مورد নির্দিষ্ট হইলেও, তাহার হুকুম বা সিদ্ধান্ত যে সাধারণভাবে সর্বত্র বলবৎ হইবে, ইহা একটা সর্ববাদী সম্মত নিয়ম। ফলতঃ এখানেও

কোর্‌আনের আদেশকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে হউক, সামাজিক অবস্থার তাকিদে হউক, জাতির মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হইলে—এবং সকলের প্রতি যথাযথ ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে—মুছলমান পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে।

ইছলামকে আল্লাহ্ فطرة الله বা প্রাকৃতিক ধর্ম বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই বিশেষণটা যে সর্ববভাবে সত্য, অবস্থা বিশেষে একাধিক বিবাহের এই অনুমতিটা তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই অনুমতি শুধু পুরুষ সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য দেওয়া হয় নাই, নারী সমাজের মঙ্গলের জন্যও অনেক সময়ে স্বামীর পক্ষে অন্য বিবাহের দরকার হইয়া থাকে। কথাটা একটু নিঃসঙ্কোচে বলিতে হইতেছে। কারণ জাতির মঙ্গল-ভবিষ্যৎ রচনার দিক দিয়া ইহা খুবই আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যৌবন-সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নারীর সম্মুখে প্রথম "আপদ" উপস্থিত হয়, মাসিক ঋতুকাল। প্রতি মাসে পাঁচ-সাত দিন করিয়া এই ঋতুকালের অবস্থান। এ সময় স্ত্রী-সহবাস সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। প্রসবের পর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রসূতির দেহ নানা প্রকার রোগ ও অশুচির আকরে পরিণত হইয়া যায়। ইছলামের ব্যবস্থায় এই অশৌচের মিয়াদ অন্ততঃ ৪০ দিন। ধর্ম ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান উভয়ের মতে এই সময়, স্বামীর পক্ষে স্ত্রী-সহবাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নামাজ ও রোজার চাইতে বড় ফরজ ইছলামে আর কিছুই নাই। কিন্তু নারীর জন্য মাসিকের সময় নামাজ সম্পূর্ণ মাফ, রোজা অন্য সময় শোধ দেওয়া যাইতে পারে। প্রসবের পর ৪০ দিন বা নেফাছের সময় নামাজ রোজা উভয়ই মাফ।

নারী জীবনের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটের সময় হইতেছে, তাহার গর্ভধারণের, বিশেষতঃ প্রসবের ও তাহার পরবর্তী সময়। মায়ের মর্যাদা বুঝাইবার জন্য কোর্‌আনে সন্তানদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে—"কত কষ্টে জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে আর কত কষ্টে সে তাহাকে প্রসব করিয়াছে,—তাহাকে ধারণ করা হইতে তাহার দুগ্ধ ত্যাগ পর্যন্তকার মুদ্দৎ চলিতে থাকে (দীর্ঘ) ত্রিশ মাস" গর্ভবতী নারী কত প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, আয়াতে মানুষকে তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। নারী জননীরূপে এই সময় যেসব ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, সন্তানের ধাত্রী দুগ্ধদাত্রীরূপে তাহাকে যে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তোমার সন্তানের গর্ভধারিণী ও ধাত্রী হিসাবে তোমার স্ত্রীকেও ঠিক সেইরূপ ক্লেশ ও কর্মভোগের মধ্য দিয়া তোমার বংশ রক্ষায় ব্রতী থাকিতে হয়। এই সব সময়ে এমন কতকগুলি অবস্থা উপস্থিত হওয়া খুবই

স্বাভাবিক, যখন পুরুষকে স্বাগতম জানাইবার মত তার শক্তিও থাকে না, আসক্তিও থাকে না। ইহা ব্যতীত নানা প্রকার স্ত্রীরোগ ও সাধারণ রোগ ও তাহার মারাত্মক ফল তো আছেই।

পুরুষকে অনেক সময়ই এই সব স্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়, এবং সত্য কথা এই যে, পুরুষ সমাজের অনেকের পক্ষে এরূপ পরিস্থিতিতে আত্মসংযম করিয়া চলাও সব সময় সম্ভব হয় না। ইহার ফল যে কিরূপ মারাত্মক হইয়া থাকে, কোনো সংসারী মানুষকে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এ অবস্থায় যদি সাধারণভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোনো স্বামী কোনো অবস্থাতে একাধিক বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে সে নির্দেশ হইবে স্বভাবধর্মের বিপরীত একটা অনাচার। পক্ষান্তরে, এই নির্দেশের নির্গলিত অর্থ হইবে, পুরুষ সমাজকে অবাধ ব্যভিচারের অনুমতি দান। পাশ্চাত্য দেশের সমাজ জীবনে নানা দিক দিয়া ও নানা আকার-প্রকারে যেসব জঘন্য অনাচার ব্যাপকভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ এই অনাচারের ফল।

এই প্রসঙ্গে পুরুষ সমাজের জানিবার ও বুঝিবার অনেক কথা আছে। সূরার প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, স্বামী ও স্ত্রীর উপর পরস্পরের দাম্পত্য স্বত্বাধিকার বর্তিয়া থাকে—আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট নীতি ও তাঁহার প্রবর্তিত আইন-কানুন অনুসারে। বিবাহিত জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র কেতাবে বলা হইতেছে—"তাহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি (নিদর্শন) এই যে, তিনি মানব সাধারণকে একই মূল উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই উপাদান হইতেই তোমাদের দম্পতি যুগলকে পয়দা করিয়াছেন—যেহেতু তোমরা (=স্বামী-স্ত্রীরা) পরস্পরের সংস্রবে শান্তিলাভ করিবে, এবং (এই জন্যই) তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি (প্রতিষ্ঠিত) করিয়া দিয়াছেন; নিশ্চয় এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলিতে চিন্তাশীল সমাজের জন্য অনেক তথ্য নিহিত আছে।" (রূম ২১, মর্মানুবাদ)।

এই প্রেম ও প্রীতিই হইতেছে বিবাহিত জীবনের সবচাইতে বড় সম্বল, সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রূপজ মোহ বা কামজ লালসা প্রেম নহে। প্রেমের স্থান ইহা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। মোহ ও লালসা ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থধর্মী এবং পাশবিক সুখসর্বস্ব। পক্ষান্তরে, প্রেম হইতেছে নিজেকে খোওয়াইয়া, বিলাইয়া, প্রেমাস্পদে তন্ময় তদগত হইয়া যাওয়ার মানসিকতার নাম। আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের সকল সময় এই মহান আদর্শের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভবপর হইয়া উঠে না, ইহা খুবই ঠিক কথা। কিন্তু, মানবজীবনের সব সত্য ও মহান আদর্শ

সম্বন্ধেও তো এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই বলিয়া মানব সমাজ যদি আদর্শ সাধনা হইতে বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার জীবনে ও বন-জঙ্গলের পশুজীবনে আর কিছু পার্থক্য থাকে না। সাধ্যাতীত কোনো কিছু করার দায়িত্ব আমাদিগের উপর অর্পিত হয় নাই। সাধ্যায়ত্তটুকুই যদি পালন করিয়া চলি, তাহা হইলেও যথেষ্ট উপকার লাভ করা যাইতে পারে। কবিতার মানসী নয়, দুনিয়ার যে মানবীকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসিয়াছি, আমার ও আমার সন্তান-সন্ততিদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে যে নিজের জীবন-যৌবনকে কোরবান করিয়াছে, তাহার মুখ চাহিয়া পাঁচ দশটা বৎসর আত্মসংযম করিয়া থাকা, ভোগের পরিবর্তে সেবার প্রসাদে আত্মনিয়োগ করা খুবই সম্ভব এবং অতিশয় আনন্দদায়ক। সত্যকার প্রেমের আস্বাদ উভয় পক্ষ কেবল এই সময়ই লাভ করিতে পারে। ইহা কল্পনা নয়, বাস্তব জীবনের মধুর অভিজ্ঞতা।

৭। **টীকা: দক্ষিণ হস্তের অধিকার**—মূলে "আয়মান" শব্দ আছে। একবচন ইয়ামিন। ইহার মৌলিক অর্থ:—(১) দক্ষিণ হস্ত, (২) হলফ, একরার, কোনো চুক্তি সম্বন্ধে পক্ষদের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি। কোনো কোনো আধুনিক লেখক ইয়ামিন শব্দকে এখানে চুক্তি-অর্থে গ্রহণ করিতে এবং সেই চুক্তি-অর্থে বিবাহের চুক্তি ও তৎসংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। দাসী-বাঁদীদের প্রসঙ্গকে এড়াইয়া যাওয়াই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। আমার মতে তাঁহাদের যুক্তিবাদের মূলে কোনও সঙ্গতি নাই এবং এসম্বন্ধে তাঁহাদের কষ্টকল্পনাগুলির দরকারও বিন্দুমাত্র নাই।

ইছ্লাম দাস প্রথার সমর্থন করে নাই, বরং এই বিশ্বব্যাপী অনাচারকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষে উৎখাত করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে সকল প্রকারের বাস্তব ও সক্রিয় উপায় অবলম্বন করিয়াছে। দাসী-বাঁদীদিগকে বিবাহ করার এই নির্দেশ, তাহারই মধ্যকার একটা অন্যতম উপায়। মানুষ হিসাবে সমাজে যাহার স্থান ছিল না, নারী হিসাবে কুত্রাপি যাহার কোনো অধিকার ছিল না —এই নির্দেশের দ্বারা কোর্আন সেই বাঁদীকে বিবির আসনে বসাইয়া দিয়াছে।

একশ্রেণীর আলেম মনে করেন যে, দাসী-বাঁদীকে বিবাহ করার নির্দেশ এ আয়াতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, দাসী-বাঁদীদিগকে, মালেকানা স্বত্বাধিকারের বলে, যথেচ্ছভাবে সম্ভোগ করা যাইতে পারে, সেজন্য বিবাহের দরকার হয় না। আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিমত ইছ্লামের সাধারণ আদর্শ ও কোর্আন প্রবর্তিত বিশেষ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটা অপসিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা

হইতেছে—তোমরা স্বাধীনা নারীদিগকে বিবাহ করিবে—

(১) দুই দুইটা করিয়া, বা
(২) তিন তিনটা করিয়া, বা
(৩) চার চারটা করিয়া, বা (অবস্থা বিশেষে)
(৪) একটা মাত্র, বা
(৫) বাঁদী-দাসীদিগকে।

ফলতঃ এই প্রকারগুলি সমস্তই "বিবাহ করিবে" এই একই ক্রিয়া পদের অধীনে বর্ণিত হইয়াছে এবং বাঁদী-দাসীদিগের প্রশ্নকে এই ব্যাপক নির্দেশের আমল হইতে বর্জিত করার একটু সামান্য ইঙ্গিতও আয়াতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এই ব্যতিক্রমের কোনো হেতু নাই।

কেহ কেহ বলেন—নেকাহ্ শব্দের অর্থ বিবাহ ও সঙ্গম উভয় হইতে পারে। বিশেষতঃ মূলতঃ ইহার অর্থ হইতেছে সহবাস, বিবাহ ইহার গৌণার্থ মাত্র। সুতরাং এ হিসাবে দাসী-বাঁদীদিগকে "নেকাহ্ করিতে পার"—পদের তাৎপর্য হইবে—"বিনা বিবাহে ইহাদিগের সহিত সহবাস করিতে পার।" আমার মতে এই যুক্তিটি সরাসরিভাবে 'ডিসমিস' করার যোগ্য। কারণ "নেকাহ্-অর্থে শুধু সহবাসও হইতে পারে"—এই যুক্তি অনুসারে, দাসী-বাঁদীর বেলায় বিবাহের শর্ত যদি উঠিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে অন্য স্ত্রীলোকদিগের সময়েও এই যুক্তি অনুসারে বিবাহ অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, সবগুলিই ।انكحوا। বা "বিবাহ কর" ক্রিয়া পদের কর্ম। তাহার পর, নেকাহ্ শব্দের মৌলিক অর্থ যে সহবাস, ইহাও অসঙ্গত দাবী।

ইমাম রাগেব বলিতেছেন —

اصل النكاح للعقد- ثم استعير للجماع ومحال ان يكن فى الاصل للجماع—لان اسماء الجماع كلها كنايات لايكون ستقبا حهم ذكره الخ -

"মূলতঃ নেকাহ্ শব্দের অর্থ হইতেছে বিবাহ, তাহার পর সঙ্গম সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে গৌণার্থে। নেকাহ্ শব্দের মৌলিক অর্থ "সঙ্গম" বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। "জেমা" বা নরনারীর যৌন সংস্রব সম্বন্ধে আরবী ভাষায় যতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সমস্তই কেনায়া বা Metaphore, হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, সাধারণ শালীনতা বোধের জন্য আরব জাতি এ বিষয় কোনো স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করাকে অসঙ্গত বলিয়া মনে করিত।"

স্বাধীনা নারীদিগের সহিত সংস্রব করার জন্য যেমন বিবাহের দরকার, দাসী-বাঁদীর সহিত সহবাস করার অধিকার লাভের জন্যও যে ঠিক সেইরূপে বিবাহের আবশ্যকতা আছে, এ সম্বন্ধে হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম ও মোজতাহেদ আবু বাক্‌র রাজীর একটি সিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। ইমাম ছাহেব এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন —

(او ما ملكت ايمانكم) ·ضميره او فانكحوا ما ملكت ايمانكم' وذلك النكاح هو العقد' فالضمير الراجع اليه ايضاً هو العقد دون الوطء - فان قيل لما صلح ان يكون النكاح اسما للوطء ثم عطف عليه قوله (او ما ملكت ايمانكم) صار كقوله فانكحوا ما ملكت ايمانكم فيكون معناه الوطء فى هذا الموضع' وان كان معناه العقد فى اول الخطاب - قيل له لايجوز هذا' لانه اذا كان ضميره ما تقدم ذكره بديا فى اول الخطاب' فوجب ان يكون بعينه و معناه المراد به ضميرا فيه' فاذا كان النكاح المذكور هو العقد فكانه قيل فاعقدوا عقدة النكاح فيما طاب لكم فاذا اضمره فى ملك اليمين' كان الضمير هو العقد' اذ لم يجز للوطء ذكره من جهة المعنى ولا من طريق اللفظ---فامتنع من اجل ذالك اضمار الوطء فيه وان كان اسم النكاح قد يتناوله ومن جهة اخرى انه لما لم يكن فى الاية ذكر النكاح الا ما تقدم فى اولها وثبت ان المراد به العقد' لم يجزان يكون ضمير ذالك اللفظ بعينه وطاء' لامتناع ان يكون لفظ واحد مجازا وحقيقة' لان احد المعنيين يتناوله اللفظ مجازا و الاخر حقيقة' ولا يجوز ان ينتظمهما لفظ واحد فيجب ان يكن ضميره عقد النكاح المذكور بديا فى الاية— الى اخر-احكام ب ٢ ص ٥٦ ·

আমি উপরে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, ইমাম ছাহেবও তাহাকে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সূরার ২৫ আয়াতে আবার এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সেখানে আলোচনা করা হইবে।

৮। **টীকা : মোহর অপরিহার্য**—প্রত্যেক বিবাহে স্ত্রীকে যৌতুক হিসাবে

কিছু ধন দান করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজেব বা অপরিহার্য কর্তব্য। বিবাহ বৈধ হওয়ার প্রধান শর্ত হইতেছে ইহাই। আয়াতে ছাদোকাৎ বলিয়া এই মোহরের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার একবচন ছাদোকা, ছাদাকা নহে। বাংলায় "প্রীতি-উপহার" বলিলে মোটের উপর সঠিক অনুবাদ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। অতি নিঃসম্বল লোকের পক্ষেও বিবাহের সময় স্ত্রীকে কিছু না কিছু উপহার দিতে হইবে, তা একটা লোহার আংটি হউক না কেন। উচ্চতম পরিমাণের কোনো সীমা নির্ধারিত করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, স্বামী ও স্ত্রীর বা তাহাদের অভিভাবকগণের পরস্পরের সম্মতিক্রমে এই পরিমাণ নির্ধারিত হইবে।

মোহরের আদান-প্রদান সম্বন্ধে কয়েকটা বিশেষ তথ্যের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

(১) উপার্জনক্ষম হওয়ার পর পুরুষেরা বিবাহ করিবে, এই তাৎপর্য আলোচ্য আয়াত হইতে পাওয়া যাইতেছে।

(২) মোহরের সম্পূর্ণ স্বত্ব-অধিকার স্ত্রীর, কন্যার পিতার বা অন্য কোনো অলি-অছীর উহার উপর কোনো প্রকার অধিকার বর্তিতে পারে না। আজ-কাল অনেক স্থানে দেখা যায়, অভিভাবকরা কন্যার মোহরের টাকা (বা "পণ") নিয়া নিজেরা ভোগ করিয়া ফেলেন, অথবা খানা মেজমানী করিয়া তাহা শেষ করিয়া দেন। যশ অর্জনের মোহে বা নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির তাকিদে, কন্যার মোহরের টাকা নিয়া এই প্রকার ছিনিমিনি খেলা অলিদের পক্ষে কোনো মতেই জায়েয হইতে পারে না। অবশ্য নিতান্ত নাচারীর অবস্থায়, কেবল কন্যার স্বার্থে, মোহরের কিছু অংশ ব্যয় করা অবৈধ হইবে না।

(৩) বিবাহের এই প্রধান শর্তটি সম্বন্ধে আজকাল মুছলমান সমাজে ঘোর অনাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ মোহর নগদ দেওয়ার কথা বিবাহের সময়ে। কিন্তু আমরা প্রথমতঃ তাহাকে معجل ও موجل বা নগদ ও গৌণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নিয়াছি। তাহার পর নগদ মোহর পাঁচ টাকা বা দশটাকা নির্ধারণ করিয়া, অবশিষ্ট ৯৯০ টাকাকে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি এবং নূতন পরিভাষায় ইহার নাম দিয়াছি দায়েন-মোহর। আমাদের হাজার করা একজন লোকও যে, এই দায়েন বা ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিয়া থাকেন, এরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, বিবাহের বৈধতার ইহা যে প্রধান শর্ত, সে অনুভূতিও যেন আমাদের অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছে। ধর্মের প্রতি এবং আল্লাহ্ ও

রাছুলের নামে, এমন নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি হইতে পারে? সকলের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, পরে মোহর দিব না মনে করিয়া বিবাহ করিলে, ইছলামের নির্দেশ অনুসারে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না।

(৪) এই নিষ্ঠুরতার চিত্রকে নিষ্ঠুরতর করিয়া তোলার জন্য, আমরা দায়েন মোহর ফাঁকি দেওয়ারও নানা প্রকার ফন্দী বাহির করিয়াছি। ইহার প্রথম ফন্দী হইতেছে নির্যাতন, দ্বিতীয় ফন্দী হইতেছে নানা কৌশলে স্ত্রীকে বিভ্রান্ত করিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে মোহর মাফ করিয়া নেওয়া এবং তৃতীয় কৌশল অবলম্বিত হয় স্ত্রীর জান-কান্দানীর সময়ে, স্বামীর খালা, ফুফু জাতীয় আত্মীয়দের "দেন মোহর বখশে" নেওয়ার নির্মম কলা-কৌশল।

(৫) আয়াতের শেষ অংশে এইসব হীন মানসিকতার প্রতিবিধানের জন্য বলা হইতেছে—মোহরের সমস্ত ধন নিগূঢ়ভাবে স্ত্রীর স্বত্বাধিকারভুক্ত, স্ত্রীকে তাহা হইতে বঞ্চিত করার বিন্দুমাত্র অধিকারও স্বামীর নাই। তবে স্ত্রী যদি "মোহরের কোনো অংশ স্বামীকে প্রদান করে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে ও আন্তরিকভাবে"—স্বামী তাহা ভোগ করিতে পারিবে কেবল সেই অবস্থায়। সুতরাং অত্যাচারে অতিষ্ঠ করিয়া, প্রেমের পুলকে প্রবঞ্চিত করিয়া, অথবা অন্য কোনো প্রকার অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া যে "দান" বা লাদাবীনামা সংগ্রহ করা হয়, তাহা সর্বতোভাবে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য।

৯। **টীকাঃ ধন-সম্পদ ও তাহার অপচয়**—আয়াত হইতে প্রথমতঃ সাধারণভাবে জানা যাইতেছে যে, বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ হইতেছে মানুষের জীবন সংগ্রামের অবলম্বনস্বরূপ এবং আল্লাহ্ই তাহাদের জন্য এই অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সেই বিষয়-সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষা করা মানুষের ধর্মীয় কর্তব্য। তাহার অপচয় হইতে দিলে আল্লাহ্র এই দানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইবে, মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন অবলম্বন হীন হইয়া পড়িবে এবং ব্যক্তি ও পরিবারদিগের যে সমষ্টিগত স্বরূপের নাম হইতেছে "মিল্লাৎ," স্বাবলম্বী জাতি হিসাবে তাহার অস্তিত্বও দুনিয়া হইতে লোপ পাইয়া যাইবে।

অপরিণত-বুদ্ধি তরুণদিগকে হঠাৎ ধন-সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী করিয়া দিলেও, এই অপচয়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সেইজন্য আয়াতে আরও বলা হইতেছে যে, নিজের ধন-সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ নহে যেসব এতীম, সম্পত্তি হইতে তাহাদের ভরণ-পোষণের ও সুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যোগ্য অধিকারীরূপে তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থার আলোচনা পরবর্তী আয়াতে করা হইয়াছে।

১০। **টীকাঃ এতীমদিগের পরীক্ষা**—বাংলা ভাষায় যথাযথ প্রতিশব্দ না থাকায় "এবতেলা" শব্দের অনুবাদ করিতে হইয়াছে, পরীক্ষা বলিয়া। পূর্ব আয়াতে অজ্ঞান বা অনভিজ্ঞদিগকে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কি করিলে এতীমরা বয়ঃ-প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণ-পরিচালন সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া নিতে পারে, এই আয়াতে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

আয়াতের প্রথম অংশের নির্গলিত তাৎপর্য এই যে, এতীমকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতও করিতে হইবে অলি-অছীদিগকে। এজন্য দরকার হইবে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির বিশেষত্ব সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে এতীমদিগকে বাস্তবক্ষেত্রে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার। শিক্ষা ব্যতীত পরীক্ষার কথাই উঠিতে পারে না। এই প্রশ্ন লইয়া হানাফী ও শাফেয়ী আলেমদিগের মধ্যে যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোনোই স্বার্থকতা নাই। দান-বিক্রয়াদির চরম অধিকার, সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত এতীমের প্রতি বর্তিবে না, ইহা ঠিক কথা। কিন্তু বিষয়-কর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য নাবালেগকে এই অধিকার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ-গুলি, চিরদিনই নিজেদের উত্তরাধিকারীদিগকে, নিজেরা ষোল আনা মালিক থাকা সত্ত্বেও, কিছু সময়ের জন্য নিজেদের দোকানে, কারখানায় ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে রাখিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। এবং এইজন্য তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই পাকা ব্যবসায়ীর সব যোগ্যতা অর্জন করিয়া নেয়, আর এই জন্যই বড় বড় ডিগ্রী হাসিল করার পরও, সরকারী চাকুরী ছাড়া আমাদের জীবন-ধারণের অন্য কোন উপায় থাকে না।

মোটের উপর কথা এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতীম যাহাতে নিজের বিষয়-সম্পত্তির পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটা বাস্তব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, অলি-অছীদিগকে প্রথম হইতে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যথায়, এতীমের অযোগ্যতার জন্য দায়ী হইবেন তাহার অলি-অছীরাই।

আয়াতের শেষার্ধে দুইটি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

(১) নিজের ভরণ-পোষণের মত অবস্থা আছে যেসব অভিভাবকের, তাঁহারা এতীমের সম্পত্তি হইতে কোনো বেতন বা পারিশ্রমিক নিতে পারিবেন না। বরং ব্যক্তিগত কর্তব্য হিসাবেই তাঁহাদিগকে এই দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে হইবে।

(২) পক্ষান্তরে যে অলি নিতান্ত দরিদ্র, নিজ পরিজনবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হয়, সেরূপ অলি এতীমের মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এই গ্রহণের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক-দল আলেমের মত এই যে, এতীমের দরিদ্র অলী মলধনের কোন ক্ষতি না করিয়া, এইভাবে যাহা গ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহার কর্জ হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং যথাসময়ে তাঁহাকে এই কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। হযরত ওমর প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবী হইতে এই মতের স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। তবে এই মতের সমর্থক আলেমগণ একথাও বলিয়াছেন যে, অলি যদি অবস্থাগতিকে জীবনে এই ঋণ পরিশোধ না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহার জন্য দায়ী করা হইবে না। (ফৎহুল বায়ান, এবন-কাছীর, কাবীর প্রভৃতি)।

কিন্তু হানাফী মজহাবের ইমাম ও আলেমগণের অভিমত উপরোক্ত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন যে, অলি নিঃস্ব হউন বা অবস্থাপন্ন হউন, কোনো অবস্থায় ও কোনো প্রকারে এতীমের মাল নিজের জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন না—কর্জ হিসাবেও নহে। আবুবাকরা রাজী এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইমাম মোহাম্মদ কেতাবুলআছারে বলিয়াছেন—"অলি কর্জ হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে এতীমের মাল ভোগ করিতে পারিবে না।" কিন্তু তাহাবীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইমাম ছাহেব হযরত ওমরের সিদ্ধান্তের পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন। (আহকামুল-কোর্‌আন, ২—২৫) দলিল-প্রমাণগুলির বিচার করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ মুছলমানকে স্বীকার করিতে হইবে যে, "মূল সম্পত্তির কোনো প্রকার ক্ষতি না করিয়া কর্জ স্বরূপে সঙ্গতভাবে কিছু গ্রহণ করার অনুমতি" অবস্থাহীন অলিদিগকে দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় কোনো দরিদ্র অলিই এতীমের সম্পত্তির ভার নিতে প্রস্তুত হইবেন না।

১১। **টীকা ঃ "ফারায়েজ" বা উত্তরাধিকার**—মানব ইতিহাসের আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত, দুনিয়ার সকল শাস্ত্র ও সকল সমাজ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ঘোর অসাম্য ও নিষ্ঠুর পক্ষপাতের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। সে ব্যবস্থায় দুর্বলের স্থান ছিল না, নারীকে সব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহুদীদিগের ধর্মীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইহার বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। Encyclopaedia Biblica লেখক বলিতেছেন—

"In harmony with the unanimus view of the ancient world, only the adult free male member of the community—capable therefore of bearing arms and carrying out blood revenge—wrs regarded as invested with full legal right's."

The right of inheritance among the Israelites belong only to agnates....

Only sons, not daughters, still less wife's, can inherit.

(Bibilica-Law Justice)

Traces of evidence are not wanting that with the older Hebrewes, as with the Arabs before Mohammed, a mans wife could be inherited exactly like his others properlp."

(Marriage, 3 29 48)

মর্মার্থ—"প্রাচীন জগতের সাধারণ নিয়ম অনুসারে, যে সব বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণের ও শত্রুদের নিকট হইতে শোণিতের প্রতিশোধ লইতে পারে, ইহুদী সমাজে কেবল তাহারাই আইনের উপকার পাওয়ার অধিকারী হইত।

উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী ছিল কেবল পুত্ররা—কন্যাদের তাহাতে কোনও অধিকার ছিল না। স্ত্রীর কোন অধিকারই ছিল না।

মোহাম্মদের পূর্ববর্তী আরবদিগের ন্যায় ইহুদী সমাজেও, মৃত ব্যক্তির অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায়, ওয়ারিস উত্তরাধিকার সূত্রে তাহার স্ত্রীরও মালেক হইয়া যাইত।"

এই নিষ্ঠুরতার চিত্রকে নিষ্ঠুরতর করার জন্য, বাইবেল রচয়িতাগণ আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, শুধু পুত্র হইলে হইবে না, কেবল যুদ্ধক্ষম হইলেও চলিবে না—পিতার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাইবেলের পরিভাষায় ইহাকে "জ্যেষ্ঠাধিকার" বলা হয়। বাইবেলে বলা হইতেছে—যদি কোন পুরুষের প্রিয়া-অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া-অপ্রিয়া উভয়ে পুত্র প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠপুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয়; তবে আপন পুত্রদিগকে সর্বস্বের অধিকার দিবার সময়ে অপ্রিয়জাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে সে প্রিয়জাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়া আপন সর্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে; কারণ সে তাহার শক্তির প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার তাহারই।" (দ্বিতীয় বিবরণ ২১—১৫, ১৬)

ইহাই মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোর্‌আনের প্রথম আয়াত। উপরে যে

বিশ্বব্যাপী অনাচারের কথা বলা হইয়াছে, এই আয়াতে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উত্তরাধিকার বণ্টনের মূলনীতি সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে—

(১) সম্পত্তির মালিক যেমন পিতা হইতে পারে, মাতাও সেরূপ নিজ স্বত্বে তাহার মালিক হইতে পারে।

(২) পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন যেসব (স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত) বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া যাইবে, তাহার ওয়ারিস হওয়ার অধিকার যেমন পুরুষদের আছে, নারীদিগেরও ঠিক সেইরূপ অধিকার আছে। এই অধিকার হইতে স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নী প্রভৃতি নারীদিগকে (নারী বলিয়া) বঞ্চিত করার ব্যবস্থা কোনো সত্য ধর্মে থাকিতে পারে না। প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়াও কোনো প্রভেদ আয়াতে করা হয় নাই।

(৩) পাঠকগণকে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি। এখানে পুরুষ ও নারীর অধিকার, একটি ধারায় বর্ণনা করিয়া দিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া পুরুষ ও নারী-দিগের অধিকার সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারার সমাবেশ করা হইয়াছে। নারীদিগের উত্তরাধিকার যে অন্যনিরপেক্ষ, এবং পুরুষদিগের প্রতি কোনো প্রকারে নির্ভরশীল নহে, স্বতন্ত্রধারা প্রয়োগের ইহাই উদ্দেশ্য।

১২। **টীকা: গরীবদিগের প্রাপ্য**—আজকালকার পরিভাষায় Legal-law বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইছলামের বহু বিধি-ব্যবস্থাকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বরং ইছলামের বিধি-ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই হইতেছে মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে। কিন্তু এইসব বিধি-ব্যবস্থাকে আমরা সাধারণতঃ চরম নিষ্ঠুরতার সহিত উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাই বৎসর বৎসর পাঁচ-সাত ডজন আইন ও ফর্মান পাস করিয়াও সমাজ মনের গতিধারার কোনই উৎকর্ষ সাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আলোচ্য আয়াতে এইরূপ একটা সামাজিক আইনের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। এই আয়তের সারমর্ম এই যে, কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, আইনসম্মত উত্তরাধিকারী তাহার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইবে। ইহা হইতেছে Legal-law। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে উত্তরাধিকারীদিগের কর্তব্য হইবে—বণ্টনের পূর্বে মোট সম্পত্তি হইতে একটি অংশ সমাজের দুস্থ ও দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য প্রদান করা। Death duty ও Succession tax বলিয়া আজকাল কোনো কোনো দেশে

যে নূতন করের প্রবর্তন করা হইতেছে, তাহা এই ব্যবস্থারই প্রকারভেদ মাত্র। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, সমাজের ব্যক্তিগণ নিজেরাই নিজেদের এই কর্তব্য পালনের জন্য অগ্রসর হইলে—সে সাহায্যটা সোজাসুজিভাবে তাহাদের দুস্থ আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের হাতে পেঁাছিয়া যায় বিনা ব্যয়ে। আর সব হুকুমতের হাতে গেলে বারবরদারী ও সরঞ্জামী খরচেই তাহার একটা বড় অংশ নিঃশেষিত হইয়া যায়। দাতাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা বুঝিতেও পারে না যে, অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে আমরা এই সাহায্য পাইতেছি, অমুক অমুক ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির আইনগত অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমাদিগের জন্য কেবল ইছলামের সম্পর্কে এই সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং এই দানের মহান উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হইয়া যায়।

১৩। টীকা ঃ অছিয়ৎ—নিজের বিধিসম্মত ওয়ারিসদিগকে বঞ্চিত করিয়া, অন্য কাহাকেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা ঘোর অন্যায়। একশ্রেণীর লোক মানুষকে এই দুষ্কর্মে লিপ্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়া থাকে। আয়াতে তাহাদের নিন্দা করিয়া বলা হইতেছে—তোমাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিলে, অন্য লোকের দুর্বল সন্তান-সন্ততিদের যে দুর্দশা উপস্থিত হইবে, এই অন্যায় ব্যবস্থার ফলে তোমাদের দুর্বল সন্তান-সন্ততিদিগেরও তো সেই অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। ফলতঃ দুর্নীতি ও অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া সদা সংক্রমণশীল ও সর্ব ব্যাপক। ইহার প্রশ্রয় দিবে যাহারা, তাহাদিগকে বা তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিবর্গকে এই পাপের প্রত্যয় ভাগী হইতে হইবে। "অছীয়ৎ" সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

১৪। টীকা ঃ এতীমদিগের সম্পত্তি—এতীম ও এতীম্যরাই দুনিয়ার সবচাইতে বেশী মজলুম। ইহার জন্য আল্লাহ্‌র কেতাবে ও রাছুলের হাদীছে পুনঃপুনঃ নানা প্রকার আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এতীমের বেদনা বিধুর অন্তরের মূল মর্মকথা কি? তাহার সব হারান—সব খোয়ান শূন্য দৃষ্টির প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু কোথায় লুকাইয়া আছে, স্বয়ং তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিবেন এবং তাহার সক্রিয় ও সার্থক ব্যবস্থা করিয়া দিবেন—এইজন্য মঙ্গলময়ের কল্যাণ হস্ত, রহমতুললিল-আলামীনকে এতীম করিয়া দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন, এবং এতীম হিসাবে তাঁহার নবুয়তের প্রথম সাধনা সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই এতীমদের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে উপভোগ করে যেসব পাষণ্ড, তাহাদের মহাপাতকের স্বরূপ এই আয়াতে রূপকভাবে বর্ণিত হইতেছে।

২ রুকূ

১১। আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন, তোমাদিগের সন্তানবর্গের (উত্তরাধিকার) সম্বন্ধে:—একজন পুরুষের প্রাপ্য দুইজন নারীর সমান, কিন্তু তাহারা যদি শুধু নারী হয়, দুজইন বা ততোধিক—তাহা হইলে (একত্রে) তাহাদের সকলের প্রাপ্য হইবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, পক্ষান্তরে সে যদি একক মাত্র হয়, তবে তাহার প্রাপ্য হইবে অর্দ্ধেক। (১৫) আর মৃত ব্যক্তির পিতামাতার প্রত্যেকের প্রাপ্য হইবে (সন্তানকর্ত্তৃক) পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া— যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে, পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে, অধিকন্তু কেবল পিতা-মাতাই তাহার ওয়ারিস হয়, সে অবস্থায় তাহার মাতা পাইবে এক-তৃতীয়াংশ; আর মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক ভাই-ভগ্নী থাকে, তাহা হইলে মাতার প্রাপ্য হইবে এক-

١١ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِ
كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ ج فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ج فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا
اَوْ دَيْنٍ ط اٰبَاۤؤُكُمْ
وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ
اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا o

ষষ্ঠাংশ—মৃত ব্যক্তি কৃত অছিয়ৎ সিদ্ধ করার ও ঋণ শোধ করার পর, তোমাদিগের পিতৃ-বর্গ ও সন্তানগণের মধ্যে কাহার দ্বারা তোমাদিগের অধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা, তাহা তোমরা অবগত নহ। (এগুলি হইতেছে) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অপরিহার্য বিধান; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

١٢ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ط
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

১২। আর (হে মুছলমান সমাজ!) তোমাদিগের স্ত্রীরা যাহা পরি-ত্যাগ করিয়া (মরিয়া) যায়, তাহার অর্ধেক হইবে তোমা-দিগের প্রাপ্য—যদি তাহা-দিগের কোনও সন্তান না থাকে, পক্ষান্তরে তাহাদিগের যদি কোনও সন্তান থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তোমাদিগের প্রাপ্য হইবে এক-চতুর্থাংশ—তাহাদিগের অছিয়ৎ সিদ্ধ ও ঋণ শোধের পর; আর তোমাদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্ত্রী-দিগের প্রাপ্য হইবে এক-চতুর্থাংশ—যদি তোমাদিগের

إن لم يكن لكم ولد ج
فإن كان لكم ولد فلهن
الثمن مما تركتم من بعد
وصية توصون بها
أو دين ط وإن كان رجل
يورث كللة أو امرأة
وله أخ أو أخت فلكل
واحد منهما السدس ج
فإن كانوا أكثر من
ذلك فهم شركاء في
الثلث من بعد وصية
يوصى بها أو دين لا غير
مضار ج وصية من الله ط

কোনও সন্তান না থাকে ; কিন্তু তোমাদিগের কোনও সন্তান যদি থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীদিগের প্রাপ্য হইবে তোমাদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ— তোমাদিগের কৃত অছিয়ৎ সিদ্ধ ও ঋণ শোধ করার পর ; (১৬) আর যদি এমন কোনো পুরুষ বা নারীর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আসে, (যাহার পিতাও নাই এবং সন্তানও নাই)—(১৭) আছে মাত্র এক (বৈপিত্রেয়) ভ্রাতা অথবা এক (বৈপিত্রেয়) ভগ্নী, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যকার প্রত্যেকের প্রাপ্য হইবে এক-ষষ্ঠাংশ, পক্ষান্তরে তাহাদের সংখ্যা যদি ইহার অধিক হয়; তাহা হইলে তাহারা সকলে একত্রে পাইবে এক-তৃতীয়াংশ— মৃত ব্যক্তি কৃত অছিয়ৎ (cxecute) সিদ্ধ করার বা ঋণ শোধ করার পর—যদি (সে অছিয়ৎ) ক্ষতিজনক না হয়, ইহা হইতেছে আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট (বিধান),

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ؕ

আর আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বজ্ঞ ও ধৈর্যশীল। (১৮)

١٣ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩। এগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পরিসীমা ; বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবে আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাছুলের, আল্লাহ্ তাহাকে দাখেল করিয়া দিবেন (বেহেশ্‌তের) কানন-পুঞ্জে, যাহার নিম্নদেশ দিয়া বহিয়া চলে নদনদীমালা, তাহারা সেখানে হইবে চিরস্থায়ী।

١٤ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ ع

১৪। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্য হইয়া চলিবে আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাছুলের এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাগুলিকে অতিক্রম করিয়া চলিবে, তাহাকে আল্লাহ্ দাখেল করাইয়া দিবেন (জাহান্নামের) অগ্নিকুণ্ডে, সে তথায় চিরস্থায়ী ; এবং তাহার জন্য নির্ধারিত আছে (আরও অনেক) হেয়স্কর দণ্ড। (১৯)

তাফ্‌ছীর

১৫। **টীকাঃ পুরুষ ও নারীর অংশ**—পুরুষের প্রাপ্য নারীর প্রাপ্যের দ্বিগুণ হওয়ার কারণ এই যে, পরিবার প্রতিপালনের ও সংসার চালাইবার দায়িত্ব নারীর থাকে না, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত আছে পুরুষের উপর। স্ত্রী লক্ষ টাকা আয়ের মালিক হইলেও তাহার সন্তানদিগের প্রতিপালন করার দায়িত্ব তাহার উপর বর্তায় না, দরিদ্র হইলেও স্বামীই তাহার জন্য—এমন

কি, এই অবস্থাপন্ন স্ত্রীর খোরপোষের জন্যও দায়ী। স্ত্রীর মোহরের টাকা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর প্রথম দায়েন বা দায় হিসাবে গণ্য হয়।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। কোর্‌-আনের ব্যবস্থা অনুসারে অনিবার্য হিসাবে নির্দিষ্ট অংশভাগী উত্তরাধিকারী হইতেছে বার জন, ইহার মধ্যে পুরুষ চারিজন মাত্র। আর নারী হইতেছে আট জন। যথা—

নারী—		পুরুষ—	
(১)	স্ত্রী	(১)	পিতা
(২)	কন্যা	(২)	পিতামহ
(৩)	পৌত্রী	(৩)	বৈপিত্রেয় ভ্রাতা
(৪)	সহোদরা ভগ্নী	(৪)	স্বামী
(৫)	বৈমাত্রেয়া ভগ্নী		
(৬)	মাতা		
(৭)	দাদী ও নানী		
(৮)	বৈপিত্রেয়া ভগ্নী		

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য সব বিষয়ে এই উদার নীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। ধন-সম্পত্তি নিষ্কেন্দ্রীয় করার ও যথাযথ বণ্টনের জন্য, ইছলাম যে সুদৃঢ় ও সুসঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে, সভ্যতার এই চরম উৎকর্ষের দিনেও, জগতে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমি এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

১৬। **টীকা ঃ প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকার**—মুছলমান উত্তরাধিকারী-গণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) জুভেল-ফরূজ বা মূল অংশী, (২) আছাবা বা অবশিষ্টাংশী ও (৩) জুভেল-আরহাম বা দূরবর্তী দায়াদগণ। কোর্‌আনে যাহাদের অংশ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাদিগকে জুভেল-ফরূজ বা নির্ধারিত অংশের প্রাপক বলা হয়। এই রুকূর আয়াতগুলিতে এই শ্রেণীর ওয়ারিস-দিগের প্রাপ্য অংশাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ফারায়েজের কেতাবে দ্রষ্টব্য।

বুঝিবার সুবিধার জন্য আয়াতগুলির সার সিদ্ধান্ত নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

(১) পুত্র-কন্যাগণ—মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যা উভয় থাকিলে কন্যার দ্বিগুণ পুত্রের প্রাপ্য—এই নিয়ম অনুসারে পুত্র-কন্যাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

উদাহরণ—আবদুল্লাহ্ দুই পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া মরিয়া গেল। এ অবস্থায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি (২+২+১+১+১+১=) ৮ ভাগে বিভক্ত হইয়া চার কন্যার প্রত্যেকে ৮ ভাগের এক ভাগ হিসাবে ও পুত্র দুইজন প্রত্যেকে ৮ ভাগের দুইভাগ প্রাপ্ত হইবে।

(২) কন্যা—(যদি পুত্র না থাকে)—একজন হইলে অর্ধেক, আর একাধিক হইলে সকলে মিলিয়া তিন ভাগের দুই ভাগ। (দ্রষ্টব্য—অবশিষ্ট সম্পত্তি আছাবাদের প্রাপ্য হইবে।)

(৩) পিতা ও মাতা—মৃত ব্যক্তির কোনও সন্তান থাকিলে পিতা ও মাতা প্রত্যেকে পাইবে এক ষষ্ঠাংশ করিয়া। পক্ষান্তরে সন্তান না থাকিলে মাতা পাইবে এক তৃতীয়াংশ।

(দ্রষ্টব্য—মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকিলে পিতা "জুভিল ফরূজ" না হইয়া আছাবা হয়। অতএব অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ পিতা পাইবে আছাবা হিসাবে।)

(৪) স্বামী ও স্ত্রী—স্ত্রী যদি তাহার গর্ভজাত কোনো সন্তান রাখিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে স্বামীর প্রাপ্য হইবে চতুর্থাংশ, অন্যথায় অর্ধেক। এইরূপে স্বামী যদি তাহার ঔরসজাত কোনো সন্তান রাখিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীর প্রাপ্য হইবে অষ্টমাংশ, অন্যথায় চতুর্থাংশ।

দ্রষ্টব্য—স্ত্রীর নিজ গর্ভজাত সন্তান স্বামীর অংশ কমাইয়া দেয়, সে সন্তান বর্তমান স্বামীর ঔরসজাত হউক বা পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত হউক। এইরূপে স্বামী যদি নিজ ঔরসজাত সন্তান রাখিয়া মরে, স্ত্রীর অংশ কমিবে কেবল সেই সময়, তা সে সন্তান স্বামীর যে কোনো স্ত্রীর গর্ভজাত হউক না কেন। একাধিক স্ত্রী থাকিলে এই চতুর্থ বা অষ্টম অংশই তাহারা সকলে সমানভাবে ভাগ করিয়া পাইবে।

১৭। **টীকা ঃ কালালা**—যদি মৃত ব্যক্তির পিতা বা সন্তান কিছুই না থাকে, তাহাকে "কালালা" বলা হয়। আয়াতে ভ্রাতা-ভগ্নী বলিতে বৈপিত্রেয় ভ্রাতা-ভগ্নীকে বুঝাইতেছে। এই সূরার শেষ আয়াতের সহিত মিলাইয়া আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে,এখানে সহোদর ভাই-ভগ্নী উদ্দেশ্য নহে। কালালার উত্তরাধিকারী একজন সহোদর ভগ্নী হইলে, তাহার প্রাপ্য হইবে অর্ধেক ও একাধিক হইলে সকলে মিলিয়া দুই-তৃতীয়াংশ, ভাই-ভগ্নী উভয় বিদ্যমান থাকিলে ভগ্নীর দ্বিগুণ ভ্রাতার প্রাপ্য হইবে—এই নিয়ম অনুসারে সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং সূরার শেষ আয়াতে বর্ণিত, কালালার ওয়ারিস ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধে ঠিক এই

ব্যবস্থাই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একক ভাই বা ভগ্নীর অংশ দেওয়া হইয়াছে ৬ ভাগের এক ভাগ, দুই বা দুইয়ের অধিক হইলে তাহারা সকলে একত্রে পাইবে এক তৃতীয়াংশ মাত্র। কিন্তু এখানে ভাই-ভগ্নী সকলের অংশ সমান সমান। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, এখানে বৈপিত্রেয় ভ্রাতাদিগের কথাই বলা হইতেছে।

১৮। **টীকাঃ অছিয়ৎ**—জীবনের শেষ সময়ে নিজের ধন-সম্পত্তি কাহাকেও দান করিয়া যাওয়াকে আইনের পরিভাষায় অছিয়ৎ বলা হয়। হযরত রাছুলে কারীমের বিভিন্ন হাদীছে অছিয়ৎ সম্বন্ধে যে সব নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে সঙ্গতভাবে ধারণা জন্মে যে, অছিয়ৎকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, বরং উহা অগত্যা পক্ষে একটা অনুমতি মাত্র। এতদ্ব্যতীত, এই সব হাদীছ হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, ওয়ারিস সম্বন্ধে অছিয়ৎ করা বৈধ নহে এবং এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তির অছিয়ৎ কোনো অবস্থাতেই করা যাইতে পারে না। এখানে অছিয়তের কথা প্রথমে ও ঋণের কথা পরে বর্ণিত হইলেও ঋণকে সম্পত্তির প্রথম দায় বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকার করা হইয়াছে এবং ইহাই সঙ্গত অভিমত।

১২শ আয়াতের শেষভাগে যদি তাহা ক্ষতিজনক না হয়—এই শর্তটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, পূর্বের আয়াতগুলিতে মৃত-ব্যক্তির সন্তান বা পিতা-মাতা বিদ্যমান ছিল, আর এখানে তাহাদের কেহই বর্তমান নাই। যে সব ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা বা পিতা-মাতা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়গণের কেহই বর্তমান না থাকে, সেখানে দূরবর্তী আত্মীয়গণকে বঞ্চিত করার জন্য অন্যায়ভাবে একটা ঋণ গ্রহণ করা বা মিথ্যা ঋণ স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়। আবার উত্তরাধিকারীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য অসঙ্গত প্রকারে অছিয়ৎ করা হয়। এই জন্য আয়াতের এই অংশে "যদি তাহা অর্থাৎ সেই ঋণ বা অছিয়ৎ কাহারও পক্ষে ক্ষতিজনক না হয়—" এই শর্তটি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষতিজনক বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহা বাতিল যওয়া যাইবে।

১৯। **টীকাঃ নাফর্মানদিগের শাস্তি**—ফারায়েজ সম্বন্ধে উপরে যে সব বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে,সেগুলি হইতেছে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। আল্লাহ্র নাফর্মান হইয়া যে সব ব্যক্তি এই সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে, এবং বিধি-ব্যবস্থাগুলি অমান্য করিবে, এই আয়াতের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে, তাহারা হইবে চিরকালের জাহান্নামী। ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি সমাজের বিভিন কেন্দ্রে যথাযথভাবে বন্টিত হউক, অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে

অধিক পরিমাণ ধন কেন্দ্রীভূত হইতে না পারুক—কোর্আনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইতেছে ইহাই। ইহার ব্যতিক্রম হইলে সমাজ জীবনে বিশৃঙখলা ও উচ্ছৃঙখলার প্রাদুর্ভাব ঘটা অবশ্যম্ভাবী। মুসলমানের জীবন সাধনার পবিত্রতম ও মহানতম আদর্শটাও তাহা দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে।

---

৩ রুকূ

১৫। আর ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে তোমাদের নারীদিগের যাহারা, তাহাদিগের সম্বন্ধে নিজেদের চারজন সাক্ষীকে তলব করিবে, ফলে তাহারা যদি (অপরাধের সমর্থনে) সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে ঐ নারীদিগকে (নিজ) গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে—যাবৎ না মৃত্যু আসিয়া তাহাদের জীবনের অবসান ঘটাইয়া দেয়, অথবা (যাবৎ না) আল্লাহ্ তাহাদিগের মঙ্গলার্থে (অন্য) কোনো পন্থা নির্ধারণ করিয়া দেন। (২০)

١٥ وَالّٰتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝

১৬। আর তোমাদিগের মধ্যকার যে পুরুষ ও নারী ঐ পাপে লিপ্ত হইবে, তাহাদিগের উভয়কে "নির্যাতন" করিবে অতঃপর তাহারা যদি অনুতপ্ত হয় ও আত্মসংশোধন করে, তাহা হইলে তাহাদের (নির্যাতন) হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ হইতেছেন মহা ক্ষমাশীল, কৃপানিধান। (২১)

١٦ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

১৭। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র হুজুরে গ্রহণীয় হয় একমাত্র সেই সব লোকের তাওবা (অনুতাপ), যাহারা মন্দ কাজ করিয়া বসে জ্ঞান-বিভ্রম বশতঃ, তাহার পর অনুতপ্ত হয় অবিলম্বে, এই শ্রেণীর লোকের তাওবাই আল্লাহ্ কবুল করিয়া থাকেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৭ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ
لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ
قَرِيْبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوْبُ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥

১৮। আর সেই সব লোকের তাওবা তো (বস্তুতঃ) তাওবাই নহে— যাহারা (আজীবন) পাপকার্য-গুলি করিয়া যাইতে থাকে, পরন্তু তাহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইয়া যায় যখন, তখন সে বলে, আমি তাওবা করিলাম এখন ; আর তাহাদের (তাওবাও গ্রাহ্য নহে), যাহারা কাফের থাকা অবস্থাতেই মরিয়া যায় ; এই যে লোকগুলি—ইহা-দিগের জন্যও আমরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যাতনাদায়ক-শাস্তি। (২২)

১৮ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا
الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ
كُفَّارٌ ط أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ٥

١٩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا ط وَلَا تَعْضُلُو
هُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ج وَعَاشِرُو
هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ج فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٥

১৯। হে মোমেনগণ! জবরদস্তি ভাবে নারীদিগের ওয়ারিস হইতে যাওয়া তোমাদিগের পক্ষে হালাল হইতে পারে না, (২৩) আর স্ত্রীদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, তাহার কতকটা ফিরাইয়া নেও-য়ার মতলবে, তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করিও না—যাবৎ তাহারা যথার্থই ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়,—অধিকন্তু তাহাদিগের সহিত বসবাস করিতে থাকিবে সঙ্গতভাবে, কিন্তু যদি উহা-দিগকে তোমরা না-পছন্দ করিয়া থাক, সে অবস্থায় তোমরা না-পছন্দ করিতেছ যে বিষয়কে, সম্ভবতঃ তাহাতেই আল্লাহ্ বহু কল্যাণ নিহিত করিবেন (বা করিতেছেন)।

٢٠ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ
زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ لا وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ط

২০। আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও, আর পূর্ব স্ত্রীকে যদি অগাধ ধন-সম্পদও প্রদান করিয়া থাক, তাহা হইলে সে ধন-সম্পদের কিছুমাত্রও তোমরা প্রতিগ্রহণ করিবে না; তবে কি তোমরা উহা

গ্রহণ করিবে অপবাদ রটাইয়া ও স্পষ্ট পাপাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। (২৪)	أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝
২১। আর তোমরা এই স্ত্রী-ধন ফিরাইয়া লইতে পার কেমন করিয়া। —অথচ (ঐ স্ত্রী-ধন দেওয়ার ফলে) তোমরা পরস্পর প্রসঙ্গ করিয়াছ, অধিকন্তু স্ত্রীরা তোমাদিগের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকারও গ্রহণ করিয়াছে। (২৫)	٢١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝
২২। আর তোমাদিগের পিতারা যেসব নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না—তবে অতীতে ঘটিয়া গিয়াছে যাহা (তাহাতে তোমাদের হাত নাই); নিশ্চয় ইহা হইতেছে চরম নির্লজ্জতার কাজ ও অতি জঘন্য কদাচার এবং অতি কুৎসিত হইতেছে এই পদ্ধতি। (২৬)	٢٢ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ط وَسَاءَ سَبِيلًا ع

তাফ্‌ছীর্

২০। **টীকা ঃ ব্যভিচার ও নারী**—সকল অধিকারে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত অনাচার-অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া, নারী-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন করার ব্যবস্থা, এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলিতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্বের ভারও তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়া যায়। তাহার মধ্যকার প্রথম কর্তব্য হইতেছে, নিজের চরিত্রগত শুচিতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলা।

অন্যথায়, তাহাদিগকে এই অবহেলার জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

প্রাক্-ইসলামী যুগে কোনো নারী সম্বন্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ হইলে, তাহাকে আমরণ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তখনকার আরব সমাজ, নারীজাতি সম্বন্ধে যে পৈশাচিক ধারণা পোষণ করিত, এই সূরাতেও তাহার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় অভিযুক্তা নারীর কারাদণ্ড, যে নিষ্ঠুরতর মৃত্যু দণ্ডেরই নামান্তর মাত্র ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য তখন বস্তুতঃ কোনো দণ্ডের ব্যবস্থাই ছিল না।

আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, ইহা অন্তর্বর্তী কালের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা। চরম নির্দেশ ইহার পরে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

এই আয়াতে আরবদিগের পুরাতন প্রথাটাকে সাময়িকভাবে বহাল রাখা হইতেছে, কয়েকটা জরুরী সংস্কার সহকারে। প্রথম সংস্কার হইতেছে অন্তরীণের স্থান সম্বন্ধে। পূর্বে ব্যবস্থা ছিল কারাগারে আটক রাখার, বর্তমান ব্যবস্থায় পারিবারিক আবাসে আটকাইয়া রাখার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। পূর্বে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া নারীকে পরোক্ষভাবে হত্যা করাই হইত উদ্দেশ্য, আর এখানে ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহার সংশোধনের ও নবজীবন লাভের। পূর্বে নারীকে দণ্ড দেওয়া হইত, তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের কোনো প্রকার বিচার না করিয়া—আর এখানে প্রথম নির্দেশ হইতেছে অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করার এবং সেজন্য চারজন প্রত্যক্ষদর্শী স্বাধীন (দাস নহে), মুছলমান পুরুষ সাক্ষীকে বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত করার। আয়াতের স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, উপরোক্তরূপে অপরাধ সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নারীকে আবদ্ধ করা যাইতে পারিবে না। পূর্বে এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হইত কেবল স্ত্রীলোকদিগকে। ব্যভিচারী পুরুষের যেন কোনও দোষই ঘটে নাই। ১৬ আয়াতে উভয়ের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে মিথ্যা অভিযোগের সম্ভাবনাও বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

আয়াতের শেষভাগে আশ্বাস দেওয়া হইতেছে যে, অবরুদ্ধ নারীদিগের মঙ্গলার্থে আল্লাহ্ অনতিবিলম্বে অন্য কোনো পন্থা নির্ধারিত করিয়া দিবেন। সূরা নূরের দ্বিতীয় আয়াতে এই পন্থা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে—"এই যে ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, ইহাদিগের প্রত্যেককে তোমরা একশত দোর্‌রার আঘাত করিবে।" জেনার দণ্ডবিধান সম্বন্ধে ইহাই কোর্‌আনের চরম নির্দেশ। এই আয়াতে বিবাহিত অবিবাহিত

বলিয়া কোনো প্রভেদ করা হয় নাই, এবং রাজ্‌ম (stoning to death) সম্বন্ধে সমান্য কোনো আভাসও দেওয়া হয় নাই।

অধিকাংশ তাফ্‌ছীরকারের মতে, এই আয়াতটি সূরা নূরের আয়াত ও কয়েকটা হাদীছের দ্বারা মনছুখ (abrogated) হইয়া গিয়াছে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই শ্রেণীর অভিমতকে আমি সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ কোর্‌আনের আয়াতগুলির মধ্যে কুত্রাপি কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতকে রহিত করার কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সেকালে কোর্‌আনের মনছুখ আয়াতের সংখ্যা ছিল পাঁচশত। এমাম ছায়ূতীর সময়ে তাহা কুড়িটিতে পরিণত হয়। শাহ্ অলীউল্লাহ্ ছাহেব ঐ কুড়িটার মধ্যে পাঁচটাকে মাত্র রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে গয়ের মনছুখ বলিয়া সপ্রমাণ করেন। তাহার পর নওয়াব ছিদ্দীকুল হাছান খাঁ "এই পাঁচটা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে" বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মাওলানা হাক্কানী ছাহেব এই পাঁচটার মধ্যকার দুইটাকে "মনছুখ নহে" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। * আমরা বাকী তিনটাকে মনছুখ বলিয়া স্বীকার করি না।

ইহাও আমার সুচিন্তিত ও সুদৃঢ় অভিমত যে, হাদীছের দ্বারা কোর্‌আনের কোনো আয়াতকে রহিত করা বৈধ হইতে পারে না। কারণ, হাদীছ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার উক্তি বা কর্মের ঐতিহাসিক বিবরণ ছাড়া আর কিছু নহে। আর হযরত আসিয়াছিলেন দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে, তাঁহারই হুকুম আহকামকে মানব সমাজে প্রবর্তিত করার জন্য। সুতরাং হযরতের উক্তি বা কর্ম আল্লাহ্‌র ফরমানের বিপরীত বা বিরোধী হইতে পারে না—হইতে পারে তাহার পরিপূরক বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। হযরত পুনঃ পুনঃ কোর্‌আনের ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন—انما اتبع ما يوحى الى من ربى "আমি তো কেবল অনুসরণ করিয়া চলি সেইসব বিষয়ের, যাহা আমার প্রতি অহী করা হয় আমার পরওয়ারদেগারের হুজুর হইতে।" (আ'রাফ ২০৩, আনআম ৫০ ও ১০৬ প্রভৃতি) আল্লাহ্ জেনাকার নর-নারীর জন্য মাত্র দোর্‌রা মারার হুকুম দিতেছেন, আর আল্লাহ্‌র রাছুল সে হুকুম রদ করিয়া তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দিতেছেন, এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে না।

এই আয়াতের বিচার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় চরিত্র গঠন সম্বন্ধে ইছলাম

যেসব বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে, তাহার সবগুলিই সাধিত হইয়াছে স্তরে স্তরে, ক্রমান্বয়ে, এবং বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। উদাহরণ হিসাবে জুয়া ও মাদকতা নিবারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মদ্যপান, জুয়াখেলা ও অসংযত নারী সম্ভোগ—এই তিনটি বিষয় ছিল আরবের সামাজিক জীবনে সর্বপ্রধান অভিশাপ। কিন্তু ইহার কোনোটাকে হঠাৎ একদিনে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। বরং চরম নিষেধাজ্ঞা প্রচারের পূর্বে বিভিন্ন উপদেশের মধ্য দিয়া সমাজের মন ও মস্তিষ্ককে তাহার জন্য ক্রমান্বয়ে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইতেছিল। জুয়া ও মদ্যপান সম্বন্ধে দেখা যায়, হযরত রাছুলে কারীমের আদর্শ প্রভাবে সমাজ জীবনের সুপ্ত বিবেকে উহার বিরুদ্ধে একটা জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে দেখিতেছি, মুছলমানরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে হযরতের নিকট প্রশ্ন করিতেছে এবং সেই প্রশ্নেরই উত্তরে রাছুলকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—"ঐ দুইটার মধ্যে আছে মহাপাপ, আর কোনো কোনো লোকের পক্ষে সামান্য উপকার, কিন্তু উপকারের তুলনায় ঐগুলির পাপের পরিমাণ অত্যধিক গুরুতর।" ইহাই মাদক সম্বন্ধে প্রথম আয়াত। ইহার পর নাজেল হয় সূরা নেছার ৪৩ আয়াত। এই আয়াতে নেশার অবস্থায় নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হইতেছে মাত্র। কারণ, নামাজের সময় যে মনোনিবেশের দরকার, নেশার অবস্থায় তাহা সম্ভবপর হয় না। এইরূপে সমাজ মনকে সংস্কার গ্রহণের জন্য ক্রমান্বয়ে উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার পর সূরা মায়দার ৯০ আয়াতে চরম আদেশ হিসাবে বলা হইতেছে যে,মাদক হইতেছে "একটা অতি জঘন্য—শয়তানী কাণ্ড,অতএব তোমরা ইহা হইতে নিবৃত্ত হও।" এখানে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের এবং দ্বিতীয় আয়াতটি তৃতীয় আয়াতের পরিপূরক মাত্র। উহার মধ্যে কোনো contradiction বা বিরোধ-বৈপরিত্য নাই।

সুতরাং এক্ষেত্রে কোনটির দ্বারা কোনটির মনছুখ (abrogated) বা রহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এই হিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, আলোচ্য আয়াত সূরা নূরের আয়াতের বিরোধী ও বিপরীত আদৌ নহে। সূরা নেছায় ব্যভিচারিণী নারীদিগের মঙ্গলের জন্য অন্য যে বিধান প্রকাশের স্পষ্ট আভাস দেওয়া হইতেছে, অনতিবিলম্বে সূরা নূরের আয়াতে সেই বিধানটাকে প্রকাশ করিয়া দিয়া বলা হইতেছে যে, অপরাধ প্রমাণিত হইয়া গেলেও নারীদিগকে আর আজীবন আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে না—

একশত দোর্রা মারিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। সূরা নেছায় শুধু অভিযোগকারীদিগকে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে নূরে বলা হইতেছে যে, অভিযোগকারী যদি চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দ্বারা নিজের অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত না করে বা করিতে না পারে, তবে প্রত্যেক অভিযোগকারীর প্রতি ৮০ দোর্রার দণ্ড বিধান করিতে হইবে। অধিকন্তু কোনো বিচার ক্ষেত্রে তাহাদের সাক্ষ্য কস্মিনকালেও গৃহীত হইতে পারিবে না – তাওবা না করা পর্যন্ত। (৪র্থ আয়াত)।* শেষোক্ত দণ্ড-বিধির ফলে নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হইয়া যাইতেছে, তাহাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। নারী সম্বন্ধে একটা যা-তা দুর্নাম প্রচার করিয়া দেওয়া এক শ্রেণীর নর-নারীর একটা জঘন্য অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কোর্আন এই কুৎসিত মানসিকতার প্রতিকার করিতে চাহিয়াছে।

এই আলোচনা হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সূরা নেছার ও সূরা নূরের আয়াতগুলি এই ব্যবস্থার বিভিন্ন সুসমঞ্জস স্তরের ক্রম-বিকাশ মাত্র। অধিকন্তু এই আয়াতগুলি পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর বিরোধী নহে। মানুষের ব্যবস্থায় সময় সময় এক আইনের দ্বারা অন্য আইনকে রদ বা রহিত করার দরকার উপস্থিত হয়। তাহার কারণ এই যে, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সমাজ জীবনের আশু, অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল দিকটাই তাহার নজরে পড়ে। সেই জন্য তাহার শাশ্বত দিকটা অনেক সময় তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। সুতরাং সে আইন প্রণয়ন করে সাময়িক গরজে, সাময়িক পরিবেশ এবং নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধি অনুসারে। কিন্তু আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্ব-মঙ্গলময়, তাঁহার বিধানে ত্রুটির স্থান হইতে পারে না, সুতরাং আল্লাহ্র মঙ্গলবিধানে নাছখ বা Abrogation এর কোনো দরকার কস্মিনকালেও উপস্থিত হইতে পারে না।

২১। **টীকাঃ ব্যভিচারী যুগলের দণ্ড**—ব্যভিচারের অভিযোগ করিয়া বা অপবাদ দিয়া নারীদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া যাওয়ার যে প্রথা, সাধারণভাবে আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতিকারের

* Whipping বা বেত্রদণ্ড বলিতে যে নির্লজ্জ ও নৃশংস পৈশাচিকতার দৃশ্য আমাদের মানসচক্ষে ভাস্বর হইয়া উঠে, কোর্আনের ও হাদীছের বর্ণিত "জালদ"কে তাহার উপর কেয়াছ করিলে ঘোরতর অন্যায় করা হইবে। শালীনতা ও মানবতার সম্ভ্রম সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া জেনার যে নিম্নতম দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে, কোর্আনে তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ব্যবস্থা প্রদানই ১৫ আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই এখানে শুধু ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত নারীদিগের কথাই বলা হইয়াছে, পুরুষ ব্যভিচারীর কোন প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় নাই। নারীকে এখানে কেবল স্বগৃহে আটকাইয়া রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেন দুষ্ট চরিত্র নর-নারীর সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া তাহার মোহ একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। ফলতঃ তাহাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দেওয়াই ছিল ১৫ আয়াতের লক্ষ্য।

আলোচ্য আয়াতে দণ্ডের কথা আসিতেছে, উভয় নারী ও পুরুষ ব্যভিচারীর জন্য। 'লাজানে' দ্বিবচন, এবং উহাতে সাধারণতঃ দুইজন পুরুষকেই বুঝায়, ইহা সত্য। কিন্তু যেখানে দুইজন নর-নারী সম্বন্ধে একই সর্বনাম ব্যবহার করা হইতেছে, সেখানকার জন্য এমন কোন শব্দ নির্বাচন করা সম্ভব নহে, যাহাতে একটি পুরুষ ও একটি নারীকে যুগপৎভাবে বুঝাইতে পারে। কাজেই হয় "লাজানে," না হয় "লাতানে" আনিতে হইবে। লাজানে শব্দে যেমন দুইজন পুরুষকে বুঝায়, লাতানে বলিলেও সেইরূপ দুইজন নারীকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে দ্বিবচন বা বহুবচন বাচক কোন এছমে-মওছুলা ব্যবহার করা আদৌ সম্ভব হইবে না। এই জন্য এসব ক্ষেত্রে পুরুষ বাচক শব্দই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা আরবী সাহিত্যের বাকধারা। ইহা ব্যতীত ইছলামী সাহিত্যে এবং আমাদের সাধারণ আইনের ভাষায়ও সর্বদাই He বলিতে She-কেও বুঝাইয়া থাকে। অন্যথায় ইছলামের শতকরা ৯০টা আদেশ-নিষেধের এলাকা হইতে নারীদিগকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। কারণ সেগুলির ক্রিয়া পদে ও বিশেষণে সর্বত্র পুরুষ বাচক শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে অনর্থক বাদবিতণ্ডা উপস্থিত করার কোনই প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, ব্যাকরণে বা অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে تغليب এর ব্যবহার বলা হইয়া থাকে।

এই আয়াতে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর ব্যভিচারীদিগের সম্বন্ধে, অন্তর্বর্তী কালের জন্য "ইজা" দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'ইজা' অর্থে আজিয়ৎ দেওয়া, মানসিক বা দৈহিক কষ্ট প্রদান করা, বাচনিক তিরস্কার ও ভর্ৎসনার দ্বারা নির্যাতন করা, পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া সৎ-উপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি সবই হইতে পারে। এক কথায় ব্যভিচারীর মনকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনাই হইতেছে এই নির্যাতনের উদ্দেশ্য। তাই আয়াতের শেষাংশে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যদি মন পরিবর্তন করে এবং অতীতের জন্য অনুতপ্ত হয়, তাহা হইলে অতঃপর আর তাহাদের

"পিছু লাগিও না—কষ্ট দান হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাইও।" ইহার পর আল্লাহ্ নিজের মহিমা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন—আমি হইতেছি সকলের অপেক্ষা তাওবা গ্রহণকারী, আমি হইতেছি তোমাদের সকলের কৃপানিধান প্রভু—আল্লাহ্। অর্থাৎ, তাওবার পর তোমরাও তাহাদিগকে সাদরে স্নেহে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিবে—নিমেষের মোহাবশে পদস্খলিত হইয়াছে যাহারা, চিরদিনের জন্য তাহাদের জীবনকে নরক কুণ্ডে পরিণত করিয়া দিও না।

২২। **টীকা : তাওবা, প্রকৃত তাৎপর্য**—তাওবা ও অনুতাপ একটা মানসিক অনুভূতির ব্যঞ্জনার নাম। কোনো পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর,—তাহার জন্য লোকনিন্দার বা দণ্ড ভোগের ভয় থাকুক বা না থাকুক—স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে মানুষের বিবেকে আত্মগ্লানির যে তীব্র জ্বালা জাগিয়া উঠে এবং তাহার ফলে সেই পাপের প্রতি তাহার অন্তরে যে তীব্র ঘৃণার অনুভূতি উদ্রিক্ত হইয়া যায়, সেই মর্মজ্বালা বা সেই অনুভূতিকেই আমরা অনুতাপ বলিব। ইহাই তাওবার দ্যোতক।

এই সূরার ৪৬ আয়াতে বলা হইতেছে: "যাহারা অনুতপ্ত হয় ও আত্ম-সংশোধন করিয়া নেয়" তাহাদের তাওবাই আল্লাহ্ কবুল করিয়া থাকেন। বাস্তবক্ষেত্রের এই আত্মসংশোধনই হইতেছে সত্যকার তাওবার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। ইহা ব্যতীত দিন-রাত্রে সহস্রবার মুখে "তাওবা" "তাওবা" চিৎকার করিলেও আল্লাহ্‌র হুজুরে তাহার কোনো মূল্য নাই। কারণ আল্লাহ্ মানুষের মনকে দেখেন এবং তাহার মনের আন্তরিকতা বা কপটতা সমস্তই তাঁহার গোচরে আছে,—"নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"

আমাদের দেশে শেষ বয়সে একবার তাওবা করার এবং মুরীদ তলকীন হইয়া নেওয়ার একটা রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এক শ্রেণীর অজ্ঞ বা অসাধু লোকের দীর্ঘকালের ব্যাপক প্রচারণার ফলে, জনসাধারণের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, পাসপোর্ট সংগ্রহের ন্যায়, শেষ যাত্রার সময় কোনো পীরের সার্টিফিকেট না থাকিলে পরকালের পথটা খুবই দুর্গম হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি পীর না ধরিলে সারা জীবনের ইবাদত-বন্দেগীও ব্যর্থ হইয়া যায়। গুরুপূজার এই অন্যায় সংস্কার বর্তমানে কিছুটা কম হইলেও একেবারে নিঃশে-ষিত হয় নাই। তাহার পর আজরাইল ফেরেশতা মাথার উপর হাজির না হওয়া পর্যন্ত যখন তাওবা কবুল হয়, তখন নিজের পূর্ণ সজ্ঞানে না হউক, নিকটা-ত্মীয়গণের আয়োজনে, শেষকালে তাওবা করাইবার ব্যবস্থা হইয়া যায়। এই

শ্রেণীর তাওবার মূল্য কতটুকু, পাঠকগণ নিজেরাই তাহা আল্লাহ্‌র কালাম হইতে জানিয়া লউন।

২৩। **টীকাঃ জবরদস্তি নারীর ওয়ারিস হওয়া**—নারী সমাজ সম্বন্ধে প্রাক্-ইছ্‌লামিক যুগে দুনিয়ার দিকে দিকে যে সব অত্যাচার ও কদাচার প্রচলিত ছিল, পূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। ইহার মধ্যে নারী-দেহের উপর তাহার মৃত স্বামীর ওয়ারিসগণের উত্তরাধিকারলাভের "আচার"ই ছিল সর্বাপেক্ষা পৈশাচিক প্রথা। এই প্রথা অনুসারে, মৃত আত্মীয়-স্বজনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায়, তাহার বিধবা স্ত্রীরাও ওয়ারিসদিগের ভোগ-দখলে আসিত এবং কখনও তাহাদিগকে নিজেরা বিনা মোহরে বিবাহ করিয়া ফেলিত, কখনও অন্যের সহিত বিবাহ দিয়া মোহরের টাকা নিজে ভোগ করিত। অথবা তাহার ধন-সম্পত্তি কিছু থাকিলে, তাহা অপহরণ করার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিত। এমন কি, মৃত ব্যক্তির পুত্ররা পর্যন্ত এই শ্রেণীর জঘন্যতায় লিপ্ত হইতে একবিন্দুও দ্বিধাবোধ করিত না। কারণ, দুনিয়ার সমস্ত অসভ্য ও পৌত্তলিক জাতির ন্যায় দেশপ্রথা বা "রেওয়াজ"-কেও তাহারা আইন বলিয়া মনে করিত।

সাধারণ তাফ্‌ছীরকারগণ এই ঐতিহাসিক পশ্চাৎভূমির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন—এই আয়াত সেই পুরাতন কুপ্রথার প্রতিকার সম্বন্ধেই নাজেল হইয়াছে। কিন্তু অন্য একদল তাফ্‌ছীরকার এই মতের সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যেও আবার মতভেদ দেখা যায়। সে যাহা হউক, এই আয়াতের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিচার আলোচনা করিয়া, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আয়াতের প্রথম অংশটিতে একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে এবং সেই জন্য ইহার শেষে ৮এর চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, অবস্থাপন্ন বিধবা আত্মীয়াদের বিবাহ দিতে তাহাদের আত্মীয় বা অভিভাবকগণ সম্মত হইতে চান না। কারণ, বিধবা অবস্থায় মরিয়া গেলে তিনি বা তাঁহার ওয়ারিসরাই তাহার সম্পত্তির উত্তরা-ধিকার লাভ করিতে পারিবেন। এমন কি, সম্পত্তিতে শরীক ঢোকার ভয়ে নিজের ভগ্নী ও কন্যাদিগের আদৌ বিবাহ দিতে চাহেন না—এরূপ দুই-চারিটা বড় ঘরের সংবাদ ব্যক্তিগতভাবে এই লেখকেরও জানা আছে। আমার মতে নারীদিগকে এই শ্রেণীর অত্যাচারী অভিভাবকদিগের কবল হইতে রক্ষা করাই এই অংশের আশু উদ্দেশ্য।

ورث ক্রিয়ার কর্ম যখন ব্যক্তি না হইয়া বস্তু হয়, তখন তাহার অর্থ হয় অমুক

ব্যক্তি মালের ওয়ারিস। সুখের বিষয় শাহ্ রফীউদ্দীন ও মাওলানা হাক্কানী ছাহেবও আয়াতের এই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে বিবাহিত স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, এবারাৎকে স্বতন্ত্রভাবে আরম্ভ করিয়া। দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বামীর মনে স্ত্রী সম্বন্ধে একটা বীতরাগ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ফলে তাহার সহিত সৌহৃদ্যের ভাব বজায় রাখিয়া চলা স্বামীর পক্ষে দিন দিন অধিক দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। পক্ষান্তরে স্বামীর এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় স্ত্রীর মনও ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া যাইতেছে। অনেক সময় দৈনন্দিন মান-অভিমানের নগণ্য অজুহাতকে অবলম্বন করিয়াই পরিণামে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া যায় এবং কালক্রমে উভয়ের অন্তরের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইতে থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করিয়া যাওয়া, তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। এক শ্রেণীর স্বামী এ অবস্থায় ধৈর্য হারাইয়া স্ত্রীবর্জনের সঙ্কল্প করিয়া বসে। কিন্তু সঙ্গে মোহরের টাকার কথা স্মরণ হয়, গহনা-পত্রের বিষয়ও মনে আসে। মোহর বাকী থাকিলে তাহা পরিশোধ করার ও নূতন মোহর প্রদানের দুশ্চিন্তারও উদ্রেক হইতে থাকে। এই সময় স্বামী (হয় তো তাহার স্বজনগণের সহায়তায়) স্ত্রীর সহিত দুর্ব্যবহার করিতে থাকে, জ্বালাযন্ত্রণা দিয়া স্ত্রীর জন্য এমন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে থাকে, যাহাতে সে নিজের প্রাপ্য ত্যাগ করিয়া অথবা আরও কিছু নগদ দিয়া স্বামীর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে।

আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় এই কার্যপদ্ধতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইতেছে। স্ত্রী বর্জন করা অবস্থা বিশেষে ও শর্তাধীনে মুছলমানের পক্ষে অবৈধ নহে বটে, কিন্তু তাহার জন্য এই শ্রেণীর অসাধু উপায় অবলম্বন করা কোনো মুছলমানের পক্ষে বৈধ হইতে পারে না। স্ত্রীদিগের নিকট হইতে এই প্রকারে তাহার ধন অপহরণ করা, স্বামীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এই নিষেধের একটি মাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারে, স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার পর। কারণ "সে অবস্থায় দাম্পত্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলা স্বামীর পক্ষে সম্ভব নহে, এবং তাহার জন্য স্ত্রীই দায়ী, এ অবস্থায় স্ত্রী-ধনের কতক অংশ ফেরত নেওয়া এবং স্ত্রীকে বর্জন করা স্বামীর পক্ষে অবৈধ হইবে না।"

আয়াতের শেষভাগে স্বামীকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। বলা হইতেছে যে, দাম্পত্য জীবনের এই মান-অভিমান বা তজ্জনিত বীতরাগ একট সাময়িক পরিস্থিতি মাত্র, অনেক সময়, ভুল বুঝা-বুঝির ফলেই এই পরিস্থিতির

উদ্ভব হইয়া থাকে। মানব সমাজের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, এইরূপ অবস্থায় আজ যে স্ত্রী স্বামীর দৃষ্টিতে নিতান্ত অনভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্ত্রীই আবার অশেষ কল্যাণের ও আন্তরিক সোহাগ-সম্প্রীতির পাত্রী হিসাবে, স্বামীর আদর্শ জীবন সঙ্গিনী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। উহার প্রধান উপায় হিসাবে স্বামীকে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

হাদীছে—"যৌবনকে উন্মাদের একটা শাখা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সময় দাম্পত্য জীবনে সর্বপ্রথমে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় প্রেমের দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ নিয়া। যে কৈবল্য ও সাকুল্য হইতেছে প্রেমের পরম আদর্শ, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সে সময় পরস্পরের প্রতি অভিযোগ পোষণ করিতে থাকে, সেই লেনা-দেনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে। কিন্তু মূলতঃ ইহা বিদ্বেষও নহে, বিদ্রোহও নহে। এই অবস্থায় আসল ত্রুটি ঘটিয়া যায় এই জন্য যে, স্বামী ও স্ত্রী এই সময় কেবল নিজের ভাব-প্রবণতায় মত্ত হইয়া থাকে, অন্যের প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর পায় না। এইটাই হইল প্রেমের অসংযত উন্মাদনা বা উন্মাদ রোগ। পক্ষান্তরে এই যে আত্মমুখী ভাবপ্রবণতা, বস্তুতঃ ইহা প্রেমের সত্যকার আদর্শও নহে। যে প্রেমে প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা নাই, সে "প্রেম" রূপজ বা কামজ মোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রেরণাই আবার অন্যপক্ষের অন্তরের অন্তস্তলে সম-প্রেরণার উদ্রেক করিয়া দেয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বিশেষরূপে জানা উচিত যে, অপর পক্ষকে প্রেম সংগ্রামে পরাজিত ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে, ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর ও সুফলতর পন্থা আর কিছুই নাই।

২৪। **টীকা: তালাক ও মোহর**—১৯ আয়াতে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ প্রকার তালাকের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে সাধারণ অবস্থার তালাক সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন যদি বস্তুতঃই দুর্বহ হইয়া দাঁড়ায়, সে অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, কোর্‌আনের বিবিধ-ব্যবস্থা অনুসারে। (বাকারা ২৯—৩২ রুকূ)। কিন্তু স্ত্রীর মোহরের সামান্য অংশও স্বামী ফিরাইয়া পাইতে পারিবে না। "যাহা প্রদান করিয়াছ"—অর্থে যে মোহর প্রদান করিয়াছ অথবা প্রদান করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছ।

দাম্পত্য সম্বন্ধের এইরূপ চরম শোচনীয় অবস্থায়, দুইটি জীবনকে একত্রে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করা হইলে তাহাদের, তাহাদের সন্তানগণের এবং তাহাদের

উভয়ের পরিজনবর্গের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে। "এক স্ত্রী স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ্ করিতে চাও"—অর্থাৎ এক স্ত্রীকে বর্জন করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও। বিবাহযোগ্য পুরুষ বা নারী অবিবাহিত থাকিবে না, ইহাই ইছ্‌লামের সাধারণ আদর্শ। এই আদর্শ অনুসারে তালাকের পর, স্বামী ও স্ত্রী নিজ নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারে অন্য বিবাহ করিবে, ইহাই নিয়ম। খ্রীষ্টান আইন অনুসারে আদালতের বিচারে স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি স্থায়ী বিচ্ছেদের আদেশ জারী হইলেও, তাহারা আজীবন্ অন্য বিবাহ করিতে পারিবে না—করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু তাহারা যদি আজীবন প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করিতে থাকে, তাহাতে কোনো অপরাধ ঘটিবে না। শুধু স্ত্রীলোকটি কাহারও বিবাহিতা স্ত্রী না হওয়া চাই, আর বিবাহিতা হইলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বামীর সম্মতির প্রমাণ থাকা চাই। ইহা ব্যতীত "বলাৎকার" না হওয়া চাই। আয়াতে استبدال শব্দ ব্যবহার করিয়া এই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থারও প্রতিবাদ করা হইতেছে। কেহ যদি অন্য বিবাহ করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাকে আর তালাকী স্ত্রীর মোহর শোধ করিতে হইবে না, এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না।

আয়াতে বলা হইয়াছে—স্বামী যদি স্ত্রীকে "কেন্‌তার" পরিমাণ ধন-সম্পদও মোহর হিসাবে (বা সাধারণ দান হিসাবে) প্রদান করিয়া থাকে, তাহা হইলেও সেই ধন-সম্পদের সামান্য অংশও সে ফিরাইয়া নিতে পারিবে না। কেন্‌তার শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে অনেক প্রকার অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। সে সবের সার অর্থ হইতেছে, রাশীকৃত ধনসম্পদ, সোনারূপার স্তূপ বা অগাধ ধন। ইহার সহিত ওমর ফারূকের খলিফা জীবনের একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনার সম্বন্ধ আছে :—

"একদা ওমর ফারূক রাছুলুল্লাহ্‌র মেম্বরে উঠিয়া, উপস্থিত মুছলমানগণকে অধিক পরিমাণে মোহর নির্ধারণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, অতঃপর কেহ চারিশত দেরহামের অধিক মোহর দিলে, আমি সেই অতিরিক্ত টাকা বাজেয়াফত করিয়া নিব এবং তাহা মুছলমানদিগের বায়তুল মালে দাখিল করিয়া দিব।" খোৎবা শেষ করিয়া নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে এক-জন স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—

"আমীরুল্ মুমেনীন। আপনি এই অন্যায় নির্দেশ দিলেন কি করিয়া ?"

"কেন ? অন্যায়টা কোথায় হইল ?"

"অন্যায় নয়। আল্লাহ্ নারীদিগকে যাহা দিয়াছেন, আপনি তাহা কাড়িয়া নিতে চাহিতেছেন ?"

"নারীদিগকে আমি কোন্ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলাম ?"

"দেখুন খলিফা ! আল্লাহ্ বলিতেছেন—'স্ত্রীদিগকে যদি কেন্তার বা স্তূপ পরিমাণ স্বর্ণও মোহর হিসাবে প্রদান কর।' সুতরাং স্ত্রীদিগকে স্তূপীকৃত স্বর্ণ মোহরে দেওয়ার স্পষ্ট অনুমতি আল্লাহ্র কালাম হইতে পাওয়া যাইতেছে। অথচ আপনি মোহরের উচ্চতর পরিমাণ বাঁধিয়া দিতেছেন মাত্র চারিশত দেরহাম।"

"ঠিক কথা মহিলা। ওমর অসঙ্গত নির্দেশ দিয়াছিল, আর তুমি তাহার সংশোধন করিয়া দিলে। দেখিতেছি, মদীনার নারীরাও ওমর অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞ।" (এবন-কাছীর)।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের নারী সমাজের মর্যাদা শৃগাল-কুকুর অপেক্ষা কোনো অংশেই ভাল ছিল না, পাঠকগণ ইহা দেখিতেছেন, ভবিষ্যতে আরও দেখিতে পাইবেন। সেই সমাজের একজন নারী নির্ভীক মনে দৃঢ় ভাষায় প্রকাশ্য জন-সম্মেলনে প্রতিবাদ করিতেছেন—প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা, মোছলেম জাহানের প্রধানতম আমীর, হযরত ওমর ফারূকের—যুক্তি-প্রমাণ সহকারে। অন্যদিকে ফারূকে আজম হযরত ওমর, অর্ধ পৃথিবী যাঁহার নামে কম্পিত হইত —সেই ওমর, নিরীহ শিশুর ন্যায় নারীর প্রতিবাদ শ্রবণ করিতেছেন, তাহার যুক্তি-প্রমাণ জানিতে চাহিতেছেন এবং জানার পর আত্মসমর্পণ করিতেছেন, সেই নারীর মহিমা কীর্তন করিতেছেন। আবার মেম্বারে আরোহণ করিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন, নিজের পূর্ব-নির্দেশ বাতিল করিয়া দিতেছেন। (*) কিন্তু হায়, আজ চন্দ্র-সূর্যের প্রদীপ নিয়া মোছলেম জাহানের দিকে দিকে সন্ধান করিয়া দেখ, কুত্রাপি এই আদর্শের সামান্য একটু আভাসও খুঁজিয়া পাইবে না। যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে দুনিয়ার দৈত্য-দানব মানুষ হইয়াছিল, মানুষ ফেরেশ্তাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, তাহা তো আজও আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজমান। তবু আজ আমাদের এই শোচনীয় দুর্দশা। ইহার কারণ কি, পাঠকগণ একবার তাহা নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলে, বৃদ্ধ বয়সের এই দুর্বহ শ্রমকে সার্থক মনে করিব।

মোহরের ঊর্ধ্বতম পরিমাণ নির্ধারিত নাই, ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোহর মানে মোহর বাঁধা নয়, মোহর দেওয়া এবং বিবাহের সময়ে নগদ দেওয়া। যাঁহার অবস্থায় কুলায়, তিনি স্ত্রীকে বা পুত্রবধূকে এইভাবে হাজার টাকা দিন, লাখ টাকা দিন, ইছলামের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া "পাঁচ টাকা নগদ আর পাঁচ হাজার টাকা আয়েন্দা ওয়াদার" যে

রেওয়াজ, আমাদের সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কোর্‌-আনের মৌলিক শিক্ষার বিপরীত। স্ত্রীদিগকে কার্যতঃ তাহাদের প্রাপ্য মোহর হইতে বঞ্চিত করার, একটা ন্যায়ের ফাঁকি ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। যাহার অবস্থায় না কুলায়, সে পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা, মোহর নগদ দিয়া স্ত্রী গ্রহণ করুক। বিবাহের সিদ্ধতার জন্য মোহর দেওয়া যে কিরূপ অপরিহার্য, এই রুকূতেও পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই জন্যই আয়াতের শেষভাগে ভর্ৎসনার স্বরে বলা হইতেছে—তবে কি তোমরা স্ত্রীদিগের মোহর ভোগ করিতে চাও, অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অন্যায় ভাবে ?

২৫। **টীকা : মোহর সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ**—পূর্ব আয়াতে তালাকের বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া, তালাকী স্ত্রীর মোহরের কোনো অংশ গ্রহণ করিতে স্বামীকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু মোহর বা স্ত্রীধন ফিরাইয়া নেওয়া, নীতির হিসাবে সকল অবস্থাতেই নিষিদ্ধ—তালাক হউক বা না হউক। তাই এই আয়াতে আবার সাধারণ ব্যবস্থা হিসাবে বলা হইতেছে—স্ত্রীদিগের মোহর তোমরা কিরূপে, ন্যায় ও নীতির কোন্ যুক্তি বলে, গ্রহণ করিতে পার ? অর্থাৎ কোনো প্রকারে গ্রহণ করিতে পার না। করিলে তাহা জুলুম হইবে, মহাপাতক হইবে। ইহার পর এই ঘোষণার সমর্থনে দুইটি যুক্তি দেওয়া হইতেছে।

প্রথম যুক্তি : আল্লাহ্ বলিতেছেন—وقد افضى بعضكم الى بعض "যে অবস্থায় তোমাদের মধ্যে "সহবাস" হইয়া গিয়াছে, সে অবস্থায় স্ত্রীর মোহর তোমরা গ্রহণ করিতে পার কি করিয়া" ? অর্থাৎ সহবাসের পর—স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া ব্যতীত, অন্য কোন অবস্থাতেই মোহর বা তাহার কোনো অংশ গ্রহণ করা স্বামীর পক্ষে বৈধ হইতে পারে না। সুতরাং ইহা হইতে, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে, প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ত্রীর সহিত সহবাস বৈধ হইয়াছে মোহর দেওয়ার কারণে। বোখারী, মোসলেম, আবু-দাউদ, নাছায়ী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে 'লেআন' (১) সংক্রান্ত একটি মোকদ্দমার বিবরণে উল্লেখ আছে যে, রাছুলে কারীম একটি বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা করেন, তখন স্বামী হযরতকে বলিলেন—আমি যে মোহর দিয়াছি, তাহার কি হইবে ? হযরত উত্তরে বলিলেন,তাহা তুমি ফেরত পাইতে পার না-فهو بما استحللت من فرجها

"স্ত্রীর সহিত বৈধভাবে সহবাস করিয়াছ, ইহার জন্যই ত মোহর।" হাফেজ এবন-কাছীর এই হাদীছ উল্লেখ করার পর বলিতেছেন—এই জন্যই আল্লাহ্ বলিয়াছেন—তোমাদিগের মধ্যে "সহবাস" হওয়ার পর মোহর ফিরাইয়া নেওয়া

কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

দ্বিতীয় যুক্তি : স্ত্রীরা স্বামীদিগের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে। আলোচ্য অবস্থায় স্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তালাক দিতেছে, অথচ মোহরের টাকাও গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, ইহাতে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হইবে এবং মুছলমানের পক্ষে ইহা সর্বতোভাবে অবৈধ। সুতরাং মোহরের টাকা স্বামী ফিরাইয়া পাইতে পারে না।

"সেই অঙ্গীকারটা কি ? কখন কি প্রকারে এই অঙ্গীকার করাইয়াছে ? এই প্রশ্নটা আজ মুছলমানের নিকট একটা উদ্ভট সমস্যা বলিয়া মনে হইবে। আমরা পুরুষ পরম্পরাক্রমে শুনিয়া ও বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, মুছলমানের বিবাহ একটা Civil contract বা দেওয়ানী চুক্তি মাত্র। সুতরাং বিবাহের সময় বধূ "হুঁ" আর বর "কবুল" করিলেই চুক্তি সম্পন্ন হইয়া গেল। মোহরের প্রসঙ্গটা বরের পাগড়ীর মত, বিবাহের পর তাহার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন, আজ আমাদের সমাজ জীবনে একটা অভিনব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অবান্তরও নহে, অভিনবও নহে। পরন্তু মুছলমানের বিবাহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের প্রাণবস্তুই হইতেছে কোরআনের বর্ণিত এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিগুলি।

আর একটা ছহী হাদীছ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلعم ان احق الشرط
ان يوفى به ما استحللتم به الفروج (مسلم ج ١ ص ٤٥٥)

"যত প্রকারের অঙ্গীকার করা হয়, তাহার মধ্যে সর্বপেক্ষা অধিক অবশ্য পালনীয় হইতেছে সেইটি—যাহার ফলে তোমরা স্ত্রীর সহিত সহবাস করাকে বৈধ করিয়া নিয়া থাক (মোছলেম, ১—৪৫৫)।

পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন, সূরা নেছার প্রথম আয়াতে নরনারীর মৌলিক ঐক্য ও তাহাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর, স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, "তোমরা স্বামী ও স্ত্রীরূপে পরস্পরের নিকট যে অধিকার লাভের দাবী করিয়া থাক, সে অধিকার তোমাদিগেতে বর্তিয়াছে আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে।" এই সব সত্য প্রকাশের পর স্বামী-স্ত্রীকে সেই বিধান সম্বন্ধে সদা সতর্ক হইয়া চলিতে আদেশ দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা এই বিধানের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলে কি-না, আল্লাহ্ তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিবেন। অর্থাৎ ঐ বিধানের অমর্যাদা করিলে তাহা-

দিগকে এই নাফরমানীর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ইহা হইল দাম্পত্য সম্পদের প্রাথমিক ভূমিকা। ইহার পর ৩য় আয়াতে فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم বলিয়া বৈধভাবে বিবাহ করার ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। ইহাকে বিবাহের প্রতিজ্ঞা বা عقد نكاح বলা হয়। এই আক্‌দ বা আক্‌দ খানি শব্দ আমাদের দেশেও বহুলভাবে প্রচলিত আছে। কোর্‌আনেও ইহাকে عقدة النكاح বলা হইয়াছে। ইহার ধাতুগত অর্থ বন্ধন, গ্রন্থি বন্ধন, ইত্যাদি। সাধারণতঃ কোনো একটি চুক্তি সম্বন্ধে দুই পক্ষের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি বা একরার-অঙ্গীকার সম্বন্ধেই ইহার ব্যবহার হয়। সুতরাং "নেকাহ কর" পদের অর্থ দাঁড়াইতেছে "স্বামী ও স্ত্রী আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও।"

সূরা রূমের ৩য় রুকুতে সম্পূর্ণভাবে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অবধারিত নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। রুকূর প্রথমে বলা হইতেছে—"আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যকার একটি (নিদর্শন) এই যে, তিনি তোমাদিগকে পয়দা করিলেন মাটি হইতে, পরে কালক্রমে তোমরা মানুষরূপে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া চলিতেছ।" (২০)।

"আর তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যকার একটি (নিদর্শন) এই যে, তিনি তোমাদিগের কল্যাণার্থে তোমাদিগেরই সম-উপাদান হইতে, তোমাদিগের যুগলার্ধ (জোড়া) গুলিকে পয়দা করিয়াছেন—যেমতে তোমরা পরস্পরের সংস্রবে স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিতে পার, এবং এইজন্য তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ ও করুণা (সঞ্চার) করিয়া দিয়াছেন; নিশ্চয় এই ব্যাপারে চিন্তাশীল লোকদিগের জন্য বহু নিদর্শন (নিহিত) আছে। (২১)

এই আয়াতগুলিতে দম্পতিযুগলের, বিশেষতঃ স্বামীর প্রতি যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা তাহারা পালন করিয়া চলিবে, ইহাই হইতেছে বিবাহের অঙ্গীকার। প্রত্যেক বিবাহের খোৎবায়, প্রথমে হামদ-নাআৎ, তাহার পর কলেমায়ে শাহাদাৎ এবং তাহার পরেই কোর্‌আনের তিনটি আয়াত * তেলঅত করিয়া সর্বাগ্রে স্বামী ও স্ত্রীকে এই অঙ্গীকারের কথা নূতনভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, ঈজাব কবুল হয় তাহার পরে।

দীর্ঘ ২৩ বৎসর ব্যাপী নবী-জীবনের সমস্ত সাধনা ও সংগ্রাম সুসমাপ্ত করার পর, রহমাতুল-লিল-আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফা আরাফাতের ময়দানে

বিপুল মোছলেম সম্মেলনের সম্মুখে যে শেষ খোৎবা দিয়াছিলেন, সেই খোৎবায় অন্য সব বক্তব্য শেষ করার পর উপসংহারে বলেন :

فاتقو الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله الحديث (مسلم ج ١ ص ٣٩٨)

"অতঃপর, নিজ স্ত্রীদিগের প্রতি আচার-ব্যবহারে তোমরা আল্লাহ্‌র (আদেশ-নিষেধ) সম্বন্ধে সদা সতর্ক হইয়া চলিবে। সাবধান! তোমরা উহাদিগকে (স্ত্রীরূপে) গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহ্‌র security বা জামানতে এবং তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের সহবাস স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র কলেমা বা ফরমান অনুসারে। (মোছলেম ৩৯৭ প্রভৃতি।)

সংসার ধর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক তরুণী নারী, নিজ পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয়-স্বজনের আদরের সোহাগের চির অভ্যস্ত পরিবেশকে বিসর্জন দিয়া, সম্পূর্ণ এক নূতন পরিবেশকে সানন্দে অবলম্বন করিতে যাইতেছে—কিসের আশায়, কোন্ শক্তিমানের জামানতের (অভয়ের) উপর নির্ভর করিয়া? সে জামানাত হইতেছে কোর্‌আনের প্রেম-প্রীতি এবং আদর অনুরাগ পাওয়ার আশ্বাস। তাহার রক্ষাকবচ হইতেছে, আল্লাহ্‌র কলেমা—তাঁহার বিধান বা ফরমান।

২৬। **টীকাঃ জঘন্য প্রথা**—বিধবা-বিমাতাকে বিবাহ করার কদর্য প্রথা প্রাক-ইছলামিক যুগের আবরদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, পাঠকগণ ইহা পূর্বে অবগত হইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস ও হাদীছ গ্রন্থগুলির আলোচনার দ্বারা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ইছলামী শিক্ষার নৈতিক প্রভাবে, এই কুৎসিত প্রথার বিরুদ্ধে সমাজ মনে একটা ঘৃণার ভাবও সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, বিশেষতঃ নারী সমাজের মনে। পূর্বে বিবাহ সম্বন্ধে, বরং সামাজিক জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, নারী সমাজের স্বাধিকার বলিয়া কিছুই ছিল না। কিন্তু কোর্-আনের শিক্ষা ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদর্শের কল্যাণে, ক্রমান্বয়ে সে অবস্থার পরিবর্তন হইতে থাকে। এমন কি, হাদীছে দেখা যায়, সূরা নেছার এই আয়াতটি নাজেল হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে, নারীরা পর্যন্ত হযরতের দরবারে অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন—"স্বামীর পুত্র আমার পুত্র এবং আমি তাহার মাতা। মাতা পুত্রের স্ত্রী হইবে, এ কেমন কথা।" (আল্-মানার ৪—৪৬৪) কিন্তু তখনও ইহার বিরুদ্ধে আইন-হিসাবে কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই।

আলোচ্য আয়াতে ইহারই চরম নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, এই শ্রেণীর বিবাহ বিবাহই নহে, বরং ব্যভিচার মাত্র। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি এই কর্মে লিপ্ত হইলে, তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হইবে। বিভিন্ন হাদীছের বর্ণনায় দেখা যায়, এই শ্রেণীর একজন অপরাধীর প্রতি হযরত প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। (এবন্‌-কাছীর)। ২১ আয়াতে নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, "কিন্তু অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ এই হুকুম নাজেল হওয়ার পূর্বে এই শ্রেণীর যে-সব "বিবাহ" হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কাহাকেও দণ্ড দেওয়া হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বর্জিত বিধির প্রয়োগ হইবে শুধু দণ্ড সম্বন্ধে। পূর্বে হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে বৈধ বিবাহ বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। একটু পরে একত্রে দুই ভগ্নীকে বিবাহ করা সম্বন্ধেও ঠিক এই ভাষায় বলা হইয়াছে—"কিন্তু অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে।" ইহার তাৎপর্য এই যে, অতঃপর দুইটির একটিকে বর্জন করিতে হইবে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রচারের পূর্বকার ঘটনা বলিয়া স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না।

কোন্ কোন্ নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, এই আয়াত হইতে তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। "মাতৃগণ" সংক্রান্ত সাধারণ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এখানে স্বতন্ত্রভাবে এই নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, ব্যাপারটার কদর্যতা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য। আয়াতের শেষ অংশে সেই কদর্যতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

---

৪ রুকু

২৩। নিষিদ্ধ করা হইল তোমাদিগের জন্য—(বিবাহ করা)—তোমাদিগের মাতৃবর্গকে, ও কন্যাদিগকে, ও ভগ্নীদিগকে, ও ফুফুদিগকে, ও খালাদিগকে, ও ভ্রাতার কন্যাদিগকে, ও ভগ্নীর কন্যাদিগকে, ও সেই-

٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ
وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ
وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ
وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ

সব (ধাত্রী) মাতাদিগকে, যাহারা তোমাদিগকে স্তন্য পান করাইয়াছে, ও দুধ-ভগ্নীদিগকে, ও তোমাদিগের স্ত্রীগণের মাতৃ-বর্গকে, ও তোমাদিগের স্ত্রী-গণের (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) সেইসব কন্যাদিগকে, যাহারা (সাধারণতঃ) প্রতিপালিত হইয়া থাকে তোমাদিগের ক্রোড়ে(এবং) যাহাদের জননীদিগের সহিত তোমরা সহবাস করিয়াছ—কিন্তু যদি সহবাস না করিয়া থাক, (সেরূপ স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করাতে) তোমাদিগের প্রতি কোন পাপ বর্তিবে না—আরও (নিষিদ্ধ করা হইল) তোমাদিগের ঔরসজাত পুত্রগণের স্ত্রীদিগকে, ও একত্র করা দুই ভগ্নীকে, তবে অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাশীল, কৃপানিধান,—(২৭)

الّٰتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ
نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ
فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ
الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ
لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ
اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ
اَصْلَابِكُمْ لا وَاَنْ تَجْمَعُوْا
بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا لا ۝

২৪। আরও (নিষিদ্ধ করা হইল) নারীদিগের মধ্যকার যাবতীয় সধবা স্ত্রীলোককে—তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে, ইহা হইতেছে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় নির্দেশ, (২৮) ইহা ব্যতীত অন্য নারীদিগকে(বিবাহ করা) তোমাদের জন্য বৈধ হইল এই শর্তে যে, তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করার চেষ্টা পাইবে নিজেদের ধন দ্বারা, স্ত্রীরূপে—(কেবল) কাম চরিতার্থ করার জন্য নহে; (২৯) অতএব যাহা কিছুর (যে মোহর ও অঙ্গীকার প্রভৃতির) দরুন তোমরা তাহাদিগের দ্বারা উপকার লাভ করিতেছ, নির্ধারণ অনুসারে সেই সমস্তের সুফলগুলি তাহাদিগকে প্রদান করিবে," (৩০) অবশ্য এইরূপ নির্ধারণের পর উভয় (স্বামী-স্ত্রী) সম্মত হইয়া যে ব্যবস্থা কর, তাহাতে তোমাদের প্রতি কোনও পাপ বর্তে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন সর্ববিদিত, প্রজ্ঞাময়।

২৪ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ج وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْ
هُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ط
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيْضَةِ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২৫। আর তোমাদের কাহারও যদি আজাদ মোছলেম নারীকে বিবাহ করার মত সচ্ছল অবস্থা না থাকে, তাহা হইলে (সে বিবাহ করিতে পারে) তোমাদের (সমাজের) অধিকারভুক্ত কোনো মুছলমান "কিশোরী"-কে; বস্তুতঃ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত:—তোমরা তো পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন,—এ অবস্থায় ঐ বাঁদীদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদিগের পরিজনবর্গের (বা মালিকগণের) অনুমতি অনুসারে, এবং তাহাদিগকে মোহর দিয়া দিবে। যথারীতি সাধুতার সহিত, যে অবস্থায় তাহারা হইবে সচ্চরিত্রা, অকুলটা—অধিকন্তু তাহারা উপপতি গ্রহণকারিণীও হইবে না। (৩১) সে মতে তাহারা বিবাহিত হইবে যখন, তাহার পর তাহারা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সে অবস্থায় আজাদ নারীদিগের (জন্য নির্ধারিত) দণ্ডের অর্ধেক দণ্ড (তাহাদিগকে দিতে হইবে);

۲۵ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ
الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ
الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ أَعْلَمُ
بِإِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَ
هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ
أَخْدَانٍ ج فَإِذَا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ

(৩২) যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, এ অনুমতি (কেবল) তাহার জন্য; আর আত্মসংযম করিয়া থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাপরায়ণ, কৃপানিধান।

مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ع

তাফ্‌ছীর

২৭। **টীকা ঃ অবৈধ নারী**—কোন্ কোন্ শ্রেণীর নারীদিগের সহিত রিবাহ করা মুছলমানের পক্ষে হারাম, এই আয়াতে তাহার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই নিষিদ্ধ নারীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, শোণিত সম্পর্কের নিকট-আত্মীয়া, এবং দ্বিতীয়, দুধের বা বিবাহ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়া। শোণিত সম্পর্কের নিষিদ্ধ আত্মীয়ারা সাত প্রকার —

(১) মাতৃবর্গ—উম্ বা মাতা বলিতে মৌলিক অর্থের হিসাবে কেবল গর্ভধারিণী জননীকে বুঝায়। কিন্তু ধর্মীয় পরিভাষায়, নানী, দাদী প্রভৃতি ঊর্ধ্বতন মাতৃবর্গ সকলেই এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত।

(২) কন্যাবর্গ—কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী প্রভৃতি direct শোণিত সম্পর্কিয়া অধস্তন নারিগণ।

(৩) ভগ্নীবর্গ—সহোদরা ভগ্নী, বৈমাত্রেয়া ভগ্নী ও বৈপিত্রেয়া ভগ্নিগণ এবং তাহাদের কন্যা প্রভৃতি অধস্তন নারিগণ।

(৪) ফুফুবর্গ—পিতার ভগ্নী, পিতামহের ভগ্নী ও মাতামহের ভগ্নী ইত্যাদি। মাতামহের ভগ্নীকে খালা-বর্গের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

(৫) খালাবর্গ—মাতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া ভগ্নী এবং নানীর এইরূপ সকল প্রকারের ভগ্নী, ইত্যাদি।

(৬) ভ্রাতুষ্পুত্রীবর্গ—সহোদর প্রভৃতি সকল প্রকারের ভ্রাতার কন্যাগণ এবং তাহাদের কন্যা ও দৌহিত্রী ইত্যাদি।

(৭) ভগ্নীর কন্যাবর্গ—সহোদরা প্রভৃতি সকল প্রকারের ভগ্নীর কন্যা ও দৌহিত্রী প্রভৃতি।

এই সাত শ্রেণীর নারীকে ابدى محرمات বলা হয়। ইহারা জন্ম-গতভাবে হারাম। কোনো অবস্থায় ও কোনো প্রকারে ইহাদিগের সহিত বিবাহ হালাল বা বৈধ হইতে পারে না।

রক্তের হিসাবে ছাড়া,অন্য দুই প্রকারে মানুষকে অন্যের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইতে হয় এবং এই আত্মীয়তা অবস্থা বিশেষে এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া যায় যে, তাহার পর ঐসব নরনারীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করা ন্যায় ও নীতির কোনো বিধান অনুসারেই সঙ্গত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর নিষিদ্ধ নারিগণ (২২ আয়াতে বর্ণিত এক প্রকার ছাড়াও) ছয় প্রকার—

(১) দুধ-মা—শিশু দুই বৎসর (মতান্তরে আড়াই বৎসর) বয়স অতিক্রম করার পূর্বেই কোনো স্ত্রীলোকের দুধ খাইলে, সেই স্ত্রীলোকটি এই শিশুর "দুধ মা" হইয়া যায় এবং এই প্রকার দুধ-মার সহিত বিবাহ হারাম। "এক ঢোক, না তিন ঢোক, না পাঁচ ঢোক" দুধ খাইলে সেই শিশু সম্বন্ধে এই নির্দেশ বলবৎ হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মোছলেম হাদীছে এ সম্বন্ধে হযরত রাছুলে কারীমের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে কেবল এইটুকু প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "কেবল স্তন মুখে নিলে বা মাত্র দুই একবার চুষিলে দুধের হুকুম বলবৎ হয় না।" ইহার সরল অর্থ এই যে, কিছু দুধ শিশুর উদরস্থ হওয়া চাই। সুতরাং কোর্‌আনের আয়াতের সঙ্গে এই হাদীছের কোনই অনৈক্য নাই, এবং সেজন্য হাদীছের দ্বারা কোর্‌আনের সাধারণ আদেশকে সঙ্কুচিত করার কোনো দরকারও উপস্থিত হইতেছে না। ইমাম আবুহানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম বোখারী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার সামান্য জ্ঞানে ইহাই সঙ্গত অভিমত। পানি খাইলে রোজা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু কুল্লী করিলে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ কুল্লীর দ্বারা মুখের অভ্যন্তরভাগ ভিজিয়া গেলেও, তাহার পানি কণ্ঠের নিম্নে নামিয়া যায় না। যদি যায়, তাহা হইলে রোজা নিশ্চয় নষ্ট হইয়া যাইবে—সেখানে এক ঢোক, তিন ঢোক বা পাঁচ ঢোকের কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সেইরূপভাবে দুধ উদরে প্রবেশ করিলেই দুধ-মা সাব্যস্ত হইবে, এক বা একাধিক ঢোকের কোন কথা নাই।

(২) দুধ-ভগ্নিগণ—দুধ মায়ের সকল প্রকারের কন্যাগণ।

আয়াতের প্রথম অংশে মাতৃবর্গের বিষয় উল্লেখ করার পর খালা-ফুফু প্রভৃতি মাতৃস্থানীয় নারীদিগের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে দুধ-মায়ের পর শুধু দুধ-ভগ্নিদিগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে এই principle বা ওছুলের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, দুধ-মা সংক্রান্ত নির্দেশটি কেবল

তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। বরং গর্ভধারণী জননীর ন্যায় দুগ্ধধাত্রী জননী সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাও তাহার উর্ধ্বতন ও অধস্তন কতিপয় ঘনিষ্ঠ স্বজন-গণের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। এই জন্যই উদাহরণ স্থলে দুধ-ভগ্নীদের প্রসঙ্গটাও উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দুধ-ভগ্নীদিগকে অবৈধ করা হইতেছে যে নীতির অনুসরণে, দুধ সম্পর্কিয় অন্যান্য আত্মীয়াগণ সম্বন্ধেও সেই নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। হযরত রাছুলে কারীম স্বয়ং এই নীতির ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। প্রমাণ হিসাবে বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতির কয়েকটা হাদীছ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(ক) বিবি আয়েশা আবু-কাইছ নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীর দুধ খাইয়া-ছিলেন। হযরতের স্ত্রীদের প্রতি পর্দার বিশেষ হুকুম নাজেল হওয়ার পর, একদিন আবু-কাইছের ভ্রাতা আফ্‌লাহ্ বিবি আয়েশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসিলেন এবং এ জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু বিবি আয়েশা মনে করিলেন—দুধ খাইয়াছি একজন-স্ত্রীলোকের, এ লোকটি তাঁহার স্বামীর ভাই। সুতরাং মোহ্‌র্‌রম হিসাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করার কোনো সঙ্গতি দেখা যাইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে হযরত বাড়ী আসিলে বিবি আয়েশা এই ঘটনা ও নিজ অভিমতের কথা তাঁহার গোচরে আনিলেন। তাহাতে হযরত বলিলেন—

ائذني له فانه عمك تربت يمينك

"আফ্‌লাহকে অনুমতি দাও, তিনি তো তোমার চাচা।"

(মালেক, বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, তিরমিজি, নাছায়ী)

(খ) আলী বলেন, রাছুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন—

ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب - ترمذى

নিশ্চয় আল্লাহ্ দুগ্ধের সম্পর্কে হারাম করিয়াছেন তাহাদিগকে, রক্তের সম্পর্কে যাহাদিগকে হারাম করিয়াছেন। (তিরমিজী)

(গ) বিবি হাফছার জনৈক দুগ্ধ সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের পর হযরত বিবি আয়েশাকে বলিলেন—

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - بخارى

"জন্ম সম্পর্কে যাহা হারাম, দুগ্ধ সম্পর্কেও তাহা হারাম।" (বোখারী)।

(ঘ) মোছলেমের দুইটি হাদীছে আছে—

فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم - انه يحرم ما يحرم من النسب -

(অনুবাদ পূর্বের ন্যায়)।

এই মর্মের আরও বহু ছহী হাদীছ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

তবে মুছলমান পাঠকের জন্য এই হাদীছগুলিই যথেষ্ট হইবে। উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দুধ সম্পর্কিত অবৈধ স্ত্রীলোকদিগের স্পষ্ট নীতি, পরোক্ষভাবে আলোচ্য আয়াতে এবং প্রত্যক্ষ ও বিশদভাবে হযরত রাছুলে কারীমের বহু বিশ্বস্ত হাদীছে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এজমার দোহাই দিয়া এই ব্যবস্থাগুলির সমর্থন করার দরকার বা সঙ্গতি বিন্দুমাত্রও নাই।

বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে সমাজের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই, এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

আজকাল এই গুরুতর বিষয়টির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইতেছে, দুই দিক দিয়া। প্রথমতঃ, অনেক সময় দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা অন্যের সন্তানকে স্তন্য পান করাইয়া থাকেন, বিনা দরকারে এবং নিতান্ত হাসি খেলার ভাবে। তাহার পর দুধ খাওয়ানোর সংবাদটা প্রচার করা হয় ঠিক বিবাহের পূর্বে,হয় তো উদ্দেশ্যমূলকভাবে। পক্ষান্তরে, অভিভাবকগণ প্রায়ই দুধ-সংক্রান্ত অবৈধতার প্রশ্নকে বড় একটা আমল দিতে চান না। এই অবহেলার ফল কি দাঁড়ায়, বোধ হয়, কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

দুধের সম্পর্কটা এত জটিল ও দুর্বোধ্য যে, জনসাধারণের পক্ষে তাহার সম্যক অবধান করা অসম্ভব—এরূপ অভিযোগও সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অভিযোগটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোর্‌আন-হাদীছে এ সম্বন্ধে যে সূত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা খুবই সরল ও সহজ বোধ্য। সে সূত্রটি এই যে, দুধ-মাকে গর্ভধারিণী জননী এবং দুধ পানকারীকে তাহার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া ধরিয়া নিয়া হিসাব করিতে হইবে।

যেমন,দুধ-ভাই=সহদোর ভাই। দুধ-ভগ্নী=সহোদরা ভগ্নী। সহোদর ভাই-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। দুধ খালা=আপন খালা। আপন খালার সহিত বিবাহ হইতে পারে না। দুধ চাচা=আপন চাচা, দুধ ভাই ঝি=আপন ভাই ঝি। আপন ভাইঝির সঙ্গে চাচার বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং দুধ চাচার সঙ্গে বিবাহ বৈধ হইবে না। মোটের উপর কথা এই যে,বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে দুধ-মাকে ও দুধ-বাপকে দুধ পানকারী শিশুর জননী ও জনক বলিয়া ধরিয়া, দুগ্ধ পানকারীকে তাহাদের নিজ গর্ভজাত ও ঔরসজাত সন্তানরূপে গণ্য করিতে হইবে। এই হিসাবে বিচার করিলে আর কোনো জটিলতা থাকিবে না।—যেমন জন্ম ও বৈবাহিক সম্পর্কের অবৈধ নারীদের বিচার করিতে কোন জটিলতা থাকে না।

(৩) শাশুড়িগণ —বিবাহের ঈজাব কবুল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, স্ত্রীর মাতা চিরদিনের জন্য জামাতার জন্য মাতৃরূপে পরিগণিত হইবে। স্ত্রী মরিয়া গেলে বা তাহার তালাক হইয়া গেলেও এ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হইতে পারে না। স্ত্রীর মাতার ন্যায়, তাহার নানী, দাদী প্রভৃতিও অবৈধ হইবে। স্ত্রীর সকল প্রকারের খালা, ফুফু প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই হুকুম যথানিয়মে বলবৎ হইবে।

(৪) বৈপিতৃক কন্যাগণ—(Foster daughter) অর্থাৎ স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাগণ। এই শ্রেণীর কন্যাবর্গের সহিত তাহার Foster Father (বি-পিতার) বিবাহ বৈধ হইতে পারে না। ইংরাজী Foster daughter আর আরবী (ربيبه) রাবীবার ধাতুগত অর্থ একই—লালন পোষণ করা। যেহেতু এই শ্রেণীর কন্যাগণ, সাধারণতঃ তাহাদের মাতার সঙ্গে থাকিয়া তাহার বি-পিতার গৃহে লালিত পালিত হয়। তাই আয়াতে এই সাধারণ অবস্থার বর্ণনা হিসাবেই বলা হইয়াছে—যাহারা তোমাদিগের সংসারে প্রতিপালিত হয়। ইহা বিবাহ অবৈধ হওয়ার শর্ত নহে। অর্থাৎ, এরূপ কন্যাদের সহিত তাহার বি-পিতার বিবাহ অবৈধ হইবে—তা' তাহারা যেখানেই প্রতিপালিত হউক না কেন। যেমন, কোর্‌আনে বলা হইয়াছে—"তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদিগকে হত্যা করিও না।" (বানি ইছরাইল)। অভাব-অসচ্ছলতার আশঙ্কা না থাকিলে সন্তানদিগকে হত্যা করা বৈধ হইবে—আয়াতের এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া সহবাসের পূর্বেই তাহাকে তালাক দিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে আইনতঃ অবৈধ হইবে না। ইহাও আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। (এবন-জরীর, বাইহাকী প্রভৃতি—হাক্কানী।) বলা-আবশ্যক, এরূপ ব্যাপারে স্বামী অর্ধেক মোহর দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে ব্যবস্থাটাকে ত্রুটিহীন করার উদ্দেশ্যে।

(৫) পুত্রবধূগণ—পুত্রের বিবাহিত স্ত্রী বা পুত্রবধূগণ চিরকালের ও সকল অবস্থার জন্য শ্বশুরের প্রতি অবৈধ হইয়া যায়। পুত্র মরিয়া গেলে বা স্ত্রীকে তালাক দিলেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিবে না। আয়াতে ঔরসজাত পুত্র বলিয়া মুখে-বলা পুত্র (ধরম পুত্র)-দিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৬) দুই ভগ্নীকে বিবাহের দ্বারা একত্র করা—দুই ভগ্নীকে একই মজলিসে বিবাহ করা অথবা এক ভগ্নী স্ত্রীরূপে বর্তমান থাকা অবস্থায় তাহার

ভগ্নীকে বিবাহ করা হারাম। আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিজী, এবন-মাজা প্রভৃতির বর্ণিত এক বিশ্বস্ত হাদীছে দেখা যায়—"ফিরোজ দায়লামী নামক জনৈক ছাহাবী যখন ইছলাম গ্রহণ করেন, তখন দুইটি সহোদরা তাঁহার কাছে ছিল স্ত্রীরূপে। এ সম্বন্ধে তিনি হযরতের নিকট কিংকর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে হযরত উত্তরে বলিলেন—"দুইটির মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা তালাক দেও।" (মনছুর ২—১৩৬)।

ইহা হইতেছে নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হওয়ার বা স্বামীর ইছলাম গ্রহণের পূর্বকার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহার পরবর্তীকালে যদি কোনো মুছলমান এক ভগ্নী বর্তমানে তার অন্য ভগ্নীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বিবাহটাই স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল হইয়া যাইবে। কারণ তাহা আদৌ বৈধ বিবাহ নহে।

দুই ভগ্নী বলিতে এখানে একাধিক ভগ্নীকে বুঝাইতেছে। এক ভগ্নী স্ত্রী-রূপে মওজুদ থাকিতে তাহার অন্য ভগ্নীকে বিবাহ করা বৈধ হইবে না—এই নিষেধাজ্ঞা দ্বিতীয় ভগ্নী সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক সেইভাবেই প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত, একাধিক ভগ্নীকে একত্রে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যে নৈতিক আদর্শ অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, স্ত্রীর ফুফু ও খালাকে বিবাহ করাও সেই আদর্শ অনুসারে অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হওয়া আবশ্যক। কোর্আনে তাই অছুল বা Principle-কে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য, উদাহরণ হিসাবে শুধু দুই ভগ্নীকে একত্র করার কথা বলা হইয়াছে। হযরত রাছুলে কারীমের বিশেষ কর্তব্য ছিল, কোর্আনের এই শ্রেণীর আভাস ও ইঙ্গিতগুলিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। তাই তিনি উম্মৎকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন যে,

لا يجمع بين المرءة و عمتها و لا بين المرءة و خالتها - مالك ' بخارى ' مسلم -

"কোনো নারীর সহিত তাহার ফুফুকে একত্র করা চলিবে না, এবং এই-রূপ কোনো নারীর সহিত তাহার খালাকে একত্র করা চলিবে না।"—(মালেক, বোখারী, মোছলেম)।

(৭) বিমাতাগণ—বিমাতাদিগের সম্বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ২২ আয়াতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি: আল্লাহ্ তাআলা জন্ম বা রক্তের সম্পর্কে সাত প্রকার নারীর সঙ্গে বিবাহকে অবৈধ করিয়া দিয়াছেন। দগ্ধর সম্বন্ধে

বা বৈবাহিক সম্পর্কেও সাত শ্রেণীর নারীকে হারাম বা অবৈধ করা হইয়াছে।

২৮। **টীকাঃ মোহ্‌ছানাত বা সধবা নারিগণ**—মোহ্‌ছানাত স্ত্রী বাচক বহু বচন, এক বচনে মোহ্‌ছানাহ্‌। এই শব্দটি احصان। (ح ص ن) এহ্‌ছান ধাতু হইতে সম্পন্ন। ইহার আভিধানিক অর্থ প্রতিরোধ বা বাধা প্রদান করা। দুর্গ ও দুর্গবাসীর রক্ষার্থে—বিরুদ্ধ শক্তি বা বিপদ-আপদকে প্রতিরোধ করে বলিয়া আরবীতে দুর্গকে 'হিছ্‌ন' বলা হয়। আজাদী যেমন মানুষকে অন্যের নিকট নতি স্বীকার করিতে, জন্মগত সৎভাব যেমন অন্যায় ও অনাবশ্যক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে এবং ধর্ম যেমন প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে মানুষকে বাধা প্রদান করে, তদ্রূপ বিবাহবন্ধনও বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে বাধা প্রদান করে। বিবাহিত নারী-পুরুষের দেহ ও মনের পবিত্রতার জন্য ইহা দুর্গ স্বরূপ। এই কারণেই আরবীতে বিবাহিত পুরুষকে মোহ্‌ছান, এবং বিবাহিতা নারীকে মোহ্‌ছানাহ্‌ বলে। কোর্‌আনে শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

পূর্বে এমন কতকগুলি নারীর কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের সঙ্গে জন্ম, বিবাহ বা দুগ্ধসূত্রে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক আছে, এবং সে কারণে তাহাদের সহিত বিবাহই বৈধ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আলোচ্য অংশের অব্যবহিত পরে "এতদ্ব্যতীত অন্য সব নারীকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।" বস্তুতঃ এই আলোচ্য অংশটিতে এমন এক শ্রেণীর নারীর কথা বলা হইতেছে, যাহার সহিত ঐসব আত্মীয়তার কোনোই সংস্রব নাই, অথচ তাহাকে বিবাহ করা সর্বৈবভাবে অবৈধ। খুব সম্ভব এই জন্যই দুই শ্রেণীর নির্দেশের মধ্যবর্তী-ভাবে এই আদেশ উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে বলা হইতেছে যে, যে আজাদ স্ত্রীর স্বামী বর্তমান আছে, কোনও মুছলমানের পক্ষে তাহাকে বিবাহ করা কোন অবস্থাতেই বৈধ হইতে পারে না। আয়াতে বলা হইয়াছে, "তোমাদিগের জন্য আরও অবৈধ করা হইতেছে—সধবাদিগকে(من النساء।)নারীদিগের মধ্য হইতে।" এখানে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, মোহ্‌ছানাৎ (=সধবা নারিগণ)স্ত্রী বাচক বহুবচন। সুতরাং ইহার পর পুনরায় "নারীদিগের মধ্য হইতে" বলার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু বলিতেছেন—যেহেতু মোহ্‌ছানা বলিতে চরিত্রবতী অথবা মোছ্‌লেমাকেও বুঝাইয়া থাকে। এ অবস্থায় এখানে যদি "من النساء। বা নারীদিগের মধ্য হইতে" পদ ব্যবহার করা না হইত, তাহা হইলে ধারণা জন্মিতে পারিত যে, কেবল মুছলমান সধবা বিবাহ করা অবৈধ। কিন্তু কাফের

নারীদিগের সম্বন্ধে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইতে পারিবে না। "নারীদিগের মধ্য হইতে" এই অংশটা সংযোগের ফলে এই ধারণার অপনোদন হইয়া যাইতেছে। (মানার ৫ — ৪)।

এই প্রসঙ্গে সসম্ভ্রমে নিবেদন করিতেছি যে, মুফতী ছাহেবের এই যুক্তিবাদের সহিত আমি একমত হইতে পারিতেছি না। তিনি বলিতেছেন, "মোহ্‌ছানা বলিতে মোছলেমা নারীকেও বুঝাইয়া থাকে," এবং ইহাই হইতেছে তাঁহার যুক্তিবাদের মূল ভিত্তি। কিন্তু মোহ্‌ছানা বলিতে মোছলেমাকেও বুঝাইয়া থাকে, ইহা তর্কের বিষয়। احصان অর্থে ইছলামও হইতে পারে—এই দাবীর প্রমাণ হিসাবে পরবর্তী (২৫) আয়াতের فاذا احصن পদের উল্লেখ করিয়া তিনি নিজেই বলিতেছেন—"কথিত হইয়াছে যে, উহার অর্থ হইবে اسلمن অর্থাৎ সে যখন মুছলমান হইল।" এই তাৎপর্যটা যে দুর্বল, "কথিত হইয়াছে" পদ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত ২৫ আয়াতে এই তাৎপর্য যে মোটেই খাটিতে পারে না, পাঠকগণ যথাস্থানে তাহা দেখিতে পাইবেন। আশ্চর্যের বিষয়, মুফতী ছাহেব নিজেও সেখানে এ অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

আমার মনে হয়, আয়াতে আলোচ্য অংশটি সংযুক্ত করার অন্য কারণ আছে। ১৯ আয়াতের প্রারম্ভে "হে মোমেনগণ" বলিয়া কেবল মুছলমান সমাজকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সম্বোধনের পর ২৪ আয়াত পর্যন্ত কেবল মুছলমানদিগের সম্বন্ধে আদেশ-নিষেধ প্রকাশ করা হইয়াছে। ২৩ আয়াতে অবৈধ নারী প্রসঙ্গে نساء كم বলিয়া শুধু মুছলমানদিগের নারীগণকে বুঝান হইয়াছে। ইহার পরই (২৪ আয়াতে) শুধু সধবাগণ বলা হইলে কেবল মুছলমান সমাজের সধবাদিগকে বুঝাইত বা বুঝাইতে পারিত। তাই এখানে সঙ্গে সঙ্গে জাতিবাচক ও সাকুল্যবোধক النساء শব্দ আনিয়া বুঝান হইতেছে যে, ইহা একটি স্বতন্ত্র আদেশ, এবং এই আদেশটি মুছলমান অমুছলমান এবং আজাদ ও দাসী-বাঁদী সকল শ্রেণীর সধবা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য।

এখানে ما ملكت ايمانكم পদের অর্থ কি হইবে, সে সম্বন্ধে দুইটি পরস্পর বিপরীত মত প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। বহু ইমাম ও আলেমের মত এই যে, এখানে ঐ পদের অর্থ হইবে—"তোমাদিগের দক্ষিণ হস্তগুলি যাহাদের অধিকারী হইয়াছে"—ইহা হইতে যুদ্ধের বন্দিনীদিগকে বুঝাইতেছে।

পূর্বের যুদ্ধের বন্দী ও বন্দিনীদিগকে দাসদাসী হিসাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হইত। আরব দেশেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইছলাম ক্রমে ক্রমে এই

নিষ্ঠুর প্রথার সংস্কার করিতে থাকে। বদর যুদ্ধের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, সূরা আনফালে ইহার বিবরণ আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, তখন পর্যন্ত বন্দীদিগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোর্‌আনে কোনো চরম নির্দেশ নাজেল হয় নাই।

সূরা মোহাম্মদের ৪র্থ আয়াতে যুদ্ধের বন্দীদিগের সম্বন্ধে স্পষ্ট ও চরম নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মর্মানুবাদ দিতেছি—

(১) কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে নিহত করিয়া চলিবে, তাহারা বিপর্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত,

(২) এ অবস্থায় পরাজিত শত্রুদিগের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ব্যবহার করিবে না—বন্দী করিবে,

(৩) অতঃপর তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবে—হয় অনুগ্রহ হিসাবে না হয় মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া,

(৪) যুদ্ধ বিরতির বা যুদ্ধাবস্থার পরিসমাপ্তির পর আর কাহাকে বন্দী করা চলিবে না।

বলা আবশ্যক যে, এই সূরাটি নাজেল হইয়াছে মাদানী-যুগের প্রাথমিক অবস্থায় এবং ইতিহাসের অবিসংবাদিত সাক্ষ্য এই যে, হযরত রাছুলে কারীম তাঁহার জীবনের প্রত্যেক যুদ্ধেই এই আয়াতের অনুসরণ করিয়াছেন, হাজার হাজার অ-মুছলমান বন্দীকে বিনাপণে মুক্তি দিয়াছেন। অথচ সেটাই ছিল মুছলমানদিগের কঠোরতম পরীক্ষার যুগ এবং যুদ্ধ বন্দীরাই ছিল তাহার প্রধান কারণ।

কিন্তু এই সব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্তেও কিছু সংখ্যক বন্দী মদীনায় থাকিয়া যাইত, বিভিন্ন কারণে। হযরতের সান্নিধ্যে আসিয়া এবং তাঁহার ছাহাবিগণের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এক শ্রেণীর বন্দী মদীনায় থাকিয়া যাইতেন। পক্ষান্তরে, এক শ্রেণীর বেদুইন আরব নিজেদের মুক্তি লাভটাকেই বড় করিয়া দেখিত, নারী বন্দীদিগকে মুক্ত করার জন্য তাহাদের খুব কমই আগ্রহ থাকিত। কারণ তাহাদের দৃষ্টিতে ছাগল-গরু ও উট-দুম্বার চাইতে নারীর মূল্য-মর্যাদা অধিক ছিল না। প্রথমোক্ত আলেমগণ বলেন যে, এই শ্রেণীর বন্দিনীদিগকে বিবাহ করা সম্বন্ধেই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ হস্তের অধিকার বা ملك يمين বলিতে এই শ্রেণীর বন্দিনীদিগকে বুঝাইতেছে।

অপর পক্ষে আবুল-আলীয়া, আতা, ছঈদ-এবন-জোবের, তাউছ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট তাবেয়ী ও তাফ্‌ছীরের রাবী বলিতেছেন—আয়াতে "আয়মান"

শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহার এক বচন ইয়ামিন। ইহার অর্থ যেমন দক্ষিণ হস্ত হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত চুক্তি এবং দিব্য, এ করার ও অঙ্গীকারকেও ইয়ামিন বলা হয়। পরস্পরের অঙ্গীকার-ক্রমে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যে সব নারীর উপর স্বামীর দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আয়াতে তাহাদিগের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে এবন-আব্বাছের সমর্থনও কোনো কোনো রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এখানে মোহ্ছানাৎ অর্থে সতী, সাধ্বী ও চরিত্রবতী নারী।

(কাবীর, কাছির, মানার, মানছুব প্রভৃতি)

২৯। **টীকাঃ বৈধ বিবাহ, তাহার আদর্শ**—কোন্ কোন্ নারীর সঙ্গে বিবাহ করা অবৈধ, পূর্বের কয়েকটি আয়াতে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, ঐ সকল ব্যতীত অন্য সমস্ত নারীকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ উহারা ব্যতীত অন্য কোনো নারীর সহিত বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে অবৈধ হইবে না।

আয়াতের ভাষায় এই তাৎপর্য নিহিত থাকিলেও, পরে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, অন্য নারী-দিগকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তিনটি স্পষ্ট শর্তের অধীনে। ইহার প্রথম শর্ত এই যে, পুরুষরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে যথাধর্ম বিবাহ করিয়া, অর্থাৎ বিবাহের আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং তাহার দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করিয়া, পরস্পরের সম্মতিক্রমে ও সাক্ষিগণের সম্মুখে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ করিবে—জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, শুধু কাম-চরিতার্থ করার জন্য নহে। তৃতীয় শর্ত এই যে, মোহর প্রদান ও শরিয়তের নির্ধারিত ও স্বামীর স্বীকৃত মোহর প্রদান ও অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে। বিবাহে ও ব্যভিচারে পার্থক্য কি, তাহা এই আয়াতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এবন-আব্বাছ বলিয়াছেন, অন্ধকার যুগে আরব দেশে দুই শ্রেণীর ব্যভিচার প্রচলিত ছিল। প্রকাশ্য ব্যভিচারকে তখনকার আরবরাও অন্যায় বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তবুও তার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এমন কি, পরিচয়ের জন্য কুলটা স্ত্রীলোকেরা নিজ গৃহে লাল পতাকা উড়াইয়া রাখিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না। আর এক শ্রেণীর কুলটা প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি করিত না। কিন্তু গোপনে পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করিত। ইহাতে কোনো দোষ আছে বলিয়া আরবরা মনে করিত না। (মানার)। এই উভয় শ্রেণীর ব্যভিচার সম্বন্ধে কোর্‌আনে বলা হইয়াছে—

و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن - انعام

"হে মুছলমানগণ। তোমরা প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোনো প্রকার ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না।" (আন্‌আম ১৫২)।

৩০। **টীকা ঃ "উপকার লাভ"**—মূলে "এছ্‌তেমতা" শব্দ আছে; মাৎওন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ উপকার লাভ করা। যে কোনো বিষয় বা বস্তু হইতে যে কোনো প্রকার উপকার লাভ করা হয়, বা উপকার লাভের আশা করা হয়, তাহাকে মাতা' বলা হয়। যেমন, ধন দওলৎকে, যৌবনকে, পুত্র ইত্যাদিকে মাতা' বলা হয়। যাহারা নারী দ্বারা উপকার লাভ করিয়াছে অথবা লাভ করিতে যাইতেছে, তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে ঃ যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির বলে বা ফলে তোমরা নারী দ্বারা উপকৃত হইয়াছ বা হইতে যাইতেছ, সাধুতার সহিত এবং পূর্ণভাবে সেগুলিকে পালন করিয়া চলা তোমাদিগের কর্তব্য। মোহরের কথা, খোর-পোশের কথা, প্রেম ও সহৃদয়তার কথা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত কথাই এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত। সেই জন্য বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে এই ব্যাপক নির্দেশটির অবতারণা করা হইয়াছে।

মোতা'-প্রসঙ্গ—মোতা'-প্রথার বৈধতার প্রমাণ হিসাবে এক শ্রেণীর আলেম এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আয়াতটিই হইতেছে জঘন্য মোতা'-প্রথার অবৈধতার অন্যতম প্রধান প্রমাণ। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে কোনো স্ত্রীলোককে সম্ভোগ করার অধিকার হয় যে চুক্তি দ্বারা, সেই চুক্তিকে মোতা' বলা হয়। এই চুক্তি অল্প সময়ের জন্য হইতে পারে, অধিক সময়ের জন্যও হইতে পারে। এই চুক্তির জন্য অলির দরকার হয় না। সাক্ষী-সাবুতের প্রয়োজন করে না। স্ত্রীলোকটি স্বীকার করিলে ও পুরুষ চুক্তিমত অর্থ দিলেই উহা সুসম্পন্ন হইয়া যায়। উপরোক্ত আলেমগণ বলেন যে, এই প্রকার চুক্তি করা এবং তাহার-বলে চুক্তিবদ্ধ নারীকে সম্ভোগ করা, হযরতের সময়ে বৈধ ছিল এবং আজও বৈধ আছে। কিন্তু প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন যে, ইহা বাজার প্রচলিত সাধারণ বেশ্যাবৃত্তির সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নহে। কোর্‌আনের চিরাচরিত শিক্ষা অনুসারে নিয়মিত বিবাহ ব্যতীত, অন্য সকল প্রকারের নারী সংস্রবই ব্যভিচার। সুতরাং তাহা হারাম ও দণ্ডার্হ। বিবাহের জন্য আইনতঃ একান্ত দরকার হয়,—মোহর প্রদান বা নির্ধারণ করার, সাক্ষীদিগের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে ঈজাব কবুলের। নৈতিক হিসাবে প্রয়োজন হয়—বিবাহের কথা প্রকাশ্যভাবে

ঘোষণা করার (এমন কি ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা করার), কোনো প্রকাশ্যস্থানে (Preferably মছজিদে) মজলিস করার, হাজেরানে মজলিসের সম্মুখে যথাবিধি খোৎবা পড়িয়া এবং স্বামী ও স্ত্রীর দ্বারা প্রকাশ্যতঃ ঈজাব কবুল বা স্বীকৃতি ঘোষণা করাইবার। সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবে বিবাহের পর অলীমা করাও ধর্মের হিসাবে অভিপ্রেত। ইহার পর, বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যথানিয়মে প্রকাশ্যভাবে তালাক দিতে বা খোলা' করিতে হয়। অন্যথায় এ বন্ধন শাশ্বত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মোতা' চুক্তিতে এই সমস্ত শর্তের কোনটিরই আবশ্যক হয় না। ইহাই হইতেছে মোতায়ী চুক্তির বাস্তব স্বরূপ। *

আমি এযাবৎ যতটা আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদনুসারে আমার মত এই যে, প্রাক্-ইছলামিক যুগের আরবদিগের মধ্যে সাধারণভাবে এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন—মদ, জুয়া, সুদ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। ইছলাম ক্রমে ক্রমে এই পাপাচারগুলিকে চরমভাবে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর বিষয়গুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না যে, ইছলাম প্রাথমিক অবস্থায় এগুলিকে অনুমোদন করিয়াছিল। একথাও বলা চলে না যে,হযরতের সময়ে কন্যা হত্যার বা বিমাতা বিবাহ করার অনুমতি ছিল, সুতরাং এখনও তাহা বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩১। **টীকা ঃ বাঁদীদিগকে বিবাহ করা**—বিবাহ করাই মোছলেম জীবনের আদর্শ। হযরত রাছুলে কারীম বলিয়াছেন—"কাঙ্গাল সেই ব্যক্তি, যাহার স্ত্রী নাই।" বস্তুতঃ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই মানুষের প্রধানতম, পুণ্যতম ও পূর্ণতম সাধন ক্ষেত্র। প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করার শিক্ষা ইছলামে নাই, সুসংযতভাবে ইহার সদ্ব্যবহার করাই তাহার শিক্ষা ও আদর্শ। এই জন্যই ইছলামের নাম হইয়াছে দীনুল্-ফেৎরাত বা প্রাকৃতিক ধর্ম।

এখানে বলা হইতেছে যে, বিবাহ করাই মুছলমানদের উচিত। কিন্তু আজাদ মোছলেম মহিলাকে বিবাহ করার এবং সেই স্ত্রীকে যথাযোগ্য মোহর দানের ও খোরপোশ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করার সঙ্গতি যদি কাহারো না থাকে, সে বাঁদী শ্রেণীভুক্ত কোনো মুছলমান "কিশোরী"কে বিবাহ করুক। ইহাতে মোহর ও সংসার যাত্রার ব্যয় কম হইয়া যাইবে, অথচ ইহাতে সম্ভ্রমহানির বস্তুতঃ কোনো আশঙ্কা নাই। কারণ, মুছলমান তোমরা পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন।

ফাতায়াত—মূলে "ফাতায়াত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি উহার অর্থ করিয়াছি, "কিশোরী" বলিয়া। প্রাক্-ইছলামিক যুগে দাস-দাসীদিগকে দুনিয়ার

সাধারণ নিয়ম অনুসারে (ঘৃণাভাবে) দাস-দাসী বলিয়া, গোলাম-বাঁদী বলিয়া আহ্বান করা হইত। অন্য সবদিকের ন্যায় এদিক দিয়াও ইছ্‌লাম তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল। হযরত রাছুলে কারীম নির্দেশ দিয়াছিলেন—তোমরা কেহ কখনও "আমার দাস", "আমার দাসী" বলিবে না—অধিকৃত ব্যক্তিরাও যেন "আমার প্রভু" বলিয়া সম্বোধন না করে। বরং তোমরা বলিবে, "আমার যুবক" My young man, "আমার যুবতী" My maiden. পক্ষান্তরে অধিকৃতরা বলিবে: "আমার অভিভাবক", "আমার অভিভাবিকা" কারণ তোমরা সকলেই হইতেছ মামলুক বা অধিকৃত এবং সকলের প্রভু হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ্। (বোখারী-মোছলেম)। ফলত: গোলাম ও বাঁদী সম্বন্ধে ব্যবহৃত فتى ও فتاة শব্দ স্নেহব্যঞ্জক বিশেষ পরিভাষা। যেমন, আমরা স্নেহভাবে খোকা-খুকী প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু বাংলার খোকা-খুকীদের বয়স খুবই অল্প। বয়:বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আদরের ডাকনাম তামাদী হইয়া যায়, খোকা-খুকীদের স্থানে কিশোর ও যুবক বাংলা সাহিত্যে স্থান পায় নাই, কিন্তু আরবী সাহিত্যে আছে। فتاة এই শ্রেণীর একটি স্নেহব্যঞ্জক শব্দ। বহু চিন্তা করিয়াও ইহার সঠিক প্রতিশব্দ বাহির করিতে পারি নাই। ইংরেজীতে বোধ হয় এরূপ স্থলে, My boy, My maiden, My young lady ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩২। **টীকা: জেনার দণ্ড লাঘব**—"ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীর প্রত্যেককে একশত "দোররা" আঘাত করিবে"—কোর্‌আনের স্পষ্ট নির্দেশ ইহাই (নুর, প্রথম আয়াত)। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ আলেম প্রাথমিক যুগের কয়েকটা নজীর তুলিয়া বলেন—জেনার জন্য পূর্বে রাজ্‌ম করার (প্রস্তরাঘাতে নিহত করার) ব্যবস্থা ছিল, এই আয়াতে দোররা মারার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। সুতরাং ব্যভিচারীদিগকে প্রথমে দোররার দণ্ড দিতে হইবে এবং তাহার পর "রাজ্‌ম" করিতে হইবে। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, আজাদ স্ত্রীলোকের জন্য জেনার যে দণ্ড নির্ধারিত আছে, বাঁদীদিগকে দিতে হইবে তাহার অর্ধেক দণ্ড। একশত দোররার অর্ধেক পঞ্চাশ দোররা, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রস্তরাঘাতে "নিহত করার" অর্ধেক তো কিছুই হইতে পারে না।

কোন কোন আলেম বলেন যে, রাজ্‌ম সংক্রান্ত নজীরগুলি প্রাথমিক সময়ের ঘটনা, এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর তাহা মনছুখ (Abrogated) হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা এই আয়াতটাকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্যতম প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইমাম রাজী ইহাকে

(اشکال قوی) 'কঠিন সমস্যা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩—২৯৭)। মাওলানা আবদুল হক এই সমস্যার সমাধান কল্পে বলিতেছেন :

اور رجم چونکہ تنصیف کے قابل نہیں اس لئے لونڈی پر رجم نہیں اور یہی حال غلام کا ہے -

"যেহেতু রাজ্মকে দুই অর্ধেকে বিভক্ত করা সম্ভবপর নহে, সেজন্য বাঁদীর রাজ্ম হইবে না, গোলাম সম্বন্ধেও এই কথা (তাফ্ছীর হাক্কানী ৩—২১৪)।

এই যুক্তিবাদের কোনই সার্থকতা নাই। রাজ্ম করার ব্যবস্থা পূর্বে সকল সময় বিদ্যমান ছিল এবং এই আয়াত নাজেল হওয়ার পরও বলবৎ আছে—ইহাই তাঁহাদের দাবী। আলোচ্য আয়াতে যে বাঁদীদিগকে আজাদ নারীর অর্ধেক দণ্ড দানের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ অভিমতও তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন যে, এই আদেশ পালন করা কার্যতঃ সম্ভবপর নহে। কারণ প্রাণদণ্ডকে বিভক্ত করা যায় না। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই হুকুমটি অচল! কিন্তু প্রাণদণ্ডের যে অংশ বা বিভাগ হয় না, আদেশ দেওয়ার সময় এই সাধারণ সত্যটিকে আল্লাহ্ তাআলা (মা আজাল্লা) বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই? ব্যভিচারীদিগকে দোররা মারা ও রাজ্ম করার উভয় ব্যবস্থাই মুছলমানদিগের মধ্যে ধর্মের হিসাবে চিরদিনের জন্য বলবৎ হইয়া আছে, এই তথ্যটি কি আল্লাহ্ তাআলার বিদিত ছিল না? যদি থাকে—এবং নিশ্চয়ই ছিল—তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া এমন একটা আদেশ দিলেন, যাহার তামিল করা মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভবপর হইতে পারিবে না? সুতরাং চিরদিনের জন্য তাহা Dead letter-এ পরিণত হইয়া থাকিবে? অন্য পক্ষের এইসব প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর আজ পর্যন্ত আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হযরত রাছুলে কারীমের ছহীহ্ হাদীছ আল্লাহ্‌র কালামের মোখালেফ হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহার কোনো নজীর ইছলামের ধর্মীয় সাহিত্যে বিদ্যমান নাই। সূরা নূরের তাফ্ছীরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করিব।

বাঁদী বিবাহ অনভিপ্রেত—সে সময় বাঁদী-দাসীদের নৈতিক জীবনের অবস্থা সবদিক দিয়া অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাহাদিগকে পারিবারিক জীবনের অংশী রূপে গ্রহণ করিলে সমাজে একটা গুরুতর রকমের বিশৃঙখলা ঘটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেইজন্য বলা হইতেছে যে, বিবাহ না করিলে পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ার আশাঙ্কা যাহার থাকে, বাঁদী বিবাহ করার

এই ব্যবস্থা কেবল তাহার জন্য। তাহার পর সাধারণভাবে বলা হইতেছে যে, পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ঘটে অনেক সময় মানসিক সংযমের অভাবে। যাহাতে এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়া ধৈর্যধারণ করা যায়, তাহার সাধনা করাই মানুষের উচিত।

---

৫ রুকু

২৬। আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে, ও তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণের রীতি-পদ্ধতিগুলি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ লাভের যোগ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩৩)

٢٦ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ط وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ o

২৭। (এইরূপে) আল্লাহ্ তো চাহিতেছেন তোমাদিগের ‘প্রতি করুণায় প্রত্যাবর্তন’ করিতে, কিন্তু লালসার বশবর্তী যাহারা, তাহারা চাহিতেছে—তোমরা যেন (পাপে) ঢলিয়া পড়, চরমভাবে। (৩৪)

٢٧ وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ قف وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا o

২৮। তোমাদের ভার লঘু করা হউক, আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত ইহাই, বস্তুতঃ মানুষ তো সৃষ্টিগত ভাবেই দুর্বল। (৩৫)

٢٨ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا o

২৯। হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের (জাতীয়) ধন-সম্পদ-

٢٩ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

গুলিকে পরস্পরের মধ্যে অন্যায়-ভাবে গ্রাস করিও না, তবে সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে বাণিজ্যসূত্রে —তাহাতে দোষ নাই, আর (সাবধান!) তোমরা পরস্পরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতি করুণাশীল। (৩৬)

٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ۝

৩০। এবং, যে কেহ ঐগুলি সম্পাদন করিবে সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারীরূপে, আমরা অবিলম্বে আগুনে নিক্ষেপ করিব তাহাকে; আর (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

٣١ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيمًا ۝

৩১। আর, যেসব মহাপাপ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করা হই-তেছে, সেগুলি হইতে তোমরা যদি নিবারিত থাক, তাহা হইলে তোমাদিগের কু-প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা সমূলে নস্যাৎ করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে দাখিল করিয়া দিব সম্ভ্রমজনক স্থলে। (৩৭)

৩২। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদিগের কতক লোককে অন্য কতক লোকের উপর শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছেন যাহা দ্বারা, তাহা লাভ করার অন্যায় অভিলাষ করিও না; পুরুষরা যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অংশ আছে; পক্ষান্তরে নারিগণ যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদেরও প্রাপ্য আছে—এবং তোমরা প্রার্থনা জানাইবে আল্লাহ্‌কে তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হইতেছেন সকল বিষয়ে সম্যক বিদিত। (৩৮)

٣٢ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ
بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبْنَ ط وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ
فَضْلِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥

৩৩। এবং (পুরুষ ও নারীদিগের) প্রত্যেকের জন্য পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়গণের পরিত্যক্ত (বিষয়-সম্পত্তির) ওয়ারিস (অবধারিত) করিয়া দিয়াছি; ইহা ব্যতীত, তোমাদিগের অঙ্গীকারগুলি আবদ্ধ করিয়াছে যাহাদিগকে, তাহাদের প্রাপ্য তাহাদিগকে দিয়া দিবে; নিশ্চয় (জানিও) যে, আল্লাহ্‌ হইতেছেন সকল বিষয়ের সম্যক পর্যবেক্ষক।

٣٣ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ط
وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ
فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ع

তাফ্ছীর

৩৩। টীকা ঃ নৈতিক বিধান—সূরার প্রথম হইতে ২৫ আয়াত্ পর্যন্ত, মুছলমানদিগের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি আদেশ-নিষেধ বা আইন-কানুনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এগুলি হইতেছে শারয়ী কানুন বা Legal-law-এর পর্যায়ভুক্ত। তাহার পর, এখানে উহারই প্রসঙ্গে কতকগুলি নৈতিক ওছুল বা Moral-law-এর বর্ণনা করা হইতেছে। ইহাই কোর্আন মাজীদের সব বর্ণনার সাধারণ ধারা। কারণ, এই নৈতিক উপলব্ধিকে সমাজ মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে না পারিলে, শুধু আইন-কানুনের বজ্র বাঁধনে বিশেষ কোনো সুফল পাওয়া যাইতে পারে না।

এই হিসাবে ২৬ আয়াতে বলা হইতেছে যে, দুনিয়ায় মোছলেম জাতির অভ্যুত্থান ঘটান হইয়াছে, আল্লাহ্র খেলাফতের বাহক হিসাবে। তাহারা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার সামর্থ্য লাভ করুক, ইহাই আল্লাহ্র অভিপ্রায়। এজন্য আল্লাহ্র আর্শীবাদ ও সাহায্য তোমরা নিশ্চয় লাভ করিবে। কিন্তু ইহার জন্য আবশ্যক হইবে, তোমাদিগের জাতীয় জীবনকে সেই আশীর্বাদ লাভের যোগ্য-রূপে গড়িয়া তোলার। তাই আল্লাহ্ আবশ্যকীয় বিষয়গুলি তোমাদিগকে বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিতেছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গতি ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পার। তোমাদিগের অন্তরের অন্তস্তলে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করার জন্যই, তিনি পূর্ববর্তী জাতিগণের ধর্মপন্থা ও কর্ম-পদ্ধতিগুলির সহিতও তোমাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকেন। যেন এইসব জাতীয় উত্থান-পতনের বা জীবন-মরণের প্রকৃত কারণগুলির আবিষ্কার করা ও সেই অভিজ্ঞতাকে নিজেদের জাতীয় জীবনে কাজে লাগান, মুছলমানদিগের কর্তব্য হয়। দুঃখের বিষয়, এই অভিজ্ঞতা লাভের উপকরণগুলিকে আজ আমরা যক্ষ্মা ও কুষ্ঠব্যাধির জীবাণু-গুলির ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্টের কঠোর পরিহাস এই যে, অতীতের পৌত্তলিক জাতিগণের পৌরাণিক কল্প-কাহিনীগুলির কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং সর্বনাশী আমল ও আকীদাগুলিকে, ইছলামী লেবাছ-পোশাকে মুছলমানদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে আমরা একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করি নাই। তফাত শুধু এই যে, তাহারা বলিত জলদেবতা—বরুণ, আর আমরা বলি খাজা-খেজের, তারা বলে অদ্বৈতবাদ, Pantheism আমরা বলি وحدت الوجود অহ্দাতুল অজুদ, তাহারা বলে প্রণায়াম্, আমরা বলি পাছে-আনফাছ پاس انفاس তারা বলে চক্র, আমরা বলি হাল্কা ; তারা বলে পরকিয়া প্রেম, আমরা বলি এশ্কে মাজাজী عشق مجازی ; তারা বলে শ্রাদ্ধ, আমরা বলি চেহ্লাম ; তারা

বলে দশা, আমরা বলি হাল ; তারা বলে গুরু-ধ্যান, আমরা বলি তাছাউঅবে শেখ। উপস্থিতের মত এই কয়টি উদাহরণ দিলাম, এ-সম্বন্ধে অনেক গুরুতর কথা বলিবার আছে।

৩৪। **টীকা ঃ করুণায় প্রত্যাবর্তন**—সৎ ও মহৎ জীবন যাপন করার যেসব উপায় ও উপকরণ আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, মানুষ যখন সেগুলির সদ্ব্যবহার করার জন্য সত্যকারভাবে ইচ্ছুক হয়, আল্লাহ্‌র মদদ ও রহমত তাহাদিগের নিকটবর্তী হইয়া আসে, সেই সময়ে। আল্লাহ্‌র "করুণায় প্রত্যাবর্তন" বলিতে এই অবস্থাকে বুঝাইতেছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সাধনাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চায়, এরূপ মানুষও সমাজে বিদ্যমান আছে ও চিরকাল থাকিবে। নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি এবং লোভ-লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য, তাহারা কখনও বা 'হীলা-শরার' ধোঁকা দিয়া আর কখনও বা আধুনিকতার ভেল্‌কী লাগাইয়া সুদকে, শরাবকে, ব্যভিচারকে, পরস্ব অপহণরকে হালাল বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাইবে। এখানে "লালসা" বলিয়া মোতায়ী চুক্তির প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর লোকদিগের দুষ্ট প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকাই মুছলমানদিগের একান্ত কর্তব্য হইবে।

৩৫। **টীকা ঃ মানুষের দুর্বলতা**—আল্লাহ্ "মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন শ্রেষ্ঠ উপাদানে।" সেই উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া সে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে সেগুলির অব্যবহার বা অপব্যবহার করার ফলে, মানুষ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে উপনীত হইয়া যায়। (তীন—৪,৫ আয়াত)।

সাধুতা ও ধর্মভাব, জ্ঞান ও ভাবুকতা, স্নেহ ও প্রেম এবং দয়া ও পরহিতৈষণা প্রভৃতির ন্যায় মানুষের ক্ষুধা-পিপাসা, কাম-ক্রোধ, ধন-জনের আকাঙ্ক্ষা ও আত্মরক্ষার আগ্রহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলিও উপরোক্ত শ্রেষ্ঠতম উপাদান সমূহের অন্তর্গত, কিন্তু এই সমস্ত প্রবৃত্তিই আবার তাহার সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়—যথাস্থানে তাহার ব্যবহার না করিলে।

৩৬। **টীকা ঃ ব্যক্তিগত ধন ও জাতীয় সম্পদ**—সূরার প্রথম হইতে, এপর্যন্ত নারীর অধিকার এবং ধন-সম্পত্তির সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেসব আদেশ-নিষেধের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি হইতেছে পারিবারিক ব্যবস্থা, প্রধানতঃ আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে বৃহত্তর পরিবার হিসাবে সমগ্র মোছলেম জাতির ধন-সম্পদের বিলি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা সর্বব্যাপী আদেশের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে কয়েকটা বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ আয়াতটি আরম্ভ করা হইয়াছে يا ايها الذين امنوا বা "হে সেই সকল লোক, যাহারা ঈমান আনিয়াছ"—বলিয়া। সুতরাং এই ভূমিকা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আয়াতে এমন কোনো বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে, যাহা শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ নহে, বরং ব্যাপকভাবে দুনিয়ার সব দেশের সকল যুগের সর্বশ্রেণীর মুছলমানের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

এইরূপে মোছলেম জাতিকে সমগ্রভাবে সম্বোধন করার পর বলা হইতেছে: "তোমরা নিজেদের ধন-সম্পত্তিগুলি" অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না। "তোমাদের কেহ অন্য কাহারও ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবে না"—এ কথা বলা হয় নাই। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া মিছরের স্বনামখ্যাত আলেম মুফতী আবদুহু বলিয়াছেন যে, এই আয়াত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, আয়াতে ধন-সম্পদের মালেক স্বত্বাধিকার ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত হয় নাই, বরং তাহাদের সকলের সমবায়ে সংগঠিত যে উম্মৎ বা জাতীয় সমষ্টি, ব্যক্তিগণের সকলের সমস্ত ধন-সম্পত্তির تكافل বা পারস্পরিক জিম্মাদারী সেই সমষ্টিতে সমর্পিত হইয়াছে। সমাজের দুস্থ ব্যক্তিদিগকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলে ধনবান ব্যক্তিরা অপরাধী হইবেন। পক্ষান্তরে এক মুছলমান অন্য মুছলমানের সম্পত্তি অপরহণ বা জোরদখল করিয়া নিলেও অপরাধী হইবে। (আল্-মানার ৫—৩৯)।

আয়াতের আর একটি বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। কোর্আনের আর চারটি আয়াতে এই মর্মের নিষেধাজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূরার দশম আয়াতে শুধু এতীমদিগের সম্পত্তি গ্রাসের নিষেধ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুছলমান জাতি সম্বন্ধে সমগ্রভাবে ঐ আয়াতের প্রয়োগ হয় নাই। অন্য তিন আয়াতে اموال الناس অর্থাৎ জনগণের ধন-সম্পদের কথা বলা হইয়াছে। "আন্নাছ" বলিতে মুছলমান অমুছলমান নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এখানে সমস্ত মুছলমানকে সমগ্রভাবে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, তোমরা (= মুছলমানরা) তোমাদিগের (= মুছলমান-দিগের) ধন-সম্পদ পরস্পরে (= মুছলমানে মুছলমানে) নিজেদের মধ্যে) = মুছলমানদিগের মধ্যে) অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না। সুতরাং এই ব্যবস্থাটা যে কেবল মুছলমানদিগের জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ-রূপে জানা যাইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই দিক দিয়াও আয়াতে মুফতী আবদুহুর যুক্তিবাদের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

ইছলাম ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বাধিকারকে অস্বীকার করে না, বরং

পুরাপুরিভাবে তাহার সমর্থনই করে। এ অবস্থায়, উম্মতকে আবার জনসাধারণের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভিভাবক বা সমষ্টিগত মালেক বলার সার্থকতা কি থাকিতে পারে, এখানে এই শ্রেণীর একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, বস্তুতঃ এরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। ইছলামের নির্দেশ অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভোগ-দখল করার সম্পূর্ণ অধিকার জনগণের আছে সত্য, কিন্তু তাহা সর্বদা উম্মতের সমষ্টিগত অভিভাবকতার অধীন। অর্থাৎ জাতিগত সাধারণ প্রয়োজনে দরকার হইলে সেই সব সম্পত্তি বা তাহার কোনো অংশ উম্মত নিজের অধিকারে লইতে পারে। কিন্তু কোর্‌আনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, সে গ্রহণ بِالْبَاطِلِ বা অন্যায়ভাবে হইবে না, بِالْإِثْمِ বা পাপভাবে হইবে না এবং ظُلْمًا বা অত্যাচারভাবে হইবে না। যেমন, সেই সম্পত্তি অধিকার করার বস্তুতঃ কোনো অপরিহার্য কারণ উপস্থিত হয় নাই, তবু তাহা অধিকার করা হইল। ইহা হইতেছে, অন্যায়ভাবে গ্রহণ। পক্ষান্তরে উম্মতের মঙ্গলের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে কিছু জমি-জমা বা ঘর-বাড়ী অধিকার করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে ঠিকই। কিন্তু তাহার মূল্য বা ক্ষতিপূরণের হার কম করিয়া নির্ধারণ করা হইল। ইহা হইতেছে পাপভাবে গ্রহণ। আবার মনে করুন, জাতির প্রয়োজনও আছে, মূল্য ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণও সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রাপকের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, আয়েন্দা ওয়াদায়। অথচ উপস্থিত তাহার সম্পত্তি দখল করিয়া নেওয়া হইল, ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া তাহাকে সপরিবারে পথে নামাইয়া দেওয়া হইল। অথচ তাহার পুনর্বাসনের কোনও প্রকার সাহায্য করা হইল না। ইহা হইতেছে অত্যাচারভাবে গ্রহণ। এই তিন প্রকারে কাহারও সম্পত্তি অধিকার করা জাতির (প্রতিনিধিগণের) পক্ষে অন্যায় হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আত্মহত্যা — আয়াতের সারমর্ম এইরূপ — মুছলমানেরা পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবে না—এবং আপোষে একত্রে বিষয়-কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার লাভ ভোগ করিবে। এই নিষেধ ও নির্দেশটি যদি তাহারা অমান্য করিয়া চলে, তাহা হইলে জাতি হিসাবে তাহারা আত্মহত্যার প্রত্যয়ভাগী হইবে। তেজারতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ ইহা এক দিকে যেমন জনসাধারণের পক্ষে অশেষ উপকারজনক, অন্যদিকে সাধুতার অভাব ঘটিলে এই ব্যবসা-বাণিজ্যই হইয়া দাঁড়ায় দেশের ও জাতির সর্বনাশের প্রধানতম কারণ। ইহার কুপ্রভাব যে কত

দূর প্রসারী নিষ্ঠুর শোষণের ন্যায়, ব্যবসা ও ব্যবসায়ীদিগের দুষ্টবুদ্ধি কুশাসনের জন্য যে কতদূর দায়ী, দেশের চক্ষুষ্মান অধিবাসীদিগকে তাহা আজ আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। আয়াতে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগকে জাতি-হন্তা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

৩৭। **টীকা ঃ** উপরে বর্ণিত আদেশ-নিষেধগুলিকে অমান্য করা অথবা পক্ষান্তরে সেগুলিকে যথাসাধ্য মানিয়া চলার ফলাফল কি হইবে, ৩০ ও ৩১ আয়াতে তাহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রথমে বলা হইতেছে যে, এই আদেশ-নিষেধগুলি যাহারা অমান্য করিবে অবাধ্যভাবে, এবং এইরূপ করিতে করিতে স্বভাবতঃ ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে যাহারা, আল্লাহ্ তাহাদিগকে আগুনের মধ্যে ঠেলিয়া দিবেন। অর্থাৎ এই অর্থ-গৃধ্নুতা ও শোষণ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ্‌র অবধারিত সাধারণ নিয়ম অনুসারে, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। ইহা যে আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ, মানব জাতির ইতিহাস শতকণ্ঠে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

৩১ আয়াতে বলা হইতেছে যে, দীনদারী ও দুনিয়াদারী বলিয়া মানব-জীবনের কোনো বিভাগকে ইছলাম স্বীকার করে না। সততা সহকারে ও সাধু উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ যে-কোনো বিষয়-কর্মে প্রবেশ করে, তাহা সমস্তই এবাদত। নিজ বা নিজ পরিজনবর্গের অভাব-অভিযোগ দূর করার উদ্দেশ্যও সাধু উদ্দেশ্য, এবং সে জন্য দুনিয়ার যেসব কাজ-কর্ম করা হয়, তাহাও এবাদত্। এইরূপে, পারিবারিক জীবনেও মানুষকে নানাদিক দিয়া বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। মুছলমান যদি বিষয়-কর্মে ও পারিবারিক জীবনে, আল্লাহ্‌র নিষেধগুলিকে যথাসাধ্য মান্য করিয়া নিজ কর্তব্য পালন করিতে থাকে, তাহা হইলে এই কর্মসাধনার সুফলে, আল্লাহ্ তাহার অন্তরের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে পরিণামে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ কর্মক্ষেত্রই হইতেছে মুছলমানের শ্রেষ্ঠতম ও কঠিনতম ধর্মক্ষেত্র এবং এই রিয়াজাতই হইতেছে সর্বাধিক দুঃসাধ্য কর্মযোগ।

৩৮। **টীকা ঃ অসঙ্গত অভিলাষ**—আয়াতে মুছলমানদিগকে "তামান্নী" বা অসঙ্গত অভিলাষ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মানুষের কতগুলি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পুরুষ যেমন জীবন সাধনার ক্ষেত্র বিশেষে নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ নারীও ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রকৃতিগত তারতম্যগুলি অপরিবর্তনীয়। সুতরাং তাহা দূর করার

জন্য যে অন্যায় আকাঙক্ষা, কোর্‌আন তাহাকে অসঙ্গত অভিলাষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, এবং তাহা হইতে বিরত থাকার জন্য মোছ্‌লেম জনগণকে নির্দেশ দিয়াছে। কারণ, এই প্রবৃত্তির দ্বারা কেবল বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে সমাজ-জীবন বিশৃঙখল হইয়া পড়ে।

আর এক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা আছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে আমল বা সাধনা-সাপেক্ষ। সততা ও সাধনার ফলে আমরা আমাদের সন্ততিবর্গের এবং বংশধর-দিগের শিক্ষা ও সভ্যতার ও আর্থিক অবস্থার ক্রমশই উন্নতি করিয়া চলিতে পারি। ইহার নজীর মুছলমান সমাজেও নিতান্ত বিরল নয়। পক্ষান্তরে এক একজন মানুষের দুশ্চরিত্রতা, অদূরদর্শিতা ও পাপ প্রবণতার ফলে কতশত সোনার সংসার যে একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে, কতশত অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের উত্তরাধিকারীরা যে গুণ্ডা-বদমায়েশে অথবা ফকীর-ভিক্ষুকে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

এই জন্য কোর্‌আন সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিতেছে—অসঙ্গত অভিলাষ ত্যাগ করিয়া সঙ্গতভাবে জীবন সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে—كسب কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া। সৌভাগ্য লাভের উপায় হইতেছে সাধনা, শুধু খোশ-খেয়াল বা আকাশকুসুম কল্পনার দ্বারা—হিংসায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরা ছাড়া—আর কোনো ফল পাওয়া যায় না।

---

৬ রুকু

৩৪। পুরুষরা হইতেছে নারীদিগের সর্বপ্রধান রক্ষকাবেক্ষক, আল্লাহ্ মানব সমাজের কতককে অন্য ক তকের উপর যে শ্রেষ্ঠতা দিয়াছেন তাহার কারণে,—অধিকন্তু পুরুষরা নিজ ধন-সম্পত্তি হইতে (স্ত্রীদিগের জন্য) যে ব্যয় বহন করিয়া থাকে, তাহারাও কারণে (৩৯) অতএব সাধু নারীরা (হইতেছে) অনুগতা, (লোক চক্ষুর) অগোচর বিষয়েও আত্মরক্ষাকারিণী—আল্লাহ্‌র অবধারিত

٣٤ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

দায়িত্ব অনুসারে ; (৪০) আর যে সব স্ত্রীর উচ্ছৃঙখলতার আশঙ্কা করিবে তোমরা, তাহাদিগকে (প্রথমে) সৎ-উপদেশ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিবে, এবং (তাহাতে ফল না হইলে) শয়নগৃহে তাহাদিগকে আলাহিদা করিয়া রাখিবে এবং (সর্বশেষে) তাহাদিগকে প্রহার করিবে,—ফলে স্ত্রীরা যদি অনুগত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আর তাহাদিগের বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইও না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন (সামর্থ্যে) শ্রেষ্ঠতম, (ক্ষমায়) সুবিরাট। (৪১)

حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٥

৩৫। পক্ষান্তরে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে মনোবিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয় যদি তোমাদের, সে অবস্থায় তোমরা স্বামীর স্বজনগণের মধ্য হইতে একজন মীমাংসক এবং স্ত্রীর স্বজনগণের মধ্য হইতে একজন মীমাংসক নিযুক্ত করিয়া দিবে,—ইহারা উভয় আত্মসংশোধনের ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সর্ববিৎ, সব বিষয়ে খবরদার। (৪২)

٣٥ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٥

৩৬। এবং তোমরা এবাদত্ করিতে থাকিবে আল্লাহ্‌র, আর কোনো

٣٦ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا

بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا
وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُوْرًا

কিছুকেই তাঁহার শরীক করিবে না, এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে থাকিবে যথাযথভাবে, (৪৩) আরও (সদ্ব্যবহার করিবে) আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতি, ও এতীমদিগের প্রতি, ও কাঙ্গালীদিগের প্রতি, ও নিকটবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি, ও দূরবর্তী প্রতিবেশিগণের প্রতি, ও পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর প্রতি, ও (নিঃস্ব) পথচারীদিগের প্রতি, ও তোমাদিগের দক্ষিণ হস্তের অধিকৃত (ব্যক্তি)-গণের প্রতি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেইসব আত্মম্ভরী অহঙ্কারী ব্যক্তিকে মহব্বত করেন না,—(৪৪)

٣٧ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابًا مُّهِيْنًا

৩৭। যাহারা নিজেরা কৃপণতা করে, অধিকন্তু অন্য লোকদিগকেও কৃপণতার নির্দেশ দিয়া থাকে, এবং আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক যে ধন-সম্পদ তাহাদিগকে দান করিয়াছেন—তাহা গোপন করিয়া রাখে ; অথচ অবস্থা এই যে, কাফেরদিগের জন্য আমরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি হেয়স্কর শাস্তি,—(৪৫)

٣٨ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ٥

৩৮। আরও (আল্লাহ্ মহব্বত করেন না) সে সব ব্যক্তিকে, যাহারা নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকে মানুষকে দেখাইবার জন্য, (বস্তুতঃ) তাহাদের না আছে ঈমান্ আল্লাহ্র উপর, আর না আছে (বিশ্বাস) পরকালের প্রতি, বস্তুতঃ শয়তান হইয়াছে মোছাহেব যাহার, অতি দুষ্টসঙ্গ সে ব্যক্তি। (৪৬)

٣٩ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ٥

৩৯। আর তাহারা যদি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করে ; তাহা হইলে কোন বিপদ তাহাদিগের উপর পতিত হইয়া যায় ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত আছেন।

٤٠ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ٥

৪০। নিশ্চয় আল্লাহ্ (মানুষের কর্মফল সম্বন্ধে) কণা পরিমাণেও অবিচার করেন না, বস্তুতঃ সে কর্ম যদি সৎ হয়, তাহার পুণ্যফল দ্বিগুণ করিয়া দেন, বরং নিজের সন্নিধান হইতে প্রদান করেন মহাপুরস্কার। (৪৭)

৪১। অতএব কি (অবস্থা) ঘটিবে তখন—যখন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে এক একজন সাক্ষীকে আনয়ন করিব আর তোমাকে আনয়ন করিব এই উম্মত সম্বন্ধে সাক্ষী হিসাবে ; —(৪৮)

৪১ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا ؕ

৪২। যাহারা কাফের হইতেছে ও রাছুলকে অমান্য করিতেছে, সে-দিন তাহারা আকাঙক্ষা করিবে : (হায় !) তাহাদিগকে (গর্ভে) নিয়া জমিন যদি আজ সমতল হইয়া যাইত ! তখন আর তাহারা আল্লাহ্‌র হুজুরে কোনো কথা গোপন করিতে পারিবে না। (৪৯)

৪২ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۠

তাফ্‌ছীর

৩৯। **টীকা: কাউওয়ামুন, রক্ষকাবেক্ষক**—এই আয়াতের তাফছীরে সাধারণতঃ এমন একটা ভাবধারার সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা পড়িলে মনে হইবে যে, ইছলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী হইতেছে একটি Home enternee, আর তাহার স্বামী হইতেছেন পিটুনী পুলিসের এক জবরদস্ত দারোগা। ইহা অতি অসঙ্গত ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণা। ইছলামের ওছুল ও আদর্শের সহিত এই ধারণার কোনো সংস্রব নাই।

আয়াতে বলা হইতেছে, الرجال বা পুরুষ সমাজ সাধারণভাবে, النساء বা নারী সমাজের قوام কাউওয়াম। ইমাম রাগেব ইহার ধাতুগত তাৎপর্য, বিভিন্ন শব্দরূপ ও ব্যবহারিক অর্থের দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক তাৎপর্যের নজীর কোর্‌আন হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ও অন্যান্য সমস্ত বিশিষ্ট অভিধানকারের সমবেত অভিমতের সারমর্ম এই যে, ق-و-م ধাতু হইতে কওম, কায়েম, কিয়াম, কেওয়াম প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি।

ইহার ধাতুগত অর্থ—দণ্ডায়মান হওয়া, স্থিতিশীল হওয়া, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নির্ভরস্থল হওয়া ইত্যাদি।

ব্যবহারে যেখানে বলা হইবে—قام الرجل على المراة অর্থাৎ পুরুষ কোনো "স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কায়েম হইল"—ইহার অর্থ হইবে مانها সে তাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। কোর্আনের আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলা হইতেছে:—

"اى متكفلون بامور النساء معنيون بشئونهن"—يعنى عورتوں كے امور كے متكفل اس كے حالات پر توجه كرنے والے - (لسان العرب) نقل از تفسير أردو محمد على و قام الرجل المراة و عليها مانها فام بشانها - قاموس

يقال فلان قوام اهل بيته و هو الذى يقيم شانهم و منه قوله تعالى و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما - صحاح اللغة للجوهرى -

এই সব আভিধানিক প্রমাণের সারমর্ম এই যে, স্ত্রীলোকের কাউওয়াম অর্থে—তাহার ভরণ-পোষণের, তাহার মানসম্ভ্রম রক্ষার ও তাহার সমস্ত অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার দায়িত্বশীল পুরুষকে বুঝাইবে। আল্লাহ্র এক নাম কাউয়ূম, ইহাও একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার তাৎপর্যে রাগেব বলিতেছেন:

القيوم ' اى القايم الحافظ لكل شىء و المعطى له ما به قوام -

"যিনি প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষক ও রক্ষক এবং তাহাকে বজায় রাখার জন্য আবশ্যক সব কিছু যিনি প্রদান করেন।"

এই সাধনায় পুরুষের অভিভাবকত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য। حاكم محكوم বা শাসক শাসিতের কোনো প্রসঙ্গই আয়াতে নাই, উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থনও নাই।

৪০। **টীকা: সাধ্বী নারীর লক্ষণ**—আয়াতে সাধ্বী নারীর দুইটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রধান লক্ষণ—সে হইবে কানেতা, অর্থাৎ অনুগত বা অনুরক্ত। স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হওয়ার কথাই এখানে বলা হইতেছে। একটি হাদীছ হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। (এবন-কাছীর ৩—৮১)। দ্বিতীয় লক্ষণ—স্বামীর অনুপস্থিতির সময় গৃহকর্ত্রী হিসাবে সে স্বামীর বিষয়-সম্পদ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলে এবং লোকচক্ষের অগোচরেও সে নিজ দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে।

আয়াতের শেষভাগে بما حفظ الله বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যেরূপে আল্লাহ্ স্বামীদিগের উপরে স্ত্রীদিগের স্বত্বাধিকারকে সুরক্ষিত করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপে স্ত্রীদিগের উপরেও স্বামীদিগের নানাপ্রকার স্বত্বাধিকার ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীদিগকেও পক্ষান্তরে স্বামীদিগের স্বত্বাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

৪১। **টীকাঃ উচ্ছৃঙ্খল স্ত্রীর সংশোধন ব্যবস্থা**—পবিত্রতা ও সাধু প্রকৃতির নারীদিগের দুইটি প্রধান লক্ষণ বর্ণনার পর এই আয়াতে অসতর্ক ও অসংযত নারীদিগের সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রদান করা হইতেছে। এখানে বলা হইতেছে যে, যদি কোন স্ত্রীর আচরণ দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে, তাহার জীবনে একটা উচ্ছৃঙলতার ভাব প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইলে বিশেষ ধৈর্য ও সহানুভূতির সহিত তাহার সংশোধন করার চেষ্টা পাওয়াই স্বামীর কর্তব্য হইবে। এই উপায়গুলিও আয়াতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সর্বপ্রথম উপায় হইতেছে "ওয়াজ"। আন্তরিক মঙ্গল কামনা সহকারে ও সহানুভূতিপূর্ণ ভাষায় সদুপদেশ দানকে ওয়াজ বলা হয়। স্ত্রীর কোন আচরণ আপত্তিজনক বলিয়া মনে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনা, তিরস্কার বা শাসন পীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলে হিতে বিপরীত ফল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কাজেই (স্বামীকে ও অন্যান্য অভিভাবকদিগকে) নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, প্রথমে বুঝাইয়া-সুজাইয়া স্ত্রীর মানসিক অবস্থার সংশোধন করিয়া দিতে। ইহাতে সুফল না হইলে স্বামী স্ত্রীর শয্যা পৃথক করিয়া দিবেন। ইহাতেও কোনো ফল না হইলে স্বামী তাহাকে প্রহার করিতে পারিবেন।

'প্রহার' সম্বন্ধে প্রথমে জ্ঞাতব্য এই যে, এখানে অবস্থা বিশেষে প্রহার করার অনুমতি মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মোছলেম, আবু-দাউদ, নাছাই, এব্‌ন-মাজা প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হযরত রাছুলে কারীমের বিভিন্ন আদেশ ও উপদেশ হইতে জানা যাইতেছে, যথাসম্ভব প্রহার না করাই শ্রেয়ঃ। বিশ্বস্ত তাফ্‌ছীর-কারগণের সাধারণ অভিমতও ইহাই। প্রহারের স্বরূপ সম্বন্ধেও রাছুলুল্লাহ্‌র হাদীছ (জাবের, মোছলেম, বিদায়ের হজ) অনুসারে পূর্বাপর মোহাদ্দেছ, তাফ্‌ছীরকার ও ফকীহগণের সমবেত মত এই যে, "ضربا غير مبرح" বা সামান্য প্রকারের প্রহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য চাবুক, বেত বা লাঠি-ছড়ি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অনেকে হাত, মেছওয়াক বা রুমাল দ্বারা প্রহার করার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হইতেছে —উপরে সংশোধনের যে পদ্ধতিগুলির উল্লেখ করা হইল, তাহার প্রথমটি সফল হইলে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টি সফল হইলে তৃতীয়টিকে অবলম্বন করিবে না। পক্ষান্তরে সংশোধনের পর পুরাতন কথার উল্লেখ করিয়া স্ত্রীকে লাঞ্ছনা দিবে না।- و اجعلوا ما كان منهن كان لم يكن - الو السعود অর্থাৎ—অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাও—এমনভাবে যেন কিছুই ঘটে নাই।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, এই প্রকার সামান্য প্রহারের অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতার অপরাধে এবং সংশোধনের চেষ্টার প্রাথমিক ২টি পর্যায় বিফল হওয়ার পর। কিন্তু আমাদের সমাজে গোরু ও জোরুকে বেদম প্রহার করার যে অত্যাচার সাধারণভাবে প্রচলিত আছে, তাহার কোনো দাদ ফরিয়াদ নাই। আয়াতের শেষে ان الله كان عليا كبيرا। বলিয়া এই শ্রেণীর জালেম পুরুষদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, দুর্বল ও লাচার দেখিয়া স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে যাহারা, তাহাদের জানা উচিত, এই "অবলা" দিগের পক্ষ হইতে প্রতিশোধ নেওয়ার সমর্থ একজন প্রবল প্রতাপ ও সর্বশক্তিমান প্রভু আছেন। তোমাদিগের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াও তিনি নিজ রহমতের ছায়ায় তোমাদের লালন-পালন করিতেছেন,সেমতে নিজেদের তুলনায় দুর্বলদিগকে ক্ষমা করা ও প্রেমভাবে গ্রহণ করা তোমাদেরও উচিত। অন্যথায় তোমাদের জুলুমের দণ্ড তোমাদিগকে ভুগিতে হইবে। এই দণ্ড আসে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সমাজ হিসাবে গৌণভাবে।

দ্বিতীয়তঃ আমার জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি, স্ত্রীপীড়ক স্বামী, সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছে।

৪২। **টীকাঃ প্রতিকারের শেষ ব্যবস্থা**—অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ স্ত্রীর পক্ষ হইতে প্রকাশ পাইলে তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব আয়াতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি বিরোধের ভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ফলে উভয়ের মনো-বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইয়া দাঁড়ায়, সে অবস্থায় তাহাদের দাম্পত্য জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার কর্তব্য সমাজের উপর ন্যস্ত করা হইতেছে।

আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর এই মনোবিচ্ছেদের অবস্থায় সমাজের জনসাধারণ বা তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা (অথবা শরিয়তের হাকেমগণ) দুইজন যোগ্য অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে মধ্যস্থ বা মীমাংসকরূপে মনোনীত করিবেন। ইহাদের একজন মনোনীত

হইবেন স্বামীর আত্মীয়দের মধ্য হইতে, আর একজন মনোনীত হইবেন স্ত্রীর পরিজনবর্গের মধ্য হইতে। এই মধ্যস্থ দুইজনের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হইবে —উভয় পক্ষের অভিযোগ যথাযথভাবে অবগত হওয়া, নিজেদের মধ্যে সে-গুলির বিচার-আলোচনা করার এবং এই প্রকারে তাহাদের মধ্যে আপোষে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেওয়া।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোবিচ্ছেদ ঘটার বিভিন্ন প্রকার কারণ হইতে পারে। এক প্রকার কারণ উপস্থিত হইয়া যায়, কতকগুলি সাময়িক ঘটনা ও অবস্থার ফলে, এবং নানা অনভিপ্রেত পরিবেশের সর্বনাশী প্রভাবের কারণে, সেগুলির দুষ্ট প্রভাব ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইতে থাকে। বহুক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হইতে জান গিয়াছে যে, এসব কলহ-কোন্দল যতই গুরুতর হউক না কেন, বস্তুতঃ দম্পতিযুগলের কেহই অন্তরের অন্তস্তলে কাহাকেও বর্জন করিতে চাহিতেছে না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সে যে নিরপরাধ, এবং অন্যেরাই মূল বা প্রধান দায়ী—এই "কথা" সপ্রমাণ করাই হয় উভয় পক্ষের প্রধান অভিপ্রায়। পক্ষান্তরে বহুক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মিয়গণ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নিজেদের পুত্র-কন্যার এবং বধূ-জামাতার দাম্পত্য জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলার উপকরণগুলি সঞ্চয় করিয়া দিতে থাকেন। পাড়া কাঁদুনী ও "ময়মনা কুটনী"দের প্ররোচনাও এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। আন্তরিকতা, সাধুতা ও সহানুভূতির সহিত চেষ্টা করা হইলে এসব ক্ষেত্রে উভয়ের মন পরিবর্তন আদৌ অসম্ভব হয় না। তাই আয়াতে বল হইতেছে যে, "তাহারা দুইজন অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী (মতান্তরে উভয় মধ্যস্থ) প্রতিকারে ইচ্ছুক হইলে তাহার অনুকূল উপকরণ আল্লাহ্ উপস্থিত করিয়া দিবেন।" ফলতঃ সংশোধন ও মীমাংসাই কোর্‌আনের লক্ষ্য ও আদর্শ।

দাম্পত্য জীবনে কৃচিৎ ও কদাচিৎ এমন গুরুতর পরিস্থিত হইয়া যায়, অন্য প্রকারের কতকগুলি দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক কারণেও। এই কারণ-গুলির প্রতিকার, সর্বত্র অসাধ্য না হইলেও, সাধারণতঃ অসাধ্য। এ অবস্থায় সংশোধন ও প্রতিকারের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। তখন অর্থাৎ মধ্যস্থগণ সংশোধন ও প্রতিকার সম্বন্ধে নিরাশ হইলে সমাজের বা মধ্যস্থগণের কর্তব্য কি হইবে, আলোচ্য আয়াতে সে সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনো ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই বলিয়া কতিপয় ইমাম ও তাফ্ছীরকার মনে করেন। অন্যান্য ইমাম ও তাফ্ছির-কারগণ ইহা স্বীকার করেন না। কাজেই এই উপলক্ষে একট মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই মতভেদের অবস্থা সম্বন্ধে মরহুম মাওলানা হাক্কানী লিখিতেছেন :

"ইমাম শাফেয়ী, মালেক, এছ্‌হাক, আওজায়ী, বরং হযরত ওছমান, আলী ও এব্‌ন-আব্বাছের অভিমত এই যে, মধ্যস্থরা যদি বুঝিতে পারেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনাও হওয়ার মোটেই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং তালাক ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, এ অবস্থায় মধ্যস্থদের তালাক ঘোষণা করিয়া দেওয়ার অধিকার আছে। পক্ষান্তরে আতা, হাছন, এবন-জয়দ ও ইমাম আবু হানিফা প্রমুখ আলেমগণ বলেন যে, তালাকের অধিকার মধ্যস্থদের নাই, সে অধিকার ন্যস্ত আছে স্বামীর ও স্থানীয় শাসনকর্তার উপর। অবশ্য, তাহাদের অনুমতি থাকিলে আপত্তির কারণ থাকে না।

এ সম্বন্ধে উভয়পক্ষ হইতে যেসব যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ইঁহাদের কোনো পক্ষই আলোচ্য আয়াতের বিচারক্ষেত্রে হযরত রাছুলে কারীমের সময়কার কোনো প্রমাণ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (কেতাবুল-উম) ও ইমাম বাইহাকী (ছুনান) এবং এব্‌ন-জরীর ও এব্‌ন-কাছীর প্রমুখ তাফ্‌ছিরকারগণ হযরত ওছমান ও হযরত আলীর খেলাফৎকালের দুইটি নজীর উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় দলের সমর্থকগণের একমাত্র অবলম্বন হইতেছে তাহাই। কিন্তু স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, এই উভয় ব্যাপারে খলিফারা মধ্যস্থ-দিগকে অবস্থা বিশেষে 'তালাক' ঘোষণা করার নির্দেশ দিতেছেন। সুতরাং এই উভয়ক্ষেত্রে মধ্যস্থগণকে শাসনকর্তা নিজের Power deligate করিতেছেন, ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে। মাওলানা হাক্কানীর বর্ণনায় পাঠকগণ দেখিয়া-ছেন যে, শাসনকর্তার বা স্বামীর অনুমতি থাকিলে আপত্তির কোনো কারণ থাকে না।

পাঠক এখন পরিস্থিতির অন্যদিকটার প্রতি লক্ষ্য করুন। মনে করুন, কোনো দেশে যথাযোগ্য শাসনকর্তার অভাব, অথবা থাকিলেও তাঁহারা যে কোনো কারণে হউক, এই শ্রেণীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ বা অসম্মত। সে অবস্থায়, স্থানীয় মুছলমানগণ সামাজিকভাবে স্বামী ও স্ত্রীর পরিজনগণের মধ্য হইতে দুইজন মধ্যস্থ নির্বাচন করিয়া দিবেন। এই মধ্যস্থ-দিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না দিয়া তাহার পরিজনবর্গ মধ্যস্থ নির্বাচন করিতে উদ্যোগী হইতে পারেন না। সুতরাং মধ্যস্থদের তালাক ঘোষণা করারও ক্ষমতা আছে, এই তথ্য অবগত হওয়ার পরও যদি সে মধ্যস্থ নির্বাচনে সম্মতি দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে নিজের তালাক দেওয়ার ক্ষমতা মধ্যস্থগণের

প্রতি تفويض বা Deligate করিয়াছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রেও অন্যপক্ষের আপত্তির কোনো কারণ থাকিতে পারে না।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ৩৪ আয়াতের প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা শেষ মীমাংসার জন্য এই চরম ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। এই ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইতেছে স্বামীর ও স্ত্রীর পরিজনভুক্ত দুইজন নির্বাচিত মধ্যস্থের উপর। আপোষ মীমাংসার সমস্ত চেষ্টা-চরিত্রের পর তাঁহারা উভয়ে একমতে এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এক্ষেত্রে তাহাদের সংশোধনের বা মত পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নাই। এরূপ অবস্থায় তাহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই সর্বতোভাবে সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে। তবে সমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, আবশ্যক মতে মধ্যস্থদের সিদ্ধান্তকে বলবৎ করার জন্য, কোনো উপযুক্ত আদালতের Confirmation বা মঞ্জুরীর ব্যবস্থা থাকিলে, কোনোপক্ষ হইতে আপত্তি করার কোনো কারণ থাকে না।

উপসংহারে, আর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি চিন্তাশীল পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মনোবিচ্ছেদের চরম অবস্থায় একটা শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যই কোর্‌আনে দুইজন মধ্যস্থ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই মধ্যস্থরা বিশেষ চেষ্টা-চরিত্র করার পর, তাহাদের মন পরিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে হতাশ হইতেছেন। কিন্তু এ অবস্থায় মধ্যস্থদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে কোর্‌আনে কোনো নির্দেশ দেওয়া হইতেছে না, এ কেমন কথা। আমার জ্ঞানবিশ্বাসমতে এরূপ অসম্পূর্ণতার ত্রুটি কোর্‌আনে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। কাজেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি আয়াতটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করি। তখন আয়াতের حكم শব্দের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে।

আয়াতে বলা হইতেছে, দুই পক্ষের পরিজনবর্গ দুইজন "হাকাম্" মনোনীত করিবেন। আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি মীমাংসক বলিয়া। ইহার মূল হইতেছে حكم হুক্‌ম। হুক্‌ম বা 'হুকুম' শব্দের অর্থ হইতেছে قضا অর্থাৎ ফয়ছালা। হাকাম্ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অভিধানকাররা বলিতেছেন—

والحاكم منفذ الحكم ' كالحكم محركة - قاموس

অর্থাৎ—যাহার নির্দেশ স্বতঃ বলবৎ (نافذ) হয়, এমন ব্যক্তি (কামূছ)। কোর্‌আনের বিখ্যাত অভিধানকার ইমাম রাগেব বলিতেছেন :

و يقال حاكم و حكام لمن يحكم بين الناس ' قال الله تعالى و تدلوا بها الى الحكام - و الحكم المتخصص ' فهو ابلغ - قال عز و جل فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها - و انما قال حكما و لم يقل حاكما تنبيها ان من شرط الحكين ان يتوليا الحكم عليهم و لهم حسب مايستصو بانه من غير مراجعة اليهم فى تفصيل ذلك - (راغب)

হাদীছের বিশিষ্ট অভিধানকার শেখ জামালুদ্দীন মোহাম্মদ তাহের বলিতেছেন : الحكم من لا يرد حكمه - مجمع البحار -।

যাঁহার হুকুম অমান্য করা যাইতে পারে না, তাঁহাকে হাকাম্ বলা হয়। (মাজ্‌মাউল-বেহার)।

মেশকাতের টীকাকার তায়বীর নিম্নলিখিত অভিমত শেখ ছাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

حكما اى حاكما يقضى بين الناس - و الحكم الامير الذى يلى امورهم - ايضًا

আরবী সাহিত্যের বিশ্বস্ত অভিধান এবং কোর্‌আন ও হাদীছের বিশিষ্ট শব্দকোষগুলি হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হাকাম্ শব্দ এমন সব বিশিষ্ট হাকেম বা বিচারককে বুঝাইতেছে, যাঁহাদের উপর কোনো বিশেষ বিষয়ের বিচারভার অর্পণ করা হয় এবং যাঁহাদের নির্দেশ স্বতঃ বলবৎ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মনোবিচ্ছেদের বিচার মীমাংসা করার জন্য দুইজন হাকাম্ মনোনীত করার আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, অবস্থা বিশেষে তালাকের নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব ও অধিকার কোর্‌আনে স্পষ্টভাবে এই বিচারকদিগের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে।

ইছলাম বৈবাহিক জীবনের শান্তি ও শৃঙখলা রক্ষার জন্য কতদূর সজাগ, এই ব্যবস্থা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তালাক সম্বন্ধে অন্যান্য কথা তাফছীরের বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। নওয়াব-বাদশাদের অশুভ প্রভাবে এবং স্বেচ্ছাচারী "আমীর-ওমরা"-গণের দুষ্ট প্ররোচনায় ইছলামের তালাক আজকাল যে নিষ্ঠুর বর্বরতায় পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা ধর্ম নয়—বরং তাহার শোচনীয় ব্যভিচার মাত্র।

৪৩। **টীকা ঃ আল্লাহ্‌র এবাদত**—সূরা নেছার প্রথম আয়াত হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৫ আয়াত পর্যন্ত মানুষের সামাজিক জীবনের নানা অবস্থা ও

ব্যবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে ঐসকল আদেশ-নির্দেশ ও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত মূল তথ্যটির প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। আয়াতের প্রারম্ভে মুছলমানদিগকে আদেশ দেওয়া হইতেছে, আল্লাহ্‌র এবাদত করিয়া চলার। ইছলামের পরিভাষায়, এবাদত—শব্দের অর্থ, প্রেমভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ (বাকারা ৪ টীকা দেখুন)।

ব্যক্তিগত, পরিবারগত, বৈবাহিক সম্বন্ধগত এবং সমাজগতভাবে মানব জীবনের যেসব কর্তব্য আছে, তাহার প্রত্যেকটিই হইতেছে আল্লাহ্‌র এবাদত। কারণ রাব্বুল আলামীন তাঁহার রাবুবিয়তের কতকগুলি কর্তব্য পালনের জন্যই মানব সমাজকে, এবং এ বিষয়ে জগতে বাস্তব আদর্শ স্থাপনের জন্য, বিশেষ করিয়া মোছলেম জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সূরা নেছার প্রাথমিক আয়াত-গুলিতে ধারাবাহিকভাবে এই কর্তব্যগুলির অবতারণা করা হইতেছে। তাই উপক্রম-উপসংহারের মধ্যভাগে, মোছলেম বা আল্লাহ্‌তে সমর্পিত-চিত বান্দা-গণকে বলা হইতেছে যে, "তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র এবাদত করিতে থাকিবে" —যুগপৎভাবে এই কর্তব্যগুলিকে পালন করিয়া।

আল্লাহ্‌র এবাদত করার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে—"আর আল্লাহ্‌র সহিত কোনো বিষয় বা বস্তুকে তাঁহার শরীক বানাইও না।" কাফের ও মোশরেকের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাফের আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে না। আর মোশরেক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন সব ধারণা পোষণ করে, যাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বিষয় বা বস্তুকেও আল্লাহ্‌র গুণ বা শক্তির অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করে। এই শ্রেণীর শের্ক আজ মুছলমান সমাজেও বহুলভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

আল্লাহ্‌র এবাদতের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতা প্রভৃতির প্রতি এহছান করার আদেশ কোর্‌আনের আরও বহুস্থানে দেওয়া হইয়াছে। কারণ উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র অন্যতম প্রধান এবাদত। দুনিয়ার মানব সাধারণ কার্যত: এই অত্যা-বশ্যকীয় সত্যটাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে। মুছলমানও যাহাতে এই প্রমাদের বশবর্তী হইয়া আত্মহত্যা করিয়া না বসে, সে জন্য পুন: পুন: সেই সত্যটা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই প্রসঙ্গের আলোচনা আমি পূর্বে বিভিন্ন স্থানে করিয়াছি। আল্লাহ্ সুযোগ দিলে ভবিষ্যতেও করিব। এখানে আভিধানিক তাৎপর্য সম্বন্ধে দুইটি তথ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইব।

সূরা নাহ্‌লের ৯০ আয়াতে বলা হইয়াছে—"আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ

করিতেছেন আদ্ল করিতে ও এহ্ছান করিতে।" আদ্ল অর্থে বিচার, এই জন্য বিচারালয়কে আদালত বলা হয়। যাহার নিকট যে পরিমাণ প্রাপ্য, সেইটুকু গ্রহণ করিলে এবং যাহার কাছে যে পরিমাণ দেয়, তাহা প্রদান করিলে, বিচার করা হইল। কিন্তু যাহাকে যে পরিমাণ দেয়, তাহার অতিরিক্ত দিলে, পক্ষান্তরে যাহার নিকট যে পরিমাণ প্রাপ্য, তাহার কম নিলে এহ্ছান করা হয়। এখানে পিতা-মাতা প্রভৃতির প্রতি এহ্ছান করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আয়াতে الصاحب بالجنب এর প্রতিও এহছান করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। جنب অর্থ—"অঙ্গ বিশেষ, শরীরের এক পার্শ্ব, এক দিক্কার অর্ধাঙ্গ।" বে-বর্ণ الصاق বা সংলগ্নতা বোধক। অর্থাৎ দেহের এক অংশের সংলগ্ন হইয়া থাকে যে সঙ্গী, الصاحب بالجنب বলিতে তাহাকে বুঝাইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন—ইহার অর্থ "সহপাঠি, সহকর্মী, সহযাত্রী প্রভৃতি যাহারা অধিক সময় মানুষের সহচর হিসাবে অবস্থান করে।" হযরত আলী ও আবদুল্লাহ্ এবন-মাছ্উদ প্রভৃতি ছাহাবী এবং অন্য কয়েকজন আলেম বলিছেন—উহার অর্থ হইতেছে স্ত্রী। আমার মতে ইহাই সঙ্গত তাৎপর্য। কারণ, অভিধান ও ব্যাকরণের সহিত এই তাৎপর্যের সর্বাধিক সামঞ্জস্য আছে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে সাহচর্য, তাহা অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সাহচর্য আর কি হইতে পারে? ইহা ব্যতীত, অব্যবহিত পূর্ববর্তী আয়াত-গুলিতে স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহারে প্রসঙ্গই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাসঙ্গিক হিসাবে এখানে যে স্ত্রীর কথাই বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়। তবে আমার মনে হয়, আয়াতে যেমন স্ত্রীর প্রতি এহ্ছান করার জন্য স্বামীকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীকেও আদেশ দেওয়া হইয়াছে স্বামীর প্রতি এহছান করিতে। এখানে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বিশেষ্য, সর্বনাম বা ক্রিয়া পদাদি পুরুষ বাচকরূপে ব্যবহৃত হইলেও, বিশেষ-ভাবে ব্যতিক্রমের ইঙ্গিত না থাকিলে সাধারণতঃ উহা নর ও নারী উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য হইয়া থাকে। অন্যথায় কোর্আনের অধিক সংখ্যক আদেশ-নিষেধ হইতে নারীদিগকে বর্জিত করিয়া দিতে হইবে। দুনিয়ার সমস্ত আইন-কানুনে এই পরিভাষা গৃহীত হইয়াছে। *

৪৫। **টীকাঃ এহছান বনাম কৃপণতা**—৩৭ ও ৩৮ আয়াত ৩৬ আয়াতের

* See Indian Penal code section 9; section 13 of the general clauses act.

সংলগ্ন, অর্থের হিসাবে এগুলি একই আয়াত। এইজন্য পূর্ণচ্ছেদ বসিয়াছে ৩৮ আয়তের শেষে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারী লোকদিগকে মহব্বত করেন না। ৩৭ ও ৩৮ আয়াতে আল্লাহ্‌র সেই নাপছন্দিদা লোকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি যথাক্রমে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৬ আয়াতে যে এহ্‌ছান করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায় অর্থ ব্যয় করার। কিন্তু অবস্থাপন্ন সমাজের একদল লোক এইসব সৎকাজে অর্থব্যয় করিতে অতি-মাত্রায় কুণ্ঠিত। অন্য কেহ লোকদিগের সেবার জন্য অর্থ ব্যয় করুক, ইহাও তাহাদের সহ্য হয় না। কারণ, এ অবস্থায় তাহাদিগকে লোকচক্ষে হেয় হইয়া পড়িতে হয়। এই কৃপণদিগের আর একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যেসব অর্থবিত্ত দান করিয়াছেন, সেগুলিকে তাহারা গোপন করিতে থাকে—যেন কেহ তাহাদের নিকট হইতে কিছু উপকার পাওয়ার আশা না করিতে পারে। লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িলে, দেশের লোক অনাহারে মরিতে বসিলে, তাহার দ্বিগুণ চর্তুগুণ লাভ করিয়া নিজেদের অর্থগৃধ্নুতার শয়তানী প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকে।

এই শ্রেণীর লোকদিগের হীন-মানসিকতার পরিচয় দেওয়ার পর, আল্লাহ্ বলিতেছেন—"আমরা কাফেরদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি হেয়স্কর শাস্তি।" এখানে "কাফের" বলিয়া আল্লাহ্ কাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন, প্রত্যেক পাঠককে তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

৪৬। টীকাঃ যশভিখারীর বদান্যতা—প্রথম শ্রেণীর লোক ছিল, ব্যয়-কুণ্ঠিত কৃপণের দল। এই আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। ইহারা ব্যয় করে কিন্তু সাত্ত্বিকভাবে নয়। ইহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, তাঁহার সন্তোষ লাভের জন্য ও তাঁহার নির্ধারিত পাত্র ও পদ্ধতিক্রমে ব্যয় না করিয়া, নিজের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য ব্যয় করে লোক দেখাইবার মতলবে, দানের পুরস্কার হিসাবে তাহাদিগের নিকট হইতে যশ ও খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে। ইহার কারণ এই যে, "তাহাদের আল্লাহ্‌র উপরও ঈমান নাই, আখেরাতে বা পরকালেও বিশ্বাস নাই।" ঈমান ও বিশ্বাসের অভাব না থাকিলে, মানুষের কাছে প্রতিদান প্রার্থী না হইয়া তাহারা পুরস্কার পাওয়ার আশা রাখিত আল্লাহ্‌র হুজুরে। কৃপণরা ব্যয় কুণ্ঠিত হয়, তাহার কারণও ইহাই।

তাহারা মনে করে, স্বদেশের বা স্বসমাজের হতভাগ্য মানুষগুলির জন্য আমি যে অর্থ ব্যয় করিব, তাহার পরিবর্তে আমার কোনো লাভ হইবে না, সমস্তই বিফল হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আছে যাহার, এরূপ ধারণা পোষণ করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। (৪০ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

৪৭। **টীকাঃ সৎকর্মের শুভফল**—৩৯ আয়াতে বলা হইতেছে যে, সৎকর্মে ব্যয় করা হয় যে অর্থ, তাহাতে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। ৪০ আয়াতটি তাহার উপসংহার। এখানে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র ন্যায়রাজ্যে বিন্দুমাত্র অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মানুষ যদি কোনো মন্দ কাজ করে, তবে নিজের কাজের অনুরূপ পাপ তাহাতে বর্তায়। কিন্তু তাহার সে কাজটি যদি সৎ হয়, তবে তাহার ফল দ্বিগুণ হয় (দশ গুণও হয়) এবং আল্লাহ্‌র রহমতে তাহা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং মানুষ ইহা দ্বারা ইহকালে ও পরকালে মহা পুরস্কারের অধিকারী হইয়া যায়।

৪৮। **টীকাঃ রাছুলগণের সাক্ষ্য**—মানব সমাজের মঙ্গল ও মুক্তি সাধনের জন্য বহু নবী ও রাছুল পূর্বে যুগে যুগে দুনিয়ার দিকে দিকে প্রেরিত হইয়াছেন। অবশেষে আমাদের হযরত প্রেরিত হইয়াছেন বিশ্বনবী হিসাবে ও শাশ্বত নবী হিসাবে। সৃষ্টিকর্তা করুণাময় আল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বমানব যাহাতে এক ভ্রাতৃসমাজে পরিণত হইয়া যাইতে পারে, সমস্ত আম্বিয়ার মিশনের চরম লক্ষ্য হইতেছে ইহাই। নবী ও রাছুলগণ তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উম্মতগুলি সেইসব শিক্ষা ও আদর্শের মর্যাদা কতটা রক্ষা করিয়াছে, একদিন সকলের মোকাবেলায় তাহার বিচার হইবে। অন্য নবীরা নিজ নিজ উম্মত সম্বন্ধে নিজেদের বক্তব্য আরজ করিবেন, আর এই উম্মত সম্বন্ধে আমাদের হযরতও আল্লাহ্‌র হুজুরে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ৪১ আয়াতে জিজ্ঞাসাচ্ছলে বলা হইতেছে—"সেদিনকার অবস্থা কি হইবে?" ৪২ আয়াতে সেই অবস্থার আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

৪৯। **টীকাঃ সেইদিনের অবস্থা**—উপরের জিজ্ঞাসার উত্তরে আল্লাহ্ নিজেই বলিয়া দিতেছেন—"যাহারা কাফের হইয়াছে ও রাছুলের নাফর্মানী করিয়াছে, সেদিন তাহারা নিজেদের কর্মফলকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে থাকিবে—আমরা যদি নিশ্চিহ্নভাবে ভূগর্ভে লীন হইয়া যাইতাম, এ দুর্দশার তুলনায় তাহাও আমাদের পক্ষে ভাল ছিল।"

৪২—

মূলে আছে—"الذين كفروا و عصوا الرسول" শাব্দিক অনুবাদে—যাহারা (আল্লাহ্‌কে) অমান্য করিয়াছে ও রাছুলের নাফর্মানী করিয়াছে ইত্যাদি। ফলতঃ আয়াত হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সত্যকার মুছলমানের পক্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে দুইটি ঃ আল্লাহ্‌কে মান্য করা আর রাছুলের ফরমাঁবরদার হইয়া চলা। কিন্তু যে ব্যক্তি মুখে বলে—"আমি আল্লাহ্‌কে স্বীকার করি, তবে আল্লাহ্‌র কালামের বা কোর্‌আন মাজীদের আদেশ-নিষেধের তাবেদারী করিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি"; সে ব্যক্তি কখনো মুছলমান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঠিক এইরূপ, যে ব্যক্তি বলে যে, "আমি হযরত মোহাম্মদকে আল্লাহ্‌র রাছুল বলিয়া স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাঁহার কালাম বা হাদীছকে মান্য করিতে প্রস্তুত নহি," সেও কস্মিনকালে মুছলমান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই সূরার ১৫০ আয়াতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ ঘটিবে।

সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী

(টীকার সংখ্যা শব্দের প্রথমে ও পৃষ্ঠার সংখ্যা শেষে দেওয়া হইল)

সূরা ফাতেহা

সূরা বাকারা

সূরা আল-এমরান

অভিধানের সিদ্ধান্ত ও রাছুলুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রতি-পাদিত হইতেছে যে, প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই খাম্‌র পদ-বাচ্য।

হযরতের একটি হাদীছে আছে—"খেজুর ও আঙ্গুর হইতে মদ প্রস্তুত হয়।" (বোখারী)। এই হাদীছ দ্বারা কেহ কেহ ইহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, এই দুইটি ব্যতীত অন্যান্য ফল বা শস্য দিয়া যে মদ তৈয়ারী করা হয়, তাহা খাম্‌র পদ-বাচ্য নহে। তাঁহাদের মতে খেজুর ও আঙ্গুর হইতে যে মদ প্রস্তুত হয়, তাহার অল্প পরিমাণও হারাম। কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্যান্য জিনিস হইতে যেসব মদ প্রস্তুত হয়, নেশা না হওয়া পর্যন্ত তাহা হালাল। মদ্যপানের জন্য যে 'হদ' বা দণ্ড নির্ধারিত আছে, তাহার উপরও এই অভিমতের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে।

কিন্তু "এই দুইটি বৃক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষের ফল হইতে মদ তৈরী হয়," হাদীছের এই উক্তির অর্থ ইহা নহে যে, এই দুইটি ফল ব্যতীত অন্য কোনও ফল বা শস্যাদি হইতে যে মাদক প্রস্তুত করা হইবে, তাহা মদ পর্যায়ভুক্ত হইবে না। বরং ইহার অর্থ এই হইবে যে, "সাধারণতঃ এই দুইটি ফল হইতে মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।" এই তাৎপর্য অন্য পক্ষের আলেমগণও স্বীকার করিতেছেন।

মাদক মাত্রই যে, খাম্‌র পর্যায়ভুক্ত, উপরে হযরতের উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইতেছে। হযরত ওমর "রাছুলের মিম্বারের উপর" দাঁড়াইয়া ছাহাবিগণকে খোৎবা দিতেছেন আর বলিতেছেন:

قد نزل تحريم الخمر و هى من خمسة اشياء : العنب و التمر
والحنطة و الشعير و العسل ' و الخمر ما خامر العقل - (بخارى)

"খাম্‌র নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম নাজেল হইয়াছিল, এবং অবস্থা এই যে, তখন খাম্‌র তৈয়ার করা হইত পাঁচটি বস্তু হইতে: আঙ্গীর হইতে, খেজুর হইতে, গম হইতে, যব হইতে ও মধু হইতে। বস্তুতঃ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যাহাকিছু, সে সমস্তই খাম্‌র।" (বোখারী)। সুতরাং খাম্‌র শব্দকে যে, মাত্র দুইটি দ্রব্যে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে না, তাহা হযরতের হাদীছ ও হযরত ওমরের ব্যাখ্যান হইতে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হযরত ওমর এই বায়ান দিয়াছিলেন মদীনার মাছজিদে, রাছুলের মিম্বরে দাঁড়াইয়া—হযরতের বহু ছাহাবীর সম্মুখে—এবং কেহই তাঁহার উক্তির প্রতিবাদও করেন নাই।

"যে পরিমাণ পর্যন্ত মানুষের হুঁশ-হাওয়াছ নষ্ট হইয়া না যায়, সেই পরি-মাণ মদখাওয়া হালাল," ইহাও হাদীছের বিপরীত কথা, এবং আমি যতদূর

জানি, হানাফী মজহাবেরও বিপরীত কথা। হযরত রাছুলে কারীমের বহু হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে—

(১) জাবেরের রেওয়ায়ত : হযরত বলিয়াছেন—

ما اسكر كثير فقليله حرام – (ترمذى ' ابوداؤد ' ابن ماجه)

"যাহার অধিক পরিমাণে নেশা হয়, তাহার অল্প পরিমাণও হারাম। (তিরমিজি, আবু-দাউদ, এবনে মাজা)।

(২) বিবি আয়েশার রেওয়ায়ত :

ما اسكر منه الفرق فملاء الكف منه حرام – (احمد ' ترمذى ' ابوداؤد)

"যাহা এক ভাঁড় খাইলে নেশা হয়, তাহার এক গণ্ডুষও হারাম। (আহমাদ, তিরমিজী, আবু-দাউদ)।

ইহা ব্যতীত, মদ তৈয়ার করা, মদের ক্রয়-বিক্রয় ও তাহাতে কোনও প্রকারে সাহায্য করা, মদের ছের্কা বা "ঔষধার্থে" সুরাপান, ইছলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া আছে। হযরতকে রোগের ঔষধ হিসাবে মদের ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলেন : (مسلم) – انه ليس بدواء و لكنه داء

"ঔষধ হওয়া দূরে থাকুক, উহা নিজেই একটা ব্যাধি" (মোছলেম)। মদ নিজেই যে একটা মারাত্মক ব্যাধিস্বরূপ এবং মানুষের হৃদয়, মস্তিষ্ক ও সমস্ত শরীরের পক্ষে সকল হিসাবে সর্বনাশকর, দুনিয়ার সমস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে।

হানাফী ফেকার কয়েকখানা পুস্তকে মদ ও মাদক সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহা দেখিয়া মনে হয়, ইমাম আবু-হানীফা ও তাঁহার মজহাব-অবলম্বী আলেমগণ বহুক্ষেত্রে এই সকল হাদীছের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কিন্তু হানাফী ফেকার আদ্যান্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ইহা সঙ্গত কথা নহে। হানাফী মজহাবের مفتى به বা গৃহীত মত হাদীছগুলির সম্পূর্ণ অনুরূপ। আলেম পাঠকগণ, নওয়াব কোতোবুদ্দীন ছাহেবের মাজাহেরুল-হক ও মেশকাতের এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হাশিয়াগুলি পাঠ করিলে প্রকৃত হানাফী মজহাবের সন্ধান পাইতে পারিবেন।

আয়াতে বলা হইতেছে যে, মদে ও জুয়ায় কিছু কিছু মানুষের কিছু কিছু উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার উপকার অপেক্ষা অপকার অনেক বেশী। উপকার লাভ করে প্রধানতঃ প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারী মহাজনগণ আর মদ

ব্যবসায়ী রাজপুরুষগণ। ইহা ব্যতীত মদ ও জুয়া অন্য সকলের পক্ষে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক প্রভৃতি সব দিক দিয়া সর্বনাশকর।" "ঔষধার্থে সুরাপান" করিলে সাময়িকভাবে শরীরে কিছু উত্তাপ বা উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারিলেও, সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে আরম্ভ হইয়া যায়।

ছাহাবী আবু হোরায়রার এক রেওয়ায়ত হইতে জানা যায় যে, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে ইহাই কোর্‌আনের প্রথম আয়াত। ইহার পর সূরা নেছার ৪৩ আয়াতে, এই প্রসঙ্গের অবতারণা করার পর, সূরা মায়দার ৯০ আয়াতে চরম নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়।

১৭২। **টীকা : ব্যয়ের পরিমাণ** - হিজরতের পর ও বদর যুদ্ধের পূর্বে, মদীনার মোছলেম সমাজে বিভিন্ন স্বাভাবিক কারণে, নানা প্রকার সমস্যা ও জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইয়া যায়। এখানে সেগুলির উত্তর দেওয়া হইতেছে। জেহাদের সূচনা হওয়ার পর, স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, তাহার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে। এই ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার জন্য মোছলেম সমাজ নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন— আমরা জেহাদের জন্য দান করিব—কি পরিমাণ? হুকুম হইলে যথাসর্বস্ব দান করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। উত্তর আসিল—সংসার-ব্যয় নির্বাহ করার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়, তাহাই দান করিবে।

দুনিয়ার জীবনকে উপেক্ষা করিয়া যে সন্ন্যাস, অথবা পরজীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া দুনিয়াদারীর যে মোহ, ইহার কোনোটির স্থান আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক ধর্মে নাই। আল্লাহ্ নিজের আয়াতগুলিকে সরল প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন, যেন আমরা নিজেদের উভয় জীবনের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারি, এবং সেমতে অমঙ্গলকে বর্জন করিয়া মঙ্গলকে অর্জন করিতে সমর্থ হই।

১৭৩। **টীকা : এতীমদিগের লালন-পালন**—এতীম বা পিতৃহীন বালক-বালিকার প্রতিপালনের সমস্যা সব সমাজে আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু মুছলমান সমাজে এই সমস্যাটা তখন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আসন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের আশঙ্কায়। আয়াতে এতীমদিগের ইছলাহ বা সুধার করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, শুধু অন্নবস্ত্রের কথা বলিয়া কোর্‌আন ক্ষান্ত হয় নাই। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে সকলের সর্বদা সজাগ থাকা আবশ্যক।

১৭৪। **টীকা : মোশরেকের সহিত বিবাহ**—মোমেনের সহিত মোশরে-

কের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিবে না, ইহাই হইতেছে আয়াতের স্পষ্ট নির্দেশ। আল্লাহ্‌র জাতে বা ছেফাতে অর্থাৎ সত্তায় বা গুণে অন্য কাহাকে বা অন্য কিছুকে শরীক করার নাম শের্‌ক। আল্লাহ্‌কে যে স্বীকার করে না সে কাফের, এবং স্বীকার করিয়াও অন্য কাহাকে বা কিছুকে যদি কেহ তাঁহার জাতের বা ছেফাতের কোনও অংশের শরীক বলিয়া বিশ্বাস করে, সে হইতেছে মোশরেক। প্রত্যেক মোশরেকই কাফের, কিন্তু প্রত্যেক কাফের মোশরেক নহে। কোর্‌আন মাজীদে বলা হইয়াছে— ان الشرك لظلم عظيم। নিশ্চয় শের্‌ক হইতেছে অতি বড় মহাপাতক। সুতরাং কোনও মোমেন নরনারীর সহিত কোনও মোশরেক নরনারীর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন বৈধ হইতে পারে না। অবশ্য, ইছলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর প্রাক্তন মোশরেকদের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদানে কোনও বাধা থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে আহ্‌লে-কেতাবদের সম্বন্ধে প্রায় প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আহ্‌লে-কেতাব নারী যদি মোশরেক না হয়, তাহা হইলে মুছলমান পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহ অবৈধ হইবে না। দুই খোদা বা তিন খোদা আকীদা হিসাবে যাহাদের ধর্মের অঙ্গ, তাহাদিগকে মোশরেকদিগের দলভুক্ত না করার কি কারণ থাকিতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না।

আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, মোমেন দাস-দাসীর মর্যাদা, স্বাধীন মোশরেক নরনারী অপেক্ষা বহু গুণে অধিক। হিন্দু ও খ্রীষ্টান নারীদিগকে বিবাহ করার ফল সাধারণতঃ মোছলেম জাতির পক্ষে কিরূপ সর্বনাশকর হইতে পারে, আমাদের ইতিহাসে ও বর্তমান যুগের বাস্তব দুর্ঘটনা-গুলিতে, তাহার বহু উদাহরণ নিহিত আছে।

---

২৮ রুকূ

২২২। এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে (স্ত্রীলোকের) মাসিক (কালীন ব্যবস্থা) সম্বন্ধে; বলিয়া দাও: উহা হইতেছে ক্লেশদায়ক, অতএব ঋতুকালে স্ত্রীদিগের "সংশ্রব" বর্জন করিবে; এবং উত্তমরূপে শুদ্ধ

٢٢٢ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ لا

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى
يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ
كُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ○

না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের "কাছে যাইবে না"—(১৭৫) অতঃপর যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন তাহাদিগেতে উপগত হইতে পার—আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে স্থানের আদেশ করিয়াছেন, সেইস্থানে; নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন তাওবা-কারীদিগকে, আরও পছন্দ করেন শুদ্ধিকামী লোক-দিগকে। (১৭৬)

٢٢٣ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ
وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

২২৩। স্ত্রীরা হইতেছে তোমাদিগের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, সেমতে তোমরা নিজেদের ক্ষেত্র-গুলিতে উপগত হইতে পার ইচ্ছামতভাবে, আর নিজেদের জন্য পূর্ব হইতে ভবিষ্যতের (সম্বল) করিয়া রাখিও এবং সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিও, আর জানিয়া রাখিও যে, তোমাদের সকলকে তাঁহার হুজুরে উপস্থিত হইতে হইবে; (১৭৭)

٢٢٤ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً
لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

২২৪। আর, তোমরা সদাচারী হইবে, সংযমী হইয়া চলিবে এবং জনগণের মধ্যে সুধার ও সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করিবে—আল্লাহ্র নামে কছম করার

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ط
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

বাহানায়, সে সকল (সৎ ও বৈধ) কাজ হইতে বিরত থাকিও না ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (১৭৮)

٢٢٥ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُ
كُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ط
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٥

২২৫। তোমাদের বেহুদা কছমগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু মনের সঙ্কল্প অনুসারে যেসব কছম তোমরা করিয়া থাক, তোমাদিগকে তিনি দায়ী করিবেন সেইগুলি সম্বন্ধে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাপরায়ণ, মহাধৈর্যশীল।

٢٢٦ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ٥

২২৬। আর, নিজেদের স্ত্রীদিগের সংশ্রবে যাইবে না বলিয়া যাহারা কছম করিয়া বসে, তাহাদের জন্য চারি মাসের অবকাশ দেওয়া হইতেছে, সেমতে এই সময়ের মধ্যে তাহারা যদি মত পরিবর্তন করে, সে অবস্থায় (জানা উচিত যে,) আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

২২৭। কিন্তু তাহারা যদি তালাক দেওয়ারই সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহা হইলে (জানা উচিত যে,) আল্লাহ্ হইতেছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (১৭৯)

২২৮। আর তালাকী স্ত্রীরা নিজ-দিগকে নিবৃত্ত রাখিবে তিন ঋতুস্নান পর্যন্ত ; এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভাশয়ে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে, তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে বৈধ হইবে না—তাহারা যদি সত্য-সত্যই আল্লাহ্‌তে ও পরবর্তী দিনে বিশ্বাস করিয়া থাকে ; অবস্থা এই যে, তাহাদের স্বামীরা এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করার সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে—যদি তাহারা সংশোধন করিয়া নিতে প্রয়াসী হয়। (১৮০) আর স্ত্রীদের যেমন দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্বামীদের উপর, স্বামীদেরও সেইরূপ দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্ত্রীদের উপর—যথানিয়মে (উভয়কে তাহা পালন করিতে হইবে) আর তাহাদের সম্বন্ধে পুরুষদিগের একটা বিশেষ দর্জা (degree) আছে। (১৮১)

২২৮ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْٓا إِصْلَاحًا ؕ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ع

তাফ্ছীর

১৭৫। টীকা ঃ ঋতুকালে স্ত্রী-সংশ্রব—বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে, বৈবাহিক জীবনের কতকগুলি কর্তব্য সম্বন্ধে নিম্নের আয়াতগুলিতে কয়েকটা বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে হায়েজ বা ঋতুকে اذى বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার অর্থ ক্লেশদায়ক বা ঘৃণাজনক বিষয়। "মাসিক"—এই উভয় অর্থে সমানভাবে প্রযোজ্য। আয়াতে এই সময় স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

আরবদেশের ইহুদী ও পৌত্তলিক সমাজ এই ব্যাপার সম্বন্ধে হইয়া পড়িয়াছিল চরমপন্থী। ঋতুবতী স্ত্রীলোকদিগকে ইহুদীরা নাপাক ও অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিত, তাহাদিগকে বাসগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিত, তাহাদের ছোঁয়া জিনিসপত্র ও কাপড়-চোপড়কেও নাপাক বলিয়া মনে করিত। অন্যদিকে পৌত্তলিক আরব সমাজ এসম্বন্ধে কোনও বাধা-নিষেধের ধার ধারিত না। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগকে সবদিক দিয়া যে নির্যাতন ভোগ করিতে হইত, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথম অবস্থায় মুছলমানদের কেহ কেহ ইহুদীদের পন্থার অনুসরণ করিতেন বলিয়াও জানা যায়। ইহুদীদের এই অত্যাচারমূলক ব্যবস্থার জন্য, পুরাতন নিয়ম, লেবীয় পুস্তক, ১৫ অধ্যায় ১৯-২৪ পদ দ্রষ্টব্য। কোরআনে ইহুদী ও পৌত্তলিকদিগের অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, মাসিকের সংশ্রবে ঘৃণ্য ও পীড়াদায়ক ব্যাপার যাহা আছে, শুধু সেইটুকু বর্জন করিয়া চলিতে হইবে, অন্য সব বিষয়ে স্ত্রীকে পাকছাফ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। (সংশ্লিষ্ট হাদীছগুলির জন্য এবন-কাছীর দ্রষ্টব্য)।

১৭৬। টীকা ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিক ব্যবস্থা—আয়াতে বলা হইতেছে যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাওয়ার (فاذا تطهرن) পর, তাহাদের সহিত সহবাস করিতে পার—আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন, সেই প্রকারে। এই تطهر বা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার অর্থ ঋতুস্নান, ইহা অধিকাংশ আলেমের মত। কিন্তু ইমাম আবু-হানিফা বলেন, হায়েজের মুদ্দত (১০ দিন) অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর, স্নান করার আবশ্যক হয় না (আল-মানার)।

আয়াতের এই অংশে আরও বলা হইয়াছে—শুদ্ধ হওয়ার পর স্ত্রীতে উপগত হইতে পারিবে, আল্লাহ্র অবধারিত স্থান হইতে। পুরুষ স্ত্রীতে উপগত হইবে কোন্ "স্থান" হইতে, আল্লাহ্ তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন দ্বারা জীবসৃষ্টির প্রথম দিন হইতে তাহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ইমাম রাগেব বলিতেছেন,

"حيث স্থানবাচক শব্দ, পরবর্তী বর্ণনায় উহার নির্দেশ পাওয়া যায়।" এখানে পরবর্তী আয়াতের বর্ণনায় এই "স্থানের" পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইমাম রাজী বলিতেছেন: "হায়ছো শব্দ মূলতঃ স্থানবাচক। মিন্‌-শব্দ—اذا نودى للصلواة من يوم الجمعة আয়াতের ন্যায় এখানেও ফী-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।" আমি এই হিসাবে অনুবাদ করিয়াছি।

১৭৭। **টীকা: শস্যক্ষেত্রের উপমা**—এই শ্রেণীর অনাচার যে সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় নিষিদ্ধ, তাহা হযরত রাছুলে কারীমের বহু এরশাদ হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, "রেওয়ায়ত পূজার" অন্যায় মোহে উন্মত্ত হইয়া, একদল লোক (এমন কি কোনো কোনো বিশিষ্ট গ্রন্থকারও) এই প্রসঙ্গে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর ন্যায় আদর্শ মুছলমানদিগের সম্বন্ধে এমন সব অভিমতের বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার উল্লেখ করিতেও আমরা লজ্জা বোধ করিতেছি। অথচ এই রেওয়ায়তগুলি জাল ও ইছলামের চিরন্তন শত্রুদিগের রচিত। বস্তুতঃ ইমাম মালেক চিরকালই কঠোর ভাষায় ইহার নিন্দা করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী তাঁহার আটখানা কেতাবে এই শ্রেণীর ব্যবহার করাকে হারাম ও মহাপাতক বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন (এবন-কাছীর)।

১৭৮। **টীকা: অন্যায় কছম**—মানুষ সব বিষয়ে সংযমী হইয়া চলিবে, সকলের প্রতি সৎ ব্যবহার করিবে ইহাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত। কিন্তু দুনিয়ায় এরূপ মানুষও আছে, যাহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য অথবা রাগদ্বেষে আত্মহারা হইয়া, ঐ সব কর্তব্য পালন করিবে না বলিয়া আল্লাহ্‌র নামে কছম করিয়া বসে। তাহার পর বলিতে থাকে, আমি আল্লাহ্‌র নামে কছম করিয়াছি, সুতরাং ঐসব কাজ করা আমার পক্ষে আর সঙ্গত হইতে পারে না। যেমন, একজন কছম করিল—আমি স্ত্রীকে খোরপোশ দিব না, বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিব না।

কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার জন্য আল্লাহ্‌র নামে হলফ করার মত বেহুদা কাজ আর কি হইতে পারে?

১৭৯। **টীকা: কছম সংক্রান্ত নির্দেশ**—কছম দুই প্রকার। ক্রোধ বা বদ-অভ্যাস বশতঃ অসতর্কতার ফলে যে কছম করা হয়, আল্লাহ্‌র অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও, সে জন্য কাহাকেও অপরাধী করা হইবে না। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। কিন্তু বুঝিয়া-সুজিয়া বা ইচ্ছা করিয়া যে কছম করা হয়, তাহার ফলাফল মানুষকে ভোগ করিতে হইবে।

কোরআন শরীফ

প্রথম খণ্ড

মোহাম্মদ আকরম খাঁ